গান্ধী-রচনাসম্ভার

পঞ্চম খণ্ড

[সর্বোদয়, অহিংস সমাজবাদ, গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি, স্বদেশী,
শিক্ষা, খাদি, পল্লী-পুনর্গঠন]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সম্পাদনা
সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি
পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম শতবার্ষিকী সংস্করণ
১০ই ফাল্গুন ১৩৭৬, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

গান্ধী-রচনাসম্ভার উপসমিতি ঃ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (সভাপতি)
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র
শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য (সম্পাদক)

পরিবেশক :
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির রচনাসম্ভার উপসমিতির পক্ষে

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মণীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
ও পি. এম. বাক্চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্চি কর্তৃক
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

লোক শিক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁর জনসেবামূলক জীবনের ঊষাকাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রায় কিছু পূর্ব পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন। ভারত সরকার গড়ে ৪০০ পৃষ্ঠার ৭০ খণ্ডে ইংরাজীতে তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন যার প্রায় অর্ধেক এ যাবৎ প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাঙলা দেশের গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির যা সঙ্গতি এবং তার হাতে যা সময় তাতে বলা বাহুল্য গান্ধীজীর সমগ্র রচনার বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। অথচ গান্ধীজীর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর একটি সঙ্কলন এই শতবার্ষিকীর বৎসরে আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রকাশিত হক—এমন দাবি বহু মহল থেকেই উঠছিল। তাই আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্গতি ও আয়োজনের এই নিদর্শন—ছয় খণ্ডের গান্ধী-রচনাসম্ভার।

সমগ্র রচনা বাঙলায় প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে যাতে তাঁর মৌলিক এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা এই রচনাসম্ভারে স্থান পায়। কেবল গান্ধী-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও অনুবাদকদের দিয়ে বঙ্গানুবাদ করান হয় নি, এর সম্পাদনার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের উপর। তাই আশা করা যায় বর্তমান সঙ্কলন বাঙলা ভাষায় গান্ধী সাহিত্যের এক প্রামাণ্য সঙ্কলন বলে বিবেচিত হবে।

অনুবাদক ও সম্পাদকবর্গ ছাড়া আমরা এই রচনাসম্ভার প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি আমাদের প্রকাশন উপসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীযুত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত চারটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান—মিত্র ও ঘোষ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী এবং দাসগুপ্ত প্রকাশনের কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহায়তা না পেলে এত অল্প সময়ে আমাদের পক্ষে এই বিরাট কাজ করা সম্ভবপর হত না। গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার জন্যই তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব বহনে সম্মত হয়েছেন—এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এক রকম নামমাত্র মূল্যে গান্ধী-রচনাসম্ভার বাঙালী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল। এঁদের

সকলকে আমরা গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি ও তার রচনাসম্ভার উপসমিতির তরফ থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অদ্বিতীয় চরিত্র ও কর্মের দ্বারা মুমূর্ষু এক জাতির মধ্যে নবীন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন এবং যুদ্ধ ও হিংসা জর্জর পৃথিবী নূতন করে বাঁচার মন্ত্র পাবার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাই তাঁর এই রচনাসম্ভার পাঠে দেশের তরুণ সমাজের ভিতর দীনতমের কল্যাণ সাধনের গঠনমূলক মানসিকতার শুভ উদ্বোধন হক—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে এই আমাদের কামনা।

শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক

শঙ্করপ্রসাদ মিত্র
চেয়ারম্যান

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
মহাজাতি সদন
১৬৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৭

সম্পাদকের নিবেদন

মূলতঃ গান্ধীজীর অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তাধারা সমূহ রচনাসম্ভারের পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বোদয়, অহিংস সমাজবাদ, গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি, স্বদেশী, শিক্ষা, খাদি এবং পল্লী-পুনর্গঠন ক্রমানুসারে সাতটি বিষয় রচনাসম্ভারের বর্তমান খণ্ডে আছে। এর মধ্যে 'সর্বোদয়' এবং 'গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি' বই দুখানি তিনি যেমন লিখেছিলেন তার সম্পূর্ণটাই উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাকী রচনা সমূহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নির্বাচিত অংশ বিশেষের সমষ্টি।

সর্বোদয়ঃ শব্দটির স্রষ্টা গান্ধীজী। তাঁর ভাবী সমাজের কল্পনা যে ধ্রুবপদের মধ্যে বিধৃত তা হচ্ছে সর্বোদয়। ১৯০৮ সালে জোহানেসবারগ থেকে ডারবান-এ যাওয়ার পথে জন রাস্কিনের 'আন্টু দিস লাস্ট' পুস্তকখানা তিনি পাঠ করেন, যা তাঁর জীবনে জাদুমন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করে। পরে তিনি পুস্তকটির গুজরাতীতে ভাবানুবাদ করেন। নাম দেন 'সর্বোদয়'। পুস্তকখানা পড়ার পর কয়েকটি জিনিস তাঁর কাছে "দিবালোকের ন্যায়" স্পষ্ট হয়। পরের দিন সকাল থেকেই সেই অনুসারে আচরণ করতে কৃতনিশ্চয় হন।*

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিঃ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে এবং পরবর্তী সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশ কাল ১৯৪৫। গান্ধীজীর কথায়, "রচনাত্মক কাজই হচ্ছে সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বরাজলাভের পথ।" স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে গঠনমূলক কাজের প্রয়াস তিনি করেছেন। একাজের সার্থক রূপায়ণ ব্যতীত, জগতের সামনে ভারতবর্ষ হয়ত স্বাধীন বলে ঘোষিত হবে কিন্তু ভারতের অধিবাসী আমরা স্বরাজের আস্বাদ পাব না—একথা তিনি মনে করতেন।

অহিংস সমাজবাদ, স্বদেশী, খাদি, পল্লীপুনর্গঠনঃ নবজীবন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত এই চারখানি বই থেকে রচনাসম্ভারের পরিসরের কথা ভেবে বিশেষ বিশেষ অংশগুলি নির্বাচিত করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও বিষয় একেবারে বাদ না পড়ে যায় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

---

* বিশদভাবে জানার জন্য গান্ধী-রচনাসম্ভার, প্রথম খণ্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় 'পুস্তকের যাদুমন্ত্র' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন।

উল্লেখনীয় যে, পরবর্তী তিনখানি বইর বহু বিষয় প্রথমটির মধ্যে এসে যাওয়ায় উক্ত তিনখানি বইর অনেকাংশ বাদ দিতে হয়েছে অথবা একটির বিষয় অপর একটির সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ার জন্য যে কোন একটাতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল চারখানি বই-ই পরস্পরের পরিপূরক।

শিক্ষা ঃ গান্ধীজীর শিক্ষা সম্পর্কীয় উক্তি ও রচনা সমূহ একত্রে অনূদিত ও গ্রথিত করে যে বৃহৎ পরিসরের পূর্ণাঙ্গ সংকলনটি (বোধ হয় অন্য কোন ভাষায় গান্ধীজীর শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তাধারা সমূহের এত বড আকারের সংগ্রহ একত্রে নেই) বইখানির অনুবাদক বাংলা ভাষীদের জন্য করেছেন তা থেকে অংশগুলি নির্বাচন করে এতে নেওয়া হয়েছে। মহাত্মাগান্ধী তাঁর গঠনকর্মপন্থায় শিক্ষাকে সকলের চেয়ে বড স্থান দিয়েছিলেন। তিনি আশা করতেন কালক্রমে সকল-রকম গঠনকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর আলাদা করে কোন কাজ করার দরকার হবে না, শিক্ষার কাজ করলেই সব কাজ করা হবে। শিক্ষার ভিতর দিয়েই নীরবে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হবে।

কোন মহৎ জীবনের অবসানের পর তাঁর রচনা সমূহই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য উত্তরাধিকার। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি এই কাজের দায়িত্ব আমাকে দেওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ ও সম্মানিত বোধ করছি। একাজে সকল দিক থেকে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে—তা ছাড়া সম্পাদনার কাজে অগ্রসর হওয়া যেত না।

সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি

বল্লভ ভবন
নস্করপুর, পোঃ আটবাটি
মেদিনীপুর

সূচীপত্র

সর্বোদয়

[জন রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' অবলম্বনে রচিত]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রস্তাবনা

পশ্চিম দেশে সাধারণত এই প্রকার ধারণা আছে যে, অধিক লোকের সুখ বা উন্নতি সাধন করাই মানুষের কাজ। সুখ বলিতে শারীরিক সুখ, টাকাপয়সার সুখ, এই অর্থ করা হয়। যদি এই সুখলাভের জন্য নৈতিক নিয়মসমূহ ভঙ্গ করিতে হয়, তবে তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। অধিক লোকের সুখের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার এই হেতু যে, যদি অল্প লোককে দুঃখ দিয়া অধিক লোককে সুখ দেওয়া যায়, তবে তাহা করিতে ক্ষতি নাই। ইহাই পশ্চিমের লোকেরা মনে করিয়া থাকেন। ইহার পরিণাম যে কি, তাহা আমরা পশ্চিম দেশের সকল স্থানেই দেখিতেছি।

বেশি লোকের শারীরিক ও আর্থিক সুখ যাহাতে হয় সেই প্রচেষ্টা করা ঈশ্বরের নিয়ম নহে। আর যদি সেই প্রচেষ্টা করিতে গিয়া নীতির নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহা ঈশ্বরের নিয়ম-বিরোধী কার্য হয়—এই কথাই পশ্চিমের কতিপয় জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় জন রাস্কিন একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব বিদ্বান্ ইংরেজ ছিলেন। চিত্রকলা ও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহার লেখা অনেকগুলি ভাল পুস্তক আছে। নীতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে ছোট একখানা পুস্তক হইতেছে, 'আনটু দিস লাস্ট'।* তিনি বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে এইখানাই সর্বাপেক্ষা ভাল। যে যে স্থানে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানেই ইহা খুব পঠিত হয়। অধিক লোকের হিত করার মতবাদ এই পুস্তকে খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, একমাত্র নীতির নিয়ম পালনেই জনসাধারণের কল্যাণ হয়।

---

* 'আনটু দিস্ লাস্ট' (Unto this last) পুস্তকটির এই নাম বাইবেলের একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রাখা হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপ এই :

॥ শেষে যে শ্রমিক এসেছেন ॥

এক ব্যক্তির আঙুর ক্ষেতে কাজের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। এই জন্য তিনি স্থানীয় বাজারে গেলেন এবং একজন শ্রমিকের সহিত কথা বলিয়া মজুরী নির্ধারণের পর তাঁহাকে নিজের কাজে নিয়োগ করিলেন। বিকাল বেলা তিনি দেখিলেন একজন শ্রমিক দিয়া কাজটা

আজকাল ভারতবর্ষে আমরা পশ্চিম দেশের খুব নকল করিয়া থাকি। কতক পরিমাণে উহা করা আবশ্যক বলিয়াই আমরা মানি। কিন্তু পশ্চিম দেশের অনেক রীতি যে খারাপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা খারাপ তাহা দূর করার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা অত্যন্ত করুণাজনক। আমরা পয়সা উপার্জন করিবার জন্য বিদেশে যাই, আর সেই গোলমালে নীতি কি, ঈশ্বর কে, তাহা ভুলিয়া যাই, স্বার্থের মধ্যে মিশিয়া যাই, ডুবিয়া যাই। ফলে, বিদেশে যাওয়ায় লাভ না হইয়া বরঞ্চ অনেক ক্ষতি হয়, অথবা বিদেশে যাওয়ার জন্য যে লাভ হওয়ার কথা তাহা পুরাপুরি হয় না। সকল ধর্মের সঙ্গেই নীতি যুক্ত রহিয়াছে। ধর্মের বিচার না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধি মত নীতি পালন করা আবশ্যক ও ইহাতেই সুখ—এই কথা জন রাস্কিন বলেন। তিনি পশ্চিম দেশের লোকের চক্ষু খুলিয়া দিযাছেন এবং আজ তাঁহার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া অনেক ইউরোপীয জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার চিন্তাধারা ভারতীয়দের পক্ষেও প্রযোজ্য মনে করিয়া উল্লিখিত পুস্তক হইতে, যাঁহারা ইংরেজী জানে না তাঁহারাও যাহাতে বুঝিতে পারেন এইভাবে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া স্থির করিযাছি।

সম্পূর্ণ করা যাইবে না। পুনরায় তিনি বাজাবে গিয়া আর একজন শ্রমিক লইয়া আসিলেন। প্রায সন্ধ্যা হইযা আসিয়াছে, তখনও কাজটা সম্পূর্ণ হইতে বাকী আছে দেখিয়া তিনি আবার বাজাবে গেলেন এবং আবও একজন শ্রমিক আনিয়া কাজে লাগাইলেন। সন্ধ্যার পব উক্ত তিনজন শ্রমিক সেই ব্যক্তিব নিকট আসিলে পর সকলকে তিনি সমান মজুরী দিলেন। প্রথম শ্রমিক এতে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "আমি সকাল হইতে কাজ শুরু করিয়াছি এবং সমস্ত দিন কাজ করিয়াছি। ইহারা দুইজন পবে আসিয়াছে এবং আমা অপেক্ষা কম সময় কাজ কবিয়াছে। তবুও আপনি আমাদেব তিনজনকে সমান মজুরী দিতেছেন। এর কারণ কী?" তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন, "দেখ তোমার সহিত মজুবী সম্পর্কে যে কথা হইয়াছিল, তদনুসারে আমি তোমাকে মজুরী দিয়াছি। তাই তোমার প্রতি আমি কোন অন্যায় করি নাই। এখন অন্য দুইজনেব কথা। ইহারা দুইজনে সকাল হইতে কাজের খোঁজে ছিল। সকাল হইতেই ইহাবা দুইজনে কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কাজ পায় নাই। ইহাতে ইহাদের কোন দোষ ছিল না। আমার কাজের জন্য ইহাদের প্রয়োজন ছিল। এদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। তাই আমি ইহাদের সাহায্য লইয়াছি এবং পুরা মজুরী দিয়াছি। পুরা মজুরী দিয়া শেষে যে শ্রমিক আসিয়াছে তাহার প্রতি আমি ন্যায়ই করিয়াছি।"

—সম্পাদক

মানুষের কি করা উচিত তাহা কিছু কিছু সক্রেটিস দেখাইয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তদনুরূপ আচরণ করিয়াছেন। একথা বলা যায় যে, রাস্কিনের এই লেখাগুলি সক্রেটিসের চিন্তাধারারই বিস্তৃত রূপ। যাঁহারা সক্রেটিসের বিচার অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজেদের বিভিন্ন কর্ম ব্যবসায় কিভাবে ব্যবহার করিবেন, তাহাই রাস্কিন সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার লেখার যে সারাংশ দিতেছি, ইহাকে তর্জমা বলা চলে না। অনুবাদ করিতে গেলে, বাইবেল ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি উদাহরণ পাঠকের বুঝিতে না পারার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আমি রাস্কিনের লেখার সারাংশ দিতেছি। পুস্তকখানার নামের অনুবাদ করি নাই, কেন না এই বইয়ের নাম যিনি বাইবেল পড়িয়াছেন শুধু তিনিই বুঝিবেন। পুস্তকখানা লেখার অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে সকলেরই—অধিকাংশের নয় সকলেরই—কল্যাণ হয়। সেই হেতু ইহার নাম 'সর্বোদয়' সকলের হিত বা উদয় দিয়াছি।

॥ ১ ॥

সভ্যতার মূল

মানুষ অনেক ভুল করিয়া ফেলে। কিন্তু পরস্পরের অনুভূতির প্রভাবের কথা বিবেচনা না করিয়া মানুষ যন্ত্রবৎ কাজ করে—এই ধারণা পরবশ হইতে তাহাদের আচার-আচরণের নিয়ম-কানুন রচনা করার মত ভুল আর কিছু হইতে পারে না। এই প্রকার ভুল করা আমাদের পক্ষে দোষের। উপর উপর দেখিলে ভুলের মধ্যে যেমন সত্য আছে বলিয়া ভ্রম হয়, লৌকিক নিয়মের ক্ষেত্রেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা লৌকিক নিয়ম সৃষ্টি করেন তাঁহারা বলেন যে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি একটা আকস্মিক বস্তু এবং এই সহানুভূতি সাধারণ প্রাকৃতিক রীতির বিরুদ্ধ। বরঞ্চ লোভ ও উন্নতি করার ইচ্ছা সর্বদাই থাকে। সেইজন্য যাহা আকস্মিক তাহা ত্যাগ করিয়া, মানুষকে পয়সা উপার্জনের যন্ত্র মনে করিয়া, কি প্রকারে শ্রম করিলে বা কোন্ কারবার করিলে বেশি পয়সা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, লোকের তাহাই চিন্তা করা উচিত। এই প্রকার চিন্তাধারার ভিত্তিতে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া, তারপর একে অন্যের প্রতি যতটুকু সহানুভূতি বজায় রাখা যায় তাহা রাখিয়া লৌকিক আচার-ব্যবহার চালাইতে হয়।

যদি পারস্পরিক অনুভূতি একটা লেনদেনের মত জিনিস হইত, তাহা হইলে উপরের যুক্তি ঠিক বলা যাইত। কিন্তু মানুষের প্রীতি বা সহানুভূতির সম্পর্ক একটা অন্তরের বস্তু, আর লেনদেনের রীতি একটা সাংসারিক নিয়ম মাত্র। সেইজন্য এই দুইটি বস্তু একজাতীয় নহে। কোন একটা জিনিসের গতি যদি এক দিকেই থাকে, আর তাহার উপর একটা শক্তি সর্বদার জন্য ক্রিয়া করে ও অপর একটা আকস্মিক শক্তি মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে আমরা প্রথমত সর্বদা ক্রিয়াশীল শক্তির পরিমাপ করিয়া পরে আকস্মিক শক্তির পরিমাপ করিয়া থাকি। এই উভয় শক্তির যোগ বা বিয়োগের ফল হইতে সেই বস্তুর গতি স্থির করিতে পারা যায়। এই পরিমাপ যে করা যায় তাহার হেতু হইতেছে এই যে, ঐ দুই প্রকারের শক্তি—সর্বদা প্রযুক্ত ও আকস্মিক শক্তি, একই জাতীয়। কিন্তু মানুষের আচার-ব্যবহারে লেনদেনের সর্বদা ক্রিয়াশীল শক্তি ও পারস্পরিক সহানুভূতির আকস্মিক শক্তি এই যে দুইটি শক্তি কার্য করিতেছে, ইহারা দুই জাতীয়। স্নেহপ্রীতি মানুষের উপর ভিন্ন প্রকারে

ভিন্ন নিয়মে কাজ করিয়া থাকে। উহা মানুষের স্বরূপ বদলাইয়া দেয়। সেইজন্য কোন বস্তু বিশেষেব উপর দুই শক্তির ক্রিয়ার ফল যেমন যোগবিয়োগ করিয়া আমরা হিসাব করিযা বাহির করিতে পারি, তেমন করিয়া স্নেহ-প্রেমের শক্তির হিসাব বাহিব করিতে পারি না। লোকের উপর স্নেহ-প্রীতির প্রভাব হিসাব করার বেলায় লেনদেনের ব্যবহারিক নিযম কোনই কাজে আসে না।

লৌকিক শাস্ত্রেব নিযম ভুল একথা বলার কোনও হেতু নাই। যদি ব্যায়াম শিক্ষক ইহাই স্থির করিয়া লন যে, মানুষ কেবল মাংসপিণ্ডমাত্র, হাড-পাঁজর নাই এবং এই ধারণার ভিত্তির উপর যদি তিনি নিয়ম সৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার সে নিয়ম ঠিক হইতে পারে কিন্তু হাড-পাঁজর-যুক্ত মানুষের পক্ষে তাহা খাটিবে না। সেইজন্যই লৌকিক শাস্ত্রের নিযম সত্য হইলেও, অনুভূতিপরাযণ মানুষের ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না। ব্যায়ামবীর যদি বলে যে, মানুষের মাংস আলাদা করিযা উহা দ্বারা পিণ্ড পাকাও বা লম্বা করিযা টানিযা উহাকে দড়ির মত কর, আরও যদি বলে যে এই মাংসে হাড-পাঁজরাও লাগাইয়া দাও, তাহা হইলে কি মুশকিলে পডিতে হইবে! কেহ এই রকম বলিলে আমরা তাহাকে পাগল বলিয়া থাকি, কেন না হাড-পাঁজরাকে মাংস হইতে আলাদা করিযা কসরতের নিযম খাটানো যায না। ঠিক সেই প্রকার, সাংসারিক শাস্ত্রের নিযম যদি মনুষ্যজাতির অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিযাই রচনা করা হয, তবে তাহা কোন কাজে আসে না। কিন্তু তাহা হইলেও আজকালকার সাংসারিক ব্যবস্থার নির্ধারণকারী শাস্ত্রীরা উপরোক্ত ব্যায়ামবীরের মতই করিতেছেন। তাঁহাদের হিসাবে, মানুষের শরীরটা নিছক যন্ত্র এবং ইহাই ধরিয়া লইয়া, তাঁহারা নিযম তৈরি করেন। শরীরের ভিতর যে জীব আছে, তাহা তাঁহারা জানিয়াও গণনার মধ্যে আনেন না। যে মানুষের ভিতর জীব বা আত্মাই প্রধান —মুখ্য, সে মানুষের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটে কেমন করিযা?

অর্থশাস্ত্র তো শাস্ত্রই নয়। উহা যে কোনও কাজের নয়, তাহা এক-একবার ধর্মঘট হইলেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সে সময় মালিক এক প্রকারে চিন্তা করে, শ্রমিকেরা ভিন্ন প্রকারে। লেনদেনের কোন একটা নিয়ম তখন কাজে লাগানো যায় না। মাথা কুটিয়া লোকে বুঝাইতে চায় যে, শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ একই কিন্তু শ্রমিক তাহা বুঝিতে চায় না। বাস্তবিক যদি দুইজনের স্বার্থ এক নাও হয়, তাহা হইলেও একের অপরের বিরোধী হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ধরুন কোন গৃহে খাদ্যাভাব হইয়াছে। বাড়িতে মা ও ছেলে আছে। দুইজনেই ক্ষুধার্ত। এখন এই দুইজনের, মা'র এবং ছেলের খাওয়ার স্বার্থ তো পরস্পরবিরোধী। মা

যদি খায় তবে ছেলে ক্ষুধার্ত থাকে, আর ছেলে খায তো মা ক্ষুধার্ত থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মা ও ছেলের মধ্যে কোনও ভেদ নাই! মায়ের গায়ে জোর বেশি বলিয়া মা-ই সমস্তটা ভাত খাইযা ফেলে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে অনুরূপ সম্বন্ধই আছে বুঝিতে হইবে।

ধরিয়া লওয়া যাক যে, মানুষ ও পশুতে কোনও ভেদ নাই এবং আমাদেরও পশুরই মত স্বার্থের জন্য পরস্পরের সহিত লড়িতে হইবে। তাহা হইলেও মালিক মজুরের মধ্যে সর্বদা ভেদ থাকিবে কিনা তাহা আমরা নিয়ম বাঁধিযা বলিতে পারি না। অবস্থানুসারে এই ভাবের পরিবর্তন হয। উদাহরণ স্বরূপ কাজটা ভাল হওযা চাই, এবং মজুরীও যেন পুরা পাওযা যায়—ইহাতে তো উভয়েরই স্বার্থ রহিযাছে। কিন্তু যখন লাভের অংশ বিতরণের সময হয, তখন একের লাভে অপরের লোকসান হইতে পারে। মজুর রুগ্ন ও অকর্মা হইয়া পড়ে এমন কম বেতন দেওযায মালিকের স্বার্থ রক্ষিত হয না, আবার যেখানে কারবার ঠিক চলিতে পারে না সেখানে মজুরের বেশি বেতন চাওযায় তাহার স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে না। যদি মালিকের হাতে কারবার চালু রাখার মত অর্থ না থাকে, তবে মজুরের পক্ষে তাঁহার নিকট হইতে পুরা বেতন বা এমন কি কিছুমাত্র বেতন চাওয়া স্পষ্টতঃ অনুচিত।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল লেনদেনের নীতির উপর কোনও শাস্ত্র খাড়া করা সম্ভবপর নয। ঈশ্বরের নিযম এই যে, টাকাপযসার কম-বেশির হিসাবের ভিত্তিতে মানুষের আচার-ব্যবহার পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। আচার-ব্যবহারের এই ভিত্তি ন্যায়ের উপর। সেইজন্যই লোকের পক্ষে নীতি হোক অনীতি হোক, যে-কোন প্রকারে নিজের কাজ আদায় করিয়া লওযার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করিতে হইবে। কোনও এক রীতিতে কাজ করিলে ভবিষ্যতে কি হইবে, একথা সব সময় বলা যায় না। কিন্তু এই কাজটা ন্যায্য, আর এই কাজটা অন্যায়, ইহা তো আমরা প্রায়ই বুঝিতে পারি। আর আমরা বলিতে পারি যে, নীতিমার্গে চলিলে পরিণাম ভালই হওয়া উচিত। সেই পরিণাম কি হইবে আর কিভাবে তাহা ফলিবে, একথা আমরা বলিতে পারি না।

নীতি অথবা ন্যায়ের নিয়মের মধ্যেই পারস্পরিক সহানুভূতির সমাবেশ ঘটে। আর সেই সহানুভূতির উপরই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের ভিত্তি রচিত হয়। ধরুন প্রভু যতটা পারে ভৃত্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করে। সে ভৃত্যকে এতটুকুও অবসর দেয় না, যতটা সম্ভব কম-বেতন দেয়, ছোট্ট কুঠুরীতে

থাকিতে দেয়। সংক্ষেপে যাহাতে ভৃত্যের দেহে প্রাণ থাকিতে পারে, ততটুকু মাত্র প্রভু ভৃত্যকে দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহাতে কিছু অন্যায় নাই। ভৃত্য নির্দিষ্ট বেতন লইয়া তাহার সমস্ত সময় মনিবকে দেয় এবং মনিব তাহা গ্রহণ করেন। কতটা কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে, মনিব তাহা অপরকে দেখিয়া স্থির করিয়া লন। ভৃত্য যদি আর কোথাও বেশি বেতন পায়, তবে সেই চাকুরি লইবার অধিকার তাহার আছে। আর লেনদেনের নিয়ম রচনাকারীগণ ইহাকেই 'অর্থশাস্ত্র' বলেন। তাঁহারা একথাও বলেন যে, এমনি করিয়া যত কম পয়সা দিয়া যত বেশি কাজ পাওয়া যায় তাহাতেই মনিবের লাভ ও অবশেষে সারা দেশের ইহাতে লাভ হয় এবং এইজন্য শেষ পর্যন্ত মজুরেরও লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কথাটা ঠিক নয়। যদি মজুর একটা যন্ত্রমাত্র হইত ও সেই যন্ত্র চালাইবার জন্য বিশেষ প্রকারের শক্তি লাগাইতে হইত, তাহা হইলে এই হিসাব খাটিত। কিন্তু এখানে মজুরকে যে চালায় সে শক্তি তো তাহার আত্মার। আর আত্মার যে বল, তাহা অর্থশাস্ত্রের সকল নিয়মের বাহিরে ও উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত ও সকল নিয়মকেই তাহা ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। মানুষরূপ কলে পয়সারূপ কয়লা দিলেই বেশি করিয়া কাজ আদায় করা যায় না। যেখানে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেইখানেই মজুর ভাল কাজ দিতে পারে। মনিব ও মজুরের সম্পর্ক পয়সার না হইয়া প্রীতির হওয়া চাই।

সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে মনিব বুদ্ধিমান ও উৎসাহী সেখানে প্রায়শঃ চাপ পড়িলেই মজুর নিজের কাজ করিয়া যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যেখানে মনিব অলস ও দুর্বল সেখানে মজুর যতটা কাজ করা উচিত ততটা করে না। কিন্তু সত্যিকার নিয়ম তো এই যে, যদি দুইজন মনিবের বুদ্ধি সমান থাকে ও দুইজনের মজুরও একই রকম হয়, তাহা হইলে যে মনিব সহানুভূতিপরায়ণ তাহার মজুর সহানুভূতিহীন মনিবের মজুর অপেক্ষা অধিক ও ভাল কাজ দিবে।

কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম ঠিক নহে। দয়া-মায়ার পরিবর্তে অনেক সময়ই বিপরীত ব্যবহার পাওয়া যায়। মজুর মাথায় ওঠে। কিন্তু এই প্রকার যুক্তি সঙ্গত নহে। যে মজুর সদয় ব্যবহার পাইয়া দায়িত্বহীন ব্যবহার করে, তাহার উপর চাপ দিলে সে কৃতঘ্নতা করিবে। যে মজুর উদারহৃদয় মনিবের প্রতি অবিশ্বস্ত আচরণ করে, অন্যায়কারী মনিবের সে ক্ষতিই করিবে।

এই হেতু সকল সময় প্রত্যেক মানুষের প্রতি পরোপকারীর দৃষ্টি রাখিলে ভাল

ফলই হয়। এখানে অনুভূতিকে আমরা একপ্রকার শক্তি বলিয়াই মনে করি। মমতা যে একটা ভাল জিনিস, আর সর্বদাই যে উহার আশ্রয়ই লওয়া উচিত তাহা ঠিক কথা। এখানে সে আলোচনা করিতেছি না। এখানে কেবল ইহাই দেখাইতেছি যে, অর্থশাস্ত্রের যে সাধারণ নিয়মের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, মায়া স্নেহ বা সহানুভূতির শক্তির নিকট তাহা কিছুই নয়।

কেবল তাহাই নয়, অনুভূতি এক ভিন্নপ্রকারের শক্তি বলিযা অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য নিয়মের সহিত উহা মিল খায় না। উহা অর্থশাস্ত্রের নিয়মসমূহকে এক কোণে ফেলিযা রাখিয়াই টিকিয়া থাকে। যে মনিব অঙ্ক কষিয়া, হিসাব করিযা প্রতিদান পাওয়ার আশাতেই মায়া প্রদর্শন করে, তাহার নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মায়া তো মায়ার জন্যই করা উচিত। উহার প্রতিদান না চাহিতে আপনি আসে। একটা কথা আছে নিজেকে পাইতে হইলে নিজেকে নিঃশেষ করিতে হয়, আর নিজেকে রাখার চেষ্টাতেই নিজের নাশ হয।

পল্টন ও তাহার সেনাপতিব উদাহরণ দেখুন। যদি কোনও সেনাপতি অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নিজের পল্টনের সিপাহীর নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে চায, তবে সে তাহার নিজ পছন্দমত কাজ করাইতে পারে না। অনেক স্থলেই দেখা যায যে, যে পল্টনের সেনাপতি নিজেই সিপাহীদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের সহিত স্নেহময় ব্যবহার করে, তাহাদের আনন্দে আনন্দ পায, দুঃখে দুঃখ বোধ করে, সংক্ষেপে বলিলে তাহাদের প্রতি সহানুভূতিপরাযণ হয়, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই সেনাপতিই সিপাহীদের নিকট হইতে যত কঠিন কাজ হোক না কেন, আদায় করিযা লইতে পারে। ঐতিহাসিক উদাহরণ হইতেও দেখা যাইবে যে, যেখানে সিপাহীরা সেনাপতিকে দেখিতে পারে না সেখানে যুদ্ধে জয় বড একটা হয না। সিপাহী ও সর্দারের মধ্যে এই যে প্রীতির সম্পর্ক ইহাই সত্যকার শক্তি। এমনিতে তো লুণ্ঠনকারী দলের মধ্যেও সর্দারের সহিত দলের প্রীতির বন্ধন রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কলকারখানায় মনিব ও মজুরের মধ্যে এই প্রকার গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। ইহার একটা কারণ এই যে, এই ধরনের কারখানায় মালিক ও মজুরের মধ্যে কেবল লেনদেনের সম্পর্কই আছে। সেইজন্যই মনিব-মজুরে প্রেমের সম্পর্ক না থাকিয়া তাহার বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। সহানুভূতির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে বিরোধই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে দুইটা প্রশ্নের বিচার আমরা করিব।

এক হইতেছে এই যে, লেনদেনের হিসাব না করিয়া মজুরদিগের বেতন

কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা যায়। দ্বিতীয় হইতেছে এই যে, পুরাতন ধরনের পরিবারের ভিতর চাকরে মনিবে যে সম্বন্ধ, অথবা পল্টনের ভিতর সিপাহী ও সেনাপতির যে সম্বন্ধ, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যতই বিপদের সময় আসুক না কেন সংখ্যার কমবেশি না করিয়া কি প্রকারে তেমনি সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়।

প্রথম প্রশ্নের বিচার করা যাক। আশ্চর্য এই যে, অর্থশাস্ত্রীরা কারখানার মজুরদের কাজের জন্য বেতনের একটা সীমা নির্দেশ করা যায় এমন কিছু করেন না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ নীলাম করিয়া বিক্রয় করা হয় না। যেমন লোকই হোন না কেন, তাঁহাদের সকলকেই এ পদে একই বেতন দেওয়া হয়। তেমনি যে সবচাইতে কম বেতন লইবে তাহাকেই আমরা পাদ্রী করি না। ডাক্তার ও উকিলদের বেলাতেও এজাতীয় আচরণ করা হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে বেতনের একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এখন কেহ বলিতে পারেন যে, তবে কি ভাল ও মন্দ মজুরের বেতন একই রকম হইবে? বাস্তবিক তো তাহাই হওয়া উচিত। তাহাতে ফল এই হইবে যে, আমরা যেমন সকল ডাক্তারের ফী একরকম হইলেও ভাল ডাক্তারকেই ডাকিয়া থাকি, যে সকল উকিলের ফী একই রকম তাহার মধ্যে ভাল উকিলকেই নিযুক্ত করিয়া থাকি, তেমনি সকল মজুরের মজুরী এক হইলেও আমরা ভাল মজুর বা কারিগরকেই কাজে লাগাইব। ভাল মজুরের বা কারিগরের পুরস্কার এই যে, লোকে তাহাকে পছন্দ করিয়া থাকে। তাই সকল শ্রেণীর মধ্যে স্বভাবতই বেতনের একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট হইয়া যাওয়া উচিত। যেখানে আনাড়ী লোক অল্প বেতন লইয়া মনিবকে ঠকায়, সেখানে ফল খারাপই হয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বিবেচনা করা যাক। ব্যবসার অবস্থা যাহাই হোক না কেন, কারখানায় যত কারিগর রাখা হয় তাহাদিগকে স্থায়ীভাবেই রাখা উচিত। যেখানে মজুরের কার্যের স্থায়িত্ব নাই সেখানে তাহাদিগকে বেশি বেতন চাহিতেই হয়। মজুরেরা যেখানে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, তাহার চাকরি আজীবন বজায় থাকিবে, সেখানে সে খুব কমেতেই কাজ করে। মনিব যদি মজুরকে স্থায়ীভাবে রাখে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ভালই হয় দেখা যাইতেছে। যে কারখানায় এইপ্রকার স্থায়ীভাবে লোক রাখা হয়, সেখানে বেশি লাভ হইতে পারে না। সেখানে বড় রকম ঝক্কিও লওয়া যায় না, আর টাকার কাঁড়িও একত্র করা যায় না। সৈনিক তাহার সেনাপতির জন্য মরিতে প্রস্তুত, সেইজন্য সৈনিকের কাজ অন্য কাজ

অপেক্ষা বেশি সম্মানের বলিয়া মনে করা হয়। সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে সৈনিকের কাজ মানুষকে হত্যা করা নয়, বরঞ্চ অপরকে রক্ষার জন্য নিজেই মৃত্যু বরণ করা। যে সৈনিক হইয়াছে, সে নিজের প্রাণ নিজের দেশের জন্য সমর্পণ করিযাছে। উকিল ডাক্তার বা পাদরীর সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। সেইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও উকিলের ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিত। ডাক্তারের উচিত অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া রোগীর চিকিৎসা করা। আর অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তবুও পাদরীর উচিত তাঁহার যজমানকে জ্ঞান দেওয়া ও তাহার কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য কাজ করিযা যাওয়া।

যদি উপরোক্ত জীবিকাগুলির সম্বন্ধে এই কথা খাটে, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাহা খাটিবে না কেন? ব্যবসাক্ষেত্রে প্রায়ই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওযা হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় যে, সাধারণত ব্যবসায়ীকে স্বার্থপরায়ণ গণ্য করিযা লওয়া হয়। ব্যবসার কাজ যদিও জন-সমাজের জন্যই আবশ্যক, তথাপি উহাকে কেবল নিজের উদর পূর্তির কাজ বলিয়াই ধরা হয। ব্যবসাদারেরা যাহাতে চট করিয়া বড়লোক হইযা উঠিতে পারে, আইন-কানুন তাহারই অনুকূল। প্রচলিত রীতিই এমনি হইয়া উঠিযাছে যে, ক্রেতা যতটা পারে কম দাম দিবে ও বিক্রেতা যতটা পারে বেশি আদায় করিবে। আর ইহাতেই লোকে ব্যবসাদারের বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে নীচু ধারণা পোষণ করে। এই রীতির পরিবর্তন করা দরকার। ব্যবসাদারেরা যে কেবল স্বার্থসিদ্ধিই করিবে, টাকাপয়সাই সঞ্চয় করিবে, এমন ত কথা নয়! এই রকম করাকে ব্যবসা করা না বলিয়া চুরি বলা যায়। সৈনিক যেমন দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তেমনি ব্যবসাদারকেও জনসাধারণের হিতের জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে, নিজেকেও পর্যন্ত বলি দিতে হইবে। প্রত্যেক রাজ্যেই—

প্রজার পালন হবে সৈনিকের ব্রত,
পাদরী করিবে তারে শিক্ষায় নিরত।
উকিলের ব্রত হবে তারে ন্যায় দান,
বৈদ্যের কর্তব্য তার স্বাস্থ্যের বিধান।
তারেই করিতে দান, নিজের ভাণ্ডারে
সঞ্চয় করিবে বৈশ্য পণ্যের সম্ভারে।

সৈনিকের নিজের স্থান ত্যাগ করার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করা উচিত। মড়কের

সময় পলাইয়া না গিয়া, নিজের সে রোগ হওয়ার ভয় থাকিলেও রোগীর চিকিৎসা করা বৈদ্যের কর্তব্য। সত্যকার শিক্ষা দিতে গেলে লোকে যদি মারিয়াও ফেলে, তবুও পাদরীকে অসত্যের পরিবর্তে সত্য-শিক্ষাই প্রচার করিতে হয়। ন্যায়ের জন্য যদি মরিতেও হয়, তথাপি ন্যায়প্রাপ্তিরই চেষ্টা করিবে, ইহাই উকিলের কর্তব্য।

কিন্তু উল্লিখিত জীবিকা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ওরূপ করিয়া মরার আবশ্যক কি, এই প্রশ্নের বিচার ব্যবসায়ী ও অন্য সকল উপজীবিকার লোকেরই করা দরকার। এই সব জীবিকা আশ্রয়কারী ব্যক্তিদেরই আবশ্যক হইলে নিজের জীবন সমর্পণ করাও উচিত। যে ব্যক্তি আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে মরিতে জানে না, সে জীবন কি তাহাও জানে না। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যবসায়ীর কাজ জনসাধারণের আবশ্যকীয় মাল যোগানো। যেমন বেতন ভোগ করা পাদরীর পেশা নয়, লোককে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার কর্তব্য, তেমনি ব্যবসায়ীর কার্যও লোকের মাল যোগানো, পয়সা রোজগার করা নয়। যে পাদরী লোক-শিক্ষা দেন, তিনি উদরান্ন পাইয়া থাকেন, তেমনি ব্যবসায়ীও লাভ পাইয়া থাকেন। এই দুই জীবিকার একটাও বেতন পাওয়ার বা লাভ করার দৃষ্টিতে করিতে নাই। বেতন পান বা না পান, লাভ হোক বা না হোক, উভয়েরই নিজ নিজ জীবিকা অনুসরণ করাই বিধি। যদি এই যুক্তি ঠিক হয়, তবে ব্যবসায়ীর কার্যও উত্তম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তখন সে জনসাধারণের জন্য উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করে ও প্রজা কিনিতে পারে এইভাবে তাহাকে যোগাইতে থাকে। এই কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া তাহার অধীনে যে শত শত বা হাজার হাজার লোক কাজ করে তাহাদের রক্ষা করা তাহার কর্তব্য, তাহাদের সুব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহা দেখা কর্তব্য। এই প্রকার ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক ধৈর্য, অনেক স্নেহ-মমতা ও অনেক কুশলতা চাই এবং এইপ্রকার কার্য করিতে গিয়া তাহাকেও যদি অপর জীবিকাশ্রয়ীদের মত মরিতে হয়, তবে মরা চাই। এই প্রকার ব্যবসায়ীর উপর যতই সংকট আসুক না কেন, সে যদি ভিখারীও হইয়া যায়, তবুও খারাপ মাল করে না ও লোককে প্রবঞ্চিত করে না। উপরন্তু সে নিজের অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত মমতাপূর্ণ আচরণ করে। অনেক সময় যুবকেরা কারখানায় অথবা ব্যবসাক্ষেত্রে চাকরি করিতে গিয়া বাড়ি-ঘর হইতে দূরে থাকে। সেখানে তো মনিবকেই মা-বাপ হইতে হয়। আর যদি ব্যবসায়ী উদাসীন হয়, তবে সেখানে যুবকেরা মা-বাপ হারা হইয়া পড়ে। এইজন্যই তো পদে পদে ব্যবসায়ী অথবা মনিবের মনে মনে নিজেকে একই প্রশ্ন করিতে হয়। সে প্রশ্ন এই: "আমি আমার নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি যে

প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি, আমার অধীনস্থ মজুর বা ভৃত্যদিগের প্রতি কি সেই প্রকার ব্যবহারই করিয়া থাকি ?”

কোনও কাপ্তানের অধীনে যখন খালাসীরা কার্য গ্রহণ করে, তখন সে খালাসীরা সন্তানের ন্যায় হইয়া পড়ে। কাপ্তানের কর্তব্য সকল লস্করকেই সন্তানের ন্যায় গণ্য করা। তেমনি কোনও ব্যবসায়ীর ব্যবসার ভিতর অনেক চাকর বা মজুরের মধ্যে নিজের ছেলেও যদি একজন থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজের ছেলের প্রতি যে ব্যবহার করেন, ভৃত্যদের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। ইহাকেই বলে সত্যকার অর্থশাস্ত্র। অনুরূপ ভাবে জাহাজ যখন বিপদে পড়ে তখন কাপ্তানের কর্তব্য যেমন সকলের শেষে সেই বিপদগ্রস্ত জাহাজ ত্যাগ করা, তেমনি যখন আকাল পড়ে অথবা যদি ব্যবসাতে কোন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন নিজের লোকদিগকে রক্ষা করাও ব্যবসায়ীর প্রাথমিক কর্তব্য। এই প্রকার যুক্তি কাহারও নিকট আশ্চর্য ঠেকিতে পারে। কিন্তু যদি সত্যসত্যই বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে আমি যে প্রকার বলিলাম উহাই রীতি হওয়া উচিত। জনসাধারণ যদি উর্ধ্বে উঠিতে চায় তবে তাহাদের মধ্যে অন্য প্রকারের কোনও রীতি চলিতেই পারে না। ইংরেজ যে আজ পর্যন্তও টিকিয়া আছে, তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা অর্থশাস্ত্রের বা লেনদেনের নিয়ম পালন করে। বরঞ্চ তাহারা অনেক সময়ই অর্থশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া উপরোক্ত নিয়মই পালন করিয়া থাকে। আর সেইজন্যই এখানকার লোকে এখনও টিকিয়া আছে। এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য প্রজার কি প্রকার ক্ষতি হয়, কেমন পিছাইয়া পড়িতে হয়, তাহা পরে বলিব।

আমরা সত্যের মূল কি সে সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি। তাহার জবাব অর্থশাস্ত্রীরা কেহ কেহ নিম্নমত দিয়া থাকেন : “পরস্পরের সহানুভূতি দ্বারা কতকটা লাভ হয় একথা ঠিক। কিন্তু এ জাতীয় লাভের হিসাব লেনদেনের অর্থশাস্ত্রীরা করেন না। তাঁহারা যে শাস্ত্রের কথা বলেন তাহাতে কীভাবে ধনবান হওয়া যায় সেই কথাই বলা হইয়া থাকে। আর এই শাস্ত্রটা যে মিথ্যা নয়, বরঞ্চ স্বার্থের সহায়কই বটে তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যাহারা ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী চলে, তাহারা খুব অর্থশালী হইয়া থাকে আর যাহারা সেই অনুসারে চলে না তাহারা গরীব হইয়া যায়। ইউরোপের ধনাঢ্য লোকেরা এই শাস্ত্র অনুযায়ী চলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধ-যুক্তি প্রদর্শন করার কোন মূল্য নাই। প্রত্যেক অভিজ্ঞ লোকই জানেন যে, অর্থ কেমন করিয়া আসে আর কেমন করিয়া যায়।”

এই সব যুক্তি ঠিক নয়। ব্যবসায়ীরা অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু তাহা সদুপায়ে

উপার্জন করিয়াছে কিনা ও তাহাতে জাতির হিত হইল কিনা একথা তাহারা জানে না। 'ধনবান' শব্দের অর্থ তাহারা অনেক সময়েই বুঝিতে পারে না। যেখানে ধনী আছে সেইখানেই দরিদ্র আছে—একথা তাহারা বুঝিতেই পারে না। অনেক সময় লোকে ভুল করিয়া বলিয়া থাকে যে, একটা বিশেষ পথে চলিলে সকলেই ধনী হইতে পারে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই ধনবান হওয়ার ব্যাপারটা কূপ হইতে জল তোলার চাক্কীর মত। একটা যদি খালি হয় তবে অপরটা ভরে। তোমার কাছে যদি একটা টাকা থাকে, তবে তাহার অস্তিত্বের প্রভাব যাহার কাছে টাকা নাই তাহার উপর পড়ে। যদি অপর লোকের ঐ টাকার গরজ না থাকে, তবে তোমার টাকা অকেজো হইয়া যায়। আমার টাকার অস্তিত্ব আমার প্রতিবেশীর দারিদ্র্য আধারিত। যেখানে নির্ধন আছে সেইখানেই ধনী। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি কাহাকেও ধনবান হইতে হয় তবে অপরকে দরিদ্র হইতে হইবে।

সার্বজনীন অর্থশাস্ত্রের মানে এই যে, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে আনন্দদায়ক ও দরকারী বস্তু উৎপাদন করা, উহা রক্ষা ও বিতরণ করা। যে কৃষক সময়মত শস্য উৎপাদন করে, যে রাজমিস্ত্রী ভাল করিয়া গাঁথনির কাজ করে, যে ছুতার কাঠের কাজ ভাল করিয়া করে, যে নারী নিজের ঘরগৃহস্থালী ঠিকমত চালায় তারা সকলে যথার্থ অর্থশাস্ত্রী। ইহারা সকলে প্রজার ধন বৃদ্ধি করে। ইহার বিপরীত যে শাস্ত্র তাহাকে সার্বজনীন বলা যায় না। উহাতে একজন মাত্র টাকা জমায়, আর অপরকে অভাবের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া সে টাকার ব্যবহার করে। এই প্রকারে যাহারা অর্থের ব্যবহার করে তাহারা নিজের ক্ষেতখামার ও পশ্বাদি হইতে কত টাকা হইতে পারে সেই হিসাব করিয়া নিজদিগকে ধনবান মনে করে। তাহাদের টাকার পরিবর্তে যতটা জমি বা পশু পাইতে পারে তাহাই যে টাকার মূল্য, সে কথা ভাবে না ও তাহারা আরও টাকা ও সোনারূপা সংগ্রহ করিতে থাকে। ঐ অর্থে তাহারা কত মজুর খাটাইতে পারে সেকথা ভাবে। এক্ষণে ধরিয়া লওয়া যাক যে, কোনও ব্যক্তির নিকট সোনা রূপা ও শস্যাদি আছে। এরকম লোকের মজুরের আবশ্যক। কিন্তু যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও সোনা রূপা বা শস্যের আবশ্যক না থাকে, তবে তাহার মজুর পাওয়া শক্ত হইবে। অর্থাৎ উক্ত ধনবান ব্যক্তিকে রান্না নিজেই করিয়া লইতে হইবে, নিজের সেলাইয়ের কাজ নিজে করিতে হইবে, নিজের ক্ষেত নিজে চষিতে হইবে। এই ব্যক্তির নিকট তাহার সোনার দাম খোলামকুচির সমান। তাহার সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য পচিবে, কেন না তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা সে তো বেশি খাইতে পারে না! অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে অপরের

ন্যায় কঠিন পরিশ্রম করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে। আর যদি এই অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে অনেক লোকে আর সোনারূপা ইত্যাদি জমাইতে চাহিবে না। যদি গভীরভাবে বিচার করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, টাকা জমানো মানেই অপরের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করা, নিজের সুখের জন্য চাকর ব্যবসায়ী ও কারিগরকে খাটাইয়া লওয়া। এই প্রকার খাটাইয়া লওয়া কতটা সম্ভব তাহা নির্ভর করে যাহাদিগকে খাটানো হইবে তাহাদের দারিদ্র্যের উপর। একজন ছুতারকে মজুরী খাটাইবার মত একজন মাত্র লোকই যদি থাকে, তবে ছুতারকে সেই ব্যক্তি যে মজুরী দেয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ছুতার খাটাইবার দুই-চারজন লোক থাকে, তবে যে বেশি পয়সা দিবে সেইখানেই ছুতার কাজ করিবে। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, অর্থশালী হওয়া মানে অপরকে যথাসম্ভব নিজের অপেক্ষা দরিদ্র করিয়া রাখা। সাংসারিক অর্থশাস্ত্রীরা একথা বলিয়া থাকে যে, এইভাবে জনসাধারণকে দরিদ্র করিয়া রাখাতেই তাহাদের লাভ। সকলে সমান হইবে—ইহা অসম্ভব। কিন্তু অন্যায় ভাবে লোকের মধ্যে দারিদ্র্য সৃষ্টি করাতে জনসাধারণ দুঃখীই হয়। স্বাভাবিক ভাবে ধনী দরিদ্র থাকায় জনসাধারণ সুখী হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

॥ ২ ॥

ধনের নেশা

সমাজের ভিতর অর্থের চলাচল, শরীরে রক্ত-চলাচলের সহিত তুলনা করা যায়। দেহে জোরে জোরে রক্ত চলাচল করিলে তাহা স্বাস্থ্যের অথবা লজ্জা পাওয়ার কিংবা জ্বরের চিহ্ন বলিয়া ধরা যায়। সুস্থ শরীর হইলে দেহে একপ্রকার রক্তিম আভা দেখা দেয়। অন্য এক প্রকারের রক্তাভা রক্তপিত্ত রোগ সূচিত করে। দেহের কোনও একস্থানে রক্ত জমাট হইয়া থাকিলে যেমন শরীরের ক্ষতি হয়, তেমনি এক জায়গায় যদি অর্থ জমিয়া থাকে তবে তাহাও জনসাধারণের ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে।

ধরুন দুইজন জাহাজের খালাসী জাহাজ ডুবি হওয়ায় কোনও জনশূন্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সেইখানেই তাহাদিগকে নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের

দিনপাত করিতে হইবে। যদি দুইজনেই সুস্থ থাকিয়া কাজ করে, তবে দুইজনেই বেশ ঘর বাঁধিয়া, ক্ষেত-খামার করিয়া কিছু ভবিষ্যতের জন্য বাঁচাইতেও পারে। উহাকে সত্যকার ধন বলিতে পারি। আর যদি দুইজনেই ভালভাবে কার্য করে, তবে দুইজনের অংশই সম-পরিমাণ হইবে। অর্থাৎ তাহাদের উপর যে অর্থশাস্ত্র প্রযুক্ত হয় তদনুসারে দুইজনে পরিশ্রমের ফল ভাগ করিয়া লইবার অধিকারী হইল। এখন মনে করুন, কিছুদিন পরে একজনের একত্র কাজ করিতে অনিচ্ছা হইল। তাহারা নিজ নিজ জমি ভাগ করিয়া লইল ও প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করিতে লাগিল। তারপর মনে করুন একজন অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন অপর ব্যক্তিকে সে সাহায্য করার জন্য ডাকিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতে পারে যে, "আমি তোমার জন্য কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু শর্ত এই যে, যখন আবশ্যক হইবে তখন তোমাকেও আমার জন্য খাটিয়া দিতে হইবে। তোমাকে লিখিয়া দিতে হইবে যে, যত ঘণ্টা আমি তোমার জন্য খাটিব, তত ঘণ্টা তোমাকে আমার জমিতে খাটিতে হইবে।" তারপর ধরুন সেই ব্যক্তির অসুস্থতা দীর্ঘদিন চলিল, আর প্রতিবারেই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ঐ প্রকার লিখিয়া দিয়া কাজ লইতে হইল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর উভয়ের অবস্থা কিরূপ হইবে? দুইজনেই গরীব হইয়া গেল বলিতে হইবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শয্যায় পড়িয়া থাকাকালীন তাহার কোন কাজ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি খুব কার্যক্ষম একথা ধরিয়া লইলেও, রোগীর জমিতে সে যত সময় কাজ করিয়াছে নিজের জমিতে সেই সময়টা দিতে পারে নাই—একথা তো সোজা। সেইজন্য দুইজনের যে সম্পত্তি হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হইল।

কেবল তাহাই নয় উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বদলাইয়া গেল। রোগীটি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ঋণগ্রস্ত হইল। এখন সে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট মজুরী করিয়াই নিজের অন্নাদি পাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাক যে, এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই অঙ্গীকার-পত্রগুলি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইল। যদি সে তাহা করে তবে তখন সে নিজে আয়েস করিতে পারে, অলস হইতে পারে অথবা যদি ইচ্ছা করে তবে সে প্রথমোক্ত লোকের নিকট হইতে আর একবার শর্তও লিখাইয়া লইতে পারে। আর তাহা যে অন্যায় হইবে একথাও কেহ বলিতে পারে না। এখন যদি কোনও আগন্তুক সেখানে আসিয়া পড়ে, তবে সে কি দেখিবে? দেখিতে পাইবে যে, একজন লোক ধনশালী হইয়াছে ও অপরজন দরিদ্র। একজন আয়েস আরাম করিয়া অলস হইয়া পড়িয়াছে, অপরজন দুইজনের মজুরী করিয়াও দারিদ্র্য ভোগ

করিতেছে। ইহা হইতেই পাঠক দেখিবেন যে, অন্তের মজুরী করার ফলে সত্যকারের সম্পত্তি কমিয়া গিয়াছে।

এখন অপর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। তিনজন লোক মিলিয়া এক রাজ্য স্থাপনা করিল ও সকলেই পৃথক পৃথক বসবাস করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল, যাহা সকলেরই কাজে লাগিতে পারে। মনে করুন যে, তাহাদের মধ্যে একজন সকলের সময় বাঁচাইবার জন্য নিজের চাষ পরিত্যাগ করিয়া একের মাল অন্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ লইল ও তাহার পরিবর্তে তাহাদের শস্যের অংশ লওয়া স্থির করিল। যদি এই ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে মাল আদানপ্রদান করিতে থাকে তবে সকলের লাভ হইবে। কিন্তু ধরিয়া লউন মাল লেন-দেন করার সময় এই ব্যক্তি চুরি করে। তাহার পর যখন দুঃসময় আসে তখন সেই দালাল নিজের চোরাই মাল খুব বেশি দামে বিক্রয় করে। এই প্রকারে শেষ পর্যন্ত সে উভয় কৃষককেই ভিখারী করিয়া ফেলিবে এবং অবশেষে তাহাদিগকে নিজের মজুর করিয়া লইবে।

উপরের উদাহরণে অন্যায়টা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও আজকালকার ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় এইভাবেই চলিতেছে। আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, এইভাবে চুরির ঘটনাটা ঘটার পরে তিনজনের সম্পত্তি একত্র করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দালাল যদি বিশ্বস্ত হইত তাহা হইলে একত্রিত সম্পত্তি যতটা হইত তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে। ঐ দুইজন কৃষকের কাজও কম হইয়াছে। তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি না পাওয়াতে তাহাদের পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইতে পারে নাই। আবার সেই চোর দালালের হাতে যে মাল আসিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ ও সৎ ব্যবহার সম্ভবপর হয় নাই।

এইভাবে আমরা গণিতের হিসাব করিয়া বলিতে পারি যে, কোনও ব্যক্তি বিশেষের ধন কিভাবে উপার্জিত হইয়াছে তাহারই উপর সে ধনবান কিনা তাহা নির্ভর করে। কাহারও নিকট এতটা অর্থ আছে বলিয়াই তাহাকে অর্থশালী বলা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের হাতে বিশেষ পরিমাণ অর্থ যেমন তাহার অধ্যবসায় চাতুর্য ও উদ্যমশীলতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তেমনি উহা অনিষ্টকারী ভোগবিলাস, অত্যাচার ও জাল-জুয়াচুরির চিহ্ন বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। আর এই প্রকারে হিসাব করাকেই শুদ্ধ নীতিশাস্ত্র বলে। একপ্রকার ধন আছে যাহা দশগুণ হয় আবার আর একপ্রকারের আছে যাহা কোন মানুষের হাতে পড়িয়া দশগুণ হানির কারণ হয়।

এই হেতু, নীতি-অনীতির বিচার না করিয়া ধন সংগ্রহ করার রীতি ও নিয়ম স্থির করাতে মানুষের অহঙ্কারই প্রকট হয়। 'যত পার সস্তায় কিনিয়া যত পার চড়া দামে বেচিবে' ব্যবসার এই নিয়ম অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অপমানজনক আর কোনও নিয়ম নাই। 'যত পার সস্তায় লইবে' ইহা তো ঠিক, কিন্তু সস্তা হইবে কেমন করিয়া? আগুন লাগিয়া বাড়ি পুড়িয়া গেলে কড়িকাঠের কয়লা সস্তা হইতে পারে, ভূমিকম্পে বাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িলে ইট সস্তা হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আগুন লাগা বা ভূমিকম্প হওয়া লোকের পক্ষে লাভজনক—একথা কেহ সাহস করিয়া বলিবে না। আবার 'যত পার চড়া দামে বেচিবে' কথাটা তো বুঝা গেল। কিন্তু চড়া দাম হইবে কিরূপে? আজ তুমি রুটির দাম খুব ভাল পাইয়াছ, কিন্তু সেই দাম কি তুমি অন্নাভাবে মরণাপন্ন লোকের শেষ কড়ি হইতে লইয়াছ? অথবা সেই রুটি তুমি কোন মহাজনকে বেচিযাছ, যে কাল তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইবে? অথবা কোনও সশস্ত্র ব্যক্তি তোমাকে ঐ দাম দিয়াছে যে কাল তোমার ব্যাঙ্ক লুট করিবে? হইতে পারে এ সকল প্রশ্নের উত্তর তুমি এ সময় দিতে পার না—কেন না তুমি জান না। কিন্তু তুমি ন্যায্যমূল্যে সুনীতি অনুসারে রুটি বেচিযাছ কিনা তাহা তো বলিতে পার। আর ন্যায্যমূল্য রাখাই উচিত। তোমার কাজ হইতে কাহারও যাহাতে দুঃখ না হয় এইটুকু জানা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করা তোমার কর্তব্য।

আমরা দেখিযাছি, টাকার দাম নির্ভর করে উহা দিযা লোককে মজুরী দেওয়ার উপর। যদি বিনামূল্যে মজুরী পাওয়া যায়, তবে তো টাকার দরকারই হয় না। বিনা পয়সায় লোকের মজুরী পাওয়া যায়, এ প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে যেখানে অর্থবল দ্বারা কাজ হয় না সেখানে সদিচ্ছা দ্বারা কাজ হয়। ইংলণ্ডের বহুস্থানে লোককে পযসা দিয়া ভুলানো যায় না।

আবার যদি আমরা একথা স্বীকার করি যে, লোকের নিকট হইতে কাজ লওয়ার শক্তির নামই ধন, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, লোকে যে পরিমাণে নীতিপরায়ণ ও দক্ষ হয় সেই পরিমাণেই ধন-দৌলত বাড়ে। এই প্রকার বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সত্যকার ধন সোনারূপা নয়। খাঁটি ধন তো মানুষ নিজে! ধনের সন্ধান ভূগর্ভে করার দরকার নাই, মানুষের হৃদয়েই উহার সন্ধান করিতে হয়। আর যদি একথা সত্য হয়, তবে সত্যকার অর্থশাস্ত্রের নিয়ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষের দেহ, মন ও প্রাণের স্বাস্থ্য রক্ষা করাই সত্যকার সম্পদ। এমন এক সময় আসিবে যখন ইংলণ্ড, গোলকুণ্ডার হীরকে নিজের দাসদিগকে সজ্জিত করিয়া

নিজেদের সম্পদ দেখাইবার পরিবর্তে, গ্রীসের যথার্থ খ্যাতিমান ব্যক্তির মত নিজেদের নীতিপরায়ণ মহাপুরুষদিগকে দেখাইয়া বলিতে পারিবে যে, 'ইহারাই আমার ধন-দৌলত'।

॥ ৩ ॥

যথার্থ ন্যায়

খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে একজন ইহুদী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সলোমন। তিনি বহু ধন উপার্জন করেন এবং তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ছিল। তাঁহার কাহিনী আজও ইউরোপে প্রচলিত আছে। ভেনিসে তিনি এত জনপ্রিয় হইয়া উঠেন যে, ভেনিসবাসী তাঁহার মূর্তি নির্মাণ করে। যদিও তাঁহার নীতি-বাক্য আজও লোকে মুখস্থ করিয়া থাকে, তবুও সে অনুসারে কম লোকই আচরণ করিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন, "মিথ্যা বলিয়া যাহারা অর্থ উপার্জন করে তাহারা অহঙ্কারী ও তাহাদের ঐ অর্থ মৃত্যুরই চিহ্ন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "অন্যায়কারীর ধন দ্বারা কোন লাভ হয় না। সত্যই মৃত্যু হইতে বাঁচায়।" এই উভয় বাক্য দ্বারা সলোমন বলিতেছেন যে, অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থের পরিণাম মৃত্যু। আজকাল এমন সুন্দর ভাবে মিথ্যা বলা হয়, মিথ্যা আচরণ করা হয় যে, সাধারণত উহাকে মিথ্যা বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় না। যেমন ধরুন, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে, লোক ভুলাইবার জন্য জিনিসপত্রের উপর মিথ্যা কথা-পূর্ণ লেবেল আঁটিয়া দেওয়া থাকে ইত্যাদি।

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আরও বলিয়া গিয়াছেন, "যাহারা ধন বাড়াইবার জন্য গরিবকে পীড়ন করে, শেষকালে তাহাদের ভিক্ষাই করিতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "গরিব বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও দুঃখী ব্যক্তিদিগের উপর জুলুম করিও না, কেন না যাহারা গরিবকে দুঃখ দেয় তাহাদিগকে ঈশ্বর দুঃখ দিয়া থাকেন।" তাহা হইলেও আজকাল ব্যবসার ক্ষেত্রে মৃতপ্রায়দিগকে পদাঘাত করা হয়। যাহারা খুব দুরবস্থার মধ্যে আছে তাহাদের নিকট হইতেও লাভ আদায় করিতে আমরা প্রস্তুত। ডাকাতেরা তো ধনীর গৃহেই ডাকাতি করে। কিন্তু ব্যবসায় গরিবকেই লুণ্ঠন করা হয়। সলোমন আরও বলেন, "ধনী ও নির্ধন

উভয়েই সমান। ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন।" ধনীর গরিব ব্যতীত, আর গরিবের ধনী ব্যতীত চলে না। একের নিকট অপরের প্রয়োজন সর্বদাই হইতেছে। সেইজন্যই ইহাদের কেহ কাহাকেও উচ্চ বা নীচ বলিতে পারে না। কিন্তু তাহারা যখন একথা ভুলিয়া যায় এবং একথাও যখন তাহাদের মনে থাকে না যে ঈশ্বরই তাহাদিগকে জ্ঞান দেন তখন বিপরীত পরিণাম দেখা দেয়।

ধন-সম্পদ নদীর মত। নদী সকল সময় সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ নিম্নদিকে যায়। তেমনি দৌলতেরও যেখানে আবশ্যক সেইখানেই যাওয়া চাই। ইহাই নিয়ম। আবার নদীর মত দৌলতেরও গতির পরিবর্তন হইতে পারে। যখন নদীর প্রবাহ একবার এদিকে একবার সেদিকে চলে তখন আশেপাশে অনেক জল জমিযা যায় ও বিষাক্ত হাওয়া উৎপন্ন হয়। আর যদি সেই নদীকে বাঁধ দিযা উহার জল যেখানে প্রয়োজন সেখানে লওয়া হয়, জল তখন ভূমিকে রসাল করে ও আশপাশের হাওয়া সুন্দর হয়। তেমনি ধনের যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে মানুষের মধ্যে অন্যায ও বুভুক্ষা বাড়ে, সংক্ষেপে সেই দৌলত বিষে পরিণত হয়। কিন্তু সেই সম্পদকে নিয়ন্ত্রণে রাখিযা নিযমমত খরচ করিলে বাঁধ দেওযা নদীর মত সুখদাযক হইযা উঠে।

অর্থশাস্ত্রীরা দৌলতের গতি নিয়ন্ত্রিত করার নিযম একেবারে ভুলিযা যান। কেবল ধন সঞ্চয করাই তাহাদের শাস্ত্র। কিন্তু ধন-দৌলত তো নানা রকমেই সংগ্রহ করা যায়। এমন একদিন ছিল যখন ইউরোপে ধনশালী লোককে বিষ দিয়া মারিযা তাহার ধন লইয়া লোকে ধনশালী হইত। আজকালকার দিনে গরিব লোকের জন্য উৎপন্ন খাদ্যে ব্যবসাযীরা ভেজাল দিযা থাকে। দুধে সোহাগা দেওয়া হয, আটায় আলুর ভেজাল দেওযা হয, কফিতে ভেজাল থাকে, মাখনে চর্বি দেওয়া হয় ইত্যাদি। ইহাও তো বিষ দিয়া টাকা করার সমান। ইহাকেই কি আমরা ধনবান হওয়ার কৌশল অথবা শাস্ত্র বলিব?

কিন্তু একথা মনে করা উচিত নহে যে অর্থশাস্ত্রীদের বক্তব্য হইল লুট করিয়া পয়সা কর। তাহাদের বলা উচিত যে 'নিয়মমত ও ন্যায্য' উপায়ে ধনবান হওয়া তাহাদের শাস্ত্র। আজকাল দেখা যায় যে, অনেক বিষয নিয়মমত হইলেও নীতি-বিরুদ্ধ। সেইজন্যই ন্যায়ের পথে অর্থ উপার্জন করাই খাঁটি পথ। আর যদি ন্যায়-পথে অর্থ উপার্জন করাই ঠিক হয়, তবে মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হইল ন্যায়বুদ্ধির শিক্ষা পাওয়া। কেবল লেনদেনের বুদ্ধিতে কুশলী হইলে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য

করিলে চলিবে না। মাছ, নেকড়ে বাঘ ও ইঁদুরেরাও ঐ নিয়মেই চলে। বড় মাছ ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে, ইঁদুর ছোটখাটো পোকামাকড়দের খায়, নেকড়ে তো মানুষ পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। তাহাদের রীতিই এই। তাহারা ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান দিয়াছেন, ন্যায়বুদ্ধি দিয়াছেন। এইজন্য অপরের সর্বনাশ করিয়া, তাহাকে ঠকাইয়া ভিখারী করিয়া, নিজে ধনশালী হইতে নাই।

তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মজুরকে মজুরী দেওয়ার ন্যায়-সঙ্গত বিধান কি রকম?

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মজুরের ন্যায্য বেতন হইতেছে, আজ সে আমাদের জন্য যাহা করিতেছে, তদনুরূপ মজুরী তাহাকে তাহার দরকারের সময় দেওয়া। সে যদি কম দিয়া থাকে তবে কম দেওয়া, আর যদি বেশি করিয়া থাকে তবে বেশি প্রতিদান দেওয়া।

একজন লোকের মজুর আবশ্যক। তাহার কাছে যদি দুইজন মজুর আসে, এবং উহাদের মধ্যে যে কম লয় তাহাকেই যদি রাখা হয় তবে সে কম মজুরী পাইবে। আবার যদি একাধিক ব্যক্তির মজুরের প্রয়োজন থাকে আর মজুর থাকে মোট একজন, তখন সেই মজুর অধিক মজুরী পাইবে এবং সম্ভবতঃ এই মজুরী সাধারণ অপেক্ষা অধিক হইবে। এতদুভয়ের মাঝখানে যে মজুরী তাহাই হইল ন্যায্য।

আজ কেহ যদি আমাকে ধার দেয় ও নির্দিষ্ট দিনে তাহা শোধ দিতে হয়, তবে সে ব্যক্তিকে সুদ দিয়া থাকি। তেমনি আজ যদি কোনও লোক আমার জন্য মজুরী খাটে, তবে পরে তাহাকে সেই মজুরী শোধ দিবার সময় সেই মজুরী ও সুদ হিসাবে আরও কিছুটা শ্রম দেওয়া উচিত। আজ যদি আমার জন্য কেহ এক ঘণ্টা কাজ করে, তবে তাহার জন্য আমাকে এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট বা তাহারও অধিক কাজ করার কথা দেওয়া কর্তব্য। প্রতিটি শ্রমিকের ক্ষেত্রেই একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এখন আমার কাছে যদি দুইজন মজুর আসে ও তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি কম চায় তাহাকে কাজে লওয়া হয়, তবে তাহার ফল এই হয় যে, সে ব্যক্তি আধপেটা খাইয়া থাকে। আর যে কাজ পাইল না, সে তো পুরাপুরি বুভুক্ষু রহিয়া গেল। যে মজুরকে আমি রাখিলাম তাহাকে যদি পুরা মজুরীও দিই, তাহা হইলেও দ্বিতীয় মজুর কাজ না পাইয়া বেকার থাকিবে। কিন্তু যাহাকে আমি রাখিয়াছি সে অন্ততঃ না খাইয়া মরিবে না এবং আমার অর্থেরও

সদ্ব্যবহার হইয়াছে বলা চলিবে। কম মজুরী দিলে বুভুক্ষার সূত্রপাত হয়। আমি যদি উচিত মজুরী দিই তাহা হইলে আমার কাছে অতিরিক্ত ধন সঞ্চিত হইতে পারিবে না, ভোগ-বিলাসে অর্থব্যয় করিতে পারিব না এবং আমার দ্বারা দারিদ্র্য বাড়িবে না। যাহাকে আমি ন্যায্য মজুরী দিব সে ব্যক্তিও ন্যায্য মজুরী দিতে শিখিবে এবং এমনি করিয়া ন্যায়ের প্রস্রবণ না শুখাইয়া গিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। আর যে সকল নাগরিকদের ভিতর এইপ্রকার ন্যায়বুদ্ধি কার্য করিবে তাহাদের সুখ হইবে ও উচিত রীতিতে সমৃদ্ধি আসিবে।

প্রতিযোগিতা যতই বৃদ্ধি পাইবে সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি ততই বাড়িতে থাকিবে—অর্থশাস্ত্রীদের এই চিন্তাধারার মধ্যে ত্রুটি আছে। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যও মজুরীর দর কমানো। উহাতে, যাহার অর্থ আছে সে অধিকতর অর্থ জমা করে, আর যে গরিব সে আরও গরিব হইয়া পড়ে। এই প্রতিযোগিতায় অবশেষে জনসাধারণের সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। লেনদেনের নিয়ম তো এইপ্রকার হওয়া চাই যে, প্রত্যেক লোকই যোগ্যতা অনুযায়ী মজুরী পাইতে পারে।

ইহাতেও কিছুটা প্রতিযোগিতা থাকিবে বটে কিন্তু পরিণামে লোকে সুখী ও কুশল হইয়া পড়িবে। কেন না এই প্রকার হইলে কাজ পাওয়ার জন্য আর মজুরী কমাইতে হইবে না, সেজন্য কেবল কর্মকুশল হইতে হইবে। এইজন্যই লোকে সরকারী কাজ পাইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। সেখানে গ্রেড বা পদমর্যাদা অনুসারে বেতন বাঁধা আছে। প্রতিযোগিতা কেবল কুশলতার ক্ষেত্রে। নিয়োগকর্তা কম বেতন লইতে বলে না, কেবল অপরের অপেক্ষা অধিক কুশলতা আছে ইহাই দেখাইতে বলে। নৌ-সৈন্য ও সিপাহীদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। আর সেইজন্যই এই সকল বিভাগে গোলমাল ও দুর্নীতি অনেকটা কম দেখা যায়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা রহিয়া গিয়াছে। আর তাহার ফলে প্রতারণা, অসচ্চরিত্রতা, চুরি ইত্যাদি দুর্নীতি বাড়িতেছে। অন্যদিকে যে সব মাল তৈয়ারি হইতেছে তাহাও খারাপ, নিরেস হইতেছে। ব্যবসায়ী ভাবে আমি রোজগার করিয়া লই, মজুর ভাবে আমি ঠকাই, আর গ্রাহক ভাবে মাঝখান হইতে আমি সুবিধা করিয়া লই। এইভাবে আচার-ব্যবহার দোষ-যুক্ত হয়, জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়, বুভুক্ষা বাড়ে, ধর্মঘট প্রসারলাভ করে, মহাজনেরা ঠগ হইয়া যায় ও গ্রাহকেরাও নীতি পালন করে না। এক অন্যায় হইতে অন্য অন্যায়ের জন্ম হয় এবং অবশেষে ব্যবসায়ী ও গ্রাহক সকলেই দুঃখী হয় ও তাহাদের বিনাষ্টি ঘটে। যাহাদের ভিতর এই রীতি চলিতে থাকে, তাহারা

শেষ পর্যন্ত হয়রান হইয়া থাকে। জনসাধারণের অর্থই বিষের মত হইয়া পড়ে।

সেইজন্যই জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, যেখানে অর্থই পরমেশ্বর সেখানে সত্য ঈশ্বরকে কেহ পূজা করে না। ধনের সহিত ঈশ্বরের চিরকাল অবনিবনা। গরিবের কুঁড়ে ঘরেই ঈশ্বর বাস করেন। ইংরেজেরা এই সকল কথা মুখে বলিলেও আচরণের সময় তাঁহারা অর্থকেই সর্বোপরি স্থান দিয়া থাকেন। কেবল অর্থশালী ব্যক্তিদের সুখীর তালিকাভুক্ত করেন। কি করিয়া তাড়াতাড়ি অর্থ সংগ্রহ করা যায় অর্থ-শাস্ত্রীরা সেই নিয়ম গড়িয়া থাকেন, যাহাতে উহা শিখিয়া লোকে অর্থসঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু যথার্থ অর্থশাস্ত্র তো ন্যায়বুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে কোনও অবস্থায় পড়িয়া কেমন করিয়া ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা যাইবে, নীতি পালন করা যাইবে—এই শাস্ত্র যে জনসাধারণ শিক্ষা করে তাহারাই সুখী হয়। বাকী আর যাহা তাহা তো ফাঁকা ও 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'র মতই। জনসাধারণকে যেমন করিয়া হোক অর্থ উপার্জন করিতে শেখানো মানে তাহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধিই শেখানো।

॥ ৪ ॥

সত্য কি

গত তিন অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, অর্থশাস্ত্রে যাহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা ঠিক নহে। সে নিয়ম অনুযায়ী চলিলে লোকে দুঃখীই হইযা থাকে। গরিব আরও গরিব হয় ও ধনবান আরও ধনী হয়, আর এই দুইযের মধ্যে কেহই সুখী হয় না।

অর্থশাস্ত্রীরা লোকের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে যাহার পযসা বেশি তাহারই উন্নতি বেশি। লোকের সুখ কেবল পয়সার উপরই নির্ভর করে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আর সেইজন্য তাঁহারা এই শিক্ষা দেন যে, কলকারখানা ও শিল্প-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা যত বেশী অর্থ সঞ্চয় করা যায় তত ভাল। এইপ্রকার বিচারধারার প্রসার হইতেই ইংলণ্ড ও অন্যস্থানে কলকারখানা বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক লোক শহরে একত্রিত হইতেছে ও চাষের কাজ ছাড়িয়া দিতেছে। বাহিরের সুন্দর নির্মল হাওয়ার বদলে কারখানার

বদ্ধ নোংরা হাওয়ায় সারাদিন শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াতেই সুখ বোধ করে। ফলে লোকে দুর্বল হইয়া পড়ে, লোভ বাড়ে, দুর্নীতির প্রসার ঘটে ও যখন দুর্নীতি দূর করার কথা বলা হয়, তখন বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত লোকেরা বলিয়া থাকেন, 'দুর্নীতি তো দূর করা যায় না, অজ্ঞানী লোকের একবারেই জ্ঞান আসিতে পারে না, সেইজন্য যেমন চলিতেছে চলিতে দাও।' এজাতীয় কথা বলার সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে গরিবের দুর্নীতির হেতুই হইতেছেন ধনীরা। তাহাদেরই ভোগবিলাসের জন্য গরিবেরা রাতদিন দাসত্ব করিতেছে। শিক্ষালাভ করা বা ভাল কাজ করার মত এক মুহূর্ত সময়ও তাহাদের থাকে না। ধনীকে দেখিয়া তাহারা ধনী হইতে চায়। ধনী হইতে পারে না বলিয়া ক্লেশ বোধ করে, রাগ করে। পরে জ্ঞানহীন হইয়া ভাল রাস্তায় ধন উপাজর্ন করিতে না পারিয়া মন্দ রাস্তায় রোজগার করার বৃথা প্রয়াস করে। এমনি করিয়া পয়সা ও মজুরী দুইই ব্যর্থ হয় অথবা দাগাবাজির কাজে তাহা ব্যবহৃত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে খাঁটি মজুরী তো তাহাকেই বলে যাহা দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। সেই সকল জিনিসকেই প্রয়োজনীয় বলা যায়, যাহা লোকের ভরণ-পোষণের কাজে লাগে। আবার ভরণপোষণ তাহাকেই বলে যাহাতে মানুষ তাহার খাওয়া-পরার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পায় ও নীতি-মার্গে থাকিয়া জীবন ধারণ করে এবং আজীবন সৎকর্ম করে। এইভাবে চিন্তা করিলে মহা-আডম্বরপূর্ণ কাজ সকলও অকাজ বলিয়া মনে হইবে। বড় কারখানা খাড়া করিয়া প্রভূত ধনাঢ্য হওয়ার রাস্তা লওয়া পাপকর্ম হইতে পারে। পয়সা অনেকেই রোজগার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার যথোচিত ব্যবহার করার লোক কমই আছে। যে পয়সা উপার্জন করায় লোকের ক্ষতি হয়, তাহার কোনও মূল্য নেই। আজ যাঁহারা ক্রোড়পতি, তাঁহারা বড় ও দুর্নীতি-পূর্ণ সংগ্রামের কারণ তাহা হইয়াছেন। আজ-কালকার অনেক যুদ্ধের কারণ অর্থ-লালসা।

কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে যে, অপরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানদান করা সম্ভব নহে। সেইজন্য যেমন ইচ্ছা থাকিবে ও পয়সা জমা করিবে। এরূপ যাহারা বলে তাহারা স্বয়ং নীতি পালন করে না। কেন না যে ব্যক্তি নীতি পালন করে ও লোভে পড়ে না, সে ব্যক্তি নিজের মন আগে স্থির রাখে। সে নিজে সমস্ত পন্থা ত্যাগ করে না ও নিজের কর্মদ্বারা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যাঁহাদের লইয়া সমাজ, তাঁহারা নিজেরাই যদি নীতি পালন না করেন, তবে জনসাধারণ কি করিয়া নীতিপরায়ণ হইবে? নিজে আমি যেমন খুশি আচরণ করিব, আর

প্রতিবেশীর দুর্নীতির জন্য তাহার ভুল ধরিব, ইহাতে কি আর ভাল ফল হইতে পারে ?

এইভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, টাকাপয়সা একটা সাধন বা উপায় মাত্র এবং উহার দ্বারা সুখ ও দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়। ভাল লোকের হাতে টাকা পড়িলে উহা দ্বারা সে চাষের কাজ করিয়া অন্নাদি উৎপন্ন করে। নির্দোষ মজুরী করিয়া কৃষক সন্তোষলাভ করে ও লোকে সুখী হয়। খারাপ লোকের হাতে টাকা পড়িলে উহা দ্বারা গোলাবারুদ তৈয়ারী হয় ও লোকের সর্বনাশ হয়। যাহারা গোলাবারুদ প্রস্তুত করে ও যাহাদের উপর তাহার প্রয়োগ করা হয় উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, খাঁটি লোকই খাঁটি দৌলত। যাহাদের ভিতর নীতিবোধ আছে তাহারাই যথার্থ ধনী। ইহকালটা ভোগবিলাস করার জন্য নয়। প্রত্যেক লোকেরই যথাশক্তি পরিশ্রম করা উচিত। পূর্বের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, যেখানে একজন লোক অলস থাকে সেখানে অপর একজনের দ্বিগুণ কাজ করিতে হয়। ইংলণ্ডে যে অন্নাভাব-ক্লিষ্ট লোক রহিয়াছে ইহাই তাহার কারণ। কয়েকজন লোকের নিকট অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তাহারা প্রয়োজনীয় কাজ করে না আর সেইহেতু তাহাদের জন্য অপরকে মজুরী খাটিতে হয়। আর এই মজুরী প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া যাহারা খাটে তাহাদের লাভ হয় না। এইজন্য জনসাধারণের পুঁজি হ্রাস পাইতে থাকে। যদিও বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, লোকে কাজ পাইতেছে, কিন্তু ভিতরে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অনেক লোক নিষ্কর্মা বসিয়া আছে। এর দ্বারা দ্বেষভাব সৃষ্টি হয়, অসন্তোষ জমিতে থাকে এবং শেষ অবধি ধনবান ও গরিব, মনিব ও মজুর উভয়েই নিজেদের সীমা লঙ্ঘন করে। বিড়ালে ইঁদুরে যেমন সর্বদা অবনিবনার সম্পর্ক, ধনীতে গরিবে, মনিবে মজুরে সর্বদাই সেই প্রকার বৈরভাব বর্তমান থাকে, আর মানুষ মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া পশুর দশাপ্রাপ্ত হয়।

॥ ৫ ॥

উপসংহার

মহামতি রাস্কিনের বক্তব্যের মর্ম আমার বলা শেষ হইল। এই লেখা বহু পাঠকের নিকট নীরস মনে হইবে তবুও যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' সকল পাঠকই যে পূর্বোক্ত বক্তব্য বিচাব-বিবেচনা করিযা তদনুযাযী চলিবেন অতটা আশা করা যায় না। কিন্তু যদি খুব অল্পসংখ্যক পাঠকও ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, ইহার সারাংশ গ্রহণ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আর যদি তাহা নাও হয়, তাহা হইলেও রাস্কিনের শেষ অধ্যায অনুযায়ী আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিযাছি, উহাতেই আমার ফললাভ হইয়াছে, এইজন্য আমি সর্বদা সন্তুষ্ট।

রাস্কিন তাঁহার ইংরেজ বন্ধুদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইংরেজদের জন্য যদি একবার খাটে, ভারতবাসার পক্ষে তাহা হাজারবার খাটে। ভারতবর্ষে নতুন চিন্তাধারা বিস্তারলাভ করিতেছে। আজকালকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যে উদ্যম দেখা দিতেছে—তাহা ঠিক। এই উদ্যমের সদ্ব্যবহার হইলেই ভাল ফল হইবে, আর উহা যদি মন্দ দিকে যায় তবে খারাপ ফলই হইবে। 'স্বরাজ' পাওযার জন্য এক দিকে দাবি উঠিতেছে। আবার অপর দিকে বিলাতের মত কারখানা কবিযা তাডাতাডি অর্থ উপার্জন করার দাবিও শুনা যাইতেছে।

স্বরাজ্য যে কি তাহা আমরা বড একটা বুঝি না। নাতালে স্বরাজ্য আছে। কিন্তু আমরা যদি নাতালের মতই স্বরাজ্য চাই, তবে সে স্বরাজ্য নরকসদৃশ হইবে। উহারা কাফ্রিদিগকে দলিত করিতেছে, ভারতীয়দিগকে হত্যা করিতেছে। স্বার্থান্ধ হইয়া স্বার্থরাজ্যই ভোগ করিতেছে। যদি কাফ্রি ও ভারতবাসীরা সে দেশ হইতে চলিয়া যায়, তবে উহারা নিজেদের মধ্যে লডাই করিয়া শেষ হইয়া যাইবে।

তাহা হইলে কি ট্রান্সভালের মত স্বরাজ্য আমরা চাই? জেনারেল স্মাট্‌স্ সেখানকার প্রধানদিগের মধ্যে একজন। তিনি নিজেই নিজের লিখিত বা কথিত বচন পালন করেন না। এক কথা বলেন, অন্য কাজ করেন। ইংরেজ তাঁহাকে লইয়া হয়রান। তিনি ব্যয় সংক্ষেপের অছিলায় ইংরেজ সিপাহীদের অন্ন মারিয়া সে

স্থানে ডচ সিপাহী রাখিতেছেন। আমি মনে করি না যে, ইহার পরিণামে ডচরাও শেষ পর্যন্ত সুখী হইবে। যাহাদের দৃষ্টি স্বার্থের দিকে, তাহারা ভিন্ন দেশীয়কে লুণ্ঠন করিয়া পরে সহজেই স্বদেশবাসীকে লুণ্ঠন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সর্বত্র তাকাইলে দেখা যায় যে, স্বরাজ্য নামে পরিচিত রাজ্য জনসাধারণের উন্নতি বা সুখের পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটা সহজ উদাহরণ লইলে সহজেই বুঝিতে পারিব। লুণ্ঠনকারীদের দলে যদি স্বরাজ্য আসে, তবে তাহার পরিণাম কি হইবে? লুণ্ঠনকারীরা তখনই সুখী হইবে যখন তাহাদের এমন একজন সৎ ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে রাখা হইবে যে স্বয়ং লুণ্ঠনকারী নয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এ সকলই বড বড দেশ, কিন্তু তাহারাও যে যথার্থ সুখী তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

'স্বরাজ্য' শব্দের যথার্থ অর্থ হইতেছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার কৌশল জানা। একাজ সেই করিতে পারে, যে নিজে নীতি পালন করে, অপরকে ঠকায় না, সত্যকে ছাড়ে না, নিজের বাপ-মা, নিজের স্ত্রী. সন্তান, চাকর ও প্রতিবেশী— সকলের প্রতিই আপন কর্তব্য পালন করে। এই প্রকার ব্যক্তি যে দেশে বাস করুক না কেন, স্বরাজ্য ভোগ করে। যে দেশে এই প্রকারের অনেক লোক আছে, সে দেশে স্বভাবতই স্বরাজ রহিয়াছে।

এক দেশের লোক অপর দেশের উপর রাজত্ব করিবে স্বভাবতই ইহা অন্যায়। ইংরেজেরা আমাদের উপর রাজত্ব করে ইহা অন্যায় কথা। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজেরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেই ভারতের ভাল হইল বলিয়া মনে করার কারণ নাই।

তাহারা যে আধিপত্য করে তাহার কারণ তো আমরাই। সে কারণ হইতেছে আমাদের পরস্পরের অমিল, আমাদের দুর্নীতি ও আমাদের অজ্ঞতা। এই তিন বস্তু যদি দূর হয়, তাহা হইলেই ইংরেজরা বিনা আয়াসে ভারত ত্যাগ করিবে, শুধু তাহাই নয়, আমরা যথার্থ স্বরাজ ভোগ করিতে থাকিব।

বোমা ছুঁড়িয়া অনেকেই খুশি হন। ইহা নিছক অজ্ঞতা ও নিবুদ্ধিতার চিহ্ন। যদি সমস্ত ইংরেজকে মারিয়া ফেলিতে পারাও যায় তবে পরে সেই হত্যাকারীরাই ভারতের মালিক হইবে। অতএব ভারতবর্ষের অবস্থা অনাথ বিধবার ন্যায় হইবে। যে বোমা ইংরেজদের উপর ফেলা হইবে ইংরেজ চলিয়া গেলে পরে তাহা ভারতবাসীর উপরই পড়িবে। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে ফরাসীরাই মারিয়াছিল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ক্লীভল্যাণ্ডকে আমেরিকানরাই মারিয়াছেন। সেইজন্যই

তাড়াতাড়ি না বুঝিয়া-সুঝিয়া পশ্চিমের লোকের অন্ধ অনুকরণ না করাই উচিত।

যেমন পাপ কর্ম দ্বারা অর্থাৎ ইংরেজ মারিয়া যথার্থ স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারে না, তেমনি ভারতবর্ষে কতকগুলি বড বড কারখানা খুলিলেই স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। কেবল সোনা-রূপা একত্র করিলেই যে রাজ্য পাওয়া যাইবে না, একথা রাস্কিন ভাল ভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমের সভ্যতা মাত্র একশত বৎসরের পুরানো—সত্য কথা বলিতে গেলে ইহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। ইহাব মধ্যেই ইউরোপের অধিবাসী যেন শোচনীয় দুর্দশায় পডিয়াছে। ইউরোপের যে অবস্থা হইয়াছে ভারতবর্ষের যেন তাহা না হয়, আমি এই কামনা কবি। ইউরোপের লোকেরা একে অন্যের উপর যেন তাক করিয়া বসিযা আছে। মাত্র নিজেদের গোলাবারুদ তৈযারীর জন্যই সকলে চুপচাপ আছে। কোনও সময একটা বড রকম আগুন জ্বলিযা উঠিলেই ইউরোপের নরক চোখে পড়িবে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই কৃষ্ণকায়দের যেন ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য করা হয। যেখানে কেবল টাকা বা পয়সার লোভই সম্বল, সেখানে অন্য আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোনও একটা দেশ দেখিতে পাওযা মাত্র, চিল যেমন মাংস দেখিলে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তেমনি, তাহারা সেই দেশের উপর গিযা ছোঁ মারিয়া পড়ে। স্বদেশের কলকারখানার জন্যই তাহারা এমন করে, একথা মনে করার হেতু আছে।

সকল ভারতবাসীই বলেন—স্বরাজ চাই। এ দাবি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এই স্বরাজ নীতির পথে থাকিয়াই পাইতে হইবে। তাহা সত্যকার স্বরাজ হওয়া চাই। হত্যা করার পথে বা বড বড কারখানা দ্বারা উহা পাওয়া যাইবে না। শিল্প-ব্যবসায অবশ্যই চাই। তবে তাহা ঠিক পথে করা চাই। এককালে এই ভারতবর্ষকে স্বর্ণভূমি বলা হইত। তাহার কারণ ভারতবাসীরাই ছিল সোনার মত। ভূমি তো এখনও সেই-ই আছে—কেবল মানুষ বদলাইয়া গিযাছে। সেইজন্যই ভারতবর্ষ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। ইহাকে আবার স্বর্ণভূমি করিতে হইলে আমাদিগকেই সদ্‌গুণ দ্বারা স্বর্ণ হইতে হইবে। এই স্বর্ণ করার পরশপাথর দুইটি অক্ষরের মধ্যে নিহিত আছে, উহা 'সত্য'। তাই যদি প্রতিটি ভারতবাসী সত্যে অবিচল থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসী ঘরে বসিয়াই স্বরাজ পাইবে।

ইহাই রাস্কিনের রচনার সারকথা।

অহিংস সমাজবাদ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকরণ ঃ লক্ষ্য

ভবিষ্যৎ আমাদের অতীতের অনুবর্তী

আমরা দেখি যে, মন যেন এক অস্থির বিহঙ্গ। সে যত পায় তত বেশিই চায় এবং তবু অতৃপ্ত থাকে। আমাদের ভোগস্পৃহাগুলিকে আমরা যতই প্রশ্রয় দিই ততই তারা অসংযত হয়ে ওঠে। সেজন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা ভোগস্পৃহার একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সুখবোধ প্রধানত একটি মানসিক অবস্থা। ধনী হলেই যে মানুষ সুখী হবে আর দরিদ্র হলে দুঃখী হবে, এমন কোন যুক্তি নেই। প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনবান-দুঃখী আর দরিদ্র-সুখী রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক চিরকাল গরীব থাকবে। এই সমস্ত লক্ষ্য করে পূর্বপুরুষরা বিলাস ও প্রমোদ থেকে আমাদের নিবৃত্ত থাকতে বলেছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে যে লাঙ্গল ছিল সেই জাতীয় লাঙ্গল দিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে নিয়েছি। প্রাচীনকালে যে জাতীয় কুটীর ছিল আমরা তাকেই রক্ষা করেছি এবং আমাদের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ববৎ আছে। আমাদের এখানে জীবনক্ষয়ী প্রতিযোগিতার মত কোন প্রথা কখনও ছিল না। প্রত্যেকেই আপন বৃত্তি বা ব্যবসা অনুসরণ করত এবং একটি নিয়ন্ত্রিত পারিশ্রমিক গ্রহণ করত। আমরা যে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে জানতাম না তা নয়, বরং আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন যে, যদি আমরা এতেই মন নিবদ্ধ করি তবে আমরা দাস হয়ে যাব এবং আমাদের নৈতিক শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলব। সেজন্য যথোচিত বিবেচনা করার পর তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, সেই কাজই আমাদের করা উচিত যা আমরা নিজেদের হাত ও পায়ের সাহায্যে করতে পারি। তাঁরা দেখেছিলেন যে, হাত ও পায়ের ন্যায্য ব্যবহারের মধ্যেই সত্যকার সুখ ও স্বাস্থ্য নিহিত। তাঁরা আরও নিরূপণ করেছিলেন যে, বড় বড় শহরগুলি একপ্রকার জাল ও ব্যর্থ ঝঞ্ঝাট মাত্র এবং সেখানে মানুষ সুখী হবে না। সেখানে চোর-ডাকাতের দল থাকবে, বারবনিতা ও পাপ বৃদ্ধি পাবে এবং গরীবরা ধনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হবে। সেইজন্য তাঁরা ছোট ছোট গ্রামে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, রাজা ও রাজদণ্ড নীতিশক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট; আর তাই ঋষি ও ফকিরদের চেয়ে সম্রাটদের তাঁরা নিচের স্তরের বলে গণ্য করেছিলেন। সেই জাতির গঠন এই প্রকার যে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা

গ্রহণ করা অপেক্ষা অপরকে শিক্ষা দেবার পক্ষেই অধিকতর উপযুক্ত। এই জাতির আদালত, উকিল এবং ডাক্তার ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতেন। প্রত্যেকেই জানতেন যে, এই বৃত্তিগুলি কোন বিশেষ উচ্চস্তরের নয়। অধিকন্তু এই উকিল ও বৈদ্যরা জনগণকে লুণ্ঠন করতেন না। জনগণের আশ্রিত বলেই তাঁদের মনে করা হত, প্রভু বলে নয়। বিচার প্রায় ন্যায়সঙ্গত ছিল। আদালতকে পরিহার করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। জনগণকে এতে প্রলোভিত করার জন্য কোন দালাল ছিল না। এই ধরনের অন্যায় কেবল রাজধানীতে এবং তার আশপাশেই দেখা যেত। সাধারণ মানুষ স্বাধীন জীবন যাপন করত এবং নিজেদের কৃষিকাজ করত। তারা সত্যকার স্বরাজ উপভোগ করত।

হিন্দস্বরাজ, ১৯০৮

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা নিচে থেকেই শুরু হওয়া উচিত। এই ভাবে, প্রতিটি গ্রাম পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন এক-একটি প্রজাতন্ত্র বা পঞ্চায়েত হবে। এর অর্থ হল যে, প্রত্যেক গ্রামকে স্ব-সংরক্ষিত এবং নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করে নেবার যোগ্য হতে হবে, এমন কি সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেও সে যেন নিজেকে রক্ষা করতে পারে। বাইরের কোন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টায় গ্রামগুলি যেন নিজেদের বলি দিতে পারে তার জন্য তাদেব শিক্ষিত এবং প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই হবে একক। তার জন্য প্রতিবেশীর অথবা বিশ্বের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য অথবা তাদের উপর নির্ভরতা বর্জন করতে হবে না। উভয়দিকে শক্তিগুলির মুক্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত আদানপ্রদান হবে। এই রকম সমাজ অবশ্যই অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন হবে। কারণ এই সমাজের প্রত্যেক পুরুষ ও নারী জানবে যে, সে কী চায়, অধিকন্তু সে এ কথাও জানবে যে, একই শ্রম করে অপরে যা পেতে পারে না তা কারও পক্ষে পেতে ইচ্ছা করা অনুচিত।

স্বভাবতই এই সমাজের বনিয়াদ হবে সত্য ও অহিংসা, এবং আমার মতে ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস ছাড়া তা হতে পারে না। ঈশ্বরের অর্থ হল স্বয়ম্ভু, সর্বজ্ঞ চেতন শক্তি, বিশ্বের সমস্ত শক্তিই এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই শক্তি কারও উপর নির্ভর করে না এবং যখন অন্য সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে অথবা কাজ করা

বন্ধ করবে তখনও এ সজীব থাকবে। এই সর্ব ব্যাপক চেতন আলোকের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া আমি আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা দেখাতে পারি না।

অসংখ্য গ্রামের দ্বারা রচিত এই সমাজ-পঞ্জরে একটি বৃত্ত থাকবে, যা চির-প্রসারমান হবে কিন্তু উর্ধ্বগামী হবে না। সমাজ-জীবন পিরামিডের মত হবে না, যার সঙ্কীর্ণ চূড়াকে বিস্তৃত নিম্নভাগ রক্ষা করে। তা হবে সমুদ্র-তরঙ্গের বৃত্তের মত। গ্রামের জন্য নিজেকে বিনাশ করতে প্রস্তুত এমন ব্যক্তিই হবে এই বৃত্তের কেন্দ্র। আবার গ্রামসমূহের চক্রের জন্য এই গ্রাম নিজেকে বিনাশ করতে প্রস্তুত থাকবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র সমাজ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হবে যারা আপন দম্ভের জন্য আক্রমণাত্মক হবে না, কিন্তু যারা থাকবে চিরনম্র এবং তারা যে সমুদ্র-তরঙ্গের অভিন্ন অঙ্গ তার মহিমা অনুভব করবে।

সুতরাং বহিস্থ অন্তিম পরিধি অন্তবর্তী বৃত্তকে চূর্ণ করার জন্য তার বলপ্রয়োগ করবে না। বরং সে ভিতরের সকলকে বল দেবে এবং নিজেও সেখান থেকে শক্তি সংগ্রহ করবে। আমাকে হয়ত এই বলে ব্যঙ্গ করা যেতে পারে যে, এই সমস্তই কাল্পনিক, সুতরাং তা মোটেই বিচারযোগ্য নয়। ইউক্লিডের পরিভাষার বিন্দু যে-কোন মানুষের পক্ষে অঙ্কিত করা অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তা যদি এক অবিনাশী মূল্যের অধিকারী হয় তবে আমার চিত্রও মানব-জাতিকে জীবিত রাখার পক্ষে তার নিজস্ব মূল্য রাখে। যদিও এই চিত্র কখনই পূর্ণ সাধনীয় নয় তবু এই সত্যকার চিত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের বাঁচা উচিত। আমরা কী চাই তার একটি সম্যক চিত্র আমাদের কাছে অবশ্যই থাকা উচিত, তাহলে সেটা না হলেও আমরা তার কাছাকাছি কোন জিনিস পেতে পারব। যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে কখনও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমি দাবি করি যে, তখনই আমার এই চিত্রের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারব, যেখানে অন্তিম মানুষটিও প্রথম মানুষটির সঙ্গে সমান হবে, বা অন্যভাবে বললে সেখানে কোন ব্যক্তি প্রথম বা অন্তিম হবে না।

এই চিত্রে প্রত্যেক ধর্মের পূর্ণ এবং সমান স্থান থাকবে। আমরা সকলেই এক মহান বৃক্ষের পত্র। এই বৃক্ষের মূল পৃথিবীর গর্ভে গভীরে চলে গিয়েছে বলে তার কাণ্ডকে মূল থেকে কম্পিত করতে পারা যায় না। প্রবলতম ঝড়ও তাকে উৎপাটিত করতে পারে না।

এতে এমন যন্ত্রের স্থান থাকবে না যা মানব-শ্রমের স্থানাধিকার করে ; এবং যা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দেয়। সুসংস্কৃত মানব পরিবারে শ্রমের এক অনুপম স্থান থাকে। যে যন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সহায়ক হয় তারই স্থান

এতে থাকবে। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, সেই যন্ত্র যে কী তা আমি কোনদিন বসে চিন্তা করি নি। সিঙ্গারের সেলাই-কলের কথা আমি ভেবেছি। কিন্তু এই ধারণাও এমনিতেই এসে গিয়েছে। আমার চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করতে তার প্রয়োজনও আমার নেই।

পঞ্চগনী ২১-৭-৪৬, হরিজন, ২৮-৭-৪৬

ভ্রমাত্মক

ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল লিবারল্ এসোসিয়েশনের প্রচার সমিতি ব্যাপকভাবে যে পুস্তিকাগুলি বণ্টন করছেন পাঠকরা তা দিয়ে আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছেন।

ছয় সংখ্যক পুস্তিকায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছে:

> "গান্ধীরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের রূপ কি রকম হবে? —রেল থাকবে না। হাসপাতাল থাকবে না। যন্ত্র থাকবে না। কোন সৈন্য বা নৌ-বাহিনীর প্রয়োজন থাকবে না। কারণ গান্ধী অন্য দেশকে এই আশ্বাস দেবেন যে, ভারতবর্ষ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সেইজন্য তারাও ভারতবর্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। না থাকবে আইনের প্রয়োজন, না আদালতের। কেন না প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে নিজের আইন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের খুশীমত কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে। খুব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন হবে, কেন না প্রত্যেককেই খদ্দরের ল্যাঙট পরে বিচরণ করতে হবে এবং উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যেতে হবে।"

আমি একে অতিশয়োক্তি বলতে পারি না। পাশ্চাত্য যুদ্ধনীতিতে অনুমোদিত এ এক চতুর ব্যঙ্গচিত্র। এর কেবল সঙ্কেতার্থই মিথ্যা। আমার অভিপ্রায় স্পষ্ট করে দিই। প্রথম কথা ভারতবর্ষ 'গান্ধীরাজ' স্থাপনা করার প্রযত্ন করছে না। স্বরাজ স্থাপনার জন্যই এ প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং সেই স্বরাজ প্রাপ্তির জন্য আনন্দের সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সে গান্ধীকে বলিদান করে দেবে। 'গান্ধীরাজ' একটি আদর্শ অবস্থা এবং সেই অবস্থায় ঐ পাঁচটি ন-কারাত্মক কথা একটি সত্যকার চিত্র উপস্থিত করবে। কিন্তু কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেন না, আর আমি তো অবশ্যই করি না যে, স্বরাজে রেল থাকবে না, হাসপাতাল থাকবে না, যন্ত্র থাকবে না, সেনা

ও নৌ-বাহিনী থাকবে না, আইন ও আদালত থাকবে না। পক্ষান্তরে, রেল থাকবে তবে ভারতবর্ষকে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বা অর্থনৈতিক শোষণ করা তার উদ্দেশ্য হবে না ; বরং তার ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যথেষ্ট সুখ-সুবিধার জন্যই হবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে ভাড়া দেয় তার পরিবর্তে তারা কিছু পাবে। স্বরাজে ব্যাধির সম্পূর্ণ অবর্তমান অবস্থা কেউ আশা করে না। সুতরাং স্বরাজে অবশ্যই হাসপাতাল থাকবে, কিন্তু এই রকম আশা করা যেতে পারে যে, ভোগ-বিলাসের রোগীদের অপেক্ষা দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের সেবা করাই তখন হাসপাতালের অধিক উদ্দেশ্য হবে। যন্ত্র অবশ্যই চরখার রূপে থাকবে। চরখাও তো একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে, স্বরাজের পর ভারতবর্ষে কিছু কলকারখানাও গড়ে উঠবে। তবে আজকের মত জনসাধারণের রক্ত শোষণ করাব পরিবর্তে তাদের কল্যাণ-সাধন করাই তখন এগুলির উদ্দেশ্য হবে। আমি নৌ-বাহিনীর কথা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে, ভবিষ্যতের ভারতে স্থলসেনা ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার এবং অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করাব জন্য ভাড়াটিযাদের দ্বারা গঠিত হবে না। তখন সেনাবাহিনীকে বহুলাংশে কমিযে ফেলা হবে, তাতে অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবক থাকবে এবং পুলিস বাহিনীর মত ভারতবর্ষের আভ্যন্তবীণ শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের প্রযুক্ত করা হবে। স্বরাজে আইন ও আদালত থাকবে, কিন্তু সেগুলি হবে জনগণের স্বাধীনতার সংরক্ষক। সেগুলি এখনকার মত আমলাতন্ত্রের হাতিযার হবে না, বর্তমানে এগুলি একটি সমগ্র জাতিকে নির্বীর্য করে দিয়েছে, এবং আরও বলহীন করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। যদিও স্বরাজে ল্যাঙ্গট পরা ও উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাওযা যে কোন লোকেরই ইচ্ছাধীন থাকবে, তবু আমি আশা করি যে, এখন যেমন সাধনের অভাবে যথেষ্ট পরিধেয কিনতে না পারায় মযলা নেকড়াই ল্যাঙ্গটের কাজ সিদ্ধ করে বলে লক্ষ লক্ষ লোককে তা-ই পরতে হয এবং ঘরের অভাবে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত শরীরকে উন্মুক্ত স্থানেই বিশ্রাম দিতে হয়, তখন তার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং 'হিন্দ স্বরাজে' ব্যক্ত কতকগুলি আদর্শকে তাদের যথাযথ সন্দর্ভ থেকে সরিয়ে এনে ব্যঙ্গাত্মকরূপে জনসাধারণের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে যে, আমি যেন সেগুলিকেই গ্রহণ করার জন্য প্রচাব করছি, এটা উচিত নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৩-২২

গরীবের স্বরাজ

আপনারা আপনাদের প্রতিবেদনে ঠিকই বলেছেন যে, আমার ধ্যানের স্বরাজ হল গরীবের স্বরাজ। জীবনের আবশ্যক বস্তুর উপভোগ রাজা ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমভাবেই আপনাদের করা উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের মত আপনাদেরও প্রাসাদ থাকবে। সুখের জন্য সেগুলির প্রয়োজন নেই। আপনারা বা আমি সেগুলির মধ্যে হারিয়ে যাব। কিন্তু একজন ধনবান ব্যক্তি জীবনের যে-সমস্ত সাধারণ সুখ-সুবিধা ভোগ করেন সেগুলি আপনাদের অবশ্যই পাওয়া উচিত। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে যতক্ষণ না স্বরাজে এই সাধারণ সুখ-সুবিধাগুলির নিশ্চয়তা আপনাদের জন্য অবশ্যই থাকছে ততক্ষণ স্বরাজ পূর্ণ স্বরাজ হবে না। আমি জানি না যে, কবে সেই স্বরাজ আমরা লাভ করব, কিন্তু তার জন্য আমাদের প্রযত্ন করতে হবে।*

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ নৈতিক আবশ্যকতা

সমাজবাদী কে ?

সমাজবাদ কথাটি সুন্দর, আর আমি যতদূর জানি সমাজবাদে সমাজের সকলেই সমান—কেউ নিচু কেউ উঁচু নয। ব্যক্তিদেহে মাথা শীর্ষদেহে আছে বলেই তা উঁচু নয, আর পদতল ভূমি স্পর্শ করে বলে তা নিচু নয়। ব্যক্তিদেহে সকল অঙ্গই যেমন সমান, সমাজদেহে তেমনি সকল মানুষই সমান। এই হল সমাজবাদ।

এই সমাজে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মনিব-কর্মচারী সকলেই এক স্তরে অবস্থিত। ধর্মের ভাষায়, সমাজবাদে কোন দ্বৈত নেই। সবই একাকার। সমগ্র বিশ্ব-সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে দ্বৈত বা বহুত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। দৃশ্যতঃ একত্বের অভাব বিদ্যমান—এই মানুষটি উঁচু, ঐ মানুষটি নীচু;

* আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘের অভ্যর্থনার উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

ইনি হিন্দু, উনি মুসলমান, তৃতীয়জন খ্রীষ্টান, চতুর্থ ব্যক্তি পারসী, পঞ্চম শিখ, ষষ্ঠ ইহুদী। এগুলির মধ্যেও আবার শাখা-প্রশাখা আছে। আমার ধারণার ঐক্যের মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের পূর্ণ সমাবেশ আছে।

এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে দার্শনিকের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের এই কথা বললে চলবে না যে, যতক্ষণ না সকলে সমাজবাদে দীক্ষিত হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের কোন চেষ্টা করতে হবে না। আমাদের জীবনের পরিবর্তন না করে আমরা ভাষণ দিতে পারি, দল গঠন করতে পারি এবং বাজপাখির মত শিকার পেলেই তাকে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এ সমাজবাদ নয়। আমরা যতই একে করায়ত্ত করার শিকার বলে মনে করব এ ততই দূরে অপসৃত হযে যাবে।

প্রথম দীক্ষিত ব্যক্তি থেকে সমাজবাদের শুরু হয়। এমন মানুষ একজনও যদি থাকেন তবে তাঁর পাশে শূন্য যোগ করলে, একে শূন্য দশ, দশে শূন্য একশ এই ক্রমে সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু আরম্ভ যাঁকে নিয়ে হবে তিনিই যদি শূন্য হন অর্থাৎ কেউ যদি আরম্ভ না করেন, তবে শূন্য বাড়িযে গেলেও তার মূল্য শূন্যই হবে। শূন্যগুলি লিখতে যে সময় ও কাগজ খরচ হবে তা সবই ব্যর্থ হবে।

এই সমাজবাদ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। সুতরাং একে লাভ করতে হলে স্ফটিকের মত নির্দোষ উপায় অবলম্বন করতে হবে। অশুদ্ধ উপায়ে প্রাপ্ত লক্ষ্যও অশুদ্ধই হয়। সেইজন্য রাজার মাথা কাটলেই রাজা-প্রজা সমান হয়ে যাবে না। আর এই কাটাকাটির প্রক্রিযাও ধনিক-শ্রমিককে সমান করতে পারবে না। অসত্যের দ্বারা কেউ সত্যকে লাভ করতে পারে না। কেবল সত্য আচরণের দ্বারাই সত্যে পৌছানো যায়। অহিংসা ও সত্য কি যমজ নয় ? কখনই নয়। অহিংসা সত্যের অন্তরে আর সত্য অহিংসার অন্তরে অবস্থিত। সেইজন্য বলা হযেছে যে, এরা একই মুদ্রার দুই মুখ। এদের একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায না। মুদ্রার দুই মুখের লেখা পড। কথার অক্ষরগুলি আলাদা, কিন্তু মুদ্রার মূল্য একই। পূর্ণ পবিত্রতা ছাডা এই দিব্য স্থিতি লাভ করা যায় না। মনে বা দেহে যদি অপবিত্রতাকে স্থান দাও তবে তোমার মধ্যে অসত্য ও হিংসা এসে যাবে।

সুতরাং একমাত্র সত্যাশ্রয়ী, অহিংস এবং পবিত্রচেতা সমাজবাদীরাই ভারতে তথা পৃথিবীতে সমাজবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আমি যতদূর জানি পৃথিবীতে প্রকৃত সমাজবাদী দেশ কোথাও নেই। উপরে যে উপায়ের কথা বলা হল তা ভিন্ন এই রকম সমাজ গঠন অসম্ভব।

নিউ দিল্লী, ৬-৭-৪৭, হরিজন, ১৩-৭-৪৭

সত্য, অহিংসা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস অত্যাবশ্যক

সমাজবাদে সত্য ও অহিংসা মূর্ত হওয়া চাই। সেজন্য সমাজবাদী কর্মীর ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখতে হবে। সত্য ও অহিংসার কেবল যান্ত্রিক অনুসরণ করলে সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য আমি বলেছি যে, সত্য-ই ঈশ্বর আর ঈশ্বর হলেন চিৎশক্তি। আমাদের জীবন সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। এই শক্তি অন্তরবাসী, কিন্তু তা দেহ নয়। এই মহাশক্তির অস্তিত্ব যে অস্বীকার করে, সে নিজেকেই বঞ্চিত করে, কেন না এই অনন্ত শক্তির সহায়তা সে লাভ করতে পারে না এবং ফলে নির্বীর্য হয়ে পড়ে থাকে। তার অবস্থা হালহীন জাহাজের মত হয়—তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ চালিত হয়ে সে একটুও অগ্রসর হতে পারে না এবং অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আসল কথা হল, এই মহাশক্তি এবং এর গূঢ় সম্ভাবনাকে জানবার জন্য বরাবর কঠোর প্রযাস সহকারে সাধনা করতে হয়েছে।

আমার দাবি হল যে, এই সাধনার পথেই সত্যাগ্রহের আবিষ্কার হয়েছে। তাই বলে এই দাবি আমি করছি না যে, সত্যাগ্রহের সব বিধিই জানা হয়ে গিয়েছে অথবা রচিত হয়েছে। তবে নির্ভয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা আমি বলব যে, প্রাপ্তব্য সব কিছুই সত্যাগ্রহের প্রয়োগে লাভ করা যেতে পারে। শ্রেষ্ঠতম এবং অমোঘ পন্থা হল সত্যাগ্রহ—সব চেয়ে বড় শক্তি। সমাজবাদ অন্য কোন পন্থাতেই সিদ্ধ হবে না। সত্যাগ্রহ রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার পাপ থেকেই সমাজকে মুক্ত করতে পারে।

নিউ দিল্লী, ১৩-৭-৪৭, হরিজন, ২০-৭-৪৭

অপরিগ্রহ অথবা দারিদ্র্য

অপরিগ্রহ অস্তেয়র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কোন জিনিস আসলে চুরি করা না হলেও যদি বিনা প্রয়োজনে আমরা অধিকার করি তবে তাকে চুরির জিনিস বলেই গণ্য করা হবে। পরিগ্রহের অর্থ ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা। একজন সত্যের উপাসক, প্রেম-পন্থার পথিক ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু জমিয়ে রাখতে পারেন না। ঈশ্বর ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা করেন না। বর্তমানে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি তিনি কখনই- উৎপন্ন করেন না। সুতরাং ঈশ্বরের শক্তি ও ব্যবস্থার প্রতি যদি

আমাদের বিশ্বাস থাকে তবে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে, তিনি আমাদের প্রতিদিনের অন্ন অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজনই পূর্ণ করে দেবেন। সাধু এবং সাধকরা, যাঁরা এই রকম শ্রদ্ধা নিয়ে জীবন যাপন করেছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিশ্বাসকে সত্য বলে পেয়েছেন। ঈশ্বরীয় বিধান মানুষকে তার প্রতিদিনের প্রয়োজনের মতই দেয়, তার বেশি দেয না। এই বিধানের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা বা অনবধানতার কারণেই অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে আর তার আনুষঙ্গিক রূপে বিভিন্ন প্রকারে দুঃখ-কষ্টও দেখা দিয়েছে। ধনীর কাছে প্রাচুর্যের ভাণ্ডার থাকে যা তার প্রয়োজন হয না আর সেজন্য তা অবহেলিত এবং অপচয হয়। অন্যদিকে জীবিকার অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায। যদি প্রত্যেকেই যেটুকু তার প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র নিজের কাছে রাখে তবে কেউ-ই অভাবে থাকবে না এবং সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। আজ ধনীরা গরীবদের চেয়ে কম অসন্তুষ্ট নয়। একজন গরীব লক্ষপতি হতে চায আর লক্ষপতি ক্রোড়পতি। সন্তোষের বৃত্তিকে সর্বত্র বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে ধনীরই অধিকার-চ্যুতির সূত্রপাত করা উচিত। তাঁরা যদি নিজেদের সম্পত্তিকে কেবল একটি সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখেন তবে ক্ষুধার্তকে সহজে খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। আর তাহলে ধনীদের সঙ্গে সঙ্গে সুখী হবার পাঠও তখন তারা গ্রহণ করবে। অপরিগ্রহ আদর্শের পূর্ণ সিদ্ধির শর্ত হল যে, পাখির মত মানুষেরও মাথার উপর কোন আচ্ছাদন থাকবে না, কোন পরিধেয় বস্ত্র থাকবে না এবং আগামী কালের জন্য কোন খাদ্যও মজুত থাকবে না। প্রতিদিনের জন্য তার অবশ্যই খাদ্যের প্রয়োজন হবে, কিন্তু তা যোগাড করা ঈশ্বরের কাজ, তার নয। এ যদি একান্তই সম্ভবপর হয তবু খুব কম লোক এই আদর্শে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু এর বাহ্যতঃ অসম্ভাব্যতা দেখে আমাদের মত সাধারণ অনুসন্ধানীদের পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয। এই আদর্শের প্রতি আমাদের সতত দৃষ্টি থাকা উচিত এবং তারই আলোকে আমাদের পরিগ্রহকে সমালোচনার দৃষ্টিতে পরীক্ষা করা ও ক্রমাগত তা কম করার চেষ্টা করা উচিত। সত্যকার সভ্যতা অভাব বৃদ্ধির মধ্যে নয়, বরং তার সজ্ঞান ও স্বেচ্ছাপূর্বক খর্বীকরণের মধ্যেই নিহিত। এর দ্বারা প্রকৃত সুখ ও সন্তোষের বৃদ্ধি হয় এবং সেবা করার শক্তি বর্ধিত হয়। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, আশ্রমে এমন জিনিস আমরা রেখেছি যার প্রয়োজন আমরা প্রমাণ করতে পারি না, আর সেইভাবে আমরা প্রতিবেশীদের চুরি করতে প্রলুব্ধ করি।

শুদ্ধ সত্যের দৃষ্টিতে শরীরও পরিগ্রহ। ঠিকই বলা হয়েছে যে, ভোগের ইচ্ছার

কারণেই আত্মার জন্য শরীরের সৃষ্টি হয়। যখন এই ইচ্ছা লুপ্ত হয় তখন আর শরীরের প্রয়োজনই থাকে না এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বিষচক্র থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আত্মা সর্বব্যাপী, শরীর-রূপী পিঞ্জরে সে কেন বন্দী হয়ে থাকতে চাইবে অথবা সেই পিঞ্জরের জন্য মন্দ কাজ বা হত্যা করবে। এইভাবে আমরা পূর্ণ ত্যাগের আদর্শে উপস্থিত হই এবং যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ তাকে সেবার কাজে প্রয়োগ করতে শিখি, এমন কি তখন অন্নের পরিবর্তে সেবা আমাদের জীবনের অবলম্বন হয়ে পড়ে। আমরা কেবল সেবা করার জন্যই খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা করি। মনের এই অবস্থা আমাদের প্রকৃত সুখ এবং সময়ের পূর্ণতায় আনন্দময় দৃষ্টিদান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের সকলের আত্মনিরীক্ষণ করা উচিত।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অপরিগ্রহের আদর্শ বস্তুর মত চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। যে-মানুষ ব্যর্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের মস্তিষ্ককে ভরিয়ে ফেলে সে এই অমূল্য সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করে। যে-চিন্তা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ করে বা তাঁর দিকে নিয়ে যায় না তা আমাদের পথের বাধক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানের সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। সেখানে আমাদেব বলা হয়েছে যে, অমানিত্বম্ (নম্রতা) প্রভৃতি হল জ্ঞান, আর বাকি সব কিছুই অজ্ঞান। যদি তা সত্য হয়—আর কোন সন্দেহ নেই যে, তা সত্য—তবে যাকে আজ জ্ঞান বলে আমরা আঁকড়ে ধরেছি তার অনেক কিছুই বিশুদ্ধ অজ্ঞান আর সেজন্য মঙ্গল করার পরিবর্তে তা কেবল আমাদের ক্ষতিই করে। এ মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে দেয়, এমন কি তাকে শূন্যও করে দেয় আর পাপের সীমাহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অসন্তোষ বর্ধিত হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ জড়তার পক্ষে যুক্তি নয়। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে মানসিক ও শারীরিক প্রবৃত্তির দ্বারা ভরে রাখা উচিত, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি যেন সাত্ত্বিক, সত্যোন্মুখী হয়। যিনি তাঁর জীবনকে সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন তিনি এক মুহূর্তও অলস থাকতে পারেন না। কিন্তু আমাদের সৎ প্রবৃত্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখতে হবে। সেবার প্রতি একাগ্রচিত্ত অনুরাগের দ্বারা সহজেই এই বিবেক লাভ করা যায়।

যারবেদা মন্দির, ১৯৩০

সেবা কি উপাসনা নয় ?

প্রশ্ন—মানুষ যে সময়টা ঈশ্বরের উপাসনায় ব্যয় করে সেই সময় দরিদ্রের সেবায় নিয়োগ করলে কি বেশি ভাল হবে না ? আর এই রকম মানুষের পক্ষে প্রকৃত সেবার ফলে ভক্তিমূলক উপাসনা কি অনাবশ্যক হওয়া উচিত নয় ?

—এই প্রশ্নের মধ্যে আমি মানসিক আলস্য এবং নাস্তিকতার গন্ধ পাই। শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীরাও কখন কীর্তন বা উপাসনা ত্যাগ করেন নি। সিদ্ধান্ত রূপে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, অপরের প্রকৃত সেবা করাই উপাসনা এবং এই রকম ব্যক্তিদের ভজন প্রভৃতিতে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসলে ভজন প্রভৃতি প্রকৃত সেবায় সহায়তা করে এবং ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্মৃতিকে জাগরূক রাখে।

নিউ দিল্লী, ৫-১০-৪৬, হরিজন, ১৩-১০-৪৬

শরীর-শ্রম

জীবনধারণের জন্য মানুষের কাজ করা উচিত, এই বিধিটি টলস্টয়ের 'শরীর-শ্রম' সম্বন্ধে লিখিত রচনা পড়েই সর্বপ্রথম আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু তারও আগে রাস্কিনের 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট' পড়ার পর থেকেই আমি একে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছিলাম। নিজের হাতে পরিশ্রম করে মানুষের অন্ন সংগ্রহ করা উচিত, এই ঈশ্বরীয় বিধানটির প্রতি সর্বপ্রথম টি. এম. বণ্ডারেফ নামে এক রুশীয় লেখক জোর দিয়েছিলেন। টলস্টয় তাঁর লেখার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং এর ব্যাপক প্রচার করেছিলেন। আমার ধারণায় এই সিদ্ধান্তকেই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যে যজ্ঞ না করে খায় সে চুরির অন্ন খায়। এখানে যজ্ঞের অর্থ কেবল শরীর-শ্রমই হতে পারে।

যুক্তির দ্বারাও আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাই। যে মানুষ শরীর-শ্রম করে না তার কি করে খাবার অধিকার থাকতে পারে ? বাইবেলে বলে, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই তুমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করবে'। কোন লাখপতি যদি সারাদিন ধরে বিছানায় পড়ে থাকে আর খাদ্যও তাকে অপরে খাইয়ে দেয়, তবে বেশিদিন সে সেইভাবে চালিয়ে যেতে পারবে না এবং শীঘ্রই সে জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়বে। সেজন্য সে ব্যায়াম করে ক্ষুধা সৃষ্টি করে এবং নিজের হাতে

খাবার খায়। এইভাবে ধনী দরিদ্র সকলকেই যদি কোন না কোন প্রকারের ব্যায়াম করতে হয় তবে তার রূপ উৎপাদক শ্রম অর্থাৎ শরীর-শ্রম হওয়া উচিত নয় কেন? কৃষককে কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে বা পেশী সঞ্চালন করতে বলে না। আর শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি লোক কৃষি করেই জীবন নির্বাহ করে। যদি এই বাকি দশভাগ লোকও অন্ততঃ নিজেদের অন্ন উৎপাদনের প্রযোজনমত শ্রম করে ঐ বিপুল বহুসংখ্যকের উদাহরণ অনুসরণ করত তবে পৃথিবী কতই না সুখী, সুস্থ ও শান্ত হত। আর এইরকম লোকেরা যদি এই কাজে হাত লাগায় তবে কৃষির বহু অসুবিধা সহজেই দূর হযে যায। তা ছাড়াও, বিনা ব্যতিক্রমে সকলেই যদি শবীর-শ্রমের কর্তব্যকে স্বীকার করেন তবে উচ্চ-নীচের বিভেদ বলে কথি বিভেদও দূর হয়ে যায সকল বর্ণের উপর এ সমানভাবে প্রযোজ্য। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ আছে এবং গরীব ধনীকে হিংসা করে। সকলেই যদি তাদের অন্নের জন্য শ্রম করে তবে উচ্চ-নীচের বিভেদ লুপ্ত হযে যায। ধনবান তখনও থাকবে, কিন্তু তারা তাদের সম্পত্তির অছি বলে নিজেদের মনে করবে এবং প্রধানত জনকল্যাণের জন্যই সেই সম্পত্তির ব্যবহার করবে।

যিনি অহিংসার অনুসরণ কবতে চান, সত্যের পূজা করতে চান এবং ব্রহ্মচর্য পালনকে প্রকৃতিগত করে নিতে চান তাঁর পক্ষে শরীর-শ্রম যথার্থ আশীর্বাদের মত। কেবল কৃষির সঙ্গেই এই শ্রমের প্রকৃত সম্বন্ধ রাখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে কোন প্রকারেই সকলের অবস্থা কৃষি কবার মত নয। সেইজন্য কৃষিকে চিরন্তন আদর্শরূপে মনে করেও ভূমি চাষ করার পরিবর্তে সূতাকাটা, তাঁত বোনা, ছুতার বা কামারেব কাজ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্যেককেই তার নিজের মেথর হওয়া উচিত। খাদ্য গ্রহণের মত মলত্যাগও সমান প্রযোজন, আর সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল প্রত্যেকেই নিজের নিজের মলমূত্র পরিষ্কার করবে। আমি বহু বৎসর ধরে অনুভব করছি যে, সমাজে একটি ভিন্ন শ্রেণীকে ময়লা পরিষ্কারের কাজ দেওযার মধ্যে নিশ্চয কোন মৌলিক দোষ রয়েছে। আমাদের কাছে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে, সর্বপ্রথম কে এই অত্যাবশ্যক আরোগ্য কার্যটিকে নিম্নতম সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি যেই হন, কোন প্রকারেই ভাল কাজ আমাদের তিনি করেন নি। বাল্যাবস্থা থেকেই এই ধারণা আমাদের মনে দৃঢ়মূল করে দেওয়া উচিত যে, আমরা সকলেই মেথর। আর তা করার সহজতম উপায় হল যে, যাঁরা এই বিষয়কে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন তাঁরা যেন মেথরের

রূপেই শরীর-শ্রম আরম্ভ করে দেন। বুদ্ধিপূর্বক মেথরের কাজ গ্রহণের দ্বারা মানুষের সমরূপতার প্রকৃত মর্যাদাবোধ সহজ হয়ে উঠবে।

বারবেদা মন্দির, ১৯৩০

শরীর-শ্রমের ধর্ম

বৌদ্ধিক শ্রমের দ্বারা মানুষ কি তার জীবিকা উপার্জন করতে পারে না?—না। শরীরের প্রয়োজন শরীরের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া চাই। 'সিজারের যা প্রাপ্য তা তাকে দিয়ে দাও'—বাইবেলের এই কথাটি এখানে বোধ হয় ভালভাবেই প্রযোজ্য হয়।

নিছক মানসিক অর্থাৎ বৌদ্ধিক শ্রমের স্থান আত্মার উদ্দেশ্যে কৃত এবং তার নিজস্ব এক পরিতুষ্টি আছে। তার জন্য কোন পারিশ্রমিক চাওয়া উচিত নয়। আদর্শ অবস্থায় ডাক্তার উকিল এবং এই প্রকারের অন্য লোকেরা কেবল সমাজের মঙ্গলের জন্যই কাজ করবেন, আত্মপোষণের জন্য করবেন না। শরীর-শ্রমের নিয়ম স্বীকার করলে সমাজে এক নিঃশব্দ বিপ্লব সংঘটিত হবে। জীবন-সংগ্রামের স্থানে পারস্পরিক সেবার সংগ্রামের দ্বারা মানুষের বিজয় সূচিত হবে। মানবধর্ম পশুধর্মের স্থান গ্রহণ করবে।

গ্রামে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল শরীর-শ্রমকে ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিষয়কে নিশ্চিতরূপে এবং স্বেচ্ছায় স্বীকার করা। কিন্তু সমালোচক বলেন, 'ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সন্তান বর্তমানে গ্রামেই বাস করেন, কিন্তু তবু তাদের অর্ধ-ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়।' দুঃখের বিষয় এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। সৌভাগ্যক্রমে আমরা জানি যে, তাদের শরীর-শ্রমের স্বীকৃতি স্বেচ্ছাপূর্বক নয়। সম্ভবপর হলে তারা বোধ হয় শরীর-শ্রমকে পরিহার করবে এবং স্থান পেলে নিকটতম কোন শহরে গিয়ে বসবাস করতে পছন্দ করবে। কোন মালিকের বাধ্যতামূলক আজ্ঞাপালন হল দাসত্বের অবস্থা আর স্বেচ্ছাপূর্বক পিতার আজ্ঞাপালন পুত্রের গৌরব। তেমনি শরীর-শ্রমের নিয়মকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করলে দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এ দাসত্বের অবস্থা। স্বেচ্ছায় একে স্বীকার করলে সন্তোষ এবং স্বাস্থ্যলাভ হবে। আর স্বাস্থ্যই সত্যকার সম্পদ, সোনা-রূপার খণ্ড সম্পদ নয়। গ্রামোদ্যোগ সংঘ স্বেচ্ছাকৃত শরীর-শ্রমের এক প্রয়োগ।

হরিজন, ২৯-৬-৩৫

দৈহিক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমি বৌদ্ধিক শ্রমের মূল্য কমাচ্ছি না। কিন্তু এর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তাতে দৈহিক শ্রমের কোন ক্ষতিপূরণই হয় না, সকলের সমান কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই দৈহিক শ্রম করার জন্যই আমাদের প্রত্যেকের জন্ম হয়েছে। দৈহিক শ্রম অপেক্ষা এ অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং তা প্রায়ই হয়, কিন্তু এ কখনই দৈহিক শ্রমের বিকল্প হয় না বা হতে পারে না। যেমন, বৌদ্ধিক ভোজন আমরা যে আহার্য গ্রহণ করি তার চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও তার স্থান সে কখন গ্রহণ করতে পারে না। আসলে ভূমি থেকে উৎপাদন না হলে বৌদ্ধিক উৎপাদন অসম্ভব হয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-২৫

বৌদ্ধিক এবং শারীরিক-শ্রম

প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথ বা রমন শরীর-শ্রম করেই তাঁদের আহার্য অর্জন করবেন, এর প্রতি আমাদের জিদ করা কেন উচিত? এ কি সম্পূর্ণ অপব্যয় নয়? যাঁরা মস্তিষ্কের কাজ করেন তাঁদের দৈহিক শ্রমের লোকদের সঙ্গে সমতুল্য বলে কেন গণ্য করা হবে না, যখন উভযেই সমাজের প্রয়োজনীয় কাজ করেন?

—বৌদ্ধিক কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের পরিকল্পনায় তার এক নিঃশব্দ স্থান আছে। কিন্তু আমার আগ্রহ শরীর-শ্রমের প্রয়োজনীয়তার উপর। আমার দাবি হল যে, কোন মানুষেরই এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়। এমন কি এ বৌদ্ধিক কাজের গুণ-বৃদ্ধিও করবে। আমি এই কথাই বলতে চাই যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা শরীর ও মন দুটির দ্বারা কাজ করতেন। কিন্তু যদি তাঁরা তা নাও করে থাকেন, বর্তমানকালে শারীরিক শ্রমের প্রযোজন এক প্রমাণিত সত্য।

ধরমপুর (নোয়াখালি), ৬-২-৪৭; **হরিজন**, ২৩-২-৪৭

তৃতীয় প্রকরণ ঃ সমবণ্টন

সমবণ্টন

গঠনকর্ম পদ্ধতির উপর লিখিত প্রবন্ধে আমি সম্পদের সমবণ্টনকে তেরো দফার অন্যতম বলে উল্লেখ করেছি।*

সমবণ্টনের প্রকৃত তাৎপর্য হল যে, প্রত্যেক মানুষ যেন তার স্বাভাবিক প্রয়োজন পূর্ণ করবার মত সাধন পায়, তার বেশি নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যক্তির যদি হজমশক্তি কম হয় এবং তার রুটির জন্য মাত্র এক পোয়া আটার প্রয়োজন হয় আর অন্য কোন ব্যক্তির যদি আধ সের আটার প্রয়োজন থাকে তবে দুজনেরই নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করবার সুযোগ পাওয়া উচিত। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থারই পুনর্গঠন করতে হবে। অহিংসার উপর আশ্রিত সমাজের অন্য কোন আদর্শ হতে পারে না। আমরা হয়ত সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারব না, কিন্তু তবু আমাদের সেই আদর্শকে স্মরণে রাখা এবং তার নিকটে পৌছবার জন্য নিরন্তর কাজ করা উচিত। লক্ষ্যের দিকে যতটা আমরা অগ্রসর হব ততই সন্তোষ ও সুখ আমরা পাব এবং অহিংস সমাজ গঠনের পথে সেই পরিমাণ সাহায্যও আমরা করব।

অপরে এই রকম করবে এই ভেবে প্রতীক্ষা না করেও একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরনের জীবনযাপন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। আর, একজন ব্যক্তি যদি আচরণের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করতে পারে তবে তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, ব্যক্তির সমষ্টিও তা করতে পারে। সত্য পথ অবলম্বনের জন্য কারুর যে অপরের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত নয়, এই বিষয়ে আমার জোর দেওয়া প্রয়োজন। লোকেরা যখন অনুভব করে যে, কোন উদ্দেশ্যের পূর্ণ মাত্রায় পূর্তি হবে না তখন সাধারণতঃ তার প্রারম্ভ করতে তারা দ্বিধা করে। এই প্রকারের মনোবৃত্তি সত্য-সত্যই প্রগতির প্রতিবন্ধক।

অহিংস উপায়ে কি করে সমবণ্টন সংঘটিত করা যায়, সেই বিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। এর প্রথম পদক্ষেপ হল এই যে, যিনি এই আদর্শকে নিজের

* ১৮-৮-৪০ তারিখের 'হরিজন'-এর ২৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

জীবনে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করে নেন। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা স্মরণে রেখে তিনি তাঁর প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ততম করে নেবেন। তাঁর উপার্জন অসাধুতা থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি ফটকার ইচ্ছা ত্যাগ করবেন। তাঁর আবাস নূতন জীবনপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সংযমের সঙ্গে কাজ করবেন। যখন তিনি নিজের জীবনে সম্ভাব্য সব কিছু করে নেবেন কেবল তখনই তিনি তাঁর সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের কাছে সেই আদর্শ প্রচারের যোগ্য হবেন।

বস্তুতঃ সমবণ্টনের এই আদর্শের বুনিয়াদে ধনবানদের অনাবশ্যক ধনের অছিবাদের সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। কেন না এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা প্রতিবেশীদেব চেয়ে এক টাকাও বেশি রাখতে পারেন না। কি করে তা করা হবে? অহিংসার দ্বারা? অথবা, ধনবানদের কাছ থেকে তাঁদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে? তা করতে হলে স্বভাবতই আমাদের হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। এই সহিংস কাজ সমাজের মঙ্গল করতে পাবে না। তাতে সমাজ আরও গরীব হয়ে যাবে, কেন না যাঁরা সম্পদ সংগ্রহ করতে পারেন তাঁদের সেই গুণ থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। সুতবাং অহিংস উপায প্রত্যক্ষরূপে শ্রেষ্ঠ। ধনবানের কাছে তার ধন রাখতে দেওয়া হবে, কিন্তু তা থেকে সে কেবল সেইটুকুই নিজের জন্য ব্যবহার করবে যেটুকু সে তাব উচিত-প্রয়োজন বলে মনে করবে এবং বাকিটুকুর জন্য সমাজের উপযোগের উদ্দেশ্যে অছি রূপে কাজ করবে। এই আলোচনায় অছির সাধুতাকে প্রামাণিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

মানুষ যখনই নিজেকে সমাজের সেবক বলে মনে করতে আরম্ভ করে, সমাজের জন্যই উপার্জন এবং সমাজের কল্যাণের জন্যই ব্যয করতে আরম্ভ করে তখনই তার উপার্জনে পবিত্রতা এসে যায় আর তার কর্মোদ্যমে অহিংসার প্রবেশ ঘটে। অধিকন্তু এই জীবন প্রণালীব দিকে যদি মানুষের মন ফেরে তবে সমাজে এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব হয়ে যাবে আর তাও বিনা কোন তিক্ততায়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মানবস্বভাবের এই রকম পরিবর্তন ইতিহাসে কোন সময়ে কি পাওয়া যায়? ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই এই রকম পরিবর্তন হয়ে থাকবে। সমগ্র সমাজে যে এই রকম পরিবর্তন হয়েছে তা হযত কেউ দেখাতে পারবে না। কিন্তু তার অর্থ এইটুকুই যে, আজ পর্যন্ত বৃহৎ ক্ষেত্রে অহিংসার পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয নি। কোন না কোন ভাবে আমাদের মধ্যে এই এক মিথ্যা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, অহিংসা মূলতঃ ব্যক্তির অস্ত্র আর সেজন্য তার প্রয়োগ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই

সীমিত থাকা উচিত। বস্তুত তা নয়। অহিংসা নিশ্চিতরূপে সমাজের ধর্ম—এই সত্যের প্রতি লোকেদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অহিংসার প্রয়োগ ও পরীক্ষা এখন আমি করছি। আশ্চর্যজনক জিনিসের এই যুগে কেউ বলবে না যে, কোন বস্তু বা কল্পনা নতুন বলেই তা অসার। কোন জিনিস কঠিন বলেই তাকে অসম্ভব বলা যুগধর্মের সঙ্গতিপূর্ণ কথা নয়। যেসব জিনিসের কল্পনা স্বপ্নেও করা হয় নি রোজই তাদের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, অসম্ভব নিয়ত সম্ভব হযে উঠছে। হিংসার ক্ষেত্রে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিসের আবিষ্কারে আমরা ক্রমাগত বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি যে, অহিংসার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি অকল্পিত এবং দৃশ্যত অসম্ভব জিনিসের আবিষ্কার হবে। ধর্মের ইতিহাস এই রকম দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ণ। সমাজ থেকে ধর্মের মূল উৎপাটনের চেষ্টা এক অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র। আর এই রকম প্রচেষ্টা যদি সফল হয়ে যায় তবে তার অর্থ হবে সমাজের বিনাশ। যুগে যুগে কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অন্যান্য ত্রুটি ধর্মে প্রবেশ করে এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে ভ্রষ্টও করে। সেগুলি আসে আবার যায়। কিন্তু ধর্ম স্বয়ং থেকে যায়। কারণ পৃথিবীর অস্তিত্ব ব্যাপক অর্থে ধর্মের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বরের বিধান অনুসরণ করাকেই ধর্মের অন্তিম ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। ঈশ্বর এবং তাঁর বিধান সমার্থক শব্দ। সুতরাং এক অপরিবর্তনীয় ও চিন্ময় বিধানের দ্বারাই ঈশ্বর অভিপ্রেত হন। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত সত্যসত্যই কেউ তাঁকে পান নি। কিন্তু অবতার এবং ধর্মগুরুরা তাঁদের তপস্যার বলে মানবজাতিকে ঐ শাশ্বত বিধানের আভাস দেখিয়েছেন।

কিন্তু যদি সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ধনবানরা সত্যকার অর্থে দরিদ্রের অভিভাবক না হন এবং দরিদ্ররাও ক্রমাগত দমিত ও অনশনে মৃত হতে থাকে, তবে কী করা হবে? এই প্রহেলিকার সমাধান অনুসন্ধান করতে গিয়ে অহিংস অসহযোগ ও সবিনয় অবজ্ঞাকেই আমার যথোপযুক্ত এবং অভ্রান্ত সাধন বলে মনে হয়েছে। ধনবানরা সমাজের গরীব লোকেদের সহযোগিতা ব্যতীত ধন সংগ্রহ করতে পারেন না। শুরু থেকেই হিংসার সঙ্গে মানুষের পরিচয় রয়েছে, কেন না পশুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই শক্তি নিজের প্রকৃতিতে সে পেয়েছে। চতুষ্পদের (পশু) অবস্থা থেকে যখন সে দ্বিপদে (মানুষ) উন্নীত হয় কেবল তখনই অহিংসার শক্তির বোধ তার অন্তর সত্তায় প্রবেশ করে। এই বোধ তার অন্তরে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে বিকশিত হয়েছে। এই বোধ যদি গরীব লোকেদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং ব্যাপ্ত হয়ে যায় তবে যে অসাম্য তাদের অনশনের প্রান্তে উপনীত করে

দিয়েছে তা থেকে অহিংস উপায়ে কি করে মুক্ত হওয়া যায় তা তারা শিখতে পারবে।

হরিজন, ২৫-৮-৪০

আর্থিক সাম্য

প্রশ্ন—গঠনকর্মে রত থাকার সময় কোন কংগ্রেসী কি আর্থিক সাম্যের কথা প্রচার করতে পারেন? সবিনয় অবজ্ঞার কার্যক্রম অনুসরণ করে আর্থিক সাম্যের স্থাপনা কি করে করা যেতে পারে?

—আপনার ভাষা সম্পূর্ণ অহিংস হলে আর জমিদার ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে জোর করে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার কথা কিছু লোক যেভাবে প্রচার করেছে, আপনার পদ্ধতিও যদি তাদের মত না হয় তবে আপনি নিশ্চয়ই তা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু প্রচার করা অপেক্ষা এক উৎকৃষ্ট পথ আমি প্রদর্শন করেছি। গঠনকর্ম পদ্ধতি দেশকে এই লক্ষ্যের দিকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। তার জন্য এখনই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সময়। চরখা এবং তার সঙ্গে সম্পক্ত শিল্পগুলি যদি পূর্ণ রূপে সফল হয় তবে তার দ্বারা সামাজিক এবং আর্থিক সমস্ত অসাম্যই প্রায় দূর হয়ে যাবে। অহিংসা জনগণকে যে শক্তি দেয় তার ক্রমবর্ধমান পরিণামের দ্বারা এবং আপন দাসত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদের বুদ্ধিপূর্বক অস্বীকার করার দ্বারা সাম্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।

হরিজন, ২৫-১-৪২

আর্থিক সাম্যের অর্থ

সাম্প্রতিক মাদ্রাজ ভ্রমণের সময় গঠনকর্মী সম্মেলনে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, 'আর্থিক সাম্য বলতে আপনি ঠিক কী মনে করেন?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার কল্পিত আর্থিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে, সকলে ঠিক পাইপয়সা হিসাবে সমান পাবে। এর সরল অর্থ হল যে, প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজন পূর্তির পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শীতের সময় আমার দুটি শালের প্রয়োজন হয়, অথচ আমার নাতি কানু গান্ধী—যে ছেলের মতই আমার কাছে থাকে—শীতবস্ত্রের মোটেই প্রয়োজন হয় না। আমার ছাগল

দুধ, কমলালেবু এবং অন্য ফলের প্রয়োজন হয়। কানু সাধারণ খাদ্যেই চালিয়ে নিতে পারে। এজন্য কানুকে আমি ঈর্ষা করি, অবশ্য তার কোন অর্থ হয় না। কানু যুবক আর আমি ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। আমার মাসিক খাবার খরচ কানু অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের মধ্যে আর্থিক অসাম্য রয়েছে। পিঁপড়ার চেয়ে হাতির হাজার গুণ বেশি খোরাক লাগে, কিন্তু তা অসাম্যের প্রকাশ নয়। সুতরাং আর্থিক সাম্যের প্রকৃত অর্থ হল, প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া। মার্ক্সের সূত্রও তাই। যদি একজন অবিবাহিত ব্যক্তি একলার জন্য, স্ত্রী ও চারটি সন্তানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সমান দাবি করে তবে তাতে আর্থিক সাম্যের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করা হবে।

'কিন্তু তাই বলে উচ্চ শ্রেণী ও জনগণ এবং রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যে বিপুল বৈষম্য রয়েছে তাকে এই যুক্তি দিয়ে যেন কেউ সমর্থন করার চেষ্টা না করেন যে, উচ্চ শ্রেণী এবং রাজাদের প্রয়োজন অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক বেশি। তাতে অলস যুক্তিবিলাসের দ্বারা আমার যুক্তিকে পরিহাস করা হবে। এখন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য তা এক বেদনাদায়ক অবস্থা। দরিদ্র গ্রামীণ জনসাধারণ একদিকে বিদেশী সরকার আর অপরদিকে তাদের দেশবাসী, শহর-বাসীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। তারা খাদ্য উৎপাদন করে কিন্তু নিজেরা ক্ষুধিত থেকে যায়। তারাই দুধ যোগায় অথচ তাদের ছেলে-মেয়েরা দুধ পায় না। এ অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থা। প্রত্যেকের উপযুক্ত পরিমিত খাদ্য, স্বচ্ছন্দ বাসোপযোগী ঘর, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং রোগে যথোচিত ঔষধ ও পথ্য অবশ্যই পাওয়া উচিত।'

গান্ধীজীর কাছে এইটিই হল আর্থিক সাম্যের চিত্র। এই প্রাথমিক প্রয়োজন-গুলি ছাড়া অন্যান্য প্রযোজনকে তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু দরিদ্র জন-সাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন পূর্তির পরেই সেগুলি আসবে। প্রথম কাজটি প্রথমেই করতে হবে।

হরিজন, ৩১-৩-৪৬

আর্থিক সাম্য

প্রশ্ন—যাঁরা সমাজের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কাজ করেন তাঁরা কৃষক বা ভাঙ্গি, ইঞ্জিনিয়ার বা একাউন্টেন্ট, ডাক্তার বা শিক্ষক যাই হোন, আপনার মতে কি

তাঁদের বাকি সকলের সঙ্গে কেবল সমান পারিশ্রমিক নেবারই নৈতিক অধিকার আছে? অবশ্য, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা এবং অন্যান্য খরচ সরকার বহন করবেন। আমাদের প্রশ্ন হল যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য সকলেরই কি একই রকম বেতন পাওয়া উচিত নয়? আপনি কি মনে করেন না যে, আমরা যদি এই সাম্যের জন্য কাজ করি তবে অন্য যে কোন পদ্ধতি অপেক্ষা এই কাজের দ্বারা দ্রুততরভাবে অস্পৃশ্যতার মূল উৎপাটিত হবে?

—আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষকে যদি এমন এক আদর্শ জীবন অনুসরণ করতে হয় যাতে বিশ্বের ঈর্ষার উদ্রেক হবে, তবে সারাদিনের সৎ-পরিশ্রমের জন্য সমস্ত ভাঙ্গি, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যদেরও একই রকম বেতন পাওয়া উচিত। ভারতীয় সমাজ হয়ত কোনদিন এই লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে এক সুখী দেশে পরিণত করতে হলে প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য যে, এই লক্ষ্যের দিকে যেন তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়।

হরিজন, ১৬-৩-৪৭

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—কেউ যদি সারাদিন কাজ করেও পেট ভরে খেতে না পায় তাহলে সে কী করবে?

—যে পরিশ্রম করে তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। এই নিয়ম আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। সব রকমের উপযোগী কাজেরই সমান তথা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। যতদিন না সেই অবস্থা আসে ততদিন অন্ততঃ এইটুকু হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক লোকই যেন কাজ করে, তার এবং তার পরিবারের খাওয়া-পরার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়। যে সরকার এইটুকুও করতে পারে না, সে সরকার সরকারই নয়। সে তো অরাজকতা। শান্তিপূর্ণভাবে এই রকম রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা উচিত। শস্যের দোকান লুট করলে বা গুণ্ডামি করলে এর কোন প্রতিকার হবে না। লুঠপাট ও গুণ্ডামির ফলে অনর্থক ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়। কর্তৃপক্ষ যদি ভয় পেয়ে নমিতও হন তবু তাতে তাঁদের বা জনসাধারণের প্রকৃত সহায়তা হবে না। এর দ্বারা অরাজকতা দূর হবে না এবং অবস্থা যেমনকার তেমন থেকে যাবে। পৃথিবীর চারদিকে চেয়ে দেখলে এই কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

সরকারের ডিপোয় খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও যদি বুভুক্ষুরা তা না পায় তবে তারা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করতে পারে। তাদের যা দেওয়া হয় নি তা বলপূর্বক নিয়ে আসা তাদের উচিত নয়। তারা আমরণ অনশন করতে পারে আর এই ভাবে তাদের নিজেদের ও অন্যান্যদের দুর্দশার প্রতিকার করতে পারে। তাদের যদি ধৈর্য থাকে তবে আমি যে উপায়ের কথা বলেছি তা সফল হবেই।

মুসৌরী, ২৯-৫-৪৬
হরিজন, ৯-৬-৪৬

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—এখন যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়েছে সেখানে কোন্ সিদ্ধান্ত অনুসারে মন্ত্রীদের বেতন নির্ধারিত হবে? এ বিষয়ে করাচী-প্রস্তাব* কি এখনও বলবৎ আছে? বর্তমান চড়া বাজারের হিসাবে যদি বেতন নির্ধারণ করতে হয় তবে প্রদেশগুলির পক্ষে আপন আয়ের সীমার মধ্যে থেকেও কি বাজেটে সমস্ত কর্মচারীদের বেতন তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? তা যদি না হয়, তবে এটা কি উচিত যে, মন্ত্রীদের ১,৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হবে অথচ একজন চাপরাসী বা শিক্ষককে বলা হবে যে, তোমরা ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকায় চালিয়ে নাও আর যেহেতু কংগ্রেসকে রাজ্যশাসন করতে হবে সেই হেতু কোন গোলমাল করো না?

—প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত। একজন মন্ত্রী ১,৫০০৲ আর চাপরাসী বা শিক্ষক ১৫৲ টাকা বেতন কেন পাবেন? কিন্তু কেবল প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারাই তার সমাধান হবে না। এই রকম পার্থক্য বহু যুগ থেকে চলে আসছে। হাতির প্রচুর পরিমাণ খাদ্য চাই অথচ পিঁপড়ার পক্ষে এক দানা শস্যই যথেষ্ট, কেন? প্রশ্নটির মধ্যেই উত্তর নিহিত রয়েছে। ঈশ্বর সকলকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে দিয়ে থাকেন। যদি হাতি এবং পিঁপড়ার মত মানুষের প্রয়োজন-ভেদও আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি তাহলে আর কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, সমাজে প্রয়োজনের ভেদ আছে। কিন্তু কী হিসাবে এই

* ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে 'মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে সাধারণতঃ কোন সরকারী কর্মচারীকে ৫০০৲ টাকার বেশি বেতন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

ভেদ হয় তা আমরা জানি না। সেইজন্য আজ আমরা যা করতে পারি তা হল এই যে, এই ভেদকে যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করা। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এবং জনমত গঠন করেই এই ভেদ কমানো যেতে পারে, জোর করে বা সত্যাগ্রহের নামে দুরাগ্রহ করে তা করা যেতে পারে না। মন্ত্রীরা জনসাধারণের লোক। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বেও তাঁদের প্রয়োজন চাপরাসীর সমান ছিল না। চাপরাসী মন্ত্রিত্ব করার যোগ্য হবে এবং তবু তার প্রয়োজন বাড়বে না, এ দেখতে পেলে আমি সুখীই হব। এটিও পরিষ্কার বুঝে নেওয়া দরকার যে, মন্ত্রীদের যে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে তা যে তাঁদের পুরাপুরি নিতেই হবে এমন নয়।

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি কথা আছে এবং তাও প্রণিধানযোগ্য। একজন চাপরাসীর পক্ষে ঘুষ না নিয়ে মাসিক ১৫৲ টাকায় নিজেকে এবং তার সংসারকে প্রতিপালন করা কি সম্ভব? যাতে সে লোভের বশবর্তী না হয় সেজন্য কি তাকে যথেষ্ট দেওয়া উচিত নয়? এর প্রতিকারের উপায় হল যে, আমরা যেন প্রত্যেকেই যথাসম্ভব নিজের নিজের চাপরাসী হয়ে যাই। কিন্তু তবু যদি চাপরাসী রাখতে হয় তবে তাদের প্রযোজন অনুযায়ী যথেষ্ট অবশ্যই দিতে হবে। এইভাবে মন্ত্রী ও চাপরাসীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা দূর হবে।

নিউ দিল্লী, ১৪-৪-৪৬ ; হরিজন, ২১-৪-৪৬

সমান বেতন

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বললেন যে, আদর্শ অবস্থায় ব্যারিস্টার ও ভাঙ্গি দুজনের একই বেতন পাওয়া উচিত তা তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য সকলের মত তিনিও জানেন যে, বিশ্বব্যাপী সমগ্র সমাজ এই আদর্শ থেকে দূরে রয়েছে। সকলকে দৈনিক ১০০৲ টাকা বেতন দেওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি এও জানেন যে, ব্যারিস্টার যা পান তা পাবার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু মক্কেলরা আনন্দের সঙ্গে অত্যধিক ফি দিয়ে থাকেন। আরও নিচে এলে দেখা যাবে যে, লোকেরা দর্জিকে খুশীর সঙ্গেই দৈনিক চার টাকা দেবে, কিন্তু মেথরকে দিনে আট আনার বেশি দেবে না। সমাজকে উপার্জনের সমান স্তরে আনার জন্য ধৈর্য সহকারে নিয়ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সাম্যের ঐ অবস্থায় পৌছাতে হলে সমাজের খুব উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে উঁচু আর নিচু শ্রেণী দুটির বেতনে যে ব্যবধান রয়েছে তা দূর করার সমস্ত প্রচেষ্টা করা উচিত। পে-কমিশন তা করেছেন। বেতনবৃদ্ধি

যদি সন্তোষজনক না হয়ে থাকে, তবে তার কারণগুলি পরীক্ষা করা উচিত। এই বাড়তি ভার বহন করার ক্ষমতা দেশের আছে কিনা তাও বিচার করা কর্তব্য। জীবনে হঠাৎ উপরে ওঠার মত কোন জিনিস নেই। যে মুর্গীটা সোনার ডিম দেয় তাকে মেরে ফেলা উচিত নয়। তা করলে দেশকে দেউলে করে দেওয়া হবে।

হরিজন, ১০-৮-৪৭

চতুর্থ প্রকরণ ঃ শিল্প

যন্ত্র ও মানুষ

সমস্ত যন্ত্রেরই তিনি বিরোধী কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন :

—আমি কি করে তা হতে পারি, যখন আমি জানি যে, এই দেহটিও একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র? চরখা একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র, ছোট্ট দাঁত-খোঁটাও যন্ত্র। যন্ত্রের উন্মাদনার বিরুদ্ধেই আমি আপত্তি করি, যন্ত্র বলেই কোন জিনিসের প্রতি আমার আপত্তি নেই। যে যন্ত্রগুলিকে শ্রমলাঘবকর বলা হয়ে থাকে উন্মাদনা তো তাদের প্রতি। যতক্ষণ না হাজার হাজার লোককে বেকার করে দিয়ে না খেয়ে মরার জন্য খোলা রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে মানুষ ততক্ষণ শ্রম বাঁচাবার জন্য এগিয়ে চলে। আমি সময় ও শ্রম বাঁচাতে চাই, কিন্তু তা মানবসমাজের এক অংশের জন্য নয়, সকলের জন্যই। আমি ধন একত্র করতে চাই, কিন্তু তাও মুষ্টিমেয়র হাতে নয়, সকলের হাতে। এখন যন্ত্র তো কেবল মুষ্টিমেয়কে লক্ষ লক্ষ লোকের কাঁধে চাপতেই সাহায্য করে। এই সমস্তর পিছনে যে উত্তম রয়েছে তা শ্রম বাঁচাবার পরোপকারবৃত্তি নয়, তা হল লোভ। এই সংগঠনের বিরুদ্ধেই আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করছি। মানব কল্যাণই সব কিছু বিবেচনার শ্রেষ্ঠ বিষয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজের অভাবে জড় ও বেকার করে দেওয়া যন্ত্রের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি বৌদ্ধিক ব্যতিক্রমের উল্লেখ করব। সিঙ্গারের সেলাই কলের কথাই ধরুন। যে অল্প কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে এইটি তার মধ্যে একটি, আর এর উদ্ভাবনের পিছনে একটি রোম্যান্স আছে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এই সেলাই কলগুলি তৈরীর জন্য কারখানা খুলতে হবে এবং তাতে সাধারণ গডনের বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রও রাখতে হবে।

উত্তরে গান্ধীজী বললেন, হাঁ, কিন্তু আমি অবশ্যই একথা বলার মত সমাজবাদী যে, রাষ্ট্রই এই ধরনের কারখানাগুলির মালিক হবে অথবা সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যক্তির শ্রম বাঁচানোই যন্ত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মানবীয় লোভের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করা তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ, বেঁকা টেকো সোজা করার যন্ত্রকে আমি সর্বদাই স্বাগত করব। কামাররা টেকো তৈরী করা বন্ধ করে দেবে তা নয়, তারা তা করতে থাকবে, কিন্তু যখনই কোন টেকো বেঁকে যাবে তাকে সোজা করার একটা যন্ত্র প্রত্যেক কাটুনীর কাছে থাকবে। সুতরাং লোভের জায়গায় প্রেমকে বসাও দেখবে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা বললেন, কিন্তু আপনি যদি সিঙ্গারের সেলাই কল আর আপনার এই টেকোকে ব্যতিক্রম ধরেন তবে এই ব্যতিক্রমের শেষ কোথায় হবে?

—ঠিক সেখানেই হবে যেখানে যন্ত্র ব্যক্তিকে সহায়তা করা বন্ধ করবে এবং তার ব্যক্তিত্বকেই আক্রমণ করতে আরম্ভ করবে। যন্ত্র দ্বারা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পঙ্গু করতে দেওয়া হবে না।

—আদর্শ রূপে আমি সমস্ত যন্ত্রকেই ত্যাগ করতে চাইব, এমন কি মোক্ষের সহায়ক নয় বলে এই শরীরকেও আমি ত্যাগ করব এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য চেষ্টা করব। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সমস্ত যন্ত্রকে বাদ দেব। কিন্তু যন্ত্র থাকবে, কেন না শরীরের মতই তা অপরিহার্য। আমি তো আপনাদের বলেছি যে, শরীর স্বয়ং একটি বিশুদ্ধ যন্ত্র, কিন্তু আত্মার ঊর্ধ্বগতির জন্য তা যদি প্রতিবন্ধক হয় তবে তাকেও বাদ দিতে হবে।

হিন্দ স্বরাজ, ১৯৩৮

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ

খাদি মনোবৃত্তির অর্থ হল জীবনের আবশ্যক জিনিসের উৎপাদন ও বণ্টনের বিকেন্দ্রীকরণ। সুতরাং এতাবৎ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা হল এই যে, প্রত্যেক গ্রাম নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছু এবং শহরের প্রয়োজনের কিছু অংশ উৎপাদন করবে।

বৃহৎ শিল্পগুলিকে অবশ্যই কেন্দ্রীয়করণ ও জাতীয়করণ করতে হবে। কিন্তু

সেগুলি বিশাল জাতীয় প্রবৃত্তির সামান্যতম অংশ হবে। এই বিশাল প্রবৃত্তির বৃহৎ অংশ প্রধানতঃ গ্রামেই থাকবে।

গঠনকর্ম পদ্ধতি, পৃ-১২ (১৯৪১)

শোষণের প্রতিকার : নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়

মরিস ফ্রিডম্যান একটি প্রশ্ন করলেন, তাহলে গ্রামেতেই আপনার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত করার রহস্যটি কী?

এর উত্তরে গান্ধীজী বললেন : আমি বলে আসছি যে, যদি অস্পৃশ্যতা থেকে যায় তবে হিন্দুধর্ম শেষ হবে, সেই রকম আমি এই কথাও বলব যে, যদি গ্রামগুলি ধ্বংস হয় তবে ভারতবর্ষও ধ্বংস হবে। তখন আর তা ভারতবর্ষ থাকবে না। বিশ্বকে দেবার মত তার বাণীও তখন হারিয়ে যাবে। গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভবপর যখন সেগুলি আর শোষিত হবে না। ব্যাপক আকারে শিল্পীকরণ করলে গ্রামগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ্যই শোষণ করা হবে, কেন না তাতে প্রতিযোগিতা ও বাজারের সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। এইজন্য গ্রামেতেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত করতে হবে যাতে গ্রামগুলি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং প্রধানতঃ আপন প্রয়োজনীয় বস্তুরই উৎপাদন করে। গ্রাম-শিল্পের এই স্বরূপ যদি বজায় থাকে তবে গ্রামেতে এমন আধুনিক যন্ত্র ও হাতিয়ারের ব্যবহারে আমার কোন আপত্তি নেই যেগুলিকে গ্রামবাসীরা গ্রামেই নির্মাণ এবং কিনে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। তাতে শর্ত এই যে, অপরকে শোষণ করার জন্য যেন সেগুলির ব্যবহার করা না হয়।

মিঃ ফ্রিডম্যান বললেন, "আমি গত দু-বছর ধরে আপনার গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনটি বোঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু গত দু-বছরে আমি যা শিখতে পারি নি আজ কয়েক মিনিটেই তা শিখেছি। আপনি সমাজবাদীদের চেয়েও বেশি মৌলিক সংস্কারক। তারা শ্রমিকদের শোষণ করার বিরোধী, কিন্তু আপনি কেবল সেইটুকুই নন উপরন্তু শ্রমিকদেরও পরস্পরকে শোষণ করার আপনি বিরোধী।"

হরিজন, ২৯-৮-৩৬

শিল্পবাদী ভারতের বিপদ

গান্ধীজী একজন বড় পুঁজিপতিকে বললেন, ভগবান না করুন ভারতবর্ষও পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পবাদ গ্রহণ করল। একটিমাত্র ছোট দ্বীপ-রাষ্ট্রের (ইংলণ্ড) অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ আজ বিশ্বকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। যদি ত্রিশ কোটি লোকের একটি সমগ্র দেশ অনুরূপ অর্থনৈতিক শোষণের পথ গ্রহণ করে তবে পঙ্গপালের মত সমস্ত পৃথিবীকেই সে লুণ্ঠন করে ফেলবে। যদি ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা জনসাধারণের কল্যাণের অছি হয়ে এবং তাঁদের বুদ্ধিকে নিজেদের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার পরিবর্তে পরোপকারের প্রবৃত্তিতে জনগণের সেবায় নিযুক্ত করে, এই দুর্ঘটনাকে পরিহার করতে সহায়তা না করেন, তবে অন্তিমে হয় তাঁরা জনসাধারণকে বিনাশ করে স্বয়ং বিনষ্ট হয়ে যাবেন নয়তো জনসাধারণই তাঁদের ধ্বংস করে দেবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১২-৩৮

শিল্পবাদ

আমার ভয় হয় যে, শিল্পীকরণ মানবজাতির কাছে এক অভিশাপ হতে চলেছে। চিরকাল একটি জাতির দ্বারা আর একটি জাতির শোষণ চলতে পারে না। আপনার শোষণ করার ক্ষমতা, বিদেশী বাজার আপনার কাছে কতটা খোলা আছে এবং অপ্রতিযোগীর অভাব, এই সবের উপর শিল্পবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। ইংলণ্ডে এই কারণগুলি দিন দিন কমে আসছে বলেই সেখানে প্রত্যহ বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। ভারতবর্ষেব বয়কট খুবই সামান্য কারণ। ইংলণ্ডেরই যদি এই অবস্থা হয় তবে ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশ শিল্পবাদের দ্বারা কল্যাণ আশা করতে পারে না। ভারতবর্ষ যখন অন্য দেশকে শোষণ করতে আরম্ভ করবে—আর ভারতবর্ষ যদি শিল্পবাদী দেশ হয় তবে তা করবেই—তখন সে অন্যান্য দেশের কাছে এক অভিশাপ, বিশ্বের কাছে এক বিপদ হয়ে উঠবে। আর অন্য দেশকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের শিল্পীকরণের কথাই বা আমি কেন চিন্তা করতে চাইব? আপনারা কি এই দুঃখপূর্ণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না যে, যেখানে আমরা ত্রিশ কোটি বেকারের জন্য কাজ যোগাড় করতে পারি সেখানে ইংলণ্ড মাত্র ত্রিশ লক্ষ লোকের জন্য কোন কাজ যোগাড় করতে পারছে না। আর সেজন্য এই সমস্যা

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। শিল্পবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানীর মত সফল প্রতিযোগীরা আজ ইংলণ্ডের সামনে উপস্থিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় কারখানাও আজ তার প্রতিযোগী। আর ভারতবর্ষে যেমন জাগৃতি এসেছে তেমনি প্রাকৃতিক, খনিজ ও মানবসম্পদে ভারতবর্ষের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি সম্পন্ন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও জাগৃতি আসবে। আফ্রিকার পরাক্রমী জাতিগুলির সামনে ক্ষমতাবান ইংলণ্ডকে ছোট্ট পিগমীর মতই দেখায়। আপনারা বলবেন যে, যাই হোক তারা হল মহান বর্বর। তারা মহান ঠিকই, তবে বর্বর নয়, আর এমন হতে পারে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই পাশ্চাত্য দেশগুলির মাল সস্তা দামে বিক্রী করার জন্য আফ্রিকার বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে, পশ্চিমের কাছেই শিল্পবাদের ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকারময় হয় তবে ভারতবর্ষের কাছে কি তা আরও বেশি অন্ধকারময় নয়?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১

শিল্পবাদের বিকল্প

কোন দেশের পক্ষে কোন-না-কোন কারণে শিল্পীকরণের প্রয়োজন, একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের পক্ষে তার প্রয়োজন তো আরও কম। বাস্তবিক আমি বিশ্বাস করি যে, স্বাধীন ভারতবর্ষ শুধু তার হাজার হাজার কুটীরশিল্পের বিকাশ করে সরল ও উদাত্ত জীবন অনুসরণের দ্বারা এবং বিশ্বের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেই দুঃখার্ত বিশ্বের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। ধনকুবেরের আরাধনার দ্বারা দ্রুতগতির উপর আশ্রিত যে জটিল জড়-জীবন আমাদের উপর চাপানো হয়েছে তার সঙ্গে উচ্চ চিন্তার কোন সঙ্গতি নেই। জীবনের সমস্ত মাধুর্য তখনই প্রকাশিত হয় যখন আমরা উদাত্ত জীবন যাপনের কলা শিখি।

সংশয়ীর মনে এই সন্দেহ জাগতে পারে যে, ভৌগোলিক আয়তনে ও সংখ্যার দৃষ্টিতে কোন দেশ যত বড়ই হোক, আগাগোড়া অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এবং ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বে তার পক্ষে কি এককভাবে এই রকম সরল জীবন অনুসরণ করা সম্ভব। এর উত্তর সহজ এবং সোজা। যদি সরলভাবে জীবন যাপন করার মূল্য থাকে তবে তা একজন ব্যক্তিই করুক আর একটি গোষ্ঠীই করুক সেই জীবন

যাপনের প্রচেষ্টারও একটি মূল্য আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি এও স্বীকার করি যে, কয়েকটি মূল শিল্পের প্রয়োজন থাকবে। আমি আরাম-কেদারা অথবা সশস্ত্র সমাজবাদ কোনটিই স্বীকার করি না। কবে সকলের পরিবর্তন হবে তার অপেক্ষায় না থেকে নিজের শ্রদ্ধা অনুসারে কাজ করাতেই আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং মূল শিল্পগুলির সংখ্যা গণনা না করে, যেসব শিল্পে বহুলোককে এক সাথে কাজ করতে হয় সেগুলির উপর আমি রাষ্ট্রের অধিকার স্থাপিত করে দেব। শ্রমিকদের শ্রমোৎপাদিত বস্তুর মালিকানা রাষ্ট্রের মাধ্যমে, তারা নিপুণ বা অনিপুণ যাই হোক, তাদের উপরই বর্তাবে। কিন্তু যেহেতু আমি অহিংসার আধারেই এই রকম এক রাষ্ট্রের কল্পনা করতে পারি সেই হেতু আমি ধনবানদের সম্পত্তি জোর করে ছিনিয়ে নেব না, বরং রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াতে আমি তাঁদের সহযোগিতা আহ্বান করব। ধনবানই হোক আর দরিদ্রই হোক, সমাজে কেউই অস্পৃশ্য নয়। এই দুটি একই ব্যাধির ক্ষত। আর শেষ পর্যন্ত সকলেই তো মানুষ।

দিল্লীর পথে ট্রেনে, ২৫-৮-৪৬, হরিজন, ১-৯-৪৬

শিল্পীকরণ

প্রশ্ন—সরকার দেশের কাঁচা মালের অধিকতর ব্যবহারের জন্য শিল্পীকরণের পরিকল্পনা উপস্থিত করছেন। কিন্তু তাঁরা দেশের বিপুল ও বেকার জনশক্তির ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন না, এই জনশক্তি তো কাজের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রকম পরিকল্পনাকে কি স্বদেশী মনে করা যেতে পারে?

—প্রশ্নটি বেশ ভাল ভাবেই করা হয়েছে। সরকারী পরিকল্পনা যে কী তা সঠিক আমি জানি না। কিন্তু আমি আন্তরিক ভাবে এই কথা সমর্থন করি যে, যে-পরিকল্পনা কোন দেশের কাঁচা মাল থেকে লাভ সংগ্রহ করে কিন্তু জনশক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আরও অধিকগুণ শক্তিকে অবহেলা করে সে পরিকল্পনা সঙ্গতিহীন এবং তা কখনই মানবীয় সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিমুখী হতে পারে না।

প্রকৃত পরিকল্পনা তখনই হবে যখন ভারতবর্ষের সমস্ত জনশক্তির উত্তম ব্যবহার করা হবে এবং তার কাঁচা মাল বাইরে পাঠিয়ে আবার অত্যধিক দামে পাকা মাল কেনার পরিবর্তে ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রামে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

হরিজন, ২৩-৩-৪৭

গ্রাম্য শিল্পে প্রত্যাবর্তন

শস্যভাঙ্গার আদিম পদ্ধতিতে, সেই পদ্ধতি আদিম বলেই, তাতে ফিরে যাবার কোন পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। আমি ফিরে যাবার কথা এইজন্যই বলি যে, গ্রামের লক্ষ লক্ষ অলস লোককে কাজ দেবার অন্য কোন উপায় আর নেই।

হরিজন, ৩০-১১-৩৪

পঞ্চম প্রকরণ ঃ ন্যূনতম বেতন

প্রামাণিক বেতনের প্রয়োজন

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ এজেন্ট এবং অন্যান্য লোকেদের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছেন। এগুলির উত্তর ১লা আগষ্টের আগেই ওয়ার্ধার কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছানো চাই ঃ

> "প্রস্তাব করা হয়েছে যে, অঃ ভাঃ গ্রামোদ্যোগ সংঘের ব্যবস্থাপনায় যেসব জিনিসের উৎপাদন বা বিক্রয় হয় সেগুলির বিষয়ে আমাদের এই আগ্রহ থাকা উচিত যে, গ্রামীণ কারিগররা যেন তাদের শ্রমের পূর্ণ পারিশ্রমিক পায়। এই জন্য কাজের পারিশ্রমিকের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা দরকার। এই মানদণ্ড সমান কাজের জন্য স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে একই হওয়া উচিত। একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম উৎপাদকের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টাকেই এই মানদণ্ডের আধার ধরা যেতে পারে। এই পারিশ্রমিক জিনিসের উৎপাদন-মূল্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এবং তা ধরে নিয়েই জিনিসের দাম নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের দাম নির্ধারণ করতে আমরা সক্ষম না হতে পারি। কিন্তু যেসব জিনিস প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না এবং যেসব মালের নিজস্ব বিশেষ গুণের জন্য ক্রেতারা তা পছন্দ করে নেন, সেগুলির বিষয়ে আমরা এই জিনিস করতে পারব।

"নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আপনার মতামতের জন্য এই প্রশ্নাবলী পাঠানো হচ্ছে :

১। আপনি কি মনে করেন যে, ন্যূনতম দৈনিক পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং জিনিসের মূল্য নির্দিষ্ট করে শ্রমিকদের সেই পারিশ্রমিকের যৌক্তিকতা বোঝানো সম্ভবপর ?

২। আমাদের কি অন্তিম মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, অথবা নিচের দিকের ন্যূনতম মানদণ্ড থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে তাকে বর্ধিত করা উচিত ?

৩। কিসের আধারে এই মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা হবে ? আপনি কি আপাতত কোন খাদ্যের কথা বিবেচনা করে, আর এইটে ধরে নিয়ে যে, তারা নিজেদের প্রচেষ্টাতেই কাপড় তৈরী করে নেবে, একটি নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিকের প্রস্তাব করতে পারেন ? ঘণ্টায় দু পয়সা কি খুব কম হবে ?"

অখিল ভারত চরখা সংঘ ও অঃ ভাঃ গ্রামোদ্যোগ সংঘ এবং এই রকম অন্যান্য পরোপকারী প্রতিষ্ঠানগুলি, সব চেয়ে সস্তা দামে কেনা এবং সব চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করার ব্যবসায়ী নীতি-বাক্যটির অনুসরণ করতে পারে না। সব চেয়ে সস্তা দামে কেনার চেষ্টা চরখা সংঘ অবশ্যই করেছে। এই সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র করা যাবে। খাদির বিকাশে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে গ্রামোদ্যোগ সংঘকে তার দ্বারা লাভবান করার ইচ্ছায় আমি সংঘের প্রভাবে যে-সব কারিগর কাজ করে তাদের প্রাপ্ত পারিশ্রমিক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। তারই ফলে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হযেছে।

জানা গিয়েছে যে, এজেন্টদের মধ্যে যথাসম্ভব কম খরচে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন করার মনোবৃত্তি থাকে। কারিগরের উপার্জনেই যদি কাট-ছাঁট করা না যায় তবে আর কোথায় করা যাবে ? সুতরাং একটি ন্যূনতম হার যদি নির্দিষ্ট করে না দেওয়া হয তবে গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষতি হবার খুবই ভয় থাকে, যদিও তাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই গ্রামোদ্যোগ সংঘের স্থাপনা হয়েছে। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে সহনশীল গ্রামবাসীদের শোষণ করে আসছি। পরোপকারের ছদ্মবেশে গ্রামোদ্যোগ সংঘের পক্ষে সেই শোষণ আরও প্রবল করা উচিত নয়। গ্রামের জিনিস যথাসম্ভব সস্তা দামে উৎপাদন করাই এর লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য হল কর্মহীন গ্রামবাসীদের নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ প্রদান করা।

এই তর্ক উত্থাপন করা হয়েছে যে, যার ফলে গ্রামে উৎপাদিত জিনিসের দাম বেড়ে যায় তা যে উদ্দেশ্যের জন্য গ্রামোদ্যোগ সংঘের স্থাপনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যকেই আঘাত করে। কেন না বলা হয়েছে যে, গ্রামের জিনিসের দাম যদি খুব চড়ে যায় তবে কেউই আর তা কিনবে না। কোন জিনিসের মূল্য থেকে উৎপাদককে যদি কেবল জীবনোপযোগী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তবে সেই মূল্যকে অত্যধিক মনে করা কেন উচিত হবে? খাদকদের এই শিক্ষা আমাদের দিতে হবে যে, জনসাধারণের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা তাঁরা যেন জানেন। যদি লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনতার প্রতি আমাদের সুবিচার করতে হয় তবে আমাদের তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক তাদের দিতে হবে। তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন এক পারিশ্রমিক দেওয়া আমাদের উচিত নয় যা তাদের একবেলাও পূর্ণ আহার দিতে পারবে না।

একথা স্পষ্ট যে, মিলজাত বস্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সংঘ অস্বীকার করবে। যে খেলায় আমাদের পরাজয় অবধারিত বলে আমরা জানি তাতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি না। টাকাপয়সার দরে, বিদেশীই হোক আর দেশীই হোক বড় বড় কোম্পানীগুলি মানুষের হাতে তৈরী জিনিসকে সর্বদাই হারিয়ে দেবে। সংঘ যা করতে চায় তা হল, মিথ্যা ও অমানবীয় অর্থনীতির স্থানে সত্য ও মানব-কল্যাণকর অর্থনীতির স্থাপনা করা। হত্যার প্রতিযোগিতা নয়, বরং প্রাণদায়ী সহযোগিতাই হল মানবীয় বিধান। হৃদয়াবেগকে অবজ্ঞা করার অর্থই হল মানুষের যে অনুভূতি আছে তা ভুলে যাওয়া। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রূপে যদি আমাদের গঠন করা হয়ে থাকে তবে অল্পের কল্যাণ নয়, বহুরও কল্যাণ নয় বরং সকলের কল্যাণই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

গ্রামোদ্যোগ সংঘের মত পরোপকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রশ্নাবলীর মধ্যে নিহিত সমস্যাগুলিকে বিচার না করে এড়িয়ে যেতে পারে না। যদি সত্যকার সমাধান অব্যবহারিক বলে মনে হয় তবে সংঘের চেষ্টা হওয়া উচিত তাকে ব্যবহারিক করা। সত্য নিত্য ব্যবহারিক। এইভাবে চিন্তা করলে সংঘের কর্মসূচীকে যথার্থই বয়স্ক শিক্ষা বলা যেতে পারে।

আর সংঘের তত্ত্বাবধানে যে-সব কারিগর কাজ করে তাদের যদি নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক সংঘকে দিতে হয় তবে তাদের সংসারের আয়-ব্যয়ের সন্ধান সংঘকে

নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তাদের যে টাকাপয়সা দেওয়া হয় তার প্রত্যেকটি পয়সা কিভাবে খরচ হচ্ছে।

ন্যূনতম অথবা নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করাই হল সব চেয়ে কঠিন প্রশ্ন। আমি প্রস্তাব করেছি যে, ভাল যোগ্যতাসম্পন্ন কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত কোন বিশেষ জিনিসের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে তার আট ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রম ধরে নিয়ে তাকে আট আনা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। আট আনা কেবল এক সংকেত, তা জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি নির্দিষ্ট মাত্রাকেই সূচিত করে। যদি পাঁচজনের পরিবারে দুজন পূর্ণমাত্রায় শ্রমিক হন তবে প্রস্তাবিত হারে তাঁরা মাসে ত্রিশ টাকা আয় করবেন, এতে কোন ছুটি বা অসুস্থতার জন্য একদিনও বাদ ধরা হয়নি। পাঁচজনের খাবার পক্ষে মাসে ত্রিশ টাকা মোটেই বৃহৎ উপার্জন নয়। এই প্রস্তাবিত প্রণালীতে অবশ্যই স্ত্রী-পুরুষ বা বয়সের ভেদ রাখা হয়নি। কিন্তু যাঁদের কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই উত্তর পাঠাবেন।

হরিজন, ১৩-৭-৩৫

ন্যূনতম নির্বাহযোগ্য বেতন

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি বোর্ডের* সামনে এসেছিল তা হল মজুর ও কারিগরদের ন্যূনতম নির্বাহযোগ্য বেতনের প্রশ্ন। কাটুনীদের জন্যও অনুরূপ বেতনের সমস্যা সমস্ত খাদি কর্মীর সামনে ছিল এবং এখন পর্যন্ত বলা যায় না যে, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সহজ, কেন না ক্ষেত্র নতুন কয়েকটি নির্দিষ্ট কুটিরশিল্প থেকেই আমাদের নতুন ভাবে কাজ শুরু করতে হবে। দুদিন ধরে সমগ্র প্রশ্নটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে এবং সদস্যদের একটি বিষয়ে একমত হতে দেখা গিয়েছিল যে, যে-সব মজুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে তাদের এমন বেতন আমাদের দেওয়া উচিত যাতে তারা যথোপযুক্ত সুসম খাদ্য পেতে পারে। এই খাদ্য বিহারে ছ পয়সা, গুজরাটে চার আনা বোম্বাইয়ে ছ আনা পড়তে পারে। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র, যদিও এর দ্বারা কেউ যেন নিজেকে এইভাবে প্রতারিত না করেন যে, সব চেয়ে গরীব লোকটি বাসি শুকনো রুটি আর অল্প একটু নুনেতেই তার জীবন নির্বাহ করতে পারে।

* অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের কর্মপরিষদ

এই জিনিসগুলি কোন লোককে সারা বছর ধরে শ্রম করতে সক্ষম করার মত সামান্যতম খাদ্যও নয়। এইজন্য স্বীকার করা হয়েছে যে, একজন মজুর বা মজুরানী যাতে তার খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ, ঘি এবং খাদ্যপ্রাণ পায় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সুসম খাদ্য স্থির করতে হবে। গান্ধীজী বললেন, 'যদি আমরা দেখি যে, কোন শিল্পের পক্ষে এই ন্যূনতম নির্বাহযোগ্য বেতন দেওয়া সম্ভবপর নয় তবে সেই ভাল হবে যে, আমরা যেন আমাদের দোকান বন্ধ করে দেই। আমাদেব দেখা উচিত যে, যে-শিল্প আমরা গ্রহণ করব তার জন্য প্রদত্ত পারিশ্রমিকে কারিগরের যেন যোগ্য নির্বাহ হতে পারে।'

গান্ধীজী স্পষ্ট করে বললেন যে, আমরা মৃত বা মৃতপ্রায শিল্পগুলির সঙ্গেই সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত রযেছি। এইগুলিকেই পুনরুজ্জীবিত করতে আমরা চেষ্টা করছি এবং বর্তমান শিল্পগুলিকে বিশৃঙ্খল করতে যাচ্ছি না। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের ফলে গ্রামবাসীদের অসুবিধা কি আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে? গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রযোজনীয জিনিসগুলির সম্বন্ধে—দৃষ্টান্তস্বরূপ মাটির বাসন বা প্রদীপ—কী হবে? এই সব জিনিসের জন্য শহরের লোকেদের বেশি দাম দিতে হবে বলে কি গ্রামবাসীদেরও বেশী দিতে হবে? শহরের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীদের এখনই দূববর্তী গ্রামেব লোকেদের চেয়ে বেশি দাম দিতে হচ্ছে। গান্ধীজী বললেন, 'এ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে দাম ঠিক করে নেবে। তা ছাড়াও, আমাদের সংগঠন যখন ভাল ভাবে চলবে তখন ছুতার, কামার, তাঁতী ও কাটুনীরা কুমোরের কাছ থেকে ন্যূনতম পারিশ্রমিকের সিদ্ধান্তে নির্ধারিত দামে জিনিস কিনবে এবং নিজেদের জিনিসের জন্যও সেই হিসাবেই দাম পাবে আর তখন দামের জন্য গরীব কুমোরকে তারা হিংসা করবে না। কিন্তু এ তো দূরবর্তী লক্ষ্য। এখন যেসব জিনিস গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং ন্যূনতম নির্বাহযোগ্য বেতনের কমে কোন জিনিস কিনতে অস্বীকার করা আমাদের উচিত।'

হরিজন, ৩১-৮-৩৫

ন্যূনতম বেতন সম্পর্কে আর একটি আলোচনা

খাদির কাজে ন্যূনতম বেতন সম্পর্কে বোর্ডে আর একটি আলোচনা হয়।

গান্ধীজী এই কথা বলে প্রতিবাদগুলির মূলেই আঘাত করলেন, 'নাম থেকেই

বোঝা যায় যে, আমাদের উদ্দেশ্য হল যারা সব চেয়ে কম পারিশ্রমিক পায় সেই কাটুনীদেরই প্রতিনিধিত্ব করা অর্থাৎ তাদের অবস্থার উন্নতি করা। সুতরাং তাদের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি আমাদের দেখতে হবে। আমি সর্বপ্রথম যে সূত্রটি দিয়েছিলাম এবং যেটি তখনকার মত এখনও ঠিক বজায় আছে সেটিকে আপনাদের স্মরণ করা উচিত। সেই সূত্রটি হল: প্রত্যেক বাড়িতে যেন একটি চরখা এবং প্রত্যেক গ্রামে যেন একটি বা একাধিক তাঁত থাকে। এইটিই হল স্বাবলম্বী খাদির আদর্শ আর আমি যদি আপনাদের আমার কথা বোঝাতে পেরে থাকি তবে আমি আপনাদের এই কথাই বলব যে, কাটুনীদের খদ্দর বিক্রি করে আপনারা তাদের যত সেবা করেন তার চেয়ে বেশি সেবা হবে যদি আপনারা কাটুনীদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য খদ্দর তৈরী করতে তাদের রাজী করাতে পারেন। আমরা নিজেদের অন্ন নিজেরাই রান্না করে নিই। গ্রামে তো আর হোটেল নেই। সেই রকম প্রত্যেক গ্রামেরই নিজের খাদি প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত। একথা নয় যে, কোন কোন গ্রাম নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদি প্রস্তুত করবে না। কিন্তু তা চাহিদার উপর নির্ভর করবে। শহরের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে খদ্দর চাইলে তাদের কাছ থেকে আমরা নিশ্চয় তার অর্ডার নেব এবং যারা তাদের দৈনিক প্রয়োজনের অনুপাতে ঘণ্টা পিছু পারিশ্রমিক পাবে এমন লোকেদেব দ্বারা ঐ খাদি প্রস্তুত করিয়ে নেব। তার ফলে খাদির বর্তমান মূল্য সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। আমরা আর জনসাধারণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে পারি না। আমি কখনই একে ইচ্ছাকৃত শোষণ বলিনি। গত পনর বছর ধরে আমরা যা কিছু করেছি তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, আর যা করেছি, তা অনিবার্য ছিল। কিন্তু এখন আমাদের এক নতুন পথ গ্রহণ করতে হবে। আমরা যুগ যুগ ধরে সর্বহারাদের অবজ্ঞা করে এসেছি এবং যখন অহঙ্কার বশে তাদের শ্রম খাটাবার অধিকাব আমাদেব আছে বলে আমরা মনে করেছি তখন এই কথা আমাদের মনে উদয় হয়নি যে, পারিশ্রমিক নির্দেশ করার অধিকারও তাদের আছে আর আমাদের ধনের মত তাদের শ্রমও তাদের কাছে পুঁজি। এখন সেই সময় এসেছে যখন তাদের কী প্রয়োজন, তাদের কাজের ঘণ্টা ও অবকাশ এবং তাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে।'

হরিজন, ১৪-৯-৩৫

ষষ্ঠ প্রকরণ ঃ পুঁজি ও শ্রম

কারখানার শ্রমিকদের প্রতি

[১৯১৭ সালে মিল-মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল তার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমেদাবাদের শ্রমিকদের কাছে গান্ধীজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, নিচে তার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হল।]

সবিনয় ও সহিংস আইন অমান্য

শ্রমিকরা যদি সহিংস আইন অমান্য দ্বারা দেশের আইনের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে তবে তার দ্বারা তারা নিজেরাই আত্মহত্যা করবে এবং তাতে ভারতবর্ষকেও অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমি চাই যে, হিংসার দ্বারা কখন কখন আপাত কাজ হয়েছে বলে মনে হলেও আপনারা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে হিংসার আশ্রয় না নেন। যখন আমি সত্যাগ্রহ ও সবিনয় আইন অমান্যের কথা প্রচার করতে আরম্ভ করি তখন মোটেই এই ধারণা করা হয়নি যে, সহিংস আইন অমান্য তার অন্তর্ভুক্ত। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, হিংসার দ্বারা কখনই সত্যের প্রচার করা যেতে পারে না। নিজেদের উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে যাদের বিশ্বাস আছে তাদের অসীম ধৈর্য থাকা উচিত আর সবিনয় আইন অমান্য কেবল তারাই করতে পারে যারা সহিংস আইন অমান্য অথবা হিংসা করার ঊর্ধ্বে থাকে। একজন মানুষ যেমন একই সময়ে শান্ত ও উগ্র হতে পারে না তেমনি একই সময়ে সবিনয় ও সহিংস আইন অমান্যও সে করতে পারে না। আর, যেমন উত্তেজনাকে জয় করার পরেই কোন মানুষ সংযমী হতে পারে তেমনি দেশের আইনের প্রতি সম্পূর্ণ ও স্বেচ্ছাপূর্বক বশ্যতা স্বীকার করে নিজেকে নিয়মানুবর্তী করার দ্বারাই সবিনয় আইন অমান্যের শক্তি লাভ করা যায়। অন্তরে যে ব্যক্তি প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েও তা জয় করতে পেরেছেন কেবল তাঁকেই যেমন প্রলোভনমুক্ত বলা যেতে পারে তেমনি ক্রোধের যথেষ্ট হেতু থাকা সত্ত্বেও যখন আমরা নিজেদের বশে রাখতে সক্ষম হব তখনই বলা যাবে যে, আমরা ক্রোধকে জয় করেছি। গত বছর এই পরীক্ষায় আমরা অসফল হয়েছিলাম। আপনাদের সকলের কাছে আমার এই ঐকান্তিক প্রার্থনা যে, এই শুভদিনে

আপনারা গত এপ্রিল মাসে যেসব ভুল করেছিলেন তা স্মরণ করুন এবং তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন।

মিল শ্রমিকদের অবস্থা

এখন আমি মিল-শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলব। এই বিষয়ে তাঁদের অনেক কিছু জানাবার প্রয়োজন আছে। আমরা কেবল বেশি পারিশ্রমিক পেলেই ধনবান হতে পারি না আর ধনবান হওয়াটাই সব কিছু নয়। অনুসূয়াবেন আপনাদের জন্য কেবল ভাল বেতন সংগ্রহ করে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেননি। আপনাদের সুখী করার মত যথেষ্ট বেতন যাতে আপনারা পান, আপনারা প্রকৃত ধার্মিক হন, নৈতিকতার শাশ্বত নিয়মগুলি আপনারা পালন করেন, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা প্রভৃতির মত বদঅভ্যাসগুলি আপনারা ত্যাগ করেন, আপনাদের উপার্জন আপনারা সৎভাবে ব্যয় করেন, আপনাদের ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আপনাদের শিশুরা যেন শিক্ষালাভ করতে পারে—এই সমস্তর জন্যই তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আপনাদের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। তাতে আরও উন্নতির অবকাশ আছে। দু-রকম ভাবে তা হতে পারে, প্রথমত, মিল-মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে, দ্বিতীয়ত, তাদের উপর অহেতুক চাপ দিয়ে। প্রথমটিই প্রকৃত প্রতিকার। পশ্চিমে সব সময়েই পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে তার স্বাভাবিক শত্রু বলে মনে করে। সেই মনোবৃত্তি ভারতবর্ষেও প্রবেশ করছে বলে মনে হচ্ছে, আর তা যদি এখানে স্থায়ীভাবে স্থান করে নেয় তবে আমাদের শিল্প ও শান্তির অন্ত হয়ে যাবে। উভয় পক্ষই যদি বুঝতে পারে যে একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তবে বিবাদ করার আর কোন কারণই থাকে না।

ন্যায্য দাবি

পুঁজিপতিদের কর্তব্য বিচার করার ইচ্ছা আমার নেই। যদি কেবল শ্রমিকরাই তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং বিশুদ্ধতম উপায়ের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখে তবে নিশ্চয়ই উভয়েরই কল্যাণ হবে। কিন্তু দুটি জিনিসের প্রয়োজন: দাবি আর সেই দাবি আদায়ের জন্য গৃহীত পন্থা যেন ন্যায়পূর্ণ ও স্পষ্ট হয়। যে-দাবি

কেবল পুঁজিপতিদের অবস্থার সুযোগ খোঁজে তা অন্যায্য। কিন্তু যখন শ্রমিকরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য এবং তাদের সন্তানদের ভালভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট বেতনের দাবি করে তখন সেই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতই হয়। হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে এবং সালিসীর দ্বারা পুঁজিপতিদের শুভ-ইচ্ছার প্রতি আবেদন করে যে বিচার প্রার্থনা করা হয় তাই হল ন্যাযসঙ্গত পন্থা।

ইউনিয়ন ও সালিসী

তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনাদের ইউনিযন থাকা চাই। ইতিমধ্যে তার প্রারম্ভও হযে গিযেছে। আমার বিশ্বাস যে, মিল-শ্রমিকরা প্রত্যেক বিভাগেই তাঁদের ইউনিয়ন গঠন করবেন এবং তাঁদের জন্য যে সব নিযম তৈরী করা হবে সেগুলি প্রত্যেকেই সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন। তখন সেই ইউনিযনগুলির মাধ্যমে আপনারা মিল-মালিকদের কাছে আপনাদের দাবি পেশ করবেন এবং তাঁদেব সিদ্ধান্ত যদি আপনাদের সন্তোষ বিধান করতে না পারে তবে আপনারা সালিসী প্রার্থনা করবেন। খুবই আনন্দের কথা যে, উভয পক্ষই সালিসীর নীতি স্বীকাব করেছেন। আমি আশা করি যে, এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করা হবে এবং ধর্মঘট চিরকালের জন্য অসম্ভব হয়ে যাবে। আমি জানি ন্যায়প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করা শ্রমিকদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু যখন পুঁজিপতিরা সালিসীর নীতি স্বীকার করেন তখন ধর্মঘট করাকে অপরাধ বলেই বিবেচনা করা উচিত। বেতনের উন্নতি তো হচ্ছে এবং তার ক্রমাগত বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু কাজের সময কম করারও সমান প্রয়োজন আছে। মিল-শ্রমিকরা বারো ঘণ্টা কি তারও বেশি সময় কাজ করে বলে মনে হয়। যাদের দিনে এত বেশি সময কাজ করতে হয তাদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতির জন্য কোন সময় বাঁচে না। এই কারণে তাদের অবস্থা নিশ্চযই পশুর মত হয়ে যায়। এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওযা আমাদের কর্তব্য। তবু যা কিছুই আমরা করি না কেন, আমাদের শিল্পগুলির ক্ষতি করা থেকে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

মিল-মালিকরা আমাকে বলেন যে, শ্রমিকরা অলস, তারা কাজে সমস্ত সময় দেয় না এবং তারা অমনোযোগী। যাদের দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হয় তাদের কাছ থেকে আমি তো মনোযোগ ও পরিশ্রম আশা করতে পারি না। কিন্তু আমি

নিশ্চয়ই আশা করব যে, যখন কাজের সময় দশ ঘণ্টা করে দেওয়া হবে তখন শ্রমিকরা আরও ভাল এবং বারো ঘণ্টায় আজ যে-পরিমাণ কাজ তারা করে প্রায় সেই পরিমাণ কাজই করবে। ইংলণ্ডে কাজের ঘণ্টা কম করে দেওয়ায় ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। যখন শ্রমিকরা মিল-মালিকদের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলে মনে করতে শিখবে তখন তাবা উন্নতি করবে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পেরও উন্নতি হবে। সুতরাং আমি কাজেব সময দশ ঘণ্টা করে দেবার জন্য মিল-মালিকদের, আব শ্রমিকদের বারো ঘণ্টায় যে-কাজ তারা করে দশ ঘণ্টাতেই তা করে দেবার জন্য অনুরোধ করব।

বর্ধিত বেতনের ব্যবহার

বর্ধিত বেতন এবং যে সময় বাঁচল তার ব্যবহার আমাদের কি ভাবে করা উচিত, সেই সম্বন্ধে এখন আলোচনা কবব। বর্ধিত বেতনকে ভাঁটিখানায় আর যে সময় বাঁচল তা জুয়ার আড্ডায় যদি ব্যয় করা হয় তবে তা তপ্ত পাত্র থেকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়ার মত হবে। একথা স্পষ্ট যে, যে-টাকা পাওয়া গেল তা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাব আর যে-সময় পাওয়া গেল তা নিজেদের শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা উচিত। ঐ দুটি বিষয়েই মিল-মালিকরা যথেষ্ট সহাযতা করতে পারেন। তাঁরা শ্রমিকদের জন্য সস্তায় রেস্টুরেণ্ট খুলতে পাবেন, সেখান থেকে তারা খাঁটি দুধ ও স্বাস্থ্যকর জলখাবাব পেতে পারবে। তাঁবা শ্রমিকদের জন্য পাঠাগার খুলতে পারেন এবং নির্দোষ মনোরঞ্জন ও খেলাধূলার ব্যবস্থা- রাখতে পারেন। এই রকম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হলে তাদেব মদ ও জুয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হযে যাবে। ইউনিয়নের এই সমস্তর জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। ইউনিযনগুলি পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করা অপেক্ষা শ্রমিকদের আন্তরিক উন্নতির উপায উদ্ভাবনার কাজেই ভালভাবে লাগতে পারে।

শ্রমবিভাগ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িযে নিয়ে উপার্জনের কাজে লাগানো জাতীয় অবনতির লক্ষণ। শিশুদের এই রকম অপব্যবহার বোধ হয় কোন উপযুক্ত জাতিই সহ্য করতে পারে না। অন্ততঃ ষোল বছর পর্যন্ত তাদের স্কুলে রাখা উচিত। এই রকম ভাবে নারীদেরও ধীরে ধীরে কারখানার কাজ থেকে ছাড়িয়ে

নেওয়া উচিত। যদি স্ত্রী ও পুরুষ জীবনের সাথী এবং একে অপরের পূরক হয় তবে পরস্পরের শ্রম বিভাজন করেই তারা ভাল গৃহস্থ হতে পারে। বুদ্ধিমতী মায়ের সমস্ত সময় ঘর সংসার এবং সন্তানদের দেখা-শোনাতেই চলে যায়। কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই কেবল জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিশ্রম করতে হয় তখন নিশ্চয়ই জাতির অবনতি হয়ে যায়। দেউলিয়ার নিজের পুঁজির ভরসায় জীবন যাপন করার মতই এই ব্যাপার।

নৈতিক শক্তির বিকাশ

শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা নিজেদের মনকে বিকশিত করা এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা যেমন প্রয়োজন তেমনি শ্রমিকদের নৈতিক শক্তিরও বিকশিত করা আবশ্যক। নৈতিক শক্তির বিকাশের অর্থ হল ধর্মীয় মনোভাবের বিকাশ। ঈশ্বরের প্রতি যাদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে এবং যারা ধর্মের যথার্থ প্রকৃতি জানে বিশ্ব তাদের সঙ্গে বিরোধ করে না। আর বিশ্ব যদি তা করেও তবে তারা নিজেদের নম্রতার সাহায্যে শত্রুর ক্রোধ শান্ত করে দেয়। ধর্মের অর্থ এখানে কেবল নমাজ পড়া বা মন্দিরে যাওয়া নয়। এর অর্থ হল নিজের আত্মার তথা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান। বয়ন করার কৌশল না জানলে যেমন কেউ তাঁতী হতে পারে না তেমনি কয়েকটি বিশেষ নিয়মের অনুসরণ বিনা কোন লোকের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। এই নিয়মগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান, সেগুলির সর্বত্র অনুসরণ হওয়া উচিত। প্রথম হল, সত্যপালন। সত্য বলাতে যে কী আছে তা যে জানে না সে অচল মুদ্রার মতই মূল্যহীন। দ্বিতীয় হল, অপরকে আঘাত না করা। যে অপরকে আঘাত করে সে অপরের প্রতি ঈর্ষালু এবং সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। কেন না বিশ্ব তার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং বিশ্বের প্রতি সর্বদা ভয়ভীত হয়েই তাকে বাস করতে হয়। আমরা সকলে প্রেমের বন্ধনেই আবদ্ধ। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই এককেন্দ্রাভিমুখী শক্তি আছে, তার অভাবে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, যেসব অণু-পরমাণুর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে যদি সংযোজনকারী শক্তি না থাকত তবে পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত এবং আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না। আর জড় পদার্থে যখন এক সংযোজনকারী শক্তি আছে তখন নিশ্চয়ই সমস্ত চেতন প্রাণীর মধ্যেও তা আছে, এবং প্রাণী জগতের সেই সংযোজনকারী

শক্তির নাম হল প্রেম। আমরা এটিকে মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে আচরণে ঐ শক্তির প্রয়োগ করতে আমাদের শিখতে হবে। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সেই আচরণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। যেখানে প্রেম সেইখানেই জীবন। বিদ্বেষ ধ্বংসের দিকেই পরিচালিত করে। আমি আশা করি যে, প্রেমের এই মহান নীতি শিক্ষাগ্রহণে অনুসূয়াবেন আপনাদের সাহায্য কববেন আব আপনাদেব প্রতি তাঁর প্রীতিকে যদি আপনারা উপলব্ধি করে থাকেন তবে আমি আপনাদের বলব যে, তার বিনিময়ে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি আপনারা প্রেম অনুভব করুন। তৃতীয় নিয়ম হল, নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করা। সংস্কৃতে একেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। আমি প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে এই কথাটির প্রয়োগ করছি না। যে অবিবাহিতের জীবন যাপন করে অথবা বিবাহিত জীবনে পবিত্রতা অনুসরণ করে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে দেয় সে ব্রহ্মচারী নয়। আত্মজ্ঞান লাভ করতে কেবল সে-ই সক্ষম যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশে আনে। যে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে সংযম পালন করে সে-ই ব্রহ্মচারী—সে শ্রদ্ধাবান মানুষ, প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান।

নিকৃষ্ট ভাষা বা অশ্লীল গান শোনাও ব্রহ্মচর্যের বিচ্যুতি। ঈশ্বরের নাম জপ করার পরিবর্তে গালি-গালাজ উচ্চারণ করা জিহ্বার অপপ্রয়োগ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও এই কথা খাটে। কেবল তাকেই খাঁটি মানুষ বলা যেতে পারে যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশে এনে সম্পূর্ণ সংযমী হয়ে যায়। আমাদের অবস্থা সেই রকম ঘোড়সওয়ারের মত যে তার ঘোড়াকে বশে রাখতে পারে না আর শীঘ্রই ভূপতিত হয়ে যায়। কিন্তু যে লাগাম টেনে ঘোড়াটিকে নিজের বশে রাখে তার নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেই রকম, যে-মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কেবল সে-ই স্বরাজের যোগ্য। কেবল সে-ই সত্যের সন্ধানী। সে-ই কেবল ঈশ্বরকে জানবার যোগ্য হয়। আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আপনারা আমার কথাগুলিকে কেতাবী তত্ত্বকথা বলে বাতিল করে দেবেন না। এই সত্য-পালনের শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা কখনই অগ্রসর হতে পারব না, এই কথাটি আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলি। এ সমস্তই আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। আপনাদের প্রতি আমার প্রীতির জন্যই আমি আপনাদের সেবা করি এবং আমি আপনাদের দুঃখের অংশীদার এইজন্যই হই যে, এবং আমার বিশ্বাস, তার দ্বারা আমার স্রষ্টিকর্তার কাছে আমি

নিজেকে সপ্রমাণ করতে পারব। আপনাদের বেতন যদি চতুর্গুণ করে দেওয়া হয় এবং আজ যত সময় আপনারা কাজ করেন আপনাদের কাজের ঘণ্টাও যদি তার এক চতুর্থাংশ করে দেওয়া হয় তবে তাতে কী-ই বা লাভ হবে যদি না আপনারা সত্য কথা বলার মূল্য বোঝেন, আপনাদের ভিতরের রাক্ষস যদি অপরকে আঘাত করে আর আপনাদের ইন্দ্রিয়গুলির বন্ধনকে ঢিলে করে দেয়। আমাদের অধিক বেতন এবং কম কাজ অবশ্যই চাই, কেন না আমরা চাই পরিষ্কার ঘর, দেহ, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা, আর এই চতুর্বিধ পরিচ্ছন্নতার জন্য এ দুটির প্রয়োজন। কিন্তু ঐগুলি লাভ করা যদি উদ্দেশ্য না হয় তবে ভাল বেতন আর কাজের ঘণ্টা কম করার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং তা পাওয়াও অপরাধ। ঈশ্বর আপনাদের এবং অনুসূয়াবেনকে এই লক্ষ্য প্রাপ্তির শক্তি দিন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৪-২০ ও ৫-৫-২০

আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ

আমেদাবাদের শ্রমিক সংঘ সমগ্র ভাবতেব পক্ষে অনুকরণ করার মত একটি নমুনা। বিশুদ্ধ অহিংসা হল এর বুনিয়াদ। কর্মজীবনে একে কখনই পিছু হটতে হয়নি। কোন রকম গোলমাল বা বাহ্যাড়ম্বর না করেই ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে চলেছে। এর নিজের হাসপাতাল, শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়, বযস্ক শিক্ষার ক্লাস, নিজের ছাপাখানা, খাদি ভাণ্ডার এবং নিজের আবাসগৃহ আছে। প্রায় সকল শ্রমিকই ভোটার এবং তাঁরা নির্বাচনের ভাগ্য নির্ণয করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেরণাতেই তাঁদের নাম ভোটারের তালিকায লিপিবদ্ধ হযেছে। কংগ্রেসের দলগত বাজনীতিতে এই প্রতিষ্ঠান কখনও মাথা গলাযনি। শহরের পৌর-নীতিতেও এ নিজের প্রভাব বিস্তার করে। সম্পূর্ণ অহিংস এমন কতকগুলি সফল ধর্মঘটের কৃতিত্বও এর আছে। মিল-মালিক ও শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় সালিসীর দ্বারা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমার ক্ষমতা থাকলে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে আমি আমেদাবাদের অনুকরণে পরিচালনা করতাম। এ কখনই অল্ ইণ্ডিযা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাজে মাথা গলাতে চাযনি আর নিজেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। আমি আশা করি যে, এমন এক সময় আসবে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে আমেদাবাদের পদ্ধতিকে স্বীকার করা সম্ভবপর হবে এবং আমেদাবাদের সংগঠনকেও অখিল ভারতীয়

সংগঠনের অঙ্গ করে নেবে। কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই। ঠিক সময়েই তা হবে।

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি (১৯৪১)

শ্রমিকদের সংগঠন

শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনার যে অবস্থা আমরা কামনা করি যতক্ষণ না তারা সেই অবস্থায় পৌছাচ্ছে, ততক্ষণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলির অপপ্রয়োগ করার আমি তীব্র বিরোধী। অবশ্য কংগ্রেসের যদি সঙ্গতি থাকে আর সে শ্রমিকদের আর্থিক উৎকর্ষের জন্য তাদের সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে তবে তাতে কোন আপত্তি হতে পারে না। এতে আপত্তি তো নেই-ই এবং শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া এবং কংগ্রেসের কাজে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা আমাদের কর্তব্য। তবে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে আমরা তাদের সংগঠনকে অংশীদাররূপে* ব্যবহার করতে পারি না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১১-২২

শ্রমিক সংঘ

গত সপ্তাহের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় শ্রমিকদের সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে আমরা তাদের সংগঠনকে শিখণ্ডীর মত ব্যবহার করতে পারি না। কিন্তু 'শিখণ্ডীর' স্থলে 'অংশীদার' ছাপা হয়েছিল আর তার ফলে সমস্ত অর্থই বদলে গিয়েছিল। তাদের নিশ্চয় অংশীদার হওয়া উচিত, তবে শিখণ্ডী হওয়া উচিত নয়। তারা যদি শিখণ্ডীর মত হয় তবে সংগ্রামটা হবে আমাদের আর তাতে তাদের ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অনৈতিক। কিন্তু তারা যদি জ্ঞানপূর্বক সংগ্রামের মধ্যে আসে তবে সেই সংগ্রাম তাদের এবং আমাদের উভয়েরই হবে এবং আমরা একসাথেই লড়াই করব। আমি শোষণেরই বিরোধী। উভয়ে সজ্ঞান অংশীদার হওয়াকে আমি স্বাগত করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-১১-২২

---

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় মূল ইংরেজীতে 'Pawns' এর বদলে 'Partner' শব্দ ভুল ছাপা হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

পরিহার্য সংগ্রাম

বোম্বাইয়ের মিল-মালিকরা তাঁদের শ্রমিকদের এই বছরে চলতি বোনাস বন্ধ করে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। সুতরাং সাড়ে তিন লক্ষ মিল-শ্রমিক এক মাসের বেতন পাবে না, এটিকে তারা 'বোনাস' রূপে পাবার আশা করেছিল। খুবই সম্ভব যে, এর পরিণামে ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। মিল-মালিকরা যদি তাঁদের লাভের এক নবমাংশ ছেড়ে দিতে রাজী হন অথবা আরও অষ্টম ভাগের জন্য লালায়িত না হন তাহলে তাঁরা এই অবাঞ্ছনীয় সংঘর্ষকে পরিহার করতে পারেন। স্বাভাবিক ভাবে যদি তাঁরা বোনাস দিয়ে দেন তাহলে তাঁদের প্রদত্ত মূলধনের শতকরা ১৮ ভাগের চেয়ে কম লাভ হবে না। অপরদিকে বোনাস কেড়ে নিলে মিল-শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের এক নবমাংশ হারাবে। সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার ও আশ্রিতদের সাধারণ নির্বাহযোগ্য অর্থ থেকে নবমাংশ কেটে নেওয়া মূলধনের উপর শতকরা সাড়ে তিন ভাগ লাভের অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার। মিল-মালিকদের কাছে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং একটি ভীষণ সংঘর্ষ ও তার আনুষঙ্গিক দুর্ঘটনাগুলিকে পরিহার করার পক্ষে এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৮-২৩

স্বল্পাকার স্বরাজ *

আপনারা জানেন যে, আমি নিজে একজন শ্রমিক। আমি নিজেকে একজন মেথর, তাঁতী, কাটুনী, কৃষক আরও না জানি কত কী বলতে গর্ব অনুভব করি এবং এই সব কাজ অন্ততঃ মোটামুটি হলেও জানা আছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি না। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একরূপ হতে আমার আনন্দ হয়, কেন না শ্রম ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে, ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় যদি নাও হয় তবুও অন্যতম বৃহৎ ভারতীয় শিল্পটি দেখব এবং সেখানকার কাজের অবস্থা অধ্যয়ন

* ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন, জামসেদপুর কর্তৃক আহূত ভোজ-সভায় গান্ধীজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে।

করব। কিন্তু আমার কাজগুলির কোনটিই একপক্ষীয় নয় আর যেহেতু সত্য ও অহিংসাতেই আমার ধর্মের আরম্ভ এবং শেষ, সেই হেতু শ্রমিকদের সঙ্গে একরূপতা পুঁজিপতিদের সাথে মিত্রতা স্থাপনে বিরোধ সৃষ্টি করে না। এও বিশ্বাস করুন যে, যদিও গত ৩৫ বছর ধরে জনসেবার মাধ্যমে দৃশ্যতঃ আমি নিজেকে পুঁজিপতিদের বিরোধী রূপে পক্ষভূত করেছি তবুও শেষ পর্যন্ত পুঁজি-পতিরা আমাকে তাঁদের প্রকৃত বন্ধু রূপেই গণ্য করেছেন। আর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই আমি বলতে পারি যে, পুঁজিপতিদের বন্ধু, টাটাদের বন্ধু রূপেই আমি এখানে এসেছি।

টাটাদের সঙ্গে আমার কিভাবে সম্বন্ধ হল তার এক ছোট্ট কাহিনী যদি আমি আপনাদের না শোনাই তবে তা আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন আমি সেখানকার ভারতীয়দের নিয়ে আমাদের সম্মান বজায় রাখবার জন্য এবং আমাদের অবস্থার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য সংগ্রাম করছিলাম তখন স্বর্গীয় স্যার রতন টাটা-ই সর্বপ্রথম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এক দীর্ঘপত্র দিয়েছিলেন এবং এক রাজকীয় দান—২৫,০০০৲ টাকার একটি চেক পাঠিয়েছিলেন। আর চিঠিতে এই কথাও দিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আরও টাকা পাঠাবেন। তখন থেকেই টাটাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের স্মৃতি আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আপনারা ভাল ভাবেই অনুমান করতে পারবেন যে, আপনাদের মধ্যে আসতে পারায় আমার কত আনন্দ হচ্ছে। আর বিশ্বাস করুন যে, কাল যখন আমি আপনাদের সঙ্গ ত্যাগ করব তখন এক ভারাক্রান্ত হৃদয়েই আমি তা করব। কেন না আমাকে অনেক কিছু জিনিস না দেখেই যেতে হবে। দুদিনের শেষে একথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহস হবে যে, এখানকার অবস্থা সত্যসত্যই আমি অধ্যয়ন করেছি। এই বিরাট শিল্পকে যিনি অধ্যয়ন করতে চান তাঁর কাজের আয়তন যে কত বড় হবে তা আমার ভাল ভাবেই জানা আছে।

এই মহান ভারতীয় কোম্পানী যত বৈভব পাবার যোগ্য তা যেন এ প্রাপ্ত হয় এবং এই মহান শিল্পের সর্বরকমের সাফল্যও আমি কামনা করি। আর আমি কি এই আশা করতে পারি যে, এই মহান পরিবার এবং এঁদের তত্ত্বাবধানে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে? আমেদাবাদে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের ভিতর আমার অনেক কাজ রয়েছে এবং আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে, আমার আদর্শ হল পুঁজি ও শ্রম যেন একে অপরের পরিপূরক

ও সহায়ক হয়। তাঁদের একতা ও সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাসকারী এক বিশাল পরিবারে পরিণত হওয়া উচিত। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কেবল ভৌতিক কল্যাণের কথা চিন্তা করবেন না, পরন্তু তাদেব নৈতিক কল্যাণের দিকেও দৃষ্টি রাখবেন—কেন না পুঁজিপতিরা হলেন তাঁদের অধীনে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের কল্যাণের সংরক্ষক।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, যদিও এখানে অনেক ইউরোপীয় ও ভারতীয় বাস করেন তবু তাঁদের সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। আমি আশা করি যে, এই সংবাদটি প্রকৃতপক্ষে সত্য। আপনাদের উভয়ের পক্ষেই এটি এক সৌভাগ্য যে, আপনারা এই বিরাট শিল্পে একসঙ্গে আছেন। নিজেদের মধ্যে ভাল ব্যবহার করে আপনাদের পক্ষে ভারতবর্ষকে প্রেম ও সৌহার্দ্যের বাস্তব পাঠ দেওয়া সম্ভব। আমি আশা করি যে, যে-বিরাট কারখানার মধ্যে আপনারা কাজ করেন কেবল সেখানেই যে আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে তা নয়, কারখানার বাইরেও আপনারা আপনাদের সৌহার্দ্য বহন করে নিয়ে যাবেন এবং আপনারা উভয়েই ভালভাবে বুঝে নেবেন যে, আপনারা এখানে ভাই-বোনের মতই থাকতে ও কাজ করতে এসেছেন, কখনই অপরকে বা নিজেকে হীন মনে করবেন না। আপনারা যদি এই জিনিস করতে পারেন তবে এক স্বল্পাকার স্বরাজ আপনারা লাভ করবেন।

আমি বলেছি যে, আমি একজন অসহযোগী। আমি নিজেকে একজন সবিনয় প্রতিরোধকারী বলে থাকি। এই শব্দ দুটির এখন ইংরেজী ভাষায় অন্য অনেক ইংরেজী শব্দের মতই খারাপ অর্থ করা হচ্ছে। কিন্তু যাতে আমি সহযোগিতা করতে পারি সেইজন্যই আমি অসহযোগ করি। আমি মিথ্যা সহযোগিতার দ্বারা, যা ষোল আনা শুদ্ধ নয় তার দ্বারা নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। আমার অসহযোগ এমন কি স্যার মাইকেল ওডায়র এবং জেনারেল ডায়রের প্রতি বন্ধুভাব রাখতেও আমাকে বাধা দেয় না। এ কারুর ক্ষতি করে না। এই অসহযোগ অন্যায় ও খারাপ পদ্ধতির বিরুদ্ধেই, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে নয়। এমন কি আমার ধর্ম অন্যায়কারীর সঙ্গেও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়, আর আমার অসহযোগ এই ধর্মেরই অঙ্গ। আমি কাউকে তুষ্ট করার জন্য এই সব কথা বলছি না—আমি যা স্বীকার করি না তা বলে আমি জীবনে কখনও অপরাধী হইনি। আমার প্রকৃতি হল সোজা হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া, আর সাময়িকভাবে তা করতে যদি আমি প্রায়ই বিফল হই, তবু আমি জানি যে, সত্য শেষ পর্যন্ত শ্রুত হবেই এবং তার প্রভাবও পড়বে। আমার অভিজ্ঞতায় প্রায়ই

তা হয়েছে। সুতরাং আপনাদের পরস্পরের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ হোক, আমার এই কামনা আমার অন্তরের অন্তস্তলেরই ইচ্ছা। আর আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা যে, আপনারা ভারতবর্ষকে অন্যায় ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সহায়ক হোন এবং বহির্বিশ্বকে শান্তির বাণী পাঠাতে তাকে সাহায্য করুন। কারণ ভারতবাসী এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের এই সভার এক বিশেষ অর্থ হওয়া উচিত বা এই রকম এক বিশেষ অর্থ দেওয়া যেতে পারে, আর এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে যে, পৃথিবীতে শান্তি ও শুভেচ্ছা প্রচার করার জন্য আমরা পরস্পর বসবাস করব? ঈশ্বর করুন যে, টাটাদের সেবা করার দ্বারা আপনারা ভারতবর্ষেরও সেবা করুন এবং সর্বদা এই অনুভব করুন যে, এই শিল্প কোম্পানীর কাজের অতিরিক্ত এক মহান কর্মের জন্যই আপনারা এখানে আছেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০-৮-২৫

আমেদাবাদের শ্রমিকদের সঙ্গে একদিন

গান্ধীজী আমেদাবাদের শ্রমিকদের সঙ্গে একটি গাছের তলায় সন্ধ্যার সময় মিলিত হলেন। ১৯১৮ সালের সফল ধর্মঘটের পর থেকে এই গাছটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক বছর বাৎসরিক উৎসবের সময় তাঁরা এই গাছের তলাতেই মিলিত হন। ১৯১৮ সালে দীর্ঘ তেইশ দিন ধরে তাঁরা এইখানেই সম্মিলিত হতেন এবং শ্রীমতী অনুসূয়া বাঈ ও গান্ধীজীর কথা শুনতেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীঅম্বালাল সারাভাইয়ের মত একজন বড় মিল-মালিক এবং মিল-মালিক সংঘের সম্পাদক শ্রীগোবর্ধনভাই প্যাটেলও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। শ্রমিক সংঘের বার্ষিক বিবরণ খুব দীর্ঘ ছিল বলে তা না পড়ে সম্পাদক ব্যবসায়ী ঢঙে বিবরণের মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন। আলোচ্য বৎসরে সংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪,০০০ আর চাঁদা থেকে আয় হয়েছিল ২৫,০০০৲। প্রত্যেক বিভাগ তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল এবং এরা বছরের মধ্যে ৭৪ বার মিলিত হয়েছিলেন। দুপুরের ছুটির সময় সংঘের কর্মীরা মিল-প্রাঙ্গণের মধ্যেই অন্ততঃ ১৩০ বার সভা করেছিলেন। সংঘ আলোচ্য বছরে ৭৪৩টি অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সংঘের নির্দেশে কোন ধর্মঘটও হয় নি—এবং সম্পাদক আনন্দের সঙ্গেই উল্লেখ করলেন, 'সংঘের পদাধিকারীদের সঙ্গে মিলের কর্ম-কর্তারা সহানুভূতি ও শিষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং ন্যায়

প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সর্বদাই তাঁদের সত্যকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, এমন কি অভিযোগ পেশ কবার জন্য কয়েকটি কারখানায় আজ পর্যন্ত আমাদের যেতেই হয়নি।' সংঘ মিতব্যয়ী শ্রমিকদের জন্য একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অল্প সুদে ১০,৬৬৮৲ টাকা ধার দিয়েছেন। খুবই উল্লেখযোগ্য যে, এই ধারের শতকরা ৫০ ভাগ চালু খরচের ঘাটতি পূরণের জন্য আর শতকরা ৪১ ভাগ পুরাতন ধার শোধ করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। এই পুরাতন ধারগুলির জন্য তো আসলের দ্বিগুণ সুদও দিতে হত। একজন উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারের অধীনে একটি সুসজ্জিত হাসপাতাল সংঘের আছে। এখানে পৃথক ভাবে প্রসূতি-গৃহ এবং স্ত্রী-বিভাগও আছে। সংঘ ২,৬৬২৲ টাকার সুলভ খদ্দর এবং ১৭,০০০৲ টাকার সস্তা শস্য বিক্রি করেছে। শ্রমিকদের অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্য একটি বিশেষ সামাজিক উৎকর্ষ বিভাগ আছে। এ প্রায় ২,০০০টি ঘরের সংবাদ সংগ্রহ করেছে এবং এর অনুসন্ধানের কাজ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে, শ্রমিকদের সাধারণ জ্ঞান-বৃদ্ধিতে ও তাদেব সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে এই বিভাগ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। সংঘ এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য মিল-মালিকদের কাছে আবেদন করে উচিত কাজই করেছে, কেন না শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের অর্থই হল তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। তবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সংঘ মিল-মালিকদের ত্রুটিগুলিকে নিজেদের কিছু না কবাব অছিলারূপে ব্যবহার করতে চায় না। বিবরণে বলা হয়েছে, 'আমরা জানি যে, কাজ করার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করতে হবে, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে। যখন তখন কাজের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন তার চেয়ে এক মিনিট বেশি সময় ব্যয় করা আমাদের উচিত নয়। মিলগুলিকে এই আশ্বাস আমাদের দেওয়া উচিত যে, আমাদের কাজে কোন খুঁত থাকবে না, আমরা সাবধানতার সঙ্গে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করব, জিনিসপত্রের অল্পতম অপচয় হতে দেব।' এটি এমনই সিদ্ধান্ত যে, তাতে সংঘের স্থিতি সবিশেষ শক্তিশালী হবে এবং সংঘ মিল-মালিকদের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভে বিশেষরূপে যোগ্য হয়ে উঠবে। মিল-শ্রমিকদের পক্ষে এটিও কম প্রশংসার কথা নয় যে, সভায় তাঁদের যেসব প্রতিনিধি বক্তৃতা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন অকপট ভাবে স্বীকারই করেছেন যে, ব্যবসায়ে অত্যধিক মন্দার দরুন তাঁরা বেতন সম্পর্কে তাঁদের দাবি পেশ করার সুযোগ পাননি। তিনি একথাও বলেছেন যে,

সালিসী ইতিপূর্বে যেসব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন, মিলের তরফ থেকে সেগুলি পালিত হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন।

গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় শ্রমিকদের কর্তব্যের উপর বিশেষ জোর দেন এবং বলেন যে, অপ্রচুর জল সরবরাহ, খাবার ঘরের অভাব, পায়খানা ঠিকমত পরিষ্কার না হওয়া, ঠিকাদারদের দ্বারা মারধোর ও দুর্ব্যবহার, থ্রুসল বিভাগে বার বার তার ছেঁড়া এবং ফলতঃ কম কাজ ও কম বেতন সম্পর্কে শ্রমিকদের অভিযোগ তিনি জানেন। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলি জিনিস যে শ্রমিকদের নিজেদের উপরই, তাঁদের মধ্যে স্বাভিমান জাগ্রত করার উপরই নির্ভর করে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। একথা জেনেও তিনি আনন্দিত হয়েছেন যে, সংঘ শ্রমিকদের কারুর কারুর ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত চড়া সুদের পরিবর্তে তাঁরা অল্প সুদের ঋণ প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু শ্রমিকদের যে এত বেশি ধার করতে হয় এটি তাদের জীবনধারার পক্ষে খুবই দুঃখকর। তাদের পারিশ্রমিক অপ্রতুল হতে পারে কিন্তু গান্ধীজীর কোন সন্দেহই নেই যে, যদি তাঁরা আর একটু মিতব্যয়ী হন, মদ্যপান ও অন্যান্য বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত হন তবে তাঁদের ঋণী হতে হয় না। তিনি আনন্দিত যে, শ্রমিকরা মিল-মালিকদের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিকে বুঝেছেন। তিনি বললেন, 'আমি খুশী যে, আপনারা এটি বুঝেছেন। যখন তাঁরা ভীষণ অসুবিধার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তখন আপনারা অধিক বেতন চাইতে পারেন না। এমন একটি সময় আসতে পারে যখন অনুগত শ্রমিকরা কারখানা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার দিকে দৃষ্টি রেখে বিনা বেতনে কাজ করবার প্রস্তাব করবেন। কিন্তু আমি জানি যে, আপনারা আজ তার জন্য প্রস্তুত নন। আপনাদের ও মিল-মালিকদের মধ্যে সেই পরিমাণ বিশ্বাস আজ নেই। আপনারা অসংখ্য অন্যায়ের ভিতর দিয়ে কাজ করছেন এবং যতক্ষণ না মিল-মালিকরা সহানুভূতি ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা আপনাদের হৃদয় জয় করছেন ততক্ষণ আপনারা এই রকম কিছু করবেন না। কিন্তু এইটিই হল চরম লক্ষ্য, আমি চাই যে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা কাজ করুন।'

দেখে আনন্দ হয় যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে শ্রমিক সংঘ ও মালিক সংঘের সম্পর্ক বেশি ভাল। অবশ্য এখানে একটি সুসংগঠিত ও দৃঢ় শ্রমিক সংঘ থাকার ফলেই তা হয়েছে। মিল-মালিক সংঘের সম্পাদকের সঙ্গে গান্ধীজীর খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছে। তিনি মিল-মালিকদের কর্তব্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন, জামসেদপুরের টাটারা অন্ততঃ জল সরবরাহ ও ময়লা

পরিষ্কারের ব্যাপারে ঠিকভাবে কোন দাবি উত্থাপনের অবকাশ রাখেননি সে কথা বলেছেন এবং টাটাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেও তাঁকে অনুরোধ করেছেন। ঐ ভদ্রলোক প্রস্তাবগুলিকে হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, বিদ্যালযের খরচ বাবদ তাঁদের অংশের বকেয়া টাকা তাঁরা এখনই চুকিয়ে দেবেন এবং অপ্রতুল জল সরবরাহ, তার ছেঁড়া প্রভৃতি যাবতীয় অভিযোগ যা তাঁর কাছে পাঠানো হবে সেগুলি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৯-২৫

কারখানা-শ্রমিকদের দুর্দশা

কলিকাতার একটি চিঠিতে আমি সেখানকার কারখানা-শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণটি পেয়েছি :

'বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায কর্মরত শ্রমিকদের গড় সংখ্যা: :

কাঁচড়াপাড়া	১২,০০০
হাজিনগর, নৈহাটি, গৌরীপুর	৩০,০০০
কাথারপাড়া, ইছাপুর, শ্যামনগর	৫০,০০০
কাঁকিনাড়া, জগদ্দল	৮০,০০০
টিটাগড়	১,২৫,০০০
কামারহাটি, কাশীপুর, দমদম, বেলেঘাটা, শিয়ালদহ	৬৫,০০০
তেলেনীপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, চাঁপাদানী, সালকিয়া, শিবপুর, হাওড়া, লিলুয়া	১,৫০,০০০
বজবজ, বাউড়িয়া, রাজগঞ্জ, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর	১,৫০,০০০
মোট	৬,৬২,০০০

অধিকাংশ শ্রমিক নিরক্ষর, তাদের স্ত্রীরা আরও অশিক্ষিত, এবং তাদের সন্তানদের নৈতিক চরিত্রের দিন দিন অবনতি হচ্ছে। তাদের অভ্যাস এমন হয়ে গিয়েছে যে, তারা যা উপার্জন করে সবই জুয়া, মদ ও মেয়েদের পিছনে খরচ করে ফেলে। যখন তাদের পকেট খালি হয়ে যায় তখন খাদ্যের অভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর কাবুলিওয়ালা ও অন্য মহাজনদের কাছ থেকে মাসে বা এমন কি সপ্তাহে টাকা প্রতি

দু-আনার মত চড়াসুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। এই কারখানার শ্রমিকরা জ্ঞানের অভাবে দিন দিন মৃতবৎ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘোর অন্ধকার থেকে এদের বার করে আনার কোন উপায় কি নেই ?'

আমি এই সংখ্যার বা বিবরণের যথার্থ প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু ঐগুলিকে সাধারণভাবে নির্ভুল মনে করা যেতে পারে। পত্রলেখক বলেছেন যে, দেশবন্ধু তাদের কষ্ট দূর করে দেবার কথা দিয়েছিলেন এবং মৃত্যু দেশবন্ধুকে যে কাজ আরম্ভই করতে দেয়নি তা তিনি আমাকে শেষ করতে বলেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, সিনেমা কোম্পানীর একটি কর্মচারীর সাহায্যের জন্য আমার দশ হাজার টাকার পুঁজি সংগ্রহ করে দেওয়া উচিত। তাহলে তিনি কারখানা অঞ্চলে সিনেমার প্রদর্শন করতে পারবেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে তাঁত ও চরখা বসাতে পারবেন।

লেখকের উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি জানেন না সিনেমা স্ত্রী-পুরুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে বা যে দোষগুলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার আসক্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না। তিনি এও জানেন না যে, এইসব শ্রমিক সম্ভবত তাঁত ও চরখা গ্রহণ করবে না, কেন না তাদের এই ধরনের পরিপূরক পেশার প্রয়োজন নেই, তারা ধর্মঘটের সময় বা বেকারত্বের সময় তাঁত ও চরখা শিখতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজ খুবই শক্ত ও কষ্টকর এই কাজ ধীরে ধীরে হয় আর তা সেই সব সংস্কারকদের পক্ষেই সম্ভবপর যাঁরা প্রায় শ্রমিকদের মাঝে গিয়েই বসবাস করবেন এবং নিজেদের বিশুদ্ধ চরিত্রের দ্বারা শ্রমিকদের জীবনের উৎকর্ষ সাধন করবেন। এই রকম কাজের জন্য পুঁজির প্রয়োজন হয় না, আর যা সামান্য দরকার হয় তা শ্রমিকরা নিজেরাই আনন্দের সঙ্গে দিয়ে দেয়। বস্তুতঃ আমেদাবাদে এখন সেই কাজই হচ্ছে আর অল্পদিনের মধ্যে জামসেদপুরেও তা হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-২৫

না এবং হ্যাঁ

আমার কম্যুনিস্ট সহকর্মী* জামসেদপুরে শ্রমিকদের মধ্যে আমার কাজের দোষ দেখেছেন। কেন না আমি টাটাদের কাছ থেকে কোন অভিনন্দন-পত্র না

* কমরেড সকলতওয়ালা

নিয়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার মনে হয় যে, তাঁর অনুমোদন এই জন্যই যে, স্বর্গীয় শ্রীরতন টাটা সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু এই সম্মানের জন্য আমি লজ্জিত নই। শ্রীটাটাকে একজন সহৃদয় ও শ্রমিকদের শুভাশুভ বিচারকারী মনিব বলেই আমার মনে হযেছিল। আমি যতদূর জানি তিনি কর্মচারীদের সমস্ত প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন এবং আমি পরে শুনেছি যে, এই নিষ্পত্তি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। আমি ধনী-দরিদ্র সকলের কাছেই সমানভাবে আমার কাজের জন্য অর্থ চেয়ে থাকি এবং উভয়ের কাছ থেকেই তা পাই। ধনীরা আনন্দের সঙ্গেই আমাকে দান করেন। এটা আমার কোন ব্যক্তিগত বিজয় নয়, এ অহিংসারই জয়। যত অসম্পূর্ণভাবেই হোক এই অহিংসারই প্রতিনিধিত্ব করতে আমি চেষ্টা করি। আমার কাছে এ এক ব্যক্তিগত আনন্দের কথা যে, যাদের মতবাদ ও নীতির আমি বিরোধ করি সাধারণভাবে তাঁদের স্নেহ ও আস্থা আমার উপর আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর তাঁদের বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং আমাকে তাঁদের বন্ধু করে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশের নীতি ও পদ্ধতির নিন্দা করা সত্ত্বেও হাজার হাজার ইংরেজ নরনারীর স্নেহ আমার প্রতি আছে এবং আধুনিক ভৌতিক সভ্যতার প্রবল দোষারোপ করা সত্ত্বেও আমার ইউরোপীয় ও আমেরিকান বন্ধুর ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। এটিও অহিংসার জয়।

অন্তিম বিষয় হল শহরের শ্রমিকদের সম্পর্কে। এই বিষয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। আমি শ্রমিকদের সংগঠনের বিরোধী নয়। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ের মত তাঁদের সংগঠনও ভারতীয় পদ্ধতিতে, বা বলতে পারেন আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে চলুক আমি তাই চাই। সেই জিনিসই আমি করছি। ভারতীয় শ্রমিকরা সহজ প্রবৃত্তিতেই তা জানে। আমি পুঁজিপতিকে শ্রমিকদের শত্রু বলে মনে করি না। উভয়ের সমন্বয় সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর বলে আমি মনে করি। দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ অথবা আমেদাবাদে যে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছিলাম সেখানে পুঁজিপতিদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি হয়নি। প্রতিরোধগুলি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং যে-সীমা পর্যন্ত তাদের প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছিল সেই অবধি তারা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সমান বণ্টনই হল আমার আদর্শ। কিন্তু আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি এই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হবে না। তাই আমি ন্যায্য বণ্টনের জন্যই কাজ করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৩-২৭

পুঁজি ও শ্রম

পুঁজি ও শ্রমের ক্রমবর্ধমান বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য কোন পরামর্শ নন্দীতে গান্ধীজীর কাছে চাওয়া হবে না বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু দুজন মিল-মালিক তাঁদের অসুবিধার করুণ বিবরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন—'শ্রমিকরা যে কেন অসন্তুষ্ট তা আমরা জানি না। আমাদের কোন লাভ হচ্ছে না। তবু আমরা যথাযথ বোনাস তাদের দিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, তাদের জন্য আমরা করতে কিছু বাকি রাখিনি। তবু তারা অসন্তুষ্ট এবং তাদের সমর্থন করার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকদেরও তারা পায়' ইত্যাদি। গান্ধীজী বললেন, তবু তাদের ক্লেশ যে থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি। শোলাপুরে বিস্ময়কর কল্যাণকার্য চলছে। সেখানে তাদের জন্য মোটামুটি ভাল আবাসগৃহ নির্মিত হয়েছে এবং তাদের ভালভাবে দেখাশোনাও করা হচ্ছে। কিন্তু তবু যদি সেখানকার কারখানার শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট থাকে এবং আরও দাবি করে তবে তাতে কারও বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। সেখানকার ম্যানেজাররা শ্রমিকদের মধ্যে যাতে সব চেয়ে কম অসন্তোষ থাকে তার জন্য কয়েকটি উপায় স্থির করেছেন। আপনারা এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

—আমি তা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আমার লোকেরা যে কোন্ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারে তা ভাবতে গিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে যাই।

গান্ধীজী বললেন, দেখুন, আমি যদি পুঁজিপতি হতাম আর আমার লোকেরা যদি অনুভব করত যে, তাদের শোষণ করা হচ্ছে এবং তাদের সংক্ষিপ্ততম অভাব ও অসুবিধা পূরণ করা হচ্ছে না তবে আমি আর একটি দিনও আমার ব্যবসা চালাতাম না। কিন্তু আজ আপনারা আমায় মাফ করবেন। আমাকে আরও শক্তিশালী হতে দিন, তারপরে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এর পর আর এক ব্যক্তি এলেন। তিনি মিল-মালিক ছিলেন না তবে কারখানা শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। শ্রমিকদের খদ্দর পরতে কী করে সম্মত করা যায় তা তাঁর জানা ছিল না, কেননা তাদের ক্ষেত্রে খদ্দর খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় আর সেজন্য তা মিলের কাপড়ের চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। গান্ধীজী বললেন, খদ্দর কিনুন এবং তা সস্তাদামে তাদের কাছে বিক্রয় করুন। যিনি তাঁর নিজের লোকদের সুখী ও সন্তুষ্ট করতে চান তিনি বিভিন্ন উপায়ে তা করতে পারেন। আপনি লিভার ব্রাদার্সের কথা জানেন? পোর্ট সানলাইট তাদের

এক আদর্শ পল্লী।—কিন্তু মনে হল যে, ঐ ভদ্রলোক কোন পরামর্শ নেবার পরিবর্তে আলোচনার আনন্দই গ্রহণ করতে এসেছিলেন। আর এই কথাটি বোঝা গেল তাঁর পরের প্রশ্ন থেকে : মনে করুন, কোন কারখানা ফোর্ডের মত একজন পুঁজিপতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যিনি তাঁর লোকেদের এক আদর্শ অবস্থার মধ্যে রেখেছেন। এই রকম ক্ষেত্রে সেই মিলের কাপড় কেনাই উচিত নয়?—গান্ধীজী উত্তর দিলেন, না, কারণ মিল-শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাটি আমাদের সুতা কাটা প্রচারের ভিত্তি নয়। আমাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনগণকে মিলে কাজ দেওয়া যে যেতে পারে না, এই বিষয়ের উপরই তা অবলম্বিত। দেশে মিলের কাজ যত ভাল ভাবেই বিস্তার করে দেওয়া হোক না কেন তবু তাতে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৯-৬-২৭

পুঁজি ও শ্রম

রায়পুর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর এজেন্ট শেঠ কস্তুরভাইয়ের অনুরোধে গান্ধীজী কোম্পানীর কারখানাগুলিতে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের শিশুদের দেখা-শোনার জন্য একটি শিশু-নিকেতনের দ্বারোদঘাটন কবেন। এই গৃহটি ২৫,০০০্ টাকায় নির্মিত হয়েছিল। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠানটির উদঘাটন করতে গিয়ে বললেন :

'এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মাত্র গতকালের নয়। এই শহরে আমার প্রথম আগমনের মত এই সম্পর্কও পুরাতন। আর সেজন্য এই কথা বলতে আমি সাহস পাচ্ছি যে, শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন করেননি। এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে জীবনের প্রাথমিক সুবিধাগুলিও শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কয়েকজন মিল-মালিক এইদিকে কিছু প্রচেষ্টা করেছেন আর বর্তমান প্রচেষ্টা তারই এক দৃষ্টান্ত।

'পশ্চিমে এখনও মালিক ও শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হয়ে রয়েছে। আমি জানি যে, দেশের মধ্যে যখন অস্পৃশ্যতার অভিশাপ রয়েছে তখন আমাদের আদর্শের কথা বলা ধৃষ্টতা। কিন্তু আমি যাকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করি তা যদি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত না করি তবে আমি নিজের কাছেই অন্যায় করব

এবং আপনাদের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদনেও ব্যর্থ হব। মিল এজেন্ট ও শ্রমিকদের সম্পর্ক পিতা-পুত্র বা সহোদর ভাইদের মত হওয়া উচিত। আমি প্রায়ই শুনেছি যে, আমেদাবাদের মিল-মালিকরা নিজেদের "প্রভু" আর কর্মচারীদের "ভৃত্য" বলে উল্লেখ করেন। আমেদাবাদের মত জায়গায় যেখানে ধর্মের প্রতি এবং অহিংসার প্রতি প্রেমের জন্য গর্ববোধ আছে সেখানে এই ধরনের শিথিল কথা শোভা পায় না। এই মনোভাব অহিংসার অপলাপ, কেন না আমাদের আদর্শ এই শিক্ষাই আমাদের দেয় যে, যারা তাদের নিজেদের অজ্ঞতার জন্য এবং আমাদের মিথ্যাধারণাবজন্য শ্রমিক বা "ভৃত্য" বলে আখ্যা লাভ করেথাকে তাদের কল্যাণের জন্যই আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া উচিত। সুতরাং আপনাদের কাছে আমি যা আশা করি তা হল এই যে, যাবা আপনাদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং যাদের শিল্প ও শ্রমের ফলে.আপনারা পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আপনাদের সমস্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে তাদের কল্যাণে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রয়েছে বলে আপনারা মনে করুন। আমি চাই যে, আপনারা আপনাদেব শ্রমিকদের নিজেদের সম্পদের অংশী করে নিন। আমার কথার অর্থ এই নয় যে, আপনারা এই সমস্ত করতে যদি নিজেদের উপর এক আইনগত বন্ধন করে না নেন তবে শ্রমিকদের তরফ থেকে বিদ্রোহ হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে যে শক্তির কথা আমি চিন্তা করতে পারি তা হল পিতা-পুত্রের সম্পর্কে পারস্পরিক প্রেম ও শ্রদ্ধা, আইনের শক্তি নয়। পারস্পরিক প্রেমের এই কর্তব্যের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাকে যদি আপনারা নীতি করে নেন তবে সমস্ত শ্রমিক-বিরোধের অবসান হয়ে যাবে এবং শ্রমিকরাও ইউনিয়নের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার প্রযোজন অনুভব করবে না। আমার ধ্যানের মধ্যে যে আদর্শ রয়েছে সেখানে আমাদের অনসূয়া বেন ও শঙ্করলালদের জন্য কিছু করার আর অবশিষ্ট থাববে না তাদের কাজেব সেখানে অবসান হযে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একজন শ্রমিকও এমন থাকবে যে সে, যে-কারখানায কাজ করে সেই কারখানাকে তার নিজের বলে মনে করবে না, অধিক পরিশ্রম ও অত্যধিক কাজের সময়ের জন্য অভিযোগ করবে আর সেইজন্য তার মনের মধ্যে মনিবের বিরুদ্ধে দ্বেষ ছাড়া আর কোন মনোভাব পোষণ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা আসতে পারে না।

'মুশকিলটা কোথায় ?

'আমাদের অভিজ্ঞতা যতই প্রসারিত হচ্ছে ততই আমরা ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে

দেখছি যে, আমাদের শ্রমিকদের যত বেশি আমরা দেব আমাদের লাভও তত বেশি হবে। আপনাদের লোকেরা যে-মুহূর্তে বুঝতে পারবে যে, কারখানার উপর তাদের অধিকার আপনাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয় সেই মুহূর্তেই তারা আপনাদের সহোদর ভাই বলে মনে করতে আরম্ভ করবে, তখন সকলের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করার কোন প্রশ্ন বা তাদের তদারক করার বিপুল আয়োজনেরও প্রয়োজন থাকবে না।

'আমি আপনাদের এই প্রচেষ্টার মূল্য কম করতে চাই না, কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে, কোন সম্পন্ন ব্যক্তি কি তাঁর ছেলে-মেয়েদের এই রকম শিশু-নিকেতনে পাঠানো পছন্দ করবেন? আমাদের প্রচেষ্টা সেই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই হওয়া উচিত যাতে কোন কারখানা-শ্রমিকের শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে পৃথক থাকার কোন প্রয়োজন না হয় এবং আমাদের শিশুরা শিক্ষালাভের যে সুযোগ পেয়ে থাকে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাও যেন তা পায়।'

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৫-২৮

একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয়

আমেদাবাদ মিল-মালিক সংঘ এবং কাপড়-শ্রমিক সংঘ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি বে-সরকারী স্থায়ী সালিশী বোর্ড নিযুক্ত করেছেন। সেই বোর্ডের দ্বারা প্রেরিত মামলার যে নির্ণযটি মধ্যস্থ দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী দিয়েছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। মধ্যস্থের রায় এই সাক্ষ্যই দেয় যে, মামলাটির তথ্য সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হযেছে। রায়টিতে সাহসিকতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রতিপাদিত হযেছে যে, 'যখন শ্রমিক এমন পারিশ্রমিক পায় না যাতে সে জীবননির্বাহের একটি উপযুক্ত স্তর বজায রাখতে পারে, তখন সে তার মনিবের কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে।' বিগত বহু বছর ধরে শ্রমিকরা দাবি করে আসছিল যে, নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক পাবার অধিকার তাদের আছে আর মালিকরাও বরাবর এই দাবি অস্বীকার করে আসছিলেন। এই অধিকার তাদের নিশ্চয় আছে বলেই আমি মনে করি এবং মধ্যস্থও তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি এই বাস্তব অবস্থার পরিচয় পেয়েছেন যে, সব চেয়ে কম ও সব চেয়ে বেশি মাইনে পায় এমন শ্রমিকদের আয় এক করলেও তাদের পরিবার পিছু গড় উপার্জন মাসে চল্লিশ টাকার বেশি হয় না

অথচ গড়ে তাদের মাসিক খরচ পঞ্চাশ টাকার কম্‌ নয়। ১৯২৩ সালে মালিকরা শ্রমিকদের বেতন থেকে যে শতকরা ১৫ টাকা কেটে নিয়েছিলেন আর শ্রমিকরা যার পুনঃপ্রদান দাবি করেছিল সেই সম্পর্কীয় মামলাটিই মধ্যস্থের কাছে পেশ করা হয়েছিল। বিদ্বান মধ্যস্থ শ্রমিকদের নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক পাবার অধিকার স্বীকার করার পরও এবং বাস্তবে আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা যখন তা পাচ্ছে না তখন কেন যে শ্রমিকদের এই কেটে নেওয়া অংশটি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রদত্ত হল না তা বোঝা মুশকিল। সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে যে-নির্ণয় আর বেতনের বেলায় তার যে সক্রিয় প্রয়োগ, এই দুটির অসঙ্গতি সম্পর্কে একমাত্র যে ব্যাখ্যাটি আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি তা হল এই যে, মধ্যস্থ তাঁর নিজের নির্ণয় সম্পর্কেই ভীত ছিলেন, অথবা ১৯২৩ সালে মিল-মালিকরা শ্রমিকদের যে বেতন হ্রাস করেছিলেন সেই সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ রূপেও নিন্দা করতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই বেতন হ্রাস সালিশীর দ্বারা হয় নি, মিল-মালিকদের শ্রমিকদের দমিত করার স্বৈর-বৃত্তির শক্তিতেই তা হয়েছে। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তখন কারখানা-শিল্পের অবস্থা যুদ্ধের সময়ের মত তত ভাল ছিল না, তবু ঐ সময়টি অল্প লাভেরই ছিল, ক্ষতি বা মূল পুঁজির ব্যয় তখন হচ্ছিল না। বেতন-হ্রাসের প্রশ্ন যদি নিতান্তই আসে তবে তা তখনই আসতে পারে যখন বেতন এত ভাল হয় যে, জীবনযাপনের জন্য ব্যয় করার পরও তা থেকে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এবং যখন সংশ্লিষ্ট শিল্পকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু শ্রমিকরা সালিশীর নীতিতে আবদ্ধ। সেজন্য বেতন হ্রাসের সম্পূর্ণ প্রত্যার্পণ না হলেও মধ্যস্থের সিদ্ধান্তকে তাদের আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে হবে। দেওয়ান বাহাদুর যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুই তাদের ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত এবং অবশিষ্টের জন্য ক্রমাগত শান্তিপূর্ণ-ভাবে চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। সত্যই তো যতক্ষণ না নির্বাহযোগ্য বেতন লব্ধ হচ্ছে এবং বাসযোগ্য ঘর ও অন্যান্য সাধারণ সুখ-সুবিধাগুলি পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তারা বা মালিকরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কিন্তু ধর্মঘট যদি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় এবং সালিশীর নীতিকে উভয়েই দৃঢ়ভাবে মেনে চলেন তবে তা খুবই লাভজনক হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১২-২৯

একটি মহান সমতা স্থাপক*

আপনাদের যদি জানা না থাকে তবে আপনারা জেনে নিন যে, যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই তখন থেকেই শ্রমিকদের সঙ্গে আমার খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর যে-কোন অংশেই তাঁরা আমাকে একজন সহকর্মী বলে গণ্য করেছেন এবং নিজেদেরই একজন মনে করে আপন করে নিয়েছেন। আপনারা বোধ হয় শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকরাও আমাকে তাদেরই একজন বলে মনে করেছিলেন এবং আমার চারপাশে হাজারে হাজারে সমবেত হয়েছিলেন। আপনাদের এবং আমার মধ্যে পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, আমি স্বেচ্ছায় শ্রমিক হয়েছি আর আপনারা পরিস্থিতির চাপে শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছেন। এবং পারলে বোধ হয় মালিক হতেও আপনারা ইচ্ছা করবেন। মালিক হবার উচ্চাভিলাষ আমি বহুপূর্বেই ত্যাগ করেছি। কেন না তাহলে একটি নগণ্য শ্রেণীরই আমি মানুষ হতাম আর আজ যেমন নিজের যোগ্যতা অনুসারে করছি তেমনি ভাবেও নিঃসম্বল, কাঙ্গাল, অর্ধভুক্ত ও উলঙ্গ, নিম্নতম ও হৃতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারতাম না। আমি চাই শ্রমিকরা যেন তাদের অদৃষ্টের জন্য দুঃখ বোধ না করে, নিজেকে কখনই হেয় জ্ঞান না করে এবং শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করে।

হরিজনদের প্রতি আপনাদের সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ আপনারা টাকার তোড়া উপহার এনেছেন, এ খুবই উচিত কাজ হয়েছে। তাদের মত আর কেইবা এত কষ্ট ভোগ করেছে? তারা তো সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। যে দারুণ কষ্ট ও হীনতা তাদের ভোগ করতে হচ্ছে তা যারা এগুলি ভোগ করেনি তারা কখনই কল্পনা করতে পারবে না। অন্য শ্রমিকরা সম্পদ সঞ্চয় করে কোনদিন মালিক হবার এবং সেইভাবে নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার আশা করতে পারে, কিন্তু হরিজনরা কখনও এইরকম উচ্চাভিলাষ পোষণ করতে পারে না। মাতৃগর্ভ থেকেই তাদের উপর অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক লিপ্ত হয়ে যায়। পতিত হয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে আর সেইভাবেই তাদের মৃত্যু হয়। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জায়গায় তাদের বাস করতে হয় এবং জীবনের যেসব সুখ-সুবিধা অন্যে ভোগ করে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। এমন কি, ঈশ্বরের যে অবারিত দান জল,

* ২৫-১১-৩৩ তারিখে বিলাসপুরে বি. এন. রেলওয়ে শ্রমিক সংঘে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

তাও তাদের দেওয়া হয় না। আমি শ্রমিক সংঘকে এই কথাই বলব যে, তাঁরা হরিজনদের এবং আপনাদের মধ্যে যে ভেদভাব রয়েছে তা দূর করে দিন। আমি ইচ্ছা করেই এই আবেদন করছি কেন না আমেদাবাদের শ্রমিকদের সঙ্গে আমার সোজাসুজি যোগাযোগ থাকার ফলে আমি জানি যে, শ্রমিকরা হরিজন ও অ-হরিজনদের মধ্যে ভেদভাব মেনে চলেন। অন্যদের চেয়ে শ্রমিকদের কাছেই আমি বেশি আশা করি যে, তাঁরা এই সমস্ত ভেদ দূর করে দেবেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, শ্রমিকদের মাধ্যমে আমরা একদিন সাম্প্রদায়িক ঐক্য লাভ করব। শ্রমকে আমি একতাবদ্ধ করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম বলেই মনে করি। এটি একটি মহান সমতা স্থাপক। শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকা লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত, কেন না তাঁরা সকলেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন উপার্জন করেন আর সেজন্য তাঁরা এক বিশাল ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর অঙ্গ হয়ে যান। সুতরাং অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ অপসারণের দ্বারা তারা এর প্রারম্ভ করুন। সাম্প্রদায়িক ঐক্যেব পথে এ একটি বড পদক্ষেপ। হরিজনদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতা আছে তা যদি একবার দূর হয়ে যায় তবে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

হরিজন, ৮-১২-৩৩

শ্রম ও পুঁজি

জব্বলপুরে স্থানীয় শ্রমিক সংঘ গান্ধীজীকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন যে, গান্ধীজী কেন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের এবং পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করার কাজে হাত দেন না। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'উচ্চ-নীচ ভেদভাবকে সমূলে উৎপাটিত করার এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তবে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তার এক ভাল প্রতিক্রিয়া হবে এবং পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ মিটে যাবে। তাদের মধ্যে সহযোগ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের পূর্ণ তাৎপর্য যদি আমরা উপলব্ধি করে থাকি তবে একথা বুঝতে আমাদের মোটেই কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে, জন্মগত অস্পৃশ্যতা ঐ অভিশাপের অসংখ্য রূপগুলির মধ্যে একটিমাত্র রূপ। স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যে কাজ আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই কাজও আমরা এই প্রকারে ভালভাবে করতে

পারব। এই আন্দোলনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যদি আমরা সক্ষম হই তবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও যত বিরোধ দেখা যায় তা সবই দূর হয়ে যাবে। হিন্দু-মুসলমান এবং পুঁজি ও শ্রমের বিভেদ মিটে যাবে। একবার যদি হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে হৃদযের একতার পথে সমস্ত বাধা অতিক্রম করা সহজ হযে যাবে।'

হরিজন, ১৫-১২-৩৩

হরিজন শ্রমিকদের সাথে

গান্ধীজী আমেদাবাদে কারখানার শ্রমিকদের (এদের অধিকাংশই হরিজন) এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। তাদের ৫০,০০০৲ টাকার তোড়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, তারা যেন এই দান হরিজনদের নিজেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার পাপকে ভবিষ্যতে প্রশ্রয় দেবার লাইসেন্সরূপে গণ্য না করে, বরং অস্পৃশ্যতাকে একেবারে নির্মূল করার সঙ্কল্পের নিদর্শনরূপেই তাকে মনে করা উচিত। তারা যেন কাউকেই নিজেদের চেয়ে ছোট বলে মনে না করে, বরং নিজেদেরই সব চেয়ে নীচু মনে করে। কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব বিনাশের সূচনা করে। সুতরাং তাদের ঢেঢ়, চামার, ভাঙ্গী প্রভৃতির মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদভাব ভুলে যাওয়া উচিত। বস্ত্র-শ্রমিক সংঘ তাদের জন্য খুবই ভাল কাজ করছে। কিন্তু তারা কি এ থেকে সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করছে? কল্যাণগ্রাম খুবই ভাল জায়গা। কিন্তু তারা যদি নিজেরাই নোংরা থাকে এবং এটিকে পরিষ্কার না রাখে তবে তারা এটিকে একটি সার্বজনিক উৎপাতের জায়গা করে তুলবে। তারপর তারা এখনও মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং মৃত মাংস ভক্ষণের বদ অভ্যাসে জড়িত রয়েছে। এই পাপ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া এবং সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলা উচিত। এইভাবে তারা যদি সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ, সত্যকারের হরিজন হয়ে যায় তবে প্রত্যেকেই তাদের দলভুক্ত হতে এবং তাদেরই একজন হতে চাইবে। সবর্ণ হিন্দুরা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে কিন্তু হরিজনদেরও আত্মশুদ্ধির দ্বারা তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে।

হরিজন, ১৩-৭-৩৪

শ্রমিকরা পরস্পর মিলিত হোক*

গান্ধীজী বললেন যে, তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শ্রমিকদের কুটির পরিদর্শন করেছেন। সেগুলিকে তাঁর খুব ছোট, অন্ধকার এবং নীচু বলে মনে হয়েছে। এগুলি মানুষের বাসযোগ্য নয়। শিক্ষা এবং বুদ্ধিযুক্ত একতার দ্বারা তারা কী করতে পারে এই জ্ঞানটুকু যদি শ্রমিকদের হয়ে যায় তবে তারা বুঝতে পারবে যে, ম্যানেজার এবং অংশীদারদের চেয়ে তারাও খনির মালিক হিসাবে কিছু কম নয়। পৃথিবীর গর্ভ থেকে যে পদার্থ তারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা বার করে আনে তার চেয়েও ভাল সোনা হল তাদের শ্রম। তিনি খনির মালিকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের যথোচিত স্থান স্বীকার না করেন এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের মত ব্যবহার না করেন তবে সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন শ্রমিকরা তাদের শর্ত মালিকদের দ্বারা পালন করিয়ে নেবে। তিনি শ্রমিকদের বললেন যে, তাদের অধিকারের উপর জোর দেওয়া যদিও সমীচীন এবং ন্যায্য তবু খনিগুলি যেন তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এইভাবে তাদের কাজ করা উচিত। তিনি তাদের মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং অন্যান্য অপরাধ ত্যাগ করতে বললেন।

হরিজন, ১৩-৬-৩৬

কারখানা শ্রমিকদের সাথে†

আঠার বছর আগে আপনারা ২১ দিন ধরে একটি শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চালিয়েছিলেন। সেই সময় কোন অশোভন ঘটনা ঘটেনি। এটি আপনাদের পক্ষে একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল এবং আপনারা তাতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরে আপনারা দুর্বল হয়ে পড়েন। পরবর্তী ঘটনাও আপনারা জানেন। কিন্তু ঐ ধর্মঘটের সমস্ত সুকৃতি সেই মহান পতাকারই, যার নিচে আপনারা কাজ করেছিলেন। সেই পতাকায় অটল প্রতিজ্ঞা—এই শব্দগুলি অঙ্কিত ছিল। যাঁরা কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন তাঁরা পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিচার করে এবং নিজেদের ক্ষমতা ও সীমার কথা বিবেচনা করেই তা করে থাকেন। নিষ্ঠার সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয় তা রক্ষা

* কোলার স্বর্ণখনির শ্রমিকদের বিরাট সভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

† আমেদাবাদের কারখানার শ্রমিকদের কাছে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

করার শক্তি আমাদের মধ্যে থাকে আর তা থাকা প্রয়োজন। লাঠির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য বিমান থেকে বোমা ফেলার শক্তি আমরা চাই না। আমরা মাটি-মায়ের সন্তান, তাই হাওয়ার ভাষায় কথা না বলে পৃথিবীর ভাষাতেই কথা বলা ভাল। প্রতিজ্ঞা-পালনের শক্তি আপনাদের এক বিরাট পুঁজি। আপনাদের কাছ থেকে একে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুপণ করেও আপনাদের একে রক্ষা করা উচিত। কোটি কোটি টাকার চেয়েও এ বেশি মূল্যবান। বহু কোটিপতিকে আত্মহত্যা করতে হযেছে। তাঁদের কোটি কোটি টাকা অপমানজনক মৃত্যু থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি।

আপনাদের সামনে যে প্রশ্ন রয়েছে, মনে হয় তা এই: শক্তিবৃদ্ধি আপনাদের হয়েছে, না মিল-মালিকদের। মিল-মালিকরা যদি সালিশীর দ্বার বন্ধ করে দেন তবে আপনাদের ধর্মঘট করতে হবে। তাঁরা আপনাদের শক্তি পরীক্ষা করতে চাইলে করতে পারেন। এখন আমি মিল-মালিকদের এই পরামর্শ দেব যে, আপনারা যদি শক্তিশালী হযে থাকেন তবে তাতে তাঁদের ভীত হবার কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা যদি শক্তিশালী হন তবে আপনাদের ভীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁদের শক্তি হল তাঁদের অর্থ আর আপনাদের শক্তি হল কাজ করার ক্ষমতা। শ্রম ছাড়া পুঁজি অসহায় হযে যাবে। কাজ করার জন্য যদি আপনারা না থাকেন তবে সমস্ত মিল বন্ধ হয়ে যাবে। এমন হতে পারে যে, তাঁদের জন্য কাজ করতে তাঁরা আপনাদের বাধ্য করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রম ছাড়া তাঁরা অসহায়। এইভাবে শ্রমিকদের হাতেই চাবিকাঠি। আমি শ্রমিকদের কথাই বলছি, শ্রমিক সংঘের কথা নয়।

পক্ষান্তরে, আপনারা যদি সংখ্যায় বেশি হন, যদি আপনারা লক্ষ লক্ষ হযে থাকেন, তবু আপনারা কারখানা চালাতে পারবেন না। আপনাদের মধ্যে কারখানা চালানোর বুদ্ধি নেই। আপনাদের কাছে যদি কোটি কোটি টাকাও থাকে তবু আপনারা তা চালাতে পারবেন না। আমাকে যদি কেউ এক কোটি টাকা দেয় তবু কারখানা পরিচালনা করতে আমি অস্বীকার করব। সেই টাকা নিযে আমি আনন্দের সঙ্গেই খাদি বা হরিজনের কাজ করব, কিন্তু একটি আদর্শ কারখানা পরিচালনা করতে পারব না। আপনাদেরও সেই এক অবস্থা। কুড়ি বছর ধরে সংগঠিত কাজ করার পরেও আপনারা কারখানা চালাবার যোগ্যতা অর্জন করেন নি। আর আগামী কুড়ি বছরের মধ্যেও তা অর্জন করার কোন সম্ভাবনা নেই। আপনারা যদি মনে করেন যে, সেই যোগ্যতা আপনাদের আছে তবে পথ প্রদর্শনের

জন্য কোন নেতার প্রয়োজন আপনাদের নেই।

অবশ্য আমি চাই যে, আপনারা যেন একদিন সেই যোগ্যতা অর্জন করেন। কারখানা চালাবার যোগ্য হতে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা আপনাদের পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব। কিন্তু সেই অবস্থায় বাকি সকলে আজকেরই মত দাস হয়ে থাকবেন। আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনারা সমষ্টিগতভাবে কারখানা চালাতে সক্ষম হবেন না।

কিন্তু আমাদের যেসব বন্ধু শ্রেণী-বোধ জাগরণে এবং শ্রেণী সংগ্রামের উপর জোর দেন, তাঁরা বলেন যে তাঁদের কথামত যদি আমরা লড়াই করি তবে সব কিছুই সম্ভব। মিল-মালিকদের সাথে আমাদের লড়াই করতে হতে পারে। কিন্তু যেমন ভাবে আমরা আমাদের প্রিয়জন ও আত্মীয় বন্ধুদের সাথে বিরোধ করে থাকি তেমনি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সঙ্গেই মিল-মালিকদের সঙ্গেও করা উচিত।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে প্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে কী হবে? দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবঞ্চক সব সময়েই থাকবে। কিন্তু আমি আপনাদের এই উপরোধই করব যে, তাদের সঙ্গে লড়াই না করে আপনারা তাদের বোঝান এবং তাদের বলুন যে, তাদের নীতি সঙ্কীর্ণ আর আপনাদের নীতিতে সমস্ত শ্রমিকের কল্যাণের চিন্তা নিহিত আছে। হতে পারে যে, তারা আপনাদের কথা শুনল না। সেই অবস্থায় আপনারা তাদের সহ্য করবেন, কিন্তু তাদের সাথে লড়াই করবেন না।

আমাদের যেসব বন্ধু শ্রেণী সংগ্রামে জোর দেন তাঁদের কাছ থেকে আমি একটি খোলা চিঠি পেয়েছি। তাঁরা বলেছেন এবং আমি তাঁদের সাথে একমত যে, আমেদাবাদে দুটি ইউনিয়ন থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁরা এমন একটি ইউনিয়ন চান যেটি তার নীতি হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামকে স্বীকার করবে। তার অর্থ হল যে, তাঁরা চান তাঁদের ইউনিয়নে আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে তবে এই প্রলোভনে আপনারা পড়বেন না।

আপনারা এবং আমি সহযোগিতায় বিশ্বাস করি। আমরা যদি কোন সময় মিল-মালিকদের সঙ্গে অসহযোগ করি তবে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতার পথে পৌঁছবার জন্যই তা করব। আমরা চাই আমেদাবাদ এবং তার কারখানা-শিল্প উন্নতি করুক। কিন্তু আমরা এও চাই যে, বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ই যেন সেই উন্নতির বিস্তৃত বনিয়াদ হয়

আমি মধ্যস্থদের একজন, তাই সাধারণ ধর্মঘটের উচিত-অনুচিত সম্পর্কে কিছু

বলতে পারি না। ধর্মঘট যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে আপনাদের কী করা উচিত সেই কথাই আমি আপনাদের বলেছি। আপনারা জানেন যে, ধর্মঘট সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হওয়া চাই। মীমাংসায পৌঁছবার জন্য আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। আমি এখনও আশা করি যে, ধর্মঘটের প্রয়োজন নাও হতে পারে। সঙ্কট পরিহার করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

কিন্তু মনে রাখবেন যে, যদি আপনাদের লডাই করতেই হয, তবে আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষমতা আপনাদের জীবনের শুদ্ধতার উপরই নির্ভর করবে। কোন জুয়াড়ী বা মদ্যপাযী বা ব্যভিচারী কখনই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারে না। একথাও মনে রাখবেন যে, আপনাদের নিজেদের শক্তিতেই লড়াই করতে হবে। অনসূয়া বেন অথবা শঙ্করলাল অথবা আমার উপর নির্ভর করবেন না। আমরা কেবল আপনাদের পথ প্রদর্শনই করতে পারি। আপনাদের নিজেদের শক্তিই কেবল আপনাদের বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আমি তো এক তৃণখণ্ড মাত্র। একথা নয় যে, আমি আপনাদের বিষযে আগ্রহ রাখা বন্ধ করেছি, কিন্তু এখন আমি একজন গ্রামবাসী হয়ে গিয়েছি এবং সেগাঁও নামে ছোট গ্রামটিতে আমার সমস্ত শক্তির পরীক্ষা চলছে। আমি সেখানে এইজন্যই বসেছি যে, আমার বিশ্বাস স্বরাজের চাবিকাঠি শহরে নেই, তা গ্রামগুলিতেই আছে। আমি যখন গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারব তখন আমি আপনাদের জন্য এবং সমগ্র ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন করব। গ্রামবাসীদের অবস্থা আপনাদের মত শহরবাসীদের চেয়েও খারাপ। আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয, হাসপাতাল এবং অন্যান্য সুবিধা আছে। তাদের কিছুই নেই। এমন কি তারা নিজেদের দুর্দশাও বুঝতে পারে না। আর প্রায একই অবস্থায় তারা বহুদিন ধরে রয়েছে। সুতরাং আমি যদি তাদের উদ্ধারের কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারি তবে স্বরাজের চাবিকাঠিও জানা হয়ে যাবে। তাদের মুক্তি আপনাদেরও মুক্তি।

হরিজন, ৭-১১-৩৬

একটি মহান পরীক্ষা

আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ অধুনা একটি মহৎ পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। এটি সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের কাছে খুবই আকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে সিদ্ধ হবে। এই পরীক্ষাটির সারবস্তু হল যে, শ্রমিক সংঘের সদস্যদের তাদের প্রধান বৃত্তি ছাড়াও কোন

অতিরিক্ত বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া। তাহলে কারখানায় লক আউট বা ধর্মঘট অথবা কর্মচ্যুতির সময় তাদের অনশনের সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হবে না এবং জীবিকার জন্য সব সময়েই কোন না কোন সাধন তাদের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। কারখানা-শ্রমিকের জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা নিঃসন্দেহে এর এক প্রতিকার এবং তা অবহেলা করলে অপরাধ করা হবে। কিন্তু এইভাবে যে সঞ্চয় তাও খুব বেশি সাহায্যকারী হয় না, কেন না আমাদের কারখানা-শ্রমিকদের অধিকাংশকে নিছক জীবনধারণের জন্যই সর্বদা সংগ্রাম করতে হয়। অধিকন্তু, ধর্মঘট বা বেকারীর সময় কোন কর্মক্ষম লোকের কিছুতেই অলসভাবে বসে থাকা চলবে না। চরিত্র ও স্বাভিমানের পক্ষে বাধ্যতামূলক অলসতার মত ক্ষতিকর আর কিছু নেই। শ্রমিকরা যতক্ষণ না তাদের জীবনধারণের জন্য সঙ্কটের সময় গাণ্ডীবে দ্বিতীয় জ্যা যুক্ত করার মত কোন অব্যর্থ বিকল্প সাধনের বলে বলীয়ান হচ্ছে ততক্ষণ শ্রমিক শ্রেণী কখনই নিঃশঙ্ক হবে না বা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তির বোধ বিকশিত হবে না।

১৯১৮ সালে যখন আমেদাবাদের কারখানা-শ্রমিকরা একুশ দিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘট করে তখন সর্বপ্রথম আমার মাথায় শ্রমিকদের সহায়ক বৃত্তির কল্পনা আসে। আমার তখন মনে হয়েছিল যে, ধর্মঘটকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করতে হয় তবে শ্রমিকদের এমন এক বৃত্তি থাকা চাই যার দ্বারা তাদের পূর্ণ বা আংশিক নির্বাহ হবে। দানের উপর তাদের নির্ভর করা উচিত নয়। ধর্মঘটের সময় তাদের অনেকেই অনিপুণ কাজে যুক্ত হয়েছিল। সেই সময়ে শ্রমিকদের কোন সহায়ক বৃত্তি শেখাবার প্রস্তাব আমি উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী ধর্মঘট না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রস্তাব অলক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল। পরে এই বিষয়ের এক রকম প্রারম্ভ করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বৃত্তি শেখাবার জন্য হঠাৎ একটি কার্যকরী সংগঠন স্থাপন করা কঠিন ছিল। দ্বিতীয় ধর্মঘট অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বৃত্তির অন্বেষণ এবং তা শেখাবার প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়ে যায়।

এখন শ্রমিক সংঘের তরফ থেকে সেইদিকে সুসংগঠিত ও সুব্যবস্থিত প্রযত্ন করা হচ্ছে। কারখানার শ্রমিকদের এমন বৃত্তি বেছে নিতে শেখানো হচ্ছে যা তারা অবসর সময়ে ঘরে বসে অভ্যাস করতে পারবে এবং যা বেকারীর সময় তাদের প্রকৃত সাহায্য প্রদান করবে। এই বৃত্তিগুলি হল—তুলা ছাড়ানো, পরিষ্কার করা, ধোনাই, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, সেলাই, সাবান ও কাগজ তৈরী, কম্পোজিং প্রভৃতি।

আমার মতে, পুঁজিপতির কাছে তার মুদ্রাও যা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বিবিধ বৃত্তি সম্পর্কে কাজ চালাবার মত জ্ঞানও ঠিক তেমনি। শ্রমিকদের দক্ষতাই হল তার পুঁজি। পুঁজিপতি যেমন শ্রমিকদের সহায়তা ছাড়া তাঁর পুঁজিকে ফলপ্রসূ করতে পারে না তেমনি শ্রমিকরাও পুঁজির সহায়তা ছাড়া শ্রমকে সফল করতে পারে না। আর যদি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভগবানদত্ত বুদ্ধির সমভাবে বিকাশ হয়ে থাকে এবং পরস্পরের কাছে ন্যায়প্রাপ্তি সম্পর্কে আপন যোগ্যতার উপর উভয়ের আস্থা থাকে তবে তারা একই সাহস অবলম্বনের দ্বারা একে অপরকে সমান অংশীদার মনে করে পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও কদর করবে। তাদের পরস্পরকে জন্মগত মিলনের অসম্ভব প্রতিপক্ষ বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অসুবিধা হল যে, আজ যেমন পুঁজিপতিরা সংঘবদ্ধ এবং নিশ্চিতরূপে সুরক্ষিত বলে দেখা যায়, শ্রমিকরা তেমন নয়। শ্রমিকদের বুদ্ধি তাদের নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক বৃত্তির ফলে কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং তারা তাদের মস্তিষ্ককে বিকশিত করার জন্য খুব কমই সুযোগ বা অবকাশ পায়। এর ফলে তারা নিজেদের শক্তি ও সম্পূর্ণ পদমর্যাদাও বুঝতে পারেনি। তাদের এতদিন শেখানো হয়েছে যে, তাদের বেতনের শর্ত তারা দাবি করবে না, পুঁজিপতিরাই তা নির্ধারণ করে দেবে। কিন্তু তাদের প্রকৃত উপায়ে সংগঠিত হতে হবে, তাদের বুদ্ধিকে তীব্র করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি শিখে নিতে হবে। আর তখন তারা মাথা উঁচু করে যেতে পারবে এবং জীবিকার সাধনের অভাবে ভীত থাকবে না।

শ্রমিকদের জঘন্যতম কুসংস্কার হল এই কথা ভাবা যে, তারা মালিকদের সামনে অসহায়। শুদ্ধভাবে এই কুসংস্কার দূর করাই আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘের কাজ। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সংঘের ঐ প্রচেষ্টাকে স্বাগত করা উচিত। এর সাফল্য শ্রমিক সংঘের এই নমনীয় সংকল্পের উপরই নির্ভর করবে যে, যে শুভ প্রারম্ভ হয়েছে অটুট ধৈর্যের সঙ্গে তাঁরা তার অনুসরণ করবেন। সংঘের ঠিকমত শিক্ষক থাকা চাই যাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে তাঁদের কাজের প্রতি সজ্ঞান আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবেন। কেবল যান্ত্রিকভাবে কোন হাতের কাজ করলেও ঠিক তেমনি মন ও আত্মা কুণ্ঠিত হয় যতটা অন্য কাজ যান্ত্রিকভাবে করলে হয়ে থাকে। বুদ্ধিহীন প্রচেষ্টা মৃতদেহের মতই নিষ্প্রাণ।

হরিজন, ৩-৭-৩৭

আমেদাবাদের কারখানা শিল্প

মিল-মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-হ্রাসের দাবি করায় আমেদাবাদের কারখানা-শিল্পে যে বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল তা যখন এখন অতিক্রান্ত হয়েছে তখন তার স্থায়িত্বের শর্তগুলি পরীক্ষা করে নিলে ভাল হয়। মধ্যস্থ স্যার গোবিন্দ রাও মডগভ্‌কর তাঁর সপ্রেম পরিশ্রমের জন্য উভয় পক্ষেরই ধন্যবাদের পাত্র। তিনি তাঁর রায়ের যুক্তি দিয়েছেন এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের পথ প্রদর্শনের উপযুক্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আশা করা যায় যে, উভয় পক্ষই মধ্যস্থর পরামর্শকে আন্তরিকভাবে মান্য করবেন এবং দিল্লী চুক্তিকে সফল করে তুলবেন।…ঐ চুক্তির প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হল এই যে, সমস্ত কারখানা শিল্পের জন্য বেতন নির্দিষ্ট করা থাকবে এবং এমন এক ব্যবস্থা থাকবে যাতে যখনই বেতনের হ্রাস বা বৃদ্ধির দাবি করা হবে তখনই সেই ব্যবস্থার দ্বারা সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে। মিল-মালিকদের তরফ থেকে এই যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে যে, বেতন নির্দিষ্ট করা এবং হ্রাস ও বৃদ্ধির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এমন ব্যবস্থা করা যাতে সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে যায়—এই প্রস্তাব দুটিই অব্যবহারিক। মধ্যস্থ এই যুক্তি অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না। দুটি পক্ষ নিশ্চয়ই জানতেন যে, দিল্লী চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সময় তাঁরা কী করেছেন। অব্যবহারিক মনে হলে তাঁরা কিছুতেই এই শর্ত দুটিকে সন্নিবিষ্ট করতেন না। হতে পারে যে, পক্ষ দুটি একটি সাধারণ ব্যবস্থায় রাজী হতে পারছেন না। তখন তাঁদের কাজ হল যে, মধ্যস্থদের কাছে তাঁদের মতভেদ উপস্থিত করা আর মধ্যস্থরা যদি না পারেন তবে কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মীমাংসার জন্য অগ্রসর হওয়া। বেতন নির্দিষ্ট করা একটি যান্ত্রিক অথবা গাণিতিক প্রস্তাব। সমস্ত কারখানাকে বেতনের একটি সমান স্তর গ্রহণ করতে রাজী করানোর আগে অথবা শ্রমিকদের সেই স্তরে, যাতে সর্বসাকুল্যে সমান থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বেতন যে যথেষ্ট কমে যাবে তাতে স্বীকৃত করতে পারার আগে একটি মধ্যবর্তী অবস্থার প্রয়োজন হবে। কিন্তু বেতনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য স্বতঃক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি জটিল ব্যাপার। এর চরিতার্থতার জন্য উভয়পক্ষের গ্রহণ ও বর্জনের মনোভাব থাকা প্রয়োজন। আর, এর

প্রকৃতিই এমন যে, এই ধরনের যে-কোন ব্যবস্থাই কেবল সাময়িক হবে এবং তাতে মাঝে মাঝে পরিবর্তন হতে থাকবে।

আমার রায়ে যে-তত্ত্বের উল্লেখ আমি করেছিলাম এবং যেটিকে স্যার গোবিন্দও রাও আদর্শবাদী বলে বাতিল করে দিয়েছেন তার আশ্রয় ছাড়া এই রকম কোন ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। অবশ্য মধ্যস্থ হিসাবে আমার এই তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করা অথবা তার উল্লেখ করাও তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ ছিল না। আমি নিজেই আমার রায়ে বলেছি যে, এই তত্ত্বগুলির অবলম্বনে আমার সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়নি। কিন্তু প্রাজ্ঞ মধ্যস্থ যখন উল্লেখ করেছেনই তখন তিনি দেখাতে পারতেন যে কিভাবে এবং কেন সেগুলি আদর্শবাদী।

আমি দেখাতে চাই যে, সেগুলি আদর্শবাদী হোক আর নাই হোক তাদের আশ্রয় ছাড়া সামঞ্জস্য বিধানের কোন সন্তোষজনক স্বতঃক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা অসম্ভব। ঐগুলি আমাদের কাজের মানদণ্ড হওয়া উচিত। আমাদের কাজ তা থেকে কম হতে পারে আর হয়ত তা হবেও। আমি এখানে মূল গুজরাটীর অনুবাদ তুলে দিচ্ছি :

> ১৬। এই অবকাশে আমি সেই নীতিগুলিরই পুনরুল্লেখ করতে চাই যা উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য তাঁদের সামনে আমি উপস্থিত করেছি। এগুলি গত ১৮ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে মধ্যস্থরূপে আমার যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ রয়েছে তারই পরিণাম।
>
> (ক) যতক্ষণ না কারখানাগুলির মুনাফা একেবারে বন্ধ হচ্ছে এবং শিল্প চালু রাখবার জন্য পুঁজিতে হাত দিতে হচ্ছে ততক্ষণ কোন রকম বেতন হ্রাস করা উচিত নয়।
>
> (খ) যতক্ষণ না বেতন নির্বাহযোগ্য স্তরে পৌছায় ততক্ষণ কোন রকম বেতন হ্রাস করা উচিত নয়। এমন সময়ের কল্পনা করা যেতে পারে যখন শ্রমিকরা শিল্পকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করবে। তখন তারা শুকনো রুটির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে এবং রাত-দিন পরিশ্রম করে শিল্পের সঙ্কট-মুক্তির জন্য সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। সেই ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হবে। বর্তমানে সেই বিষয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক।
>
> (গ) নির্বাহযোগ্য বেতন নির্ণয়ে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকবে।

(ঘ) কয়েকটি শিল্পের অবস্থার অবনতি শ্রমিকদের সাধারণভাবে বেতন হ্রাসের স্বপক্ষে যুক্তি হতে পারে না।

(ঙ) শিল্পের উৎকর্ষের জন্য খুবই প্রয়োজন হল এই যে, শ্রমিকদের অংশীদারদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতে হবে। আর সেজন্য কারখানার লেনদেন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকার অধিকার তাদের আছে।

(চ) প্রাপ্তব্য সমস্ত শ্রমিকদের এমন একটি তালিকা থাকা উচিত যেটিকে উভয় পক্ষই স্বীকার করবে। এবং বস্ত্র-শ্রমিক সংঘ ছাড়া অন্য কোন এজেন্সির মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

১৭। আমি এমন কোন ভরসা নিয়ে এই নীতিগুলি উপস্থিত করিনি যে, আমার সহকর্মী মধ্যস্থরা অথবা মিল-মালিক অথবা শ্রমিকরা তা স্বীকার করবেন। বর্তমান ক্ষেত্রে এগুলি সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে নির্দেশ করেনি। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এই নীতিগুলি গ্রহণ না করলে শিল্প অর্থাৎ মালিক এবং শ্রমিক উভয়েই বিপদগ্রস্ত হবে।

এখন প্রথম তত্ত্বটিকে নিন। কারখানায় যতক্ষণ লাভ হতে থাকবে ততক্ষণ বেতন হ্রাসের ইচ্ছা তাদের কেন হওয়া উচিত? এ যেন সেই কারও পেটের গোলমাল দূর করার জন্য তার পদযুগল কেটে ফেলার আগ্রহ। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ তোলার জন্য মালিকরা কি কোন কোন মেশিন বাদ দেবেন? স্ত্রী ও পুরুষ, যাদের প্রাণবান যন্ত্র বলা যেতে পারে তারা কি জড় মেশিনগুলির চেয়ে কম, ন্যূনতম লাভ তোলার জন্য শ্রমিকদের, যারা অন্ততঃ যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ির মতও শিল্পের বুনিয়াদ, তাদের বেতন হ্রাস করা হবে না, এই পরামর্শের মধ্যে খুব বেশী আদর্শবাদিতা কি কিছু ছিল? আমি সাহস করে বলতে পারি যে, যদি সহৃদয় অংশীদারদের,—আর কারখানার অংশীদারদের আমি হৃদয়বান বলেই মনে করি,—মত নেওয়া হয় তবে তাঁরা, যাদের উপর তাঁদের মুনাফা নির্ভর করে সেই শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করে নিজেদের লাভ তুলতেই বেশি পছন্দ করেন, এই প্রস্তাবকে সোজাসুজি বাতিল করে দেবেন।

আর যদি প্রথম তত্ত্বটিকে অন্ততঃ গভীরভাবে বিচার করা হয় তবে নির্বাহ-যোগ্য বেতনের দ্বিতীয় তত্ত্বটি তা থেকেই এসে যায়। লাভ একেবারেই হচ্ছে না, এই রকম অবস্থার আগে যদি বেতন হ্রাস করা না যায় তবে যে সীমার পরে আর বেতন হ্রাস করা যাবে না তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অন্য ভাষায়,

নির্বাহযোগ্য বেতনে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। নামের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যদি ভাল শোনায় তবে একে ন্যূনতম বেতনও বলতে পারেন। পদ্ধতি সেই একই। যে বেতনের কোন রকম হ্রাস করা যায় না তার সব চেয়ে ভাল নাম হল নির্বাহযোগ্য বেতন।

আর নির্বাহযোগ্য বেতনের স্বীকৃতির মধ্যেই তার মধ্যে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সেই বিষয়গুলিও এসে যায়। নেশা কি তার অঙ্গ, তামাক কি এর মধ্যে ধরা আছে, দুধ, ঘি বা গুড় কি তা থেকে বাদ যেতে পারে? এগুলি কোন কাল্পনিক জিনিস নয়। শ্রমিকদের জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গেই এগুলির সম্পর্ক। ঠিকমত জীবনযাত্রার উপর শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা খুব বেশি নির্ভর করে। আর দক্ষতা যত বাডবে লাভের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে।

তত্ত্ব (ঘ)-টি স্বয়ংসিদ্ধ আর মধ্যস্থরা এবং সালিশীর নেতাও এটিকে স্বীকার করেছেন।

শ্রমিকদেরও অংশীদারদের মত মালিক মনে করা উচিত, এই কথার (তত্ত্ব গ) ঔচিত্য কে অস্বীকার করতে পারে? যদি পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের সংঘর্ষকে পরিহার করতে হয়—আর আমি বিশ্বাস করি যে, তা করা যায় এবং করা উচিত—তবে শ্রমিকদেরও পুঁজিপতিদের মত পদ ও মর্যাদা থাকা কর্তব্য। দশ লক্ষ টাকা একত্র করলে তার মূল্য দশ লক্ষ পুরুষ বা স্ত্রীর সামূহিক মূল্যের চেয়ে কেন বেশি হওয়া উচিত? তারা কি রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা—যেগুলি ধাতুমাত্র, তার চেয়ে অসংখ্য গুণে বেশি মূল্যবান নয়? অথবা ধাতুর মালিকদের কি সর্বদা এই রকম ধরে নেওয়া উচিত হবে যে, শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারে না এবং ধাতুগুলিকে যেমন পারা যায় তেমনি ভাবে তাদের এক করা যায় না? গত আঠার বছর ধরে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক, সচেতন ভাবেই হোক আর অজ্ঞানবশতই হোক আমেদাবাদে এই ধারণা নিয়েই কাজ করেছেন যে, তাঁদের উভয়েরই মধ্যে কোন জন্মগত বিরোধ নেই। একথা সত্য যে, তাঁদের সন্ধি এক অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু তা এই জন্যই হয়েছিল যে উভয় পক্ষই স্থায়ী শান্তির শর্ত হিসাবে এই তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঔচিত্যকে স্বীকার করেননি।

তাহলে শ্রমিকরা যদি অংশীদারদের মতই মালিক হয় তবে কারখানার লেনদেনে তাদের সংগঠনেরও সমান গতায়াত হওয়া উচিত। বাস্তবিক, গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবরগুলি যদি শ্রমিকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়, তবে ব্যবস্থাপকদের প্রতি তাঁদের আস্থা কিভাবে থাকতে পারে?

শেষ তত্ত্বটিকে ছোট করার কোন অবকাশ নেই। শ্রমিক সংঘকে যদি মিল মালিকদের সংঘের মতই একটি বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয় এবং তাকে যদি কেবল একটি প্রয়োজনীয় পাপ মনে না করা হয় তবে উভয় পক্ষের দ্বারা স্বীকৃত প্রাপ্তব্য শ্রমিকদের একটি তালিকাও থাকা উচিত এবং কারখানার মালিকদের শ্রমিক-সংঘের বাইরে থেকে কোন লোককে গ্রহণ বা নিয়োগ করা উচিত নয়।

এইভাবে আমার মনে হয় যে, তত্ত্বগুলি কাল্পনিক নয়। বরং পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই বিরাট শিল্পের স্বচ্ছন্দ অস্তিত্ব অথবা বিকাশের জন্য সেগুলি অত্যাবশ্যক। আর ঐ শিল্পের মঙ্গলের জন্যই আমি এই পরামর্শগুলি দিয়েছি।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপস্থাপিত সূচীটি কোন রকমেই চূড়ান্ত নয়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আমি আবার যখন সক্ষম হব তখন আমি নিশ্চয় আরও পরামর্শ দেব।

হরিজন, ১৩-২-৩৭

অহিংসা একমাত্র উপায়

শ্রমিকদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী একদল ছাত্র আমেদাবাদে শ্রমিক সংগঠন বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করার পর ফেরবার পথে অল্প সময়ের জন্য ওয়ার্ধায় এসেছিলেন। গান্ধীজী আনন্দের সঙ্গেই তাদের সময় দেন এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে কথা বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সার্বজনীন জীবন শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে তিনি শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, সেকথা তিনি তাঁদের বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতি করার জন্য তিনি যখন সেখানে থেকে গেলেন তখনই তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত অবশিষ্ট সময় সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য ব্যয় করবেন। প্রথম যে ব্যক্তিটি তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিল সে হল একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এই মামলার ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রমিকরা মালিকদের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঝগড়াও তাঁর সামনে উপস্থিত করত। এইভাবে তাদের জীবন সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান হয় অন্য কোন রকমেই তা হতে পারত না। তিনি সর্বপ্রথম

অহিংসার কথাই তাদের বলেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক সঙ্কটময় অবস্থায় যখন ৬০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তখন তাদের দ্বারা কেবল অহিংসা অনুসরণের প্রতিজ্ঞাই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট, যন্ত্রণা ও উপবাস সহ্য করতে হয়েছিল, কিছু লোক মারাও গিয়েছিল, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত অহিংসায় অটল ছিল। তাদের অবস্থা ভয়ানক কষ্টকর ছিল এবং এক দিক দিয়ে এখানকার শ্রমিকদের চেয়ে খারাপ ছিল। তারা স্বাধীন ছিল না, চুক্তিবদ্ধ ছিল আর সেজন্য কেবল মালিকদের সঙ্গে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই তাদের লড়াই করতে হয়নি উপরন্তু তিন পাউণ্ডের যে অপমানজনক কর তাদের বিনাশের পথে এগিয়ে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধেও তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু তারা অহিংসার সাহায্যে রক্ষা পেয়েছিল। চম্পারণ ও আমেদাবাদে তাঁর কাজ তো ইদানীংকালের ইতিহাস। চম্পারণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, সেখানকার কৃষকদের অবস্থা প্রায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মতই ছিল। তাদের একত্র করতে অহিংসার মত কোন সংযোগকারী শক্তি না থাকায় তারা তাদের অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলনে বিফল হয়েছিল। সেখানে কতকগুলি দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল এবং বছরের পর বছর তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। কিন্তু অহিংসার প্রথম পরীক্ষাতেই তারা নতুন জীবনের স্পর্শ পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত খুব অল্প সময়ের সংগ্রামে তারা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

অহিংসার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছাড়া শ্রমিকরা অন্তর্দ্বন্দ্বে যুক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের আপন ক্ষমতার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তার বিকাশের জন্য কখনই প্রস্তুত হবে না। সংগঠন, বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং অন্যান্য সব কিছুই অহিংসার মৌলিক নীতি স্বীকার করার পরে আসে। শ্রেণী-সহযোগও তারপর আপনাআপনি এসে যায়। শ্রমিকরা সংখ্যায় বেশি, তবু তারা নিজেদের খুবই পর-নির্ভরশীল, মালিকদের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী মনে করে। তার কারণ হল যে, তারা নিজেদের আভ্যন্তর শক্তির পরিচয় জানে না। তা না হলে, মালিকরা আজ যেমন করে থাকেন তেমনি ভাবে নিজেদের সাধন একত্র করতে এবং আপনাদের শর্ত মানিয়ে নিতে কী বাধা আছে? তাদের এই জিনিসটিই বুঝে নিতে হবে যে, সোনা-রূপার মত শ্রমও এক বড় পুঁজি। সেই জ্ঞান কেবল অহিংসার স্বীকৃতির দ্বারাই আসতে পারে।

কিন্তু সেই জ্ঞান লাভের পর এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে

যাবার পর অহিংসা নিরর্থক হয়ে যায় না। তারা যদি অহিংসাকে বিদায় দিয়ে দেয় তবে তারা পুঁজিপতিদের মতই খারাপ হয়ে যাবে এবং নিজেদের শোষকে পরিণত করবে। তাদের শক্তির জ্ঞান অহিংসা পালনের সঙ্গে যুক্ত হলে তা পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদের সক্ষম করবে এবং পুঁজিকে উচিত ব্যবহারে রূপান্তরিত করবে। তখন আর তারা পুঁজিকে তাদের বিরোধী পক্ষ বলে মনে করবে না। কারখানা আর মেশিনগুলিকে শোষকদের সম্পত্তি এবং তাদের পিষ্ট করবার জিনিস বলেও গণ্য করবে না। এগুলিকে তারা উৎপাদনের জন্য স্বীয় যন্ত্রপাতি বলেই মনে করবে এবং সেজন্য নিজেদের সম্পত্তি তারা যেভাবে রক্ষা করে সেইভাবে এগুলিকেও রক্ষা করবে। তারা সময়ের অপহরণ এবং কাজ কম করবে না, বরং যতদূর সাধ্য বেশি শক্তি দিয়েই কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজি ও শ্রম পরস্পরের অছি হবে এবং উভয়ে সম্মিলিত হয়ে নিজেরা খাদকদের অছিতে পরিণত হবে। অছিবাদের সিদ্ধান্ত একপক্ষীয় নয়, এবং তাতে অছিদের শ্রেষ্ঠমন্যতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আমি যেমন দেখিয়েছি, এটি সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক বিষয় এবং প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই তার কল্যাণ সব চেয়ে ভালভাবে সাধিত হয়। ভগবদ্গীতা বলেন, 'তুমি দেবতাদের প্রসন্ন রাখ তাহলে দেবতারাও তোমাকে প্রসন্ন রাখবেন আর এইভাবে পরস্পরের সন্তুষ্টিবিধানের দ্বারা তুমি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ কর।' পৃথিবীতে দেবতা নামে কোন ভিন্ন জীব নেই, কিন্তু যাদের মধ্যে উৎপাদনের শক্তি আছে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করে যারা সমাজের কাজ করে তারাই হল দেবতা,—শ্রমিকরা পুঁজিপতি অপেক্ষা কোন অংশেই ছোট নয়।

হরিজন, ২৫-৬-৩৮

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত

মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক এলাকায় গান্ধীজী শ্রমিকদের কাছে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি আশা করেন যে শ্রমিকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নেই। তারা সকলেই শ্রমিক। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যদি শ্রমিকদের মধ্যে প্রবেশ করে তবে উভয় পক্ষই শ্রমিকদের শক্তি ক্ষয় করবে। তার ফলে তারা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে দেশেরও ক্ষতি করবে। শ্রমিকরা

বুদ্ধিহীন থাকাই পছন্দ করেছে বলে হয় তারা পুঁজিপতিদের দাস হয়ে পড়ে নয়ত তাদের মালপত্র ও মেশিনগুলিকে, এমন কি পুঁজিপতিদেরও হত্যা করার ধৃষ্টতাকে বাহাদুরি বলে মনে করে। তিনি নিজেকে শ্রমিক ও ভাঙ্গি বলেই মনে করেন। সেজন্য তাঁর স্বার্থ শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তাই তিনি তাদের এই কথাই বলতে চান যে, হিংসা তাদের কখনই রক্ষা করতে পারবে না।

তিনি যে কথা বহু বছর ধরে বলে আসছেন তা হল এই যে, শ্রম পুঁজি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রম ছাড়া সোনা, রূপা ও তামা অপ্রয়োজনীয় ভার মাত্র। মুদ্রা ব্যতীত শ্রমের কল্পনা তিনি বেশ ভালভাবেই করতে পারেন। শ্রমই অমূল্য, সোনা নয়। তিনি চান পুঁজি ও শ্রমের পরিণয়। সহযোগিতার দ্বারা তারা বহু আশ্চর্য কাজ করতে পারে। কিন্তু তা তখনই হতে পারে যখন শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যেই সহযোগ স্থাপন করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান হবে এবং সম্মানীয় সাম্যের শর্তে পুঁজিপতিদের সহযোগিতা প্রদান করবে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ এইজন্যই করেন যে, তাঁরা সম্মিলিত হবার কথা জানেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন জলবিন্দু বাতাসে মিলিয়ে যায়; সেই জলবিন্দুই যখন পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয় তখন তা থেকে সমুদ্র সৃষ্টি হয়—যার বিশাল বক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোত বিচরণ করে। সেই রকম পৃথিবীর কোন অংশে যদি শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয় তবে তাদের উচ্চ বেতনে প্রলোভিত করতে পারা যাবে না অথবা তারাও অসহায় অবস্থায় সামান্য বেতনের প্রতি নিজেদের আকৃষ্ট হতে দেবে না। শ্রমিকদের প্রকৃত তথা অহিংসার ভিত্তিতে সংগঠন চুম্বকের মত কাজ করবে এবং কারখানা চালাবার মত প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগৃহীত করতে পারবে। তখন পুঁজিপতিরা কেবল অছি হিসাবেই থাকবেন। যখন এই শুভদিনের আবির্ভাব হবে তখন পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। তখন শ্রমিকরা পর্যাপ্ত খাদ্য, সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর, সন্তানদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, নিজেদের অধ্যয়নের জন্য প্রচুর অবকাশ এবং উপযুক্ত চিকিৎসার সহায়তা লাভ করবে।

হরিজন, ৭-৯-৪৭

গরজ কার

চাকর রাখার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু চাকরদের সঙ্গে মনিবের ব্যবহারে বিভিন্ন সময়ে তারতম্য ঘটেছে। কেউ কেউ চাকরদের পরিবারের লোক বলেই মনে করে, আবার কেউ কেউ তাদের দাস বা সম্পত্তি বলে মনে করে। এই দুই অন্তিম দৃষ্টিভঙ্গির মাঝামাঝি অবস্থায় চাকরদের প্রতি সমাজের সাধারণ মনোভাবটি নিরূপণ করা যেতে পারে। আজকাল সর্বত্রই চাকরদের প্রয়োজন বেড়েছে। তারা নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে আর সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা বেতন ও কাজ সম্পর্কে নিজেদের শর্ত উত্থাপন করে। তাদের পক্ষে এই রকম করা তখনই উচিত হবে যখন নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান হবে এবং দৃঢ়ভাবে তারা তা পালন করবে। তখন আর তারা চাকর থাকবে না, পরিবারের লোকেদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নেবে। কিন্তু হিংসায় কাজ হয়, এই বিশ্বাস আজকাল সর্বত্রই রয়েছে। তাহলে চাকররা মনিবদের পরিবারের মধ্যে নিজেদের স্থান কি করে করবে, এই প্রশ্ন করা যেতে পারে।

আমার বিশ্বাস যে লোক সহযোগিতা চায় এবং নিজেও অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তার চাকরের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। চাকরের অনটনের সময় যদি কাউকে চাকর রাখতেই হয় তবে তাকে চাকর যে বেতন চাইবে তাই দিতে হবে এবং তার অন্যান্য শর্তও স্বীকার করে নিতে হবে। তার ফলে, সে আর মনিব না হয়ে চাকরের চাকর হয়ে যাবে। মনিব বা চাকর, কারুর পক্ষেই এটা ভাল নয়। কিন্তু অপরের কাছ থেকে দাসত্ব কামনা না করে কেউ যদি সঙ্গী-সাথীর কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করে তবে সে যে কেবল নিজেরই সেবা করে তা নয়, উপরন্তু যার কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে সে তারও সেবা করে। এই নীতির বিস্তারের দ্বারা মানুষের সাংসারিক গণ্ডি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে আর মানুষ পরস্পরের প্রতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' রূপে ব্যবহার করবে। ঈপ্সিত ফললাভের এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

যিনি এই নীতির প্রয়োগ করতে চান তাঁকে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আরম্ভ করতে হবে এবং তাতে সন্তুষ্টও থাকতে হবে। হাজার হাজার লোকের সহযোগিতা লাভের যোগ্যতা থাকলেও তাঁর মধ্যে একাকী দাঁড়াবার মত পর্যাপ্ত

সংযম ও স্বাভিমান থাকা উচিত। এই রকম মানুষ স্বপ্নেও কোন লোককে তাঁর দাস মনে করবেন না এবং তাকে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একেবারে ভুলেই যাবেন যে, তিনি তাঁর চাকরদের মনিব। তিনি তাদের নিজেদের স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা করবেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, যে জিনিস অন্য লোক পেতে পারে না তা বাদ দিয়েই সন্তুষ্ট মনে তাঁর কাজ চালিয়ে নেওয়া উচিত।

পুনা, ১-৩-৪৬ ; হরিজন, ১০-৩-৪৬

চৌর্য

প্রশ্ন—চুরি যদি কোন কর্মচারীর জন্মগত অভ্যাস হয়ে যায় এবং অনুনয় বা সাজা দিয়েও যদি তার অভ্যাস দূর করা না যায় তবে মালিক কী করবেন ?

—এমনও তো হতে পারে যে, অন্য লোকেদেরও এই বদ অভ্যাস আছে তবে তারা ধরা পড়ে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমরা সকলেই চোর। তফাৎ এই যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের দোষ সহ্য করি। কিন্তু যারা একটু বেশি চোর এবং ধরা পড়ে তাদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি। যে মানুষ জিনিস বিক্রি করতে বসে যত বেশি সম্ভব চড়া দাম হেঁকে বসে সে চোর নয়ত আর কি ? যদি উত্তর হয় যে এখানে ক্রেতা তো স্বেচ্ছা-প্রতারিত, তবে তাতে প্রশ্নকে এড়ানো হবে। প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা অসহায় বলেই ঠকে, ইচ্ছা করে ঠকে না। যে চুরির উল্লেখ করা হল তা সমাজের ভিতরে যে ব্যাধি দৃঢ়মূল হয়ে আছে তারই লক্ষণ। মুষ্টিমেয় ধনবান ও অসংখ্য নির্ধনের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ আছে, এ তারই প্রকাশ। কাজেই মালিকদের আমি এই পরামর্শ দিতে পারি যে, এই রকম লোকদের সামনে থেকে সমস্ত প্রলোভন তাঁরা সরিয়ে নেবেন, তাদের সঙ্গে নিজেদের ভাই-এর মতই ব্যবহার করবেন, আর যদি সদয় ব্যবহারেও তাদের কোন সংশোধন না হয় তবে তাদের পথ দেখে নিতে বলবেন। মালিকদের সর্বদা এই কথাই ভাবা উচিত যে, তাঁদের ভাই এই রকম কাজ করলে তার সঙ্গেও তিনি এই ব্যবহার করতেন কিনা।

পঞ্চগনী, ১৪-৭-৪৬ , হরিজন, ২১-৭-৪৬

সপ্তম প্রকরণ ঃ ধর্মঘট

ধর্মঘট

আজকাল ধর্মঘটের এক রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। ঐগুলি বর্তমান অসন্তোষের লক্ষণ। সব রকমের অস্পষ্ট ধারণা হাওয়ায় ভাসছে। একটি অনিশ্চিত আশা সকলকে অনুপ্রেরিত করছে আর তা যদি এক নির্দিষ্ট রূপ ধারণ না করে তবে লোকেদের মধ্যে বিরাট নৈরাশ্য দেখা দেবে। অন্য দেশের মত ভারতবর্ষের শ্রমিকরাও এমন লোকেদের দয়ার উপর নির্ভর করে যাঁরা নিজেরাই উপদেষ্টা আর পথ-প্রদর্শক বনে যান। এই লোকেরা সব সময় নীতিনিষ্ঠ হন না, আর হলেও সব সময় বুদ্ধিমান হন না। শ্রমিকদের মধ্যে তাদের নিজেদের অবস্থার জন্য অসন্তোষ আছে। তাদের অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের শেখানো হচ্ছে, আর তা ঠিকই যে, মালিকদের ধনবান করবার জন্য তারা যেন নিজেদের মুখ্য সাধন বলে মনে করে। সুতরাং তাদের যন্ত্রপাতি ত্যাগ করে কাজ না করার জন্য প্ররোচিত করতে খুব অল্প চেষ্টার দরকার হয়। রাজনৈতিক অবস্থাও ভারতবর্ষের শ্রমিকদের প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছে। আর এমন শ্রমিক নেতারও অভাব নেই যাঁরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মঘট করা চলতে পারে।

আমার মতে এই রকম উদ্দেশ্যের জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কাজে লাগালে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ভুল করা হবে। আমি এ কথা অস্বীকার করি না যে, এই রকম ধর্মঘটের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু অহিংস অসহ-যোগের পরিকল্পনায় তা আসে না। যতক্ষণ না শ্রমিকরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সকলের সাধারণ কল্যাণের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত হচ্ছে তার আগে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যে খুব বিপজ্জনক, এই কথা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এই জিনিস তাদের কাছে হঠাৎ আশা করা যায় না। তারা যতক্ষণ না নিজেদের অবস্থার এমন উন্নতি করছে যাতে দেহ ও মনকে তারা সুরুচিসম্পন্নভাবে নির্বাহ করতে সক্ষম হয় ততক্ষণ তাদের কাছে এই আশা করা যেতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকরা, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে, নিজেদের আরও বিদিত করে, নিজেদের অধিকারের প্রতি জিদ রেখে এবং এমন কি যে মাল উৎপাদনে তাদেরও এক প্রয়োজনীয় অংশ আছে তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য মালিকদের কাছে

দাবি করে তারা শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আনুকূল্য দেখাতে পারে। বস্তুত শ্রমিকদের প্রকৃত অভিব্যক্তি তখনই হবে যখন তারা আংশিক মালিকের পদে নিজেদের উন্নীত করতে পারবে। অতএব, বর্তমানে কেবল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যই ধর্মঘট হওয়া উচিত। আর যখন তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বৃত্তির উন্মেষ হবে, তখন তাদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিসের মূল্য নির্ধারণের জন্যও ধর্মঘট করা হবে।

সকল ধর্মঘটের নিয়মগুলি সাধারণ এবং সেগুলি পালিত হলে ধর্মঘট ব্যর্থ হবার কোন কারণ থাকে না :

(১) ধর্মঘটের কারণ ন্যায্য হওয়া উচিত।

(২) ধর্মঘটীদের মধ্যে ব্যবহারিক একমত থাকা উচিত।

(৩) যারা ধর্মঘট করবে না তাদের বিরুদ্ধে কোন হিংসার কাজ করা উচিত নয়।

(৪) ধর্মঘট চলার সময় ইউনিয়নের টাকার আশ্রয় ছাড়াই ধর্মঘটীদের নিজেদের জীবন নির্বাহ করার শক্তি থাকা উচিত। আর সেজন্য তাদের কোন প্রয়োজনীয় ও উৎপাদক অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত।

(৫) যেখানে ধর্মঘটীদের স্থান পূরণ করার জন্য অন্য শ্রমিক যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে সেখানে ধর্মঘট মোটেই প্রতিকার ব্যবস্থা নয়। সেক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার অথবা অপ্রচুর বেতন অথবা এই রকম অন্য কোন বিষয়ের প্রতিকারকল্পে পদত্যাগই একমাত্র উপায়।

(৬) উপরের নিয়মগুলি পালিত না হলেও কখনো কখনো ধর্মঘট সফল হয়েছে। কিন্তু তাতে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সেক্ষেত্রে মালিকরা দুর্বল ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের অপরাধবোধ ছিল। আমরা প্রায়ই খারাপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে ভীষণ ভুল করে থাকি। যে বিষয়ে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান প্রায় থাকে না তার অনুকরণ না করে যে নিয়মগুলি আমাদের জানা আছে এবং যেগুলিকে সাফল্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি সেইগুলিকে অনুসরণ করাই সব চেয়ে বেশি নিরাপদ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-২-২১

ধর্মঘট সম্পর্কে

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এবং স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘট দুটি মামুলী ধর্মঘট নয়। আমি যতদূর জানি, শ্রমিক সংঘের বাইরের লোকেদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করার এই দুটিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। সুতরাং ধর্মঘট দুটি হয় সহানুভূতিপূর্ণ দয়াভাব-প্রেরিত অথবা রাজনৈতিক ছিল। সমগ্র রেলপথেই, বিশেষ করে গৌহাটী, চট্টগ্রাম ও বরিশালে ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, লোকেরা তাদের কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ধর্মঘটে লিপ্ত হয়ে যাবার পর তারা তার পরিণাম ভোগ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে হলে তিনি কী করতেন, এই কথা কোন বাইরের লোকের পক্ষে বলা সর্বদাই বিপজ্জনক ও অনুদার। কিন্তু মতের জন্য যদি কেউ পীড়াপীড়ি করে তবে আমি বলব যে, শ্রমিকরা কোন পরোপকারী ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমার মতে ভারতবর্ষের শ্রমিক এবং কারিগররা এখনও সহানুভূতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত কোন ধর্মঘটকে সফল করতে যে পরিমাণ জাতীয় সচেতনতার প্রয়োজন তা লাভ করেনি। তার দোষ আমাদের। আমরা যারা জাতির সেবার আগ্রহ রাখি তারা এযাবৎ এই শ্রেণীর লোকেদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার অধ্যয়ন করিনি এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার কষ্টও করিনি। আমরা এতদিন এই বিশ্বাসই করে এসেছি যে, যারা হাই স্কুল আর কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে কেবল তারাই দেশের কাজ করার যোগ্য। সুতরাং শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর কাছ থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া হঠাৎ অন্যের স্বার্থ অনুভব করা এবং তার জন্য আত্মত্যাগ করার প্রত্যাশা করা যথোচিত হবে না। আমরা যেন তাদের রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার না করি। শ্রমিক ও কারিগরদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়ে তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের ন্যায্য অভিযোগগুলি নিজেরাই যাতে পূরণ করে নিতে পারে, সেই অবস্থায় তাদের উন্নীত করে আমরা তাদের শ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারি আর সেইভাবে তাদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সেবাও আমরা লাভ করতে পারি। আর তখনই তারা রাজনৈতিক, জাতীয় অথবা মানবীয় সেবার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, তার আগে নয়।

সুতরাং নিজেরা যোগ্য হবার আগেই কোন সহানুভূতিপূর্ণ ধর্মঘটে যোগদান করলে তার ফলে আমাদের কাজে অনন্ত ক্ষতি হবে। অহিংসার কর্মসূচীতে সরকারকে বাধ্য করে কিছু লাভ করার মতলব আমাদের সোজাসুজি ত্যাগ করা উচিত। আমাদের কাজ যদি শুদ্ধ হয় আর সরকারের কাজ অসাধু, তবে সরকার নিজে থেকেই শুদ্ধ না হয়ে গেলে আমাদের শুদ্ধতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, কোন বিনাশের আন্দোলনে বিনাশকারী অশুদ্ধ থেকে যায় এবং যাকে সে বিনাশ করতে চায় নিজে তার স্তরে নেমে আসে।

এইজন্য, এমন কি আমাদের সহানুভূতিপূর্ণ ধর্মঘটগুলির উদ্দেশ্যও আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ অসহযোগ হওয়া উচিত। আর তাই, কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যখন আমরা ধর্মঘট ঘোষণা করি তখন বাস্তবে সেই অন্যায়ে অংশ নেওয়া আমরা বন্ধ করে দিই আর সেইভাবে অন্যায়কারীকে তার নিজের সাধনেই ছেড়ে দিই; অন্য ভাষায়, অন্যায়কারীকে অন্যায় করতে থাকার নির্বুদ্ধিতা বুঝতে সক্ষম করে দিই। এই রকম ধর্মঘট তখনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে যখন এর পিছনে কাজে প্রত্যাবর্তন না করার দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে।

সুতরাং বড় বড় সফল ধর্মঘট পরিচালনা করেছে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির পুনরাবৃত্তি করছি। ধর্মঘটী নেতাদের পথ প্রদর্শনের জন্য এর আগেও এই কথাগুলি বলা হয়েছে :

(১) অভিযোগ না থাকলে ধর্মঘট করা উচিত নয়।

(২) সম্বন্ধিত লোকেরা তাদের সঞ্চয় থেকে অথবা তুলা ধোনা, সুতা কাটা এবং তাঁত বোনার মত কোন অস্থায়ী কাজে যুক্ত হয়ে নিজেদের নির্বাহ করতে সক্ষম না হলে ধর্মঘট করা উচিত নয়। ধর্মঘটীদের কখনই সার্বজনীন চাঁদা বা অন্য দানের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

(৩) ধর্মঘটীরা একটি অপরিবর্তনীয় স্বল্পতম দাবি নিশ্চয় করবে এবং ধর্মঘট শুরু হবার আগেই তা ঘোষণা করে দেবে।

দাবি ন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও এবং অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চালিয়ে যাবার যোগ্যতা ধর্মঘটীদের থাকলেও তা ব্যর্থ হতে পারে যদি সেখানে ধর্মঘটীদের স্থানাধিকার করার জন্য অন্য শ্রমিক থাকে। সেইজন্য কোন বুদ্ধিমান লোক যদি বোঝে যে, তার স্থান অধিকৃত হয়ে যেতে পারে তবে বেতন বৃদ্ধি বা অন্য সুখ বিধানের জন্য ধর্মঘট করবে না। কিন্তু যখন কোন পরোপকারী বা দেশভক্ত লোক

প্রতিবেশীর দুঃখে সহানুভূতিশীল হবে এবং তার দুঃখের ভাগী হতে ইচ্ছা করবে তখন সে তার স্থানাধিকার করার মত লোক প্রয়োজনাতিরিক্ত থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘট করবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরে বর্ণিত সবিনয় ধর্মঘটে ভীতি প্রদর্শন, অগ্নি সংযোগ বা অন্য কোন রকমের হিংসার অবকাশ নেই। সুতরাং যদি দেখি যে, ধর্মঘটীদের একজনের অপকীর্তির জন্যই চট্টগ্রামের কাছে সাম্প্রতিক রেলগাড়ীর লাইনচ্যুতি হয়েছিল তবে আমি নিতান্ত দুঃখিত হব। আমি যে পরীক্ষাগুলির পরামর্শ দিয়েছি সেইগুলি দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, ধর্মঘটীদের বন্ধুরা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য, কংগ্রেসের অথবা অন্য কোন সার্বজনীন অর্থের কাছে আবেদন করতে এবং সেই অর্থ গ্রহণ করতে, তাদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা মোটেই উচিত হয়নি। যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ধর্মঘটীরা পায় বা গ্রহণ করে তাদের সহানুভূতির মূল্যও সেই পরিমাণ কমে যায়। সহানুভূতিপূর্ণ ধর্মঘটের গুণাগুণ সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকারের দ্বারাই নিরূপিত হয়।

এখন কথা হল যে, যে সব ধর্মঘটী ভীতি প্রদর্শন ও প্রলোভন সত্ত্বেও পুরুষোচিতভাবে অবিচল ছিল এবং যারা সংখ্যায় অর্ধেকেরও বেশি তাদের জন্য কী করা হবে অথবা তারাই বা কী করবে। এই বিষয়ে আমার মত ইতিপূর্বে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে ব্যক্ত করেছি এবং তা বজায় রাখতেই আমি চাই। যদি ধর্মঘটীরা চাঁদপুরের অত্যাচারিত কুলিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মঘট করে থাকে এবং নিজেদের সহকর্মীদের কোন রকম ভীতি প্রদর্শন না করে থাকে তবে ধর্মঘট করার সম্পূর্ণ নৈতিক অধিকার তাদের ছিল এবং তারা অপ্রত্যাশিত মাত্রায় দেশপ্রেম ও সমবেদনার পরিচয় প্রদান করেছিল। আমি আশা করি যে, যতক্ষণ না সরকার সম্পূর্ণরূপে এবং খোলাখুলিভাবে ক্ষমা চাইছেন এবং কুলিদের দেশে পাঠাবার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা সম্বন্ধিত ব্যক্তিদের প্রদান করা হচ্ছে ততক্ষণ তারা কাজে যোগদান করতে অস্বীকার করবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-৯-২১

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের শর্তাবলী

একজন বন্ধু ব্রিটিশ শান্তিবাদীদের মুখপত্র 'নো মোর ওয়ার'-এর একটি অংশ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তা থেকে নিম্নলিখিত শর্তগুলি আমি উদ্ধৃত করছি। মিস্টার এ. ফেনার ব্রকওয়ে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট যাচাই করার জন্য এগুলি দিয়েছেন:

"১। মানব-জীবনের বিনাশকারী কোন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কৃত ধর্মঘটের মতই শান্তিপূর্ণ কাজ। (বন্দুকের গুলি যত লোককে মারে, যে বেতন মানুষকে ক্ষুধার্ত রাখে তাও ততগুলি লোককেই হত্যা করে।)

২। যদি বলা হয় যে, এই অন্যায় অপসারণের জন্য 'বৈধানিক' উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তবে সেই কথা যুদ্ধের বেলাতেও বলা যায়। আমাদের 'বৈধানিক' যন্ত্রটি অপ্রতুল। দু-বছর আগে ভোটদাতাদের মনে বেতন হ্রাস বা যুদ্ধের ধারণা ছিল না।

৩। যদি বলা হয় যে, বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট (এবং বিশেষ করে সাধারণ ধর্মঘট) দেশ অথবা সরকারকে 'বলপূর্বক নমিত' করার প্রচেষ্টা, তবে সেই কথা যুদ্ধবিরোধী সাধারণ ধর্মঘটের বেলাতেও বলা যেতে পারে। আসলে, জাতির একটি বড় অংশ সমর্থন না করলে দুটির কোনটিতেই সাফল্যের সম্ভাবনা নেই।

৪। ধর্মঘটকে অর্থনৈতিক অবরোধের তুল্য করা ঠিক নয়। যেখানে বুভুক্ষার বিপদের প্রশ্ন সেখানে ধর্মঘটীরাই যন্ত্রণাভোগ করবে। বাস্তব ঘটনা হল এই যে, সাম্প্রতিক সাধারণ ধর্মঘটে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। সরকারই সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৫। কোন ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ কিনা তার নির্ণায়ক তত্ত্ব হল সেই বৃত্তিটি যা থেকে এর উদ্ভব। কোন যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘটের হেতু যুদ্ধের পরিবর্তে সরকারের সদস্যদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হলে এবং তার মধ্যে যদি এমন মনোবৃত্তি থাকে যা গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে তবে তা শান্তিবাদের কাজ হবে না। তেমনি মালিকের বা সরকারের প্রতি বিদ্বেষ অথবা সমাজবিরোধী মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত

বেতন-হ্রাস বিরোধী ধর্মঘটেও এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু দুটিই শান্তিবাদের কাজ বলে গণ্য হবে যদি তাদের পিছনে কোন অন্যায়ের বিরোধিতা করার মনোভাব থাকে।

৬। যদিও একথা ঠিক যে, কখনো কখনো কথাবার্তায় এবং আরও অল্প মাত্রায় কাজের মধ্য দিয়ে ধর্মঘটীরা অ-শান্তিবাদী মনোভাব প্রদর্শন করেছে তবু আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলব যে আত্মত্যাগমূলক নৈতিক প্রতিবাদ করাই ছিল এই মহান ধর্মঘটের মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজ-বিরোধী শক্তি বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এর প্রেরণা যোগায় নি। এইটির জন্যই ধর্মঘট আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করেছিল আর তার মধ্যেই লোকেদের সংযমের রহস্যটিও লুকিয়ে ছিল।

যে শান্তিবাদ কেবল কদাচিৎ সামরিক যুদ্ধের মধ্যেই নিষ্ঠুরতা দেখতে পায় আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন নির্দয়তা রয়েছে তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে সেই শান্তিবাদের কোন মূল্য নেই। যে উদার মানবীয় আন্দোলন শুধু যুদ্ধেরই অবসান চায় না, উপরন্তু ততটাই অ-শান্তিবাদী সভ্যতারও মোটামুটি অন্ত চায়, আমাদের শান্তিবাদ যদি তার মধ্যে প্রকাশিত না হয় তবে মানব-জাতির অগ্রগতিতে তার কোনই প্রয়োজন থাকবে না। তাহলে জীবনসত্তা এর দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়েই অগ্রসর হয়ে যাবে।

'নো মোর ওয়ার' আন্দোলন যতটা এই কাজকে স্বীকার করবে তার উদ্দেশ্যও ততটা সিদ্ধ হবে।"

এই প্রশংসনীয় শর্তগুলির সঙ্গে আমি কেবল আর একটি যুক্ত করব। শান্তিবাদী ধর্মঘট কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যারা ঐ অপসারণীয় কষ্টের মধ্যে কাজ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'টিম্বাকটুর' দেশলাই প্রস্তুতকারকরা যদি তাদের নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু তাদের শ্রমিকরা ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যাবার মত বেতন পায় বলে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ধর্মঘট করে তবে দেশলাই প্রস্তুতকারকদের ধর্মঘট এক প্রকারের হিংসাই হবে। তারা টিম্বাকটুর মিল মালিকদের জিনিস বয়কট করে খুবই কার্যকরী সাহায্য করতে পারে এবং তা করা উচিত; আর এইভাবে তারা হিংসার দোষারোপ থেকেও নিজেদের মুক্ত রাখবে। কিন্তু এমন অবস্থারও কল্পনা করা সম্ভবপর যখন যারা সোজাসুজি কষ্ট ভোগ করছে না তাদেরও কাজ করে দেওয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে।

এইভাবে, কল্পিত দৃষ্টান্তে যদি দেশলাই কারখানার মালিকরা টিয়াকটুর মিল মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে কারখানার শ্রমিকদের সাথে সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া দেশলাই কারখানার কারিগরদের স্পষ্ট কর্তব্য হয়ে যায়। কিন্তু আমি কেবল উদাহরণার্থেই এই সংযোজনের প্রস্তাব করেছি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়টিকে তার নিজস্ব গুণাগুণের উপর বিচার করতে হবে। হিংসা এক কূটশক্তি। একে অনুভব করতে পারলেও সব সময় একে দেখতে পাওয়া সহজ নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-১১-২৬

ঝড়ের সঙ্কেত

শোলাপুরের ঘটনা এবং কানপুর ও আমেদাবাদের শ্রমিক অসন্তোষ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তির উপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কত অনিশ্চিত। অপরাধ-প্রবণ বলে কথিত উপজাতিদের আচরণ কী হবে তা নির্ণয় না করে পুরাতন রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন ব্যবহার তাদের সঙ্গে করা যেতে পারে না। অবশ্য একটি পার্থক্য এখনই করা যায়। অপরাধী মনে করে তাদের ভয় করবার এবং পরিহার করবার প্রয়োজন নেই, বরং তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভক্তি সৃষ্টির এবং তাদের জাতীয়তার প্রভাবের মধ্যে আনার চেষ্টা করা উচিত। কংগ্রেসীরা কেন এই সব উপজাতিদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি এবং এদের পরম্পরাগত হিংসা প্রবণতার অপব্যবহার যারা করে থাকে তাদের সোহাগ থেকে এদের বাঁচবার যোগ্য করে তুলতে পারে নি, আর সে-প্রবণতা মিথ্যাই হোক বা সত্যই হোক?

আমেদাবাদে ও কানপুরে কেন আমরা অতর্কিত বা অবৈধ ধর্মঘটের চিরন্তন ভীতির মধ্যে বাস করব? কংগ্রেস কি সংগঠিত শ্রমিকদের প্রকৃত পথে পরিচালিত করতে অক্ষম? কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে আমরা সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে অবিশ্বাস নাও করতে পারি। দায়িত্বহীন সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে আমরা যেরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করতাম এদের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে সেরূপ অবহেলা করতে পারি না। আমরা যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অবিশ্বাস করি অথবা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হই তবে লৌকিকতা না করেই তাদের পদচ্যুত করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ তাদের পদাসীন থাকতে দেওয়া হবে ততক্ষণ তাদের

বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনগুলিকে সমস্ত কংগ্রেসীর মনে-প্রাণে সমর্থন করা উচিত।

অন্য কোন শর্তে কংগ্রেসীদের পদাসীন থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কংগ্রেসীদের প্রামাণিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শক্তিকে পুলিস ও মিলিটারীর সাহায্য ব্যতিরেকে আয়ত্ত করতে না পারা যায় তবে আমার মতে কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কোন শক্তি ও অর্থই থাকে না। আর যত তাড়াতাড়ি মন্ত্রিদের ফিরিয়ে আনা হবে কংগ্রেসের পক্ষে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের পক্ষে ততই সেটা মঙ্গলকর হবে। আমার মনে হয় যে, শোলাপুরের উপনিবেশের উপদ্রব এবং আমেদাবাদ ও কানপুরের শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিকদের এবং তথাকথিত অপরাধপ্রবণ উপজাতিদের অবস্থার আমূল সংশোধনের জন্য অত্যধিক আশার পরিণাম। তাহলে বিশৃঙ্খলা রোধ করতে কংগ্রেসের অসুবিধা থাকা উচিত নয়। আর পক্ষান্তরে তা যদি কংগ্রেসী নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার লক্ষণ হয় তবে কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পুনর্বিচার প্রয়োজন।

হরিজন, ২০-১১-৩৭

বৈধ এবং অবৈধ ধর্মঘট

প্রশ্ন—৩০শে মার্চের মূল প্রবন্ধে আপনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহীরা 'অবিমৃষ্যকারিতার সঙ্গে শ্রমিকদের ধর্মঘট করিয়ে' সংগ্রামের গতিতে বাধা সৃষ্টি করবেন না। প্রবন্ধটিতে 'অবিমৃষ্যকারিতা'—কেবল এই একটি গূঢ় শব্দ রয়েছে। যখন আমি প্রথমে এটি পড়ি তখন এটিকে বিশেষ লক্ষ্য করি নি। কিন্তু পরে আমাকে এর যথেষ্ট ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। যদি পাঠক খুব সাবধানী না হন বা আপনার চিন্তা ও সেটা প্রকাশ করার ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত না থাকেন তবে তিনি এইটা পড়ে বিপথগামী হয়ে যেতে পারেন। তিনি 'অবিমৃষ্যকারিতা' কথাটির তাৎপর্য না বুঝতে পারেন এবং মনে করতে পারেন যে, আপনি বোধ হয় শ্রমিকদের সমস্ত ধর্মঘটকেই অপছন্দ করেন।

যুদ্ধ-বোনাসের জন্য অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আমেদাবাদ সংগ্রামের কথা স্মরণ করে একথা মনে করার অধিকার কারও নেই যে, আপনি শ্রমিকদের ধর্মঘট মাত্রেরই বিরোধী। আমেদাবাদের ধর্মঘট প্রতিনিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনি ধর্মঘটের অনুমতি দিয়েছিলেন আর শ্রমিকরাও তাদের দাবি আদায়

করেছিল। আমেদাবাদে নিয়মানুগতভাবে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। শ্রমিকদের দাবি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা এবং সেটা যথারীতি উপস্থিত করা হয়েছিল, সালিশীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল, মালিকদের যথাসময়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এবং ধর্মঘটের প্রশ্নে ভোট নেওয়া হয়েছিল আর তাতে এক লক্ষেরও বেশি ভোট পড়েছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, এই প্রকার নিয়মানুগত কাজের পরেও যদি ধর্মঘট এড়ানো না যায় তবে আপনি সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করবেন এবং অন্ততঃ নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, সেখানে কোন হিংসা নেই।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিজেকে সংগঠিত ধর্মঘটের বিশেষজ্ঞ মনে করি। আমার প্রথম সফল ধর্মঘট দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই করা হয়েছিল। আমেদাবাদে সেই কৌশলের উন্নতি করি। পূর্ণতায় পৌছেছি, এ দাবি আমি করি না। আমি কেবল অবৈধ ধর্মঘটগুলিকেই অপছন্দ করেছি। কংগ্রেস শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন করে নি। কয়েকজন কংগ্রেসীর সে দক্ষতা আছে। প্রায় প্রত্যেক শ্রমিক নেতারই নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তাঁরা সকলে অহিংস নন। কয়েকজন স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হন। কয়েকজন আবার ন্যায়-অন্যায় বিচারহীন। এজন্য সক্রিয় যদি নাও হয়, অন্ততঃ নিক্রিয় সহযোগিতা আমি চাই। সংগ্রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধর্মঘটের প্রয়োজন আমার নেই। ব্যাপক সবিনয় অবজ্ঞা যদি একান্তই ঘটে তবে তা কী আকারে আসবে তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু তাতে আমার হাত থাকলে কী কী জিনিস তাতে হবে না তা আমি বলতে পারি। আমি জানি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমিকদের উপর কংগ্রেসের যদি অহিংস নিয়ন্ত্রণ থাকে তবে কংগ্রেস আজ যত শক্তিশালী তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হত। সেই নিয়ন্ত্রণ তখনই হবে যখন শ্রমিকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের একটিমাত্র নীতি থাকবে আর তাকে কার্যান্বিত করতে যথেষ্ট কর্মী থাকবে।

হরিজন, ২০-৪-৪০

আদর্শের সংঘাত

'চাকরির অবস্থা অপমানকর হলে ভারতীয় নৌ-বহরের সেনারা কাজে ইস্তফা দিক, গান্ধীজীর এই কথা তিনি বুঝতে অসমর্থ। যদি তারা তা করে তবে জীবিকার একমাত্র উপায়ই তাদের ছাড়তে হয়। তা ছাড়াও, তারা আদর্শের জন্যই লড়াই করছে। এখন যদি তারা চাকরি ছাড়ে তবে বর্তমান চাকুরিহীনতার দিনে শত শত লোক তাদের স্থান নেবে। আর তাদের সঙ্গে আগের মতই প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হবে। ফলে ভারতীয় নৌ-বহরের সেনারা কিছুই লাভ করবে না। কংগ্রেসীরা নিজেরাই যখন আইনসভাগুলিতে যাচ্ছেন তখন সেনাদের চাকরি ছাড়তে বলা তাঁদের মুখে শোভা পায় না। এতে দেশের কল্যাণ-চেষ্টাতেও এতটুকু সাহায্য হয় না।'

উদ্ধৃত যে কথাগুলি অরুণা বেগ প্রেস-প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন তার প্রত্যেকটি, কংগ্রেসীরা সাধারণত যে মত পোষণ করেন অথবা যেগুলিকে তাঁদের মত বলে সকলেই জানেন তার বিপরীত। অরুণার মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বলানো হয়েছে সেগুলি সত্যই তাঁর মত কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এখন ঐগুলির গুণাগুণ বিচার করলে এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবের সঙ্গে তাদের অসঙ্গতি দেখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

পরলোকগত লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২০ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে অপমানকর সব কিছুর বিরুদ্ধ অসহযোগ করাকে অহিংস কর্মপ্রচেষ্টার প্রাথমিক নীতি বলে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। একথা মনে রাখতে হবে, শাসিতের মঙ্গলের জন্য ভারতীয় নৌ-বহরের সৃষ্টি হয় নি—একথা জেনেশুনেই লোকেরা সেখানে গিয়েছিল। ভেদভাব সেখানে বাইরে থেকেই নজরে আসে। ভারতকে পদানত রাখতে স্পষ্টত যার সৃষ্টি, সেখানে চাকরি করতে গেলে এই ভেদভাবকে এড়ানো যেতে পারে না। তবে এই অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে আর তা করা উচিত। কিন্তু তারও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। আর তা বিদ্রোহের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে না। বিদ্রোহ সফল হওয়া সম্ভব, একথা ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তাতে বিদ্রোহীদের আর তাদের আত্মীয়দেরই লাভ হবে, সমগ্র ভারত উপকৃত হবে না। পরবর্তীদের পক্ষেও তা এক সুশিক্ষা

হবে। নিয়মানুবর্তিতার আজ যতটা প্রয়োজন স্বরাজ হলেও অন্তত ততটাই প্রয়োজন থাকবে। বিদ্রোহীরা 'সফল হলে তাদের অধীনে ভারতবর্ষ বিবদমানদলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে আত্মকলহের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

একথা যদি সত্য হয় যে, অপমানের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বর্তমান নৌ-সেনারা কাজে ইস্তফা দিলে শত শত লোক তাদের স্থান গ্রহণ করবে তবে বলতে হয় যে, কংগ্রেসী-ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের খুব কমই মর্যাদা দিয়েছে। আমরা যদি এতই অধঃপতিত হয়ে থাকি যে, অপমানিত দেশবাসীর স্থান গ্রহণ করে অপমান হজম করতে আমাদের মধ্যে শত শত লোক প্রস্তুত আছে তবে কি করে জনগণের স্বরাজ আমরা লাভ করব? এরূপ চিন্তাই কংগ্রেসের লোকের অযোগ্য আর তাও এমন সময়ে যখন স্বরাজকে দৃষ্টিগোচর বলে মনে হচ্ছে।

যাঁরা মনে করেন যে, নৌ-বহরে চাকরি করাই ভারতীয় নৌ-সেনাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়, তাঁরা এদের সম্বন্ধে খুব সামান্য ধারণা পোষণ করেন। সৈনিকের জীবন খুব কঠোর। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে তারা অনুশাসনবদ্ধ এবং খন্তা-কোদাল হাতে কাজ করতে তারা শিক্ষিত। এই রকম সৈনিকদের পক্ষে সিপাহীগিরি করা ছাড়া জীবিকার অন্য পথ নেই, একথা চিন্তা করতে তারা অপমান বোধ করবে। আমরা যদি ভাবি যে, সৈনিকরা খেটে খেতে পারে না তবে বলতে হয় যে, তাদের সম্বন্ধে খুব অল্প ধারণাই আমাদের আছে। পারিশ্রমিক অর্জন করার যোগ্যতা তো শ্রমিকের সব সময়ই থাকে। অবশ্য একথা ঠিক যে, সিপাহীগিরি ছাড়লে সৈনিকের জৌলুস ও সুখ-সুবিধাগুলি আর থাকে না। হত্যা ও ধ্বংসের পেশা এযাবৎ যে নকল ঔজ্জ্বল্যের আবরণে মণ্ডিত হয়েছিল তাকে যদি আমরা আজও খসিয়ে দিতে না পেরে থাকি তবে বহুমূল্যের পঁচিশটি বছরকে আমরা বৃথাই নষ্ট করেছি।

নৌ-সেনারা কাজে ইস্তফা দিলে কোনই লাভ হত না, এই কথা অরুণা আসফ আলী বলেছেন বলে বিবৃত হয়েছে। আমি বলি, পুরুষোচিতভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা যদি বোম্বাইয়ের নাগরিকদের মান-মর্যাদা রক্ষার উপায় শিখিয়ে দিত তবে তারা নিজেরাও সম্মান ও মর্যাদা লাভ করত এবং বোম্বাই শহরে যে অনর্থক নরহত্যা, সম্পত্তিনাশ ও মূল্যবান খাদ্যসম্ভার নষ্ট হয়েছে তা হত না। আর এইটুকু করতে পারলে তা নিশ্চয়ই নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য হত না।

প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের অন্তিম বিবৃতিটি নিশ্চয়ই চিন্তা-বিরোধপ্রসূত। দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কংগ্রেসের লোকদের বিধানসভায় যাওয়া আর নৌ-সেনাদের স্বদেশবাসীর তথা নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা আছে জেনেও জীবিকার জন্য সেই চাকরি করতে যাওয়া এক ব্যাপার নয়। যেসব কংগ্রেসের লোক বিধানসভায় যান তাঁরা ভোটারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁরা আর কিছু করতে না পারলেও মিথ্যা প্রতিনিধিদের বিধান-সভায় যাওয়া বন্ধ করতে পারেন। বিধানসভায় যাওয়া মোটের উপর খারাপ হতে পারে কিন্তু যে রকম তুলনা করা হয়েছে তা করা যেতে পারে না।

পুণা, ৩-৩-৪৬ ; হরিজন, ১০-৩-৪৬

পুঁজিবাদ ও ধর্মঘট

শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে ধনিকদের আচরণ কি রকম হবে?—এই প্রশ্ন আজ সর্বত্রই এবং বর্তমানে তার গুরুত্বও খুব বেশি। এর একটি পথ হল দমনের পথ এবং তাকে 'আমেরিকান' বলা হয় বা ঐ নাম দিয়ে বিদ্রূপ করা হয়। এই পথে গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করা হয়। প্রত্যেকেই একে অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক বলে মনে করেন। অন্য পথটি ন্যায় ও সম্মানের পথ। তাতে প্রত্যেক ধর্মঘটের গুণাগুণ বিচার করতে এবং শ্রমিককে তার প্রাপ্য দিতে হয়। সেই প্রাপ্য ধনিকরা ঠিক করেন না, শ্রমিকরা নিজেরাই তা স্থির করেন এবং তাতে শিক্ষিত জনমতের সমর্থন থাকে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকজগৎ নিজ দাবি সম্বন্ধে অধিকতর উগ্র হয়ে উঠছে। তার দাবিও নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই দাবি স্বীকার করাবার জন্য অধীর হয়ে হিংসার আশ্রয় নিতেও সে দ্বিধা করছে না। সেই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন উপায়ও অবলম্বন করা হচ্ছে। শ্রমিকরা মালিকদের সম্পত্তি নষ্ট করতে, কলকব্জা বিগড়ে দিতে, যেসব বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকরা ধর্মঘটে যোগ দেয় না তাদের উত্ত্যক্ত করতে এবং শঠ শ্রমিকদের বলপ্রয়োগে আটক করে রাখতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। এই পরিস্থিতিতে মালিক তাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করবেন?

মালিকদের প্রতি আমার উপদেশ হল যে, যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেন, শ্রমিকরাই যে সেগুলির প্রকৃত মালিক

এ কথা স্বেচ্ছাপূর্বক তাঁরা মনে করুন। শ্রমিকদের ভালভাবে শিক্ষিত করে তোলাকেও তাঁরা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করুন; তাতে শ্রমিকদের সুপ্ত ধী-শক্তির উন্মোচন হবে। শ্রমিকদের একতার দ্বারা যে শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে খুশীমনে বিবর্ধিত করা এবং স্বাগত করাও মালিকদের কর্তব্য।

এই মহান কাজ মালিকরা একদিনে করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে, ধর্মঘটীরা যাঁদের কলকারখানায় ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবে তাঁরা কী করবেন? এই রকম মালিকদের বিনা দ্বিধায় আমি এই পরামর্শ দেব যে, তাঁরা ধর্মঘটীদের কারখানা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করুন। কেন না, কারখানা তুল্যভাবে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই। কিন্তু অসন্তুষ্ট মনে নয় বরং উচিত মনে করেই তাঁরা কারখানা ত্যাগ করবেন এবং তাঁদের সেই সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ শ্রমিকদের তাঁরা নিজেদের ইঞ্জিনিয়ার ও অন্য দক্ষ কর্মচারীদের দ্বারা সাহায্য প্রদান করবেন। মালিকরা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে, এর দ্বারা তাঁরা কিছুই হারান নি। বস্তুত তাঁদের প্রকৃত পথ অবলম্বনের ফলে বিরোধিতা নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং তাঁরা তাঁদের শ্রমিকদের আশীর্বাদ লাভ করবেন। এর ফলে তাঁদের দিক থেকে পুঁজির উচিত ব্যবহার হবে। আমি এই রকম কাজকে পরোপকার বলে মনে করব না। এই কাজের দ্বারা পুঁজিপতিরা তাঁদের সঙ্গতি-সংস্থানের বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করবেন আর শ্রমিকদের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করবেন। এর ফলে শ্রমিকরাও তাঁদের সম্মানিত অংশীদারে পরিণত হবেন।

উরুলী, ২৩-৩-৪৬ ; হরিজন, ৩১-৩-৪৬

বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট

প্রশ্ন—কংগ্রেস সমর্থন করতে পারে না এমন বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট যখন হয় তখন তা বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসীদের এবং জনসাধারণের কী করা উচিত?

—প্রথম কথা হল যে, কংগ্রেসের সংগঠন যদি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তবে বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট হবে না। আর যেহেতু আপন এলাকায় প্রত্যেক যুক্তিপূর্ণ ধর্মঘটের দায়িত্ব জনগণের প্রতিষ্ঠানেরই বহন করা কর্তব্য সেই হেতু, শুধু ঐ কারণেই অন্য কোন ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হলে তা অনুচিত বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেস শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে নি। সুতরাং প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটের বেলায় কোন্ দল সেই ধর্মঘটের জন্য দায়ী

সে কথা চিন্তা না করে ধর্মঘটের গুণাগুণ দেখেই বিচার করতে হবে। যখন কোন ধর্মঘট দোষগুণ বিচারের পর সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না তখন কংগ্রেসের এবং জনসাধারণের তাকে স্পষ্টভাষায় নিন্দা করা উচিত। তখন স্বাভাবিকভাবেই ধর্মঘটী লোকেরা কাজে ফিরে যাবে। আর ধর্মঘট যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকলে যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান যদি ধর্মঘটীদের নমিত করার জন্য চর লাগায় বা অন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে তবে তাকেও অনুরূপভাবে নিন্দা করতে হবে।

উরলী, ২-৩-৪৬, হরিজন, ৩১-৩-৪৬

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট

প্রশ্ন—ধর্মঘট কিভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে গুণ্ডামি ও হিংসা পরিহার করা যায়?

—ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত, বাইরের চেষ্টায় তা হওয়া উচিত নয়। জোর-জবরদস্তি না করে যদি ধর্মঘট সংঘটিত হয় তবে গুণ্ডামি ও লুঠতরাজের ভয় থাকে না। ধর্মঘটীদের পারস্পরিক সম্পূর্ণ সহযোগিতাই হল এই রকম ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য। এইগুলি শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত এবং তাতে বল-প্রদর্শনেরও প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। ধর্মঘটীরা জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথকভাবে অথবা পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্য কোন কাজ করবে। এই ধরনের কাজের প্রকৃতি আগে থেকেই চিন্তা করে রাখা উচিত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই জাতীয় শান্তিপূর্ণ, কার্যকরী ও সুদৃঢ় ধর্মঘটে গুণ্ডামি বা লুঠতরাজের কোন অবকাশ থাকবে না। এই রকম ধর্মঘট আমি দেখেছি। আমি কোন কাল্পনিক চিত্র উপস্থিত করি নি।

নূতন দিল্লী, ২৬-৫-৪৬, হরিজন, ২-৬-৪৬

অহিংস ধর্মঘট

ধর্মঘট-ব্যাধির সংক্রমণের মৌলিক কারণ হল যে জীবন, অন্য জায়গার মত এখানেও তার মূল থেকে উৎপাটিত হয়েছে। ধর্মই হল জীবনের মূল। একজন ইংরেজ লেখক ঠিকই বলেছেন যে, আজ ‘নগদ নারায়ণ’ সেই স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনে এই যোগসূত্রটি খুবই

বিপজ্জনক। তবে ধার্মিক আধার থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘট হবে, কেন না একথা কল্পনা করা যায় না যে, সকলের ক্ষেত্রেই ধর্ম জীবনের মূল হয়ে যাবে। সুতরাং একদিকে শোষণের চেষ্টা চলবে আর অন্যদিকে ধর্মঘট হবে। কিন্তু তখন এই সমস্ত ধর্মঘট শুদ্ধ অহিংস প্রকৃতির হবে। এই রকম ধর্মঘট কখনই কারও ক্ষতি করবে না। বোধ হয় এই রকম ধর্মঘটই জেনারেল স্মাট্‌সকে বশীভূত করেছিল। জন স্মাট্‌স্ বলেছিলেন, আপনি যদি কোন ইংরেজকে আঘাত করতেন তবে আমি আপনাকে গুলি করতাম এবং আপনার লোকদেরও নির্বাসিত করে দিতাম। তা না করে আমি আপনাকে জেলে বন্দী করেছিলাম এবং বহুপ্রকারে আপনাকে ও আপনার লোকদের দমন করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশোধ নেন না তখন আমি এইভাবে কতদূর আর যেতে পারি? —সুতরাং কুলিদের পক্ষভুক্ত একজন সামান্য কুলির সঙ্গে তাঁকে মিটমাট করতে হয়েছিল। (দক্ষিণ আফ্রিকায় সমস্ত ভারতীয়কেই তখন কুলি বলা হত।)

হরিজন, ২২-৯-৪৬

মেথর ধর্মঘট

এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা নিয়ে ধর্মঘট করা অন্যায়। মেথরদের অভাব অভিযোগ এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উপস্থিত আমি কিছু বলতে চাই না। ১৮৯৭ সালে আমি যখন ডারবানে ছিলাম তখন থেকেই মেথরদের ধর্মঘট সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধ-মত রয়েছে। সেখানে একবার সাধারণ ধর্মঘটের কথা হয় এবং প্রশ্ন ওঠে যে, মেথরদেরও তাতে যোগ দেওয়া উচিত কিনা। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি মত দিয়েছিলাম। মানুষ যেমন হাওয়া ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি ঘরদুয়ার এবং চারিপাশ যদি পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলেও সে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। আধুনিক ময়লা নিষ্কাশনের পদ্ধতিকে বিকল করে দিলে কোন না কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেবেই।

সেইজন্য বোম্বাইয়ের মেথর ধর্মঘটের খবর শুনে আমি বিচলিত হয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখন তার অবসান হয়েছে। আমি শুনেছি যে, মেথররা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই তাদের অভিযোগ সালিশীর কাছে দিতে অস্বীকার করেছে।

মেথরদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, বরং সেই কারণেই, তারা যে জোর-জবরদস্তির পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল বলে শোনা গিয়েছে তার জন্য তাদের আমার নিন্দা করা উচিত। এই পদ্ধতির ফলে শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শহরের লোকেদের সব সময় বশ করা যাবে না। যদি তা যায় তবে তার অর্থ হবে যে, সমস্ত পৌরসংঘ পরিচালনাই ভেঙ্গে পড়েছে। জোর-জবরদস্তির পরিণাম শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বিবাদ মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ সালিশীকে সব সময়েই স্বীকার করা উচিত। অস্বীকার করা দুর্বলতার নিদর্শন। ভাঙ্গীর পক্ষে এক দিনও কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়। আর ন্যায়বিচার লাভ করার জন্য অন্য অনেক পথ তাদের সামনে রয়েছে।

অপর পক্ষে, শহরের বাসিন্দাদেরও অস্পৃশ্যতা বলে কিছু আছে একথা ভুলে যেতে হবে। নিজেদের এবং শহরের নর্দমাগুলি পরিষ্কার করতেও তাদের শিখে নিতে হবে, যাতে অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে ও সাময়িক-ভাবে প্রয়োজনমত কাজ চালিয়ে নিতে পারে। তাদের বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নয়। আমি এমন কথাও বলব যে, এই রকম আকস্মিক অবস্থায় সেনা বিভাগের লোকেদেরও এই কাজে নিয়োগ করা উচিত, কেন না তারা এ কাজ জানে। স্বরাজ যদি সত্যই আসন্নপ্রায় হয়ে থাকে তবে সেনা বিভাগের লোকদের আমরা আপনজন বলেই মনে করতে পারি এবং তাদের দ্বারা যেসব গঠনমূলক কাজ করা সম্ভবপর তাও তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে কোন দ্বিধা করার প্রয়োজন নেই। এতদিন পর্যন্ত আমাদের উপর বেপরোয়া গুলি চালনা করার জন্যই তাদের নিয়োগ কর হয়েছিল। এখন তাদের জমি চাষ করতে, কূয়া খুঁড়তে, পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এইভাবেই জনগণের ঘৃণাকে তাদের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে হবে।

ধর্মঘট যখন শেষ হয়ে গিয়েছে তখন প্রত্যেকেরই উচিত ভাঙ্গীদের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া। তাদের শিক্ষা দিতে হবে, ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং অপর সকলের মত তারাও যাতে ইচ্ছামত জায়গায় বাস করতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে। তারা যাতে উপযুক্ত বেতন পায় এবং দাবি না করলেও তাদের প্রতি যাতে সুবিচার হয় তারও ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষে যদি এরকম করা যায় তবে আমরা

অবশ্যই স্বরাজ লাভের এবং তা রক্ষা করার যোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করতে পারব।

নূতন দিল্লী, ১৫-৪-৪৬ ; হরিজন, ২১-৪-৪৬

এক হরিজনের পত্র

মেথরদের ধর্মঘট সম্পর্কে আমার লেখার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানিয়ে একজন হরিজন বন্ধু পত্র দিয়েছেন।

তাঁর প্রথম অভিযোগ হল যে, মিষ্টি 'হরিজন' নামটি পরিত্যাগ করে তার বদলে আমি ভাঙ্গী শব্দটি ব্যবহার করেছি। এই সমালোচনা থেকেই পত্র লেখকের স্পর্শকাতর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন গুজরাটী 'অস্পৃশ্যই' সর্বপ্রথম আমাকে 'হরিজন' নামটির পরামর্শ দেয় এবং আমি সানন্দে তা গ্রহণ করি। তার অর্থ এই নয় যে, কোন বিশেষ উপজাতির প্রচলিত নাম কখনও ব্যবহার করা যাবে না। আমি নিজেকে একজন হরিজন বলেই মনে করি এবং বিশেষ করে নিজেকে ভাঙ্গী বলতেই আমি এইজন্য আনন্দ বোধ করি যে, ভাঙ্গীরাই হল হরিজনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জাত। সম্প্রতি আমি যখন দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনীতে বাস করছিলাম তখন সেখানকার হরিজনরাও ভাঙ্গী কথাটি ব্যবহার করার জন্য অভিযোগ করেছিল। তারা 'মেথর' কথাটি বলতে পরামর্শ দেয়। আমি তাদের এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করি যে, একই পেশার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন নামের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা হল তাতে কিছুই যায় আসে না। যদিও এইটিকে হীনতম পেশা বলে মনে করা হয় তবু আসলে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না এই কাজের দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়; আর সেজন্য নাম সম্বন্ধে তাদের উদাসীন থাকা উচিত। কথাটির মূল যাই হোক, আমার মতে ভাঙ্গী শিবেরই আর এক নাম। একজন ঝাড়ুদারকে মেথর বা ভাঙ্গী যাই বলা হোক, শিবের মতই সে মানুষের স্বাস্থ্য বিধান করে। একজন ঘরদোর পরিষ্কার করে মানুষের স্বাস্থ্য বিধান করে আর অন্যজন মানুষের মনকে নির্মল করে।

দ্বিতীয় আলোচনাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব-সংস্কার থেকেই ভুল বোঝার সৃষ্টি হয়। আমাদের যা পাবার সঙ্গত অধিকার আছে তা যদি আমরা জোর করে আদায় করি তবে তাতে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। জোর করে আমরা যা আদায় করব তাকে আপন করে নিতে হয়ত আমরা সক্ষম হব না। ধর্মঘটীরা

যা পেয়েছে তা জোর-জবরদস্তির দ্বারা আদায় করা জিনিস। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। আমার পেশা যদি হয় পায়খানা পরিষ্কার করা, আর আমি যদি সেই কাজ করতে অস্বীকার করি তবে জোর-জবরদস্তি ছাড়া অন্য নামে কি তাকে অভিহিত করা যেতে পারে? অবশ্য, পায়খানা পরিষ্কারের কাজ নিতে আমি বাধ্য নই এবং এ কথাও বলা যায় যে, কোন্ শর্তে সেই কাজ গ্রহণ করব তা জানবার পূর্ণ অধিকার আমার আছে। কিন্তু আমার যা চিন্তাধারা তাতে মনে হয় যে, শর্ত ঠিক করে দেবার অধিকার ব্যক্তির নিরঙ্কুশ অধিকার নয়। যদি একে নিরঙ্কুশ অধিকার বলে মেনেও নেওয়া যায় তবু বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ উচিত বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু এই যুক্তির ঔচিত্য সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করতে চাই না। আমি প্রবন্ধটিতে ভাঙ্গীদের এবং নাগরিকদের কর্তব্য কি, তাই দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, ভাঙ্গীদের প্রতি সকল রকমের অন্যায় করা হয়ে থাকে। নাগরিগকরা যে ভাঙ্গীদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে না, এ বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। হরিজনদের বাসস্থান যাতে ভালভাবে নির্মিত হয়, পরিষ্কার করবার উপকরণগুলি যাতে ভাল হয়, তাদের কাজ করবার পোশাক যাতে আলাদা হয়, তাদের সন্তানরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, এই সব সম্পর্কে অবহিত হওয়া নাগরিকদের কর্তব্য। এইগুলির এবং অন্যান্য সমস্যার অবিলম্বে সমাধান হওয়া উচিত। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য ভাঙ্গীদের ধর্মঘট করা উচিত নয়। কিন্তু তাদের হয়ে নাগরিকদেরই এই সবের জন্য দাবি তোলা উচিত।

মেথরদের কাজ করার জন্য সৈন্যদের ব্যবহার করতে যে-পরামর্শ আমি দিয়েছি তার বিরুদ্ধেও সমালোচনা হয়েছে। আমি যা বলেছিলাম তাতে কোন অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার প্রবন্ধটি আবার পড়েছি এবং তা থেকে একটি শব্দও আমি প্রত্যাহার করতে চাই না। আমি যা লিখেছি তার জন্য আমার কোন খেদ নেই। আমি আমার হরিজন বন্ধুদের এটি যথোচিত সহৃদয়তার সঙ্গে পড়তে উপদেশ দিই। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখবেন যে, তাঁদের প্রতি আমার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি।

সিমলা, ৫-৫-৪৬; হরিজন, ১২-৫-৪৬

মেথরদের দুর্দশা

প্রশ্ন—এ বিষয়ে আপনি অবশ্য আগে লিখেছেন, কিন্তু আমার অনুরোধ যে, আপনি আবার মেথরদের ময়লা পরিষ্কার করবার যথোপযুক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করার সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটি, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এবং গৃহস্থ মনিবদের যা কর্তব্য সে সম্পর্কে কিছু বলুন। জল পড়ে না এমন লোহার পাত্র যদি দেওয়া না হয় তবে বর্ষাকালে ঝুড়ি বা পাটের থলির ভিতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ময়লা বেচারীদের মাথার উপর পড়ে। ময়লা পরিষ্কারের এমন উপায় থাকা প্রয়োজন যাতে হাত বা শরীরের কোন অংশ নোংরা না হয়। এ রকম যদি করা হয় তবে ময়লা পরিষ্কারের কাজেরও সম্মান বাড়ে—যে সম্মান এখন নেই। ময়লা পরিষ্কার ও ঝাঁট দেবার উপযুক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে মেথরদের কাজ সম্বন্ধে তালিম দেওয়ার প্রয়োজন। এটি এমন এক বিষয় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উন্নতির জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা উচিত।

—আমি তো আইনের এমন উপধারা প্রবর্তনের পক্ষপাতী যাতে হাত দিয়ে ময়লা তুলতে হয় না, এই রকম অনুমোদিত পাত্র, ঝাঁটা প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং কাজের জন্য সাদাসিধে পোশাকের ব্যবস্থা থাকবে। পরিদর্শক বা ওভারসিয়ারদের এই মানব-হিতকর ও জনস্বাস্থ্যকর কাজের শিক্ষা দিতে হবে, কোন প্রকারে মেথরদের কাছ থেকে কাজ আদায় করাটাই যেন তাঁদের কর্তব্য বলে মানা না হয়। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে চরম অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, অল্পতম কাজ, উৎকোচ, দুর্নীতি আর অভদ্র ব্যবহার।

নূতন দিল্লী, ৩০-৯-৪৬, হরিজন, ৬-১০-৪৬

আবার মেথর ধর্মঘট

যে ভদ্রলোক লুটপাটের ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন তিনি আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, অন্য সমস্ত উপায় যখন ব্যর্থ হয়ে যাবে তখন বেচারা মেথররা কী করবে? তিনি সক্রোধে জিজ্ঞাসা করেছেন :—

'মেথররা কি ময়লা আর আবর্জনার মধ্যে বাস করে যে বেতনে তাদের পেট ভরে না তাতেই কাজ চালিয়ে যাবে?'

প্রশ্নটি সঙ্গত। আমার কথা হল যে, এরকম অবস্থায় ধর্মঘট মোটেই উপযুক্ত প্রতিকার নয়। বরং মেথররা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে কর্মে নিয়োগ-কারী মিউনিসিপ্যালিটিকে এই কথা জানিয়ে দেবে যে, তারা মেথরের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য। কেন না ঐ কাজ যারা করে তাদের জীবনভোর অনশনে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ধর্মঘট এবং একেবারে কাজ ছেড়ে দেওয়ার (কাজ বন্ধ করা নয়) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ধর্মঘট হল সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় অনুষ্ঠিত এক সাময়িক ব্যাপার। আর কাজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হল কোন সুবিধা লাভের প্রত্যাশা নেই বলে কোন বিশেষ কাজ একেবারে ত্যাগ করা। যথারীতি কাজ ছেড়ে দেবার পিছনে দুটি বিষয় আছে, একটি হল কাজ ছাড়বার আগে সময় থাকতে জানিয়ে দেওয়া আর দ্বিতীয় হল যে, কাজ ছাডার মধ্য দিয়ে ভাল বেতন এবং ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা। এর ফলে সমাজের লজ্জাকর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং জনমনের উপর যে আবর্জনা জমে তার বিবেকবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে রেখেছে তা দূর হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেথরদের কাজ চারুশিল্পে পরিণত হবে এবং যে মর্যাদা তাদের অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, তাও তারা পেয়ে যাবে।

হরিজন, ২৩-৬-৪৬

ধর্মঘট

ডাক ধর্মঘট আমি সমর্থন করেছিলাম বলে যে সংবাদ দৈনিক পত্রিকা-গুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সত্য নয়। আসল কথা হল, একদিন একটি পিওন আমাকে 'বন্দে মাতরম্' করবার জন্য অনুমতি চেয়েছিল। কানু গান্ধী তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু আগন্তুকটি, পিওনদের যে ধর্মঘট তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। আমি তাকে বলেছিলাম যে, ধর্মঘট যদি ন্যায়পূর্ণ হয় এবং তাদের আচরণ যদি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকে তবে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। এ কথার দ্বারা কোন বিশেষ ধর্মঘটকে সমর্থন করা বোঝায় না। আমি যা বলেছি সে কথা এবং ডাক ধর্মঘটের দোষগুণের কথা ছেড়ে দিলেও, যেহেতু আমি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সফল ধর্মঘটগুলি সম্পর্কে একজন দক্ষ লোক সেইহেতু এই ধর্মঘটের এবং অন্যান্য

ধর্মঘটের সঞ্চালকদের তথা জনসাধারণকে সকল ধর্মঘটের শর্তগুলি জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।

বলা বাহুল্য যে, দোষগুণের বিচারে যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত না হলে কোন ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। কোন অন্যায় ধর্মঘট সফল হওয়া উচিত নয়। এই রকম ধর্মঘটের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকা উচিত নয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণের আস্থাভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা না থাকলে ধর্মঘটের দোষগুণ নির্ণয় করার অন্য কোন উপায় জনসাধারণের থাকে না। ধর্মঘটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের নিজেদের বিষয়ের দোষগুণ বিচার করতে পারেন না। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বীকৃত কোন সালিশী অথবা আদালতে মীমাংসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, দুপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত সালিশী থাকলে বা আদালতে মীমাংসা করার ব্যবস্থা হলে বিষয়টি আর জনসাধারণের সামনে আসে না। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন দর্পিত মালিকরা সালিশীর নিষ্পত্তিকে অবহেলা করেছেন অথবা পথভ্রষ্ট শ্রমিকরা তাঁদের শক্তি সম্পর্কে অতিসচেতন হয়ে মধ্যস্থতাকে অবহেলা করেছেন এবং বলপ্রয়োগে তাঁদের দাবি স্বীকৃত করাতে চেয়েছেন।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে ধর্মঘট করা হয় তার পিছনে কোন পরোক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এই ধরনের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কখনই সফল হয় না এবং সার্বজনীন জীবন যদি বিপর্যস্ত নাও হয় তবুও সাধারণভাবে তা ধর্মঘটীদের বিপদ ডেকে আনে। ডাক ধর্মঘটের মত সর্বজনীন প্রয়োজনীয় বস্তুর ধর্মঘটেও তাই হয়ে থাকে। এতে সরকার কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারেন, কিন্তু একেবারে অচল হয়ে পড়েন না। ধনী ব্যক্তিরা পর্যাপ্ত খরচ করে নিজেদের ডাকের ব্যবস্থা করে নেন। কিন্তু এই রকম ধর্মঘটের সময় দরিদ্র জনসাধারণের বিশাল সমুদ্র প্রাথমিক প্রয়োজনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এই সুবিধা তাঁরা যুগ যুগ ধরে ভোগ করে আসছেন। এই রকম ধর্মঘট কেবল তখনই করা যায় যখন অন্য সমস্ত বৈধানিক উপায় ব্যর্থ হয়ে যায়।

বর্তমানে প্রদেশগুলিতে আমাদের জাতীয় সরকার রয়েছে। ডাক কর্মচারীদের, এই অন্তিম পথ গ্রহণের পূর্বে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। আমি যতদূর জানি শ্রীবালা সাহেব খের, শ্রীমঙ্গলদাস পাকওয়াসা এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মধ্যস্থতা করেছেন। ডাক কর্মচারীরা যদি এঁদের পরামর্শ

প্রশ্নটি সঙ্গত। আমার কথা হল যে, এরকম অবস্থায় ধর্মঘট মোটেই উপযুক্ত প্রতিকার নয়। বরং মেথররা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে কর্মে নিয়োগকারী মিউনিসিপ্যালিটিকে এই কথা জানিয়ে দেবে যে, তারা মেথরের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য। কেন না ঐ কাজ যারা করে তাদের জীবনভোর অনশনে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ধর্মঘট এবং একেবারে কাজ ছেড়ে দেওয়ার (কাজ বন্ধ করা নয়) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ধর্মঘট হল সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় অনুষ্ঠিত এক সাময়িক ব্যাপার। আর কাজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হল কোন সুবিধা লাভের প্রত্যাশা নেই বলে কোন বিশেষ কাজ একেবারে ত্যাগ করা। যথারীতি কাজ ছেড়ে দেবার পিছনে দুটি বিষয় আছে, একটি হল কাজ ছাড়বার আগে সময় থাকতে জানিয়ে দেওয়া আর দ্বিতীয় হল যে, কাজ ছাড়ার মধ্য দিয়ে ভাল বেতন এবং ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা। এর ফলে সমাজের লজ্জাকর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং জনমনের উপর যে আবর্জনা জমে তার বিবেকবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে রেখেছে তা দূর হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেথরদের কাজ চারুশিল্পে পরিণত হবে এবং যে মর্যাদা তাদের অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, তাও তারা পেয়ে যাবে।

হরিজন, ২৩-৬-৪৬

ধর্মঘট

ডাক ধর্মঘট আমি সমর্থন করেছিলাম বলে যে সংবাদ দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সত্য নয়। আসল কথা হল, একদিন একটি পিওন আমাকে 'বন্দে মাতরম্' করবার জন্য অনুমতি চেয়েছিল। কানু গান্ধী তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু আগন্তুকটি, পিওনদের যে ধর্মঘট তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। আমি তাকে বলেছিলাম যে, ধর্মঘট যদি ন্যায়পূর্ণ হয় এবং তাদের আচরণ যদি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকে তবে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। এ কথার দ্বারা কোন বিশেষ ধর্মঘটকে সমর্থন করা বোঝায় না। আমি যা বলেছি সে কথা এবং ডাক ধর্মঘটের দোষগুণের কথা ছেড়ে দিলেও, যেহেতু আমি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সফল ধর্মঘটগুলি সম্পর্কে একজন দক্ষ লোক সেইহেতু এই ধর্মঘটের এবং অন্যান্য

ধর্মঘটের সঞ্চালকদের তথা জনসাধারণকে সফল ধর্মঘটের শর্তগুলি জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।

বলা বাহুল্য যে, দোষগুণের বিচারে যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত না হলে কোন ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। কোন অন্যায় ধর্মঘট সফল হওয়া উচিত নয়। এই রকম ধর্মঘটের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকা উচিত নয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণের আস্থাভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা না থাকলে ধর্মঘটের দোষগুণ নির্ণয় করার অন্য কোন উপায় জনসাধারণের থাকে না। ধর্মঘটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের নিজেদের বিষয়ের দোষগুণ বিচার করতে পারেন না। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বীকৃত কোন সালিশী অথবা আদালতে মীমাংসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, দুপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত সালিশী থাকলে বা আদালতে মীমাংসা করার ব্যবস্থা হলে বিষয়টি আর জনসাধারণের সামনে আসে না। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন দর্পিত মালিকরা সালিশীর নিষ্পত্তিকে অবহেলা করেছেন অথবা পথভ্রষ্ট শ্রমিকরা তাঁদের শক্তি সম্পর্কে অতিসচেতন হয়ে মধ্যস্থতাকে অবহেলা করেছেন এবং বলপ্রয়োগে তাঁদের দাবি স্বীকৃত করাতে চেয়েছেন।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে ধর্মঘট করা হয় তার পিছনে কোন পরোক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এই ধরনের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কখনই সফল হয় না এবং সার্বজনীন জীবন যদি বিপর্যস্ত নাও হয় তবুও সাধারণভাবে তা ধর্মঘটীদের বিপদ ডেকে আনে। ডাক ধর্মঘটের মত সর্বজনীন প্রয়োজনীয় বস্তুর ধর্মঘটেও তাই হয়ে থাকে। এতে সরকার কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারেন, কিন্তু একেবারে অচল হয়ে পড়েন না। ধনী ব্যক্তিরা পর্যাপ্ত খরচ করে নিজেদের ডাকের ব্যবস্থা করে নেন। কিন্তু এই রকম ধর্মঘটের সময় দরিদ্র জনসাধারণের বিশাল সমুদ্র প্রাথমিক প্রয়োজনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এই সুবিধা তাঁরা যুগ যুগ ধরে ভোগ করে আসছেন। এই রকম ধর্মঘট কেবল তখনই করা যায় যখন অন্য সমস্ত বৈধানিক উপায় ব্যর্থ হয়ে যায়।

বর্তমানে প্রদেশগুলিতে আমাদের জাতীয় সরকার রয়েছে। ডাক কর্মচারীদের, এই অন্তিম পথ গ্রহণের পূর্বে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। আমি যতদূর জানি শ্রীবালা সাহেব খের, শ্রীমঙ্গলদাস পাকওয়াসা এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মধ্যস্থতা করেছেন। ডাক কর্মচারীরা যদি এঁদের পরামর্শ

অস্বীকার করে থাকেন তবে তাঁরা এক গুরুতর ও বিপজ্জনক কাজ করেছেন। এই সমস্ত শক্তিশালী ইউনিয়ন যদি তাঁদের নিজেদের সরকারকে এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে উপেক্ষা করেন তবে তার ফলে তাঁরা কংগ্রেসকেও অস্বীকার করবেন। তবে কংগ্রেস যদি তাঁদের স্বার্থ বিক্রয় করে তবে এরকম করার অধিকার তাঁদের নিশ্চয় আছে।

সহানুভূতিপূর্ণ ধর্মঘট ততক্ষণ কিছুতেই করা উচিত নয় যতক্ষণ না নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে যত বৈধানিক পথ ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং যতক্ষণ না একথাও প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা তাঁদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে অথবা নির্দয় ও সহানুভূতিহীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যায়লাভ করার জন্য যতক্ষণ না কংগ্রেস সহানুভূতিপূর্ণ ধর্মঘট আহ্বান করে।

সরকারকে বিকল করে দেবার জন্য দেশব্যাপী ধর্মঘট করার কথা শোনা যাচ্ছে। এই ধরনের বিকল করে দেওয়া অন্তিম রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং তা কেবল কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠানই করতে পারে। ইউনিয়নগুলি যত শক্তিশালীই হোক না কেন এ কাজ তারা করতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসই যদি জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয় তবে বিকল করে দেবার কাজও সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের হাতে থাকা উচিত।

এখন কংগ্রেস প্রস্তাবিত সংবিধান সভাকে সফল করার কাজে নিযুক্ত। সেই পথে অশেষ বাধা-বিপত্তি আছে। সরকারের কাজ বিফল করে দেবার জন্য ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হলে তা অবশ্যই কংগ্রেসের কাজে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।

উপরোক্ত কথা থেকে এই সার পাওয়া যায় যে, রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলিকে তাদের নিজস্ব দোষগুণের দ্বারা বিচার করতে হবে এবং তাদের কখনই অর্থ নৈতিক ধর্মঘটগুলির সঙ্গে মিশ্রিত বা যুক্ত করা উচিত হবে না। অহিংসার কর্মসূচীতে রাজনৈতিক ধর্মঘটের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তা কখনই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। এই ধর্মঘটের অবশ্যই উন্মুক্ত থাকা উচিত, গুণ্ডামির দ্বারা কখনই পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। এর পরিণামে কখনো হিংসা হবে না।

সুতরাং সমস্ত ধর্মঘটীর কাছে আমার এই বিনীত পরামর্শ যে, তাঁরা মধ্যস্থতার বা আদালতের মীমাংসা মানবেন বলে খোলাখুলি ঘোষণা করে দিন, কংগ্রেসের পথনির্দেশ লাভের চেষ্টা করুন এবং তার উপদেশ মেনে চলুন। সহানুভূতি

প্রদর্শনের জন্য যাঁরা ধর্মঘট করেছেন তাঁদের আমি বলব যে, কংগ্রেস যখন ঈপ্সিত বিধান সভাকে সফল করার কাজে নিযুক্ত এবং প্রদেশগুলিতে যখন জাতীয় সরকার কাজ করছেন তখন তাঁরা যেন এই রকম ধর্মঘট বন্ধ রাখেন।

উরুলী কাঞ্চন, ৩-৮-৪৬, হরিজন, ১১-৮-৪৬

অষ্টম প্রকরণ : চা-শ্রমিক ও কৃষক

লোক সংগ্রহে পাপাচার

সিরসি (কানাড়া) থেকে একজন পত্রলেখক জানিয়েছেন :—

> 'আসাম চা-করদের একজন এজেণ্ট সেখানকার চা-বাগানে কাজ করার জন্য কুলি ভর্তি করার উদ্দেশ্যে এখানে একটি কেন্দ্র খুলতে চান। তিনি মুসলমান কুলি চান না, কেন না তারা বাধ্য নয়। হিন্দুরা বশ্য বলে তিনি কেবল তাদেরই চান। প্রত্যেক কুলির ভর্তির জন্য তিনি পনের টাকা দেন। এই পাপ কি বন্ধ করা যায় না? এই সম্পর্কে বহু মিথ্যা কথা জানানো হচ্ছে।'

পাপাচারটি নিঃসন্দেহে খুবই প্রবল। আসাম কোন জনবিরল স্থান নয়। দূর কানাড়া থেকে যদি আসামে শ্রমিক নিয়ে যেতে হয় তবে বোঝা যাবে যে, সেখানে নিশ্চয় কোন গোলমেলে ব্যাপার আছে। কানাড়ায় সাধারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে আসামের চা-বাগানের অবস্থা জানা সম্ভবপর নয়। চুক্তি-পত্রের স্বাধীনতা তো দালাল আসা মাত্রই নষ্ট হয়ে যায়, কেন না যে কোন প্রকারে শ্রমিক সংগ্রহ করাই হল দালালের কাজ। কানাড়ীরা যদি ইচ্ছা করে এবং তাদের যাওয়ার ফলে যদি অসমীয়ারা কর্মচ্যুত না হয় তবে তারা আসামে যাক। কিন্তু পত্রলেখকের বর্ণিত তথ্য যদি সত্য হয় তবে বর্তমান ক্ষেত্রে কানাড়ীদের পক্ষে ইচ্ছা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, আর বাইরে থেকে কেউ গেলে অসমীয়াদেরও কর্মচ্যুত হতে হয়। আসামে চা-এর চাষ যদি করতেই হয় তবে যতক্ষণ সেখানে দরিদ্র বেকার লোক থাকবে ততক্ষণ সেখানকার শ্রমিকদের দ্বারাই সে কাজ করতে হবে।

পত্রলেখক লোক-সংগ্রহে এই পাপাচার নিবারণ করা সম্পর্কে আমার পরামর্শ চেয়েছেন। জনমতই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ফলদায়ক উপায়। পত্রলেখক যথেষ্ট কর্মী সংগ্রহ করুন। অবসর সময়ে আশপাশের গ্রামে যাওয়া এবং গ্রামবাসীদের জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের সাবধান করে দেওয়াই হবে এই সব কর্মীদের কাজ। এই কর্মীদের মধ্য থেকে একজনের, হয় নিজে আসামে গিয়ে অথবা ঐ বিষয়ে প্রকাশিত সাহিত্য থেকে আসামের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করা উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৯-২৬

জমিদার ও তালুকদার

সাম্প্রতিক উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণের সময় কয়েকজন তরুণ জমিদারকে নিজেদের জীবন সরল করতে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রায়তদের দুর্দশা লাঘব করতে দেখে আমার যত আনন্দ হয়েছিল আর কিছুতেই তত হয় নি। বহু জমিদারের কথিত অত্যাচারের ভয়াবহ বিবরণ আমি শুনেছিলাম। তাঁরা কিভাবে বিভিন্ন সুযোগে বৈধ ও অবৈধভাবে খাজনা আদায় করতেন এবং যার ফলে রায়তরা একেবারে কৃষিদাসে পরিণত হয়ে যেত, তার কথাও আমি শুনেছিলাম। তাই এই ধরনের কয়েকজন তরুণ তালুকদারদের আবিষ্কার করতে পারা আমার কাছে এক সুখকর বিস্ময় হয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন আরও অগ্রসর এবং সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর সঙ্গে রায়তদের বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। সামান্য যা কিছু করা হয়েছে তার জন্য এখনও খুবই অনুগ্রহব্যঞ্জক ও আত্মতুষ্টির মনোভাব তাঁদের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু করা হোক না কেন তা কখনই রায়তদের প্রাপ্যের বিলম্বিত প্রত্যর্পণের বেশি নয়। তথাকথিত ক্ষত্রিয়রা যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে আর গরীব রায়তরা নিজেদের বংশানুক্রমিক হীনতাকে এই বলেই বিনীতভাবে স্বীকার করে নেয় যে, তাদের কপালে এই জিনিসই লেখা আছে তার জন্য বর্ণাশ্রমের কুৎসিত ব্যঙ্গই হল দায়ী। ভারতীয় সমাজকে যদি শান্তিপূর্ণ পথে প্রকৃত প্রগতি করতে হয় তবে ধনিক-শ্রেণীকে নিশ্চিতরূপে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে যে আত্মা, রায়তদের মধ্যেও সেই এক আত্মা বিরাজ করছে এবং ধনসম্পদ গরীবদের চেয়ে

বেশি কৌলীন্ত তাঁদের দেয় নি। জাপানী মহানুভবদের মত তাঁদেরও নিজেদের সম্পদের অছি বলে মনে করতে হবে, সেই সম্পদ তাঁদের অধীন রায়তদের কল্যাণের জন্তই রক্ষিত। তখন তাঁরা আর তাঁদের পরিশ্রমের কমিশনরূপে সঙ্গত অর্থের একটুও বেশি নেবেন না। বর্তমানে ধনিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর ও অপচয় এবং যে রায়তদের মধ্যে তাঁরা বাস করেন তাদের নোংরা পরিবেশ ও পেষণকারী দারিদ্র্যের মধ্যে কোন অনুপাত নেই। সুতরাং একজন আদর্শ জমিদার এই মুহূর্তে রায়তরা আজ যা ভার বহন করছে তার অনেকাংশ লাঘব করে দেবেন। তিনি রায়তদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবেন, তাদের অভাব জানবেন এবং যে নিরাশা তাদের জীবনকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে তার স্থানে আশার সঞ্চার করবেন। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সম্পর্কে রায়তদের অজ্ঞানতার প্রতি তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবেন না। রায়তরা যাতে জীবনের আবশ্যক বস্তুগুলি পায় তার জন্য তিনি নিজেকে দারিদ্র্যের মধ্যে লীন করে দেবেন। তিনি তাঁর রায়তদের আর্থিক অবস্থার অধ্যয়ন করবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, সেই বিদ্যালয়ে রায়তদের ছেলে ও নিজের সন্তানদের একসঙ্গে তিনি শিক্ষা দেবেন। গ্রামের কুয়া ও পুকুরগুলিকে তিনি পরিষ্কার করাবেন। তিনি নিজে প্রয়োজনমত পরিশ্রম করে রায়তদের রাস্তা ঝাঁট দিতে ও পায়খানা পরিষ্কার করতে শিক্ষা দেবেন। রায়তদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁর বাগানগুলিকেও নিঃসঙ্কোচে উন্মুক্ত করে দেবেন। নিজের প্রমোদের জন্য তিনি যে সব অট্টালিকা রেখেছেন তার অধিকাংশকেই তিনি হাসপাতাল, স্কুল বা ঐ জাতীয় অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহার করবেন। পুঁজিপতি শ্রেণী যদি কেবল কালের সঙ্কেত পাঠ করেই সম্পদ সম্পর্কে তাঁদের আজ যে মনোভাব রয়েছে যে, সম্পদের প্রতি তাঁদের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার আছে তার সংশোধন করেন তবে যে সাত লাখ আবর্জনার স্তূপ আজ গ্রাম বলে পরিগণিত হচ্ছে সেগুলিকে অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যেই শান্তি, স্বাস্থ্য ও সুখধামে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুঁজিপতিরা যদি জাপানীর সমুরাই (ঐশ্বর্যশালী)-দের অনুসরণ করেন তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিছুই হারাবেন না, বরং সব কিছুই পাবেন। কেবল দুটি পথই আছে তা থেকে আমাদের একটি বেছে নিতে হবে। একটি হল, পুঁজিপতিরা তাঁদের প্রাচুর্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন এবং পরিণামস্বরূপ সকলেই প্রকৃত সুখলাভ করবেন। আর অন্যটি হল, সময় থাকতে পুঁজিপতিরা যদি না জাগেন তবে

জাগ্রত কিন্তু অজ্ঞ ও ক্ষুধার্ত কোটি কোটি মানুষ দেশে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে যে, কোন শক্তিশালী সরকারের সশস্ত্র বাহিনীও তা রোধ করতে পারবে না। আমি আশা করি যে, ভারতবর্ষ এই বিপত্তি থেকে রক্ষা পেতে সমর্থ হবে। উত্তর প্রদেশের কয়েকজন তরুণ তালুকদারের সঙ্গে মিলিত হবার যে সুযোগ আমার হয়েছিল তা আমার এই আশাকে আরও বলবতী করেছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১২-২৯

বিশেষ শ্রেণীর হিত*

এখন আমি উপ-শীর্ষক (৫) অর্থাৎ 'বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্রের দ্বারা বিশেষ শ্রেণীর হিতের প্রতিনিধিত্ব'-তে আসছি। বয়স্ক ভোটাধিকারে শ্রমিক এবং ঐ জাতীয় কোন শ্রেণীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অবশ্যই কোন প্রয়োজন নেই আর জমিদার-দের তো তা নিশ্চিতরূপেই নেই। তার যুক্তি আমি আপনাদের বলছি। কংগ্রেসের ইচ্ছা নয় আর এই মূক সর্বহারাদেরও নয় যে, ভূস্বামীদের কাছ থেকে তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু তারা চায় যে, জমিদাররা রায়তদের অছি থাকুক। আমার ধারণায় জমিদারদের পক্ষে এটা গৌরবের কথা যে, এই লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী যারা তাদের রায়ত, তারা তাদের প্রার্থী ও প্রতিনিধিরূপে বাইরের কোন লোককে অথবা নিজেদের মধ্য থেকেই কাউকে ততটা পছন্দ করবে না যতটা এই জমিদারদেরই করবে।

সুতরাং, তা করতে হলে জমিদারদের দৃষ্টি রায়তদের সঙ্গে সমস্বার্থের করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ, এর চেয়ে ভাল তারা আর কী-ই বা করতে পারেন? কিন্তু যদি জমিদাররা, দুটি সভাতেই হোক অথবা জনপ্রিয় একটি সভাতেই হোক, তাতে বিশেষ ব্যবহার ও প্রতিনিধিত্বের জন্য জেদ করেন তবে তার দ্বারা তাঁরা আমাদের মধ্যে সত্যই এক বিবদমান বিষয়ের অবতারণা করবেন বলে আমার ভয় হয়। আমি আশা করি যে, জমিদার বা ঐ জাতীয় কোন শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই রকম দাবি উত্থাপন করা হবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-৩১

---

*লণ্ডনের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ফেডারেল স্ট্রাক্‌চারল কমিটিতে গান্ধীজীর প্রদত্ত ভাষণ থেকে।

কৃষক ও জমিদার

'জমিদারী প্রথার সংস্কার করা হবে, না উচ্ছেদ করা হবে, আমাদের মতভেদের মূল এই প্রশ্নের মধ্যে নিহিত। আমি বলি জমিদারী প্রথার সংস্কার হওয়া উচিত, আর তা যদি না হয় তবে এ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। আপনারা বলেন, এর আর সংস্কার হতেই পারে না'—এই কথাগুলির দ্বারা গান্ধীজী কলিকাতার কংগ্রেসীদের এক ঘরোয়া সভায় সমাজবাদী বিচারধারা ও যাকে সত্যাগ্রহী বিচারধারা বলা যায় তাদের পার্থক্যের তাৎপর্য বললেন। এই বিষয়ে যে বহুবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাদের গোড়ায় এই মৌলিক ভেদ রয়েছে। আর এই সব প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা যে দর্শনে বিশ্বাস করেন তা স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়। যে সব প্রশ্ন অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দেয় তাদের মধ্যে একটি হল :

'জমিদার ও মহাজনরা হল আমলাতন্ত্রের হাতিয়ার। তাঁরা সব সময়েই এদের পক্ষ নিয়েছেন এবং তাঁরা আমাদের প্রগতি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। এই বাধা কেন দূর করা হবে না?'

এর উত্তরে গান্ধীজীর কথা, যাতে তাঁর বিচারধারা প্রতিফলিত হয়েছে তা হল —'তাঁরা আমলাতন্ত্রের অঙ্গ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা এর অসহায় যন্ত্র মাত্র। তাঁরা কি সব সময়েই এই রকম থাকবেন? আমাদের কাছ থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে দেবার মত কোন কাজ আমাদের করা উচিত নয়। তাঁরা যদি তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করেন তবে জাতির জন্য তাঁদের সেবার ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মধ্যে যদি অহিংসা থাকে তবে তাঁদের আমরা ভীত করব না। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন আমাদের দ্বিগুণ সাবধান থাকতে হবে।'

প্রশ্ন—কিন্তু আমরা কি বলতে পারি না যে, জমিদারী প্রথা হল কাল-ব্যতিক্রম, সুতরাং তার অবসান হওয়া উচিত, অবশ্য তা অহিংস উপায়ে।

—আমরা নিশ্চয় তা বলতে পারি। প্রশ্ন হল, আমাদের কি তা বলতেই হবে? আমরা কেন জমিদারদের এই কথা বলতে পারি না যে, এই হল অন্যায়। আমরা আপনাদের নিজে থেকেই এগুলির অপনোদন করতে বলি। আমি মনে করি, এর জন্য মানব-স্বভাবের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন—আপনি কি বলবেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকা উচিত?

—না, এর অবসান হবেই। কৃষকদের সুখী ও সমৃদ্ধ করার উপায় হল তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে তাদের বর্তমান অবস্থার কারণ এবং কি করে তা সংশোধন করা যায় তা বুঝতে পারে। আমরা তাদের অহিংস বা সহিংস যে কোন পথ দেখাতে পারি। সহিংস পথটি লোভনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু অন্তিমে তা বিনাশেরই পথ।

প্রশ্ন—কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন না যে, জমি তারই যে চাষ করে?

—আমি তা বিশ্বাস করি। কিন্তু আবশ্যিকভাবে তার অর্থ এই নয় যে, জমিদারদের অবসান করা উচিত। যে মানুষ বুদ্ধি ও পুঁজি দেয় সেও যে নিজে হাতে চাষ করে তার মত কৃষক। আমাদের লক্ষ্য হল বা তা হওয়া উচিত এই যে, তাদের মধ্যে বর্তমানে যে ভীষণ অসাম্য রয়েছে তা দূর করা।

প্রশ্ন—কিন্তু কৃষকদের কেন জমি বণ্টন করে দেওয়া হবে না?

—এ অবিমৃষ্যকারিতা। জমি আজ তাদের হাতে। কিন্তু নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই এবং সেই অধিকার কি করে প্রয়োগ করতে হয় তাও তারা জানে না। ধরে নিন তাদের বলা হল যে, তারা জমি থেকে সরবে না এবং জমিদারদের খাজনাও দেবে না; তবে আপনারা কি মনে করেন যে, তাদের দুর্দশা অপাসরিত হবে? তারপরেও নিশ্চয় অনেক কিছু করা বাকি থেকে যাবে। আমার পরামর্শ হল যে, সেই কাজই এখন হাতে নেওয়া উচিত আর যা বাকি তা দিনান্তে রাত্রির আগমনের মত অবশ্যম্ভাবীরূপে হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে কিষাণ-সভাগুলি, তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক, তাদের আশয় এবং কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হল।

গান্ধীজী বললেন, 'সারা জীবন ধরে আমি কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছি। তার ফলে আমার মত সুস্পষ্ট। কিষাণ-সভাগুলিকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতে অথবা যখন স্বাভাবিক পথে আসবে তখন তাদের পদাধিকারীদের কংগ্রেসের পদাধিকারী হতে দিতে কংগ্রেসের পক্ষে কোন সাংবিধানিক বাধা নেই। কিন্তু স্বতন্ত্র কিষাণ-সংঘগুলিকে অধ্যয়ন করার পর আমি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সেগুলি কৃষকদের হিতের জন্য কাজ করছে না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা কৃষকদের ঠিক পথে চালিত করেও এই কাজ করতে পারে; কিন্তু আমার মনে হয় তারা কৃষকদের ভুল পথেই চালিত করছে। যদি কৃষকরা এবং তাদের নেতারা যে সব কাজ কংগ্রেসের স্বীকৃত সেগুলি ছাড়া অন্য কোন কাজ না করে কংগ্রেসকে দখল করে

তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তারা যদি মিথ্যা রেজিস্টার তৈরী করে, সভা-সমিতিগুলি আক্রমণ করে বা ঐ জাতীয় অন্য কিছুর দ্বারা এই কাজ করে তবে তা ফ্যাসিজ্‌মের মতই কাজ হবে।

'কিন্তু প্রধান প্রশ্ন হল যে, আপনারা কি চান, কিষাণ সভাগুলি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে, না দুর্বল করবে? কিষাণ-সভাগুলি কংগ্রেসকে বেদখল করার জন্য ব্যবহার করা হবে, না কৃষকদের সেবা করার জন্য? দৃশ্যতঃ কংগ্রেসের নাম নিলেও কিষাণ সভাগুলি প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের এক বিরোধী প্রতিষ্ঠান হবে, না কংগ্রেসের কর্মসূচী ও নীতি অনুসরণকারগ এক প্রতিষ্ঠান হবে? এ যদি প্রকৃতপক্ষে বিরোধী প্রতিষ্ঠান হয় আর শুধু নামেই কংগ্রেস থাকে তবে কংগ্রেসকে বাধা দিতেই এর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় হবে এবং কংগ্রেসও কিষাণ-সভাকে প্রতিরোধ করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করবে আর তার ফলে দরিদ্র কৃষকরা যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে পিষ্ট হবে।'

হরিজন, ২৩-৪-৩৮

অহিংস অনুমোদন

ধরা যাক যে, একজন জমিদার তাঁর প্রজাদের শোষণ করে এবং তাদের পরিশ্রমের ফল নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে তাদের বঞ্চিত করেন। তারা যখন অনুযোগ করে তখন তিনি মোটেই কর্ণপাত করেন না এবং এই বলে আপত্তি তোলেন যে, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়ে প্রভৃতির জন্য এত এত দরকার। তখন কৃষকরা বা তাদের পক্ষাবলম্বনকারী এবং কৃষকদের উপর যাদের প্রভাব আছে তাঁরা জমিদারের স্ত্রীকে এই অনুরোধ করবেন যে, তিনি যেন তাঁর স্বামীর কাছে অনুযোগ করেন। সম্ভবত তিনি বলবেন যে, তাঁর নিজের জন্য স্বামীর শোষিত অর্থের প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েরা বলবে যে, তাদের যা প্রয়োজন তা তারা নিজেরাই অর্জন করে নেবে।

ধরা গেল যে, তিান কারও কথাই শুনলেন না অথবা তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাও সমবেতভাবে প্রজাদের বিরুদ্ধে গেল। তবু তারা দমিত হবে না। তাদের যদি বলা হয় তবে তারা জমি ছেড়ে চলেও যাবে কিন্তু তবু তারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে যে, যে চাষ করে জমি তারই। মালিক সমস্ত জমি নিজে চাষ করতে পারেন না এবং তাঁকে তাদের ন্যায্য দাবি স্বীকার করতেই হবে।

অবশ্য এমন হতে পারে যে, নতুন প্রজার দল তাদের স্থান দখল করল। তখন যতক্ষণ না স্থানাধিকারী প্রজারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং উৎখাদিত প্রজাদের সঙ্গে যোগ দেয় ততক্ষণ হিংসা না করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সত্যাগ্রহ জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার এক প্রক্রিয়া। এটি এমন যে, সমাজের সমস্ত তত্ত্বকেই সে আবৃত করে দেয় এবং অন্তিমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হিংসা এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং সমগ্র সমাজ-পঞ্জরে প্রকৃত বিপ্লবকে বিলম্বিত করে দেয়।

সত্যাগ্রহ সার্থক করতে এই শর্তগুলি প্রয়োজন : (১) সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র ঘৃণা থাকা উচিত নয়; (২) বিষয়টি সত্য ও যথার্থ হওয়া উচিত, (৩) সত্যাগ্রহীকে তার কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

হরিজন, ৩১-৩-৪৬

নবম প্রকরণ ঃ অছিরূপে পুঁজিপতি ও জমিদার

তথাকথিত অসঙ্গতি

আমার এমন কয়েকজন নাছোড়বান্দা পত্রলেখক আছেন যাঁরা আমার সামনে কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। এই রকম পত্রলেখকের একটি চিঠির নমুনা দিচ্ছি :—

> 'যখনই আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় এবং যখনই আপনাকে পুঁজি ও শ্রমের আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখনই আপনি অছিবাদের কথা তুলেছেন। এটি সর্বদাই আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। আপনি চান যে, ধনিকরা তাদের সমস্ত সম্পদ গরীবদের অছিরূপে রাখবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করবে। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে, এ কি সম্ভবপর, তাহলে আপনি বলবেন যে, মানবস্বভাবের মূল স্বার্থপরতা এই বিশ্বাস থেকেই আমার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় আর আপনার সিদ্ধান্তের আধার হল মানবস্বভাবের মূল

শ্রেষ্ঠতা। অবশ্য মানবস্বভাবের মূল যে শ্রেষ্ঠতা এই বিশ্বাস ত্যাগ না করেও আপনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখেন না। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের প্রভুত্বের জন্য এই অছিবাদের দোহাই দেন। কিন্তু আপনি বহু পূর্বেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন এবং আজ আপনার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই। রাজনৈতিক জগতে এক বিধি আর অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধির মধ্যে কি কোন সঙ্গতি আছে? অথবা আপনি কি বলতে চান যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশদের প্রতি আপনি যেমন আস্থা হারিয়েছেন, পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের প্রতি সে-রকম হারান নি? কারণ, আপনার অছিবাদের সিদ্ধান্ত অনেকটা রাজাদের দৈব-অধিকারবাদের মতই শোনায়, আর এই দৈব-অধিকারবাদ তো অনেক দিন আগেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অন্য সকলের অছি হয়ে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার জন্য যে লোকটিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং যে সেই ক্ষমতা তাদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিল সে যখন তার অপব্যবহার করল তখন জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং গণতন্ত্রের জন্ম হয়। সেই রকম, আজ মুষ্টিমেয় লোক যাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে এবং যাদের অছি রূপে থাকা তাদের উচিত, তারা যখন সেই ক্ষমতাকে আত্মোন্নতির জন্য প্রয়োগ করে ও অবশিষ্ট লোকদের বঞ্চিত করে রাখে তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই হবে যে, অধিকাংশ লোক ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে অর্থাৎ সমাজবাদের জন্ম হবে।

'এযাবৎ ভাল-মন্দ যা কিছু অর্জন করার জন্য হিংসাই একমাত্র স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। এমন কি যখন ভাল কিছু পাবার উদ্দেশ্যেও হিংসা প্রযুক্ত হয় তখন তার সাথে সাথে মন্দও এসে যায় এবং লব্ধ ভালর সঙ্গে রফা করে নেয়। এখন আমি স্বীকার করি যে, জগতে আপনার শ্রেষ্ঠ দান হল যে অপর একটি পদ্ধতি অর্থাৎ অহিংসার সার্থক প্রয়োগ আপনি দেখিয়েছেন। অহিংসা হিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তার ফলে মানবীয় সম্পর্ক বিষাক্ত হয় না। সুতরাং আমার ঐকান্তিক আশা যে, আপনি অহিংস উপায়ে সংগ্রাম

করে বর্তমান ব্যবস্থার অবসান করবেন এবং এক নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টিতে সাহায্য করবেন।’

পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমার ব্যবহারে আমি কোন অসঙ্গতি দেখি না। আমার পত্রলেখক বুদ্ধিভ্রমের দ্বারা চালিত হয়েছেন। রাজা, সাম্রাজ্যবাদী অথবা পুঁজিবাদীরা কি দাবি করেন এবং করছেন তার উল্লেখ বা চিন্তা আমি করি নি। পুঁজির বিনিয়োগ কিভাবে হবে আমি সে সম্পর্কে বলেছি এবং লিখেছি। তাছাডা, দাবি করা এক জিনিস আর সেই অনুসারে জীবন যাপন করা ভিন্ন জিনিস। ধরুন আমার মত প্রত্যেক লোকই জনগণের সেবক বলে দাবি করলে কেবল মুখের কথাতেই সেবক হয়ে যায় না। আবার আমার মতন লোকেরা যদি সকলেই দাবি অনুসারে জীবন যাপন করে তবে সবাই আমাদের কদর করবে। তেমনি, কোন পুঁজিপতি যদি একক মালিকানা সত্ব থেকে নিজেকে চ্যুত করে এবং ঘোষণা করে যে, তার কাছে যে সম্পদ আছে সে তার অছি মাত্র, তবে সকলেই উল্লসিত হবে।

খুব সম্ভব আমাদের উপদেশ গৃহীত হবে না এবং আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে না। কিন্তু এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে যে, সমাজবাদীদের স্বপ্ন বাস্তব হবে? পুঁজিপতিরা পুঁজির অপব্যবহার করেন, এই আবিষ্কারের ফলে সমাজবাদের জন্ম হয় নি। আমি তো বলেছি যে, কেবল সমাজবাদ নয়, সাম্যবাদও ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আসল ব্যাপারটি হল যে, যখন কয়েকজন সংস্কারক হৃদয় পরিবর্তনের পদ্ধতির প্রতি আস্থা হারালেন তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলে কথিত জিনিসটির জন্ম হল। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের সামনে যে সমস্যা আমি সেইগুলিরই সমাধানে প্রযুক্ত। অবশ্য একথা ঠিক যে, সদাসর্বদা এবং একমাত্র নির্ভেজাল অহিংসার পথই আমার পথ। এ ব্যর্থ হতে পারে। তা যদি হয় তবে অহিংসার কৌশল সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার জন্যই তা হবে। যে মতবাদের প্রতি আমার বিশ্বাস দিন দিন বেড়ে চলেছে আমি তার একজন মন্দ ব্যাখ্যাতাও হতে পারি। অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এবং অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ হল সেই প্রতিষ্ঠান যাদের মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে অহিংসার কৌশলের পরীক্ষা হচ্ছে। কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যেখানে নীতির হের-ফের সর্বদাই হতে পারে তার বন্ধনে না পড়ে আমি যাতে আমার পরীক্ষা চালিয়ে যেতে সক্ষম হই সেইজন্যই কংগ্রেস এগুলিকে স্বতন্ত্র সংস্থারূপে সৃষ্টি করেছে। আমার কল্পনার অছিবাদকে এখন তো আপন

মূল্য সিদ্ধ করতে হবে। যোগ্য লোকদের দ্বারা জনগণের সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার কি করে করা যায় এ তারই এক প্রচেষ্টা।

হরিজন, ২০-২-৩৭

অছিবাদের সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন—আপনার লেখা থেকে মনে হয় যে, আপনার 'অছি' সদ্‌ভাবনাশীল, পরহিতৈষী দাতার অধিক কিছু নয়; যেমন কিনা প্রথম পারসী বারোনেট, টাটা, ওয়াদিয়ারা, বিড়লারা, শ্রীবাজাজ প্রভৃতি। তাই কি? আপনি কি দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন যে, কোন ধনীর সম্পদ থেকে লাভগ্রহণে প্রাথমিক বা প্রকৃত অধিকার কাদের আছে বলে আপনি মনে করেন? যে পরিমাণ টাকা বা আয় ও পুঁজির অংশ ধনীরা নিজেদের জন্য, আত্মীয়স্বজনের জন্য এবং অ-সার্বজনিক কাজে খরচ করতে পারবেন তার কি কোন সীমা থাকবে? কেউ যদি এই সীমা অতিক্রম করে তবে তাকে কি বাধা দেওয়া যেতে পারে? অছিরূপে কেউ যদি তার দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হয় অথবা অন্য কারণে বিকল হয় তবে কি তার সম্পদের লাভ গ্রহণকারীদের দ্বারা অথবা রাষ্ট্রের দ্বারা তাকে অপসারিত এবং হিসাব পেশ করতে বাধ্য করা যেতে পারে? এই নীতি কি রাজন্য ও জমিদারদের বেলাতেও প্রযোজ্য, না তাদের অছিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির?

—অছিবাদের আদর্শ যদি শক্তিশালী হয় তবে পরোপকার বলতে আমরা যা বুঝি তা থাকবে না। যাঁদের নাম আপনি করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র যমুনালালজীই এর নিকটে এসেছিলেন; কিন্তু কেবল নিকটেই। জনসাধারণ ছাড়া অছির অন্য কোন উত্তরাধিকারী হয় না। অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে অছিদের কমিশন নিয়ন্ত্রিত হবে। রাজন্য ও জমিদাররাও অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের সমতুল্য হবেন।

সেবাগ্রাম, ৬-৪-৪২; হরিজন, ১২-৪-৪২

অছিবাদ

প্রশ্ন—কেবল হিংসার দ্বারাই যা লব্ধ হতে পারে তা কি অহিংসার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভবপর ?

—হিংসার দ্বারা যা লব্ধ হয় তা অহিংসার দ্বারা রক্ষিত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, অহিংসার শর্ত হল যে, অন্যায় উপায়ে প্রাপ্ত সমস্ত জিনিস ত্যাগ করতে হবে।

—উন্মুক্ত বা প্রচ্ছন্ন হিংসা ছাড়া কোন উপায়ে পুঁজি সংগ্রহ করা কি সম্ভবপর ?

—সহিংস উপায় ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এই রকম পুঁজি সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু অহিংস সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক সংগ্রহ করা কেবল সম্ভবপরই নয় উপরন্তু তা বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী।

—সমাজের অন্যান্য লোকদের সাহায্য বা সহযোগিতার দ্বারাই মানুষ যা কিছু ভৌতিক বা নৈতিক সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে। তা হলে সেই সম্পদের যে-কোন অংশ ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যয় করার নৈতিক অধিকার কি তার আছে ?

—না, তার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

—একজন অছির উত্তরাধিকারী কি ভাবে নির্ধারিত হবে ? তাঁর কি কেবল নাম প্রস্তাব করারই অধিকার থাকবে ; চূড়ান্ত নির্ণয়ের অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের ?

—মূল মালিক, অর্থাৎ যিনি প্রথম অছি হবেন তাঁরই নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। তবে রাষ্ট্রের দ্বারাই নির্বাচনের চূড়ান্ত নির্ণয় হবে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং ব্যষ্টি, উভয়ের ক্ষেত্রেই অনুশাসন থাকবে।

—অছিবাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার ফলে যখন এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সার্বজনীন সম্পত্তিতে রূপায়িত হয়ে যাবে তখন কি হিংসার সাধন যে রাষ্ট্র তার হাতে মালিকানা থাকবে, নাকি গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির মত স্বাধীন প্রকৃতিবিশিষ্ট সংগঠনগুলির থাকবে ? অবশ্য এই সংগঠনগুলি তো রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা তাদের চূড়ান্ত অধিকার লাভ করবে।

—এই প্রশ্নের মধ্যে চিন্তা-বিকৃতি রয়েছে। রূপান্তরিত অবস্থায় আইনত

মালিকানা অছিরই থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্রে তা বর্তাবে না। রাষ্ট্রের বাজেয়াপ্ত পরিহার করার জন্ম এবং সমাজের জন্ম মূল মালিকের যোগ্যতাকে তার নিজস্ব অধিকারে রাখার জন্ম অছিবাদের সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রও যে সব সময় হিংসাশ্রিত হবে তার কোন কথা নেই। মতবাদের দিক থেকে তা ঠিক হতে পারে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ এমন রাষ্ট্রের দাবি করে যা বহুলাংশে অহিংসার উপর আশ্রিত হবে।

সাতঘরিয়া (নোয়াখালি), ২-২-৪৭ , হরিজন, ১৬-২-৪৭

ট্রাস্ট কী

'আপনি ধনবানদের অছি হয়ে যেতে বলেছেন। তার অর্থ কি এই যে নিজেদের ব্যক্তিগত মালিকানার বিসর্জন তাঁদের করতে হবে এবং এমন একটি ট্রাস্ট তৈরী করতে হবে, যা আইনের চোখে বৈধ হবে এবং যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে ? বর্তমান অধিকারীর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী কিভাবে নির্ধারিত হবে ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন যে, বহু বৎসর পূর্বে তিনি যে মত পোষণ করতেন আজও তাঁর আস্থা সেই মতের প্রতি আছে এবং তা হল এই যে, প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের থেকেই তা এসেছে। সুতরাং তা তাঁর সৃষ্ট সমস্ত মানুষেরই, কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। যখন কোন লোকের কাছে তাঁর নিজের আনুপাতিক অংশের বেশি থাকে তখন তিনি সেই বাড়তি অংশের জন্ম ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের অছি হয়ে যান।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সেজন্ম তাঁর জমা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি প্রতিদিন সৃষ্টি করে যান ; আর তারই সিদ্ধান্ত রূপে মানুষের প্রতিদিনের কাজ প্রত্যেক দিন করা উচিত, বস্তু জমা করার প্রয়োজন নেই। জনগণ যদি সাধারণ-ভাবে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে তবে তা আইনসঙ্গত হয়ে যাবে এবং অছিবাদ বৈধ সংগঠনে পরিণত হয়ে যাবে। তিনি চান যে, বিশ্বের কাছে এটি যেন ভারতের বিশেষ দান হয়ে যায়। তখন আর কোন শোষণ থাকবে না এবং অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশ যেমন সাদা চামড়ার লোকদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্ম সংরক্ষিত স্থান হয়ে রয়েছে তাও থাকবে না। এই ভেদভাবের মধ্যেই যুদ্ধের বীজ নিহিত। আর এই যুদ্ধ বিগত দুটি যুদ্ধের চেয়েও উগ্রতর হবে। উত্তরা-

ধিকারী বিষয়ে কথা হল যে, পদাসীন ট্রাস্টির উত্তরাধিকারীর নাম মনোনয়নের অধিকার থাকবে, তবে তা আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই।

হরিজন, ২৩-২-৪৭

রাজা ও জমিদার

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বর্তমান রাজা ও অন্যান্যরা কি দরিদ্রের অছি হয়ে যাবেন বলে আশা করা যেতে পারে? যদি তাঁরা নিজে থেকেই অছি হয়ে না যান তবে পরিস্থিতির জোরই এই সংশোধন করে নেবে; অবশ্য যদি না তাঁরা সম্পূর্ণ বিনাশের আকাঙ্ক্ষা করেন। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে হিংসা যা কখনই করতে পারে না জনমতই তা করে দেবে। সাধারণ লোকেরা যতক্ষণ না তাদের নিজেদের শক্তি উপলব্ধি করছে কেবল ততক্ষণই জমিদার, পুঁজিপতি ও রাজারা বর্তমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। লোকেরা যদি জমিদারী ও পুঁজিবাদের অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করে তবে তা নির্জীব হয়ে মরে যাবে। পঞ্চায়েত রাজে কেবল পঞ্চায়েতকেই মান্য করা হবে এবং পঞ্চায়েতেও কেবল তাদের সৃষ্ট আইনের মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

হরিজন, ২৩-২-৪৭

দশম প্রকরণ ঃ দরিদ্র

শ্রম বিনা খাওয়া বন্ধ

কিছুদিন আগে আমাকে কলিকাতার 'মার্বেল প্যালেস' নামে এক ঐশ্বর্যময় সৌধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই বাড়িটি কতকগুলি খুব মূল্যবান এবং কয়েকটি খুব সুন্দর চিত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। বাড়ির মালিক যত ভিক্ষুকই আসুক না কেন তাদের সকলকেই এই অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে খাওয়ান এবং আমাকে বলা হয় যে, তাদের সংখ্যা প্রতিদিন কয়েক হাজারের মত হয়। নিঃসন্দেহে এটি এক রাজকীয় দান। এর দ্বারা দাতাদের পরোপকার বৃত্তির প্রকাশ হয়। এবং তা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু একদিকে এই চীরধারী

মানুষদের খাওয়ানো আর অন্যদিকে রাজপ্রাসাদ এই দুটির অসঙ্গতি যে ঐ মানুষদের দুর্দশাকেই ব্যঙ্গ করে এ কথা দাতাদের মনে একেবারেই উদয় হয় না। সিউড়িতে গিয়েও আমি এই রকম এক বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখেছি। সেখানে অভ্যর্থনা সমিতি জেলার ভিখারীদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মার্বেল প্যালেসে যে জনতা আমাকে বেষ্টন করেছিল তারা মাটির উপর ময়লা পাতা রেখে যে সব ভিখারী খাচ্ছিল তাদের পংক্তি অতিক্রম করেই এসেছিল। কয়েকজন তো প্রায় তাদের মাড়িয়েই ফেলেছিল। সিউড়িতে কিছু ভাল ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে জনতা ভিখারীদের পংক্তি অতিক্রম করে আসে নি। কিন্তু যে মোটরগাড়ীটি আমাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাচ্ছিল সেটিকে আহাররত ভিক্ষুকদের সারির মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি নিজেকে অপমানিত মনে করি। বিশেষ করে এই কথা আরও ভেবে যে, এই সমস্তই আমার সম্মানের জন্য করা হয়েছে। কারণ সেখানকার এক বন্ধুই আমাকে বলেন যে, আমি হলাম 'দরিদ্রের বন্ধু'। মানব সমাজের এক বিরাট অংশের ভিক্ষুক হয়ে থাকাতেই যদি আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম তবে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এক দুঃখপূর্ণ ঘটনা হত। আমার বন্ধুরা খুব অল্পই জানেন যে, ভারতবর্ষের কাঙালদের প্রতি আমার মিত্রতা আমাকে এতদূর কঠিন হৃদয় করে দিয়েছে যে, তাদের একেবারে ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে যাবার তুলনায় তাদের অনশনে মৃত্যুবরণ করাকেই আমি নির্বিকার চিত্তে প্রত্যাশা করব। জীবিকা অর্জনের জন্য একজন সুস্থ লোক যদি সততার সঙ্গে কোন না কোন উপায়ে কাজ না করে তবে তাকে বিনামূল্যে খাদ্য দেবার আদর্শকে আমার অহিংসা বরদাস্ত করে না, বরং আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে যেখান থেকে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়, এই রকম প্রত্যেকটি সদাব্রতকে আমি বন্ধ করে দিতাম। এগুলির ফলে জাতির পতন হয়েছে এবং এগুলি আলস্য, শ্রমবিমুখতা, ভণ্ডামি এবং এমন কি অপরাধপ্রবণতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। এই অপাত্রে দান দেশের ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কোন সম্পদকেই কিছুমাত্র বৃদ্ধি করে না। অথচ দাতার মনে শ্লাঘার মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে। দাতারা যদি এমন প্রতিষ্ঠান গঠন করতেন যেখানে পুরুষ ও নারী দাতাদের পক্ষে কাজ করার বিনিময়ে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে খাদ্য পাবে তবে তা কত সুন্দর ও বুদ্ধিমানের কাজ হত। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, চরখা বা তার সঙ্গে সম্বন্ধিত ঐ জাতীয় কোন কাজই হল এ বিষয়ের আদর্শ

পন্থা। কিন্তু সে বিশ্বাস যদি তাঁদের না থাকে, তবে অন্য যে-কোন কাজ তাঁরা বেছে নিতে পারেন। নিয়ম কেবল এই হওয়া উচিত যে, 'বিনাশ্রমে খাওয়া বন্ধ'। প্রত্যেক শহরেরই ভিক্ষুকদের বিষয়ে নিজস্ব কঠিন সমস্যা আছে; আর এই সমস্যার জন্য ধনবানরাই দায়ী। আমি জানি যে, অলস ব্যক্তিদের মুখের সামনে আহার্য ছুঁড়ে ফেলা সহজতর কাজ, কিন্তু যেখানে খাদ্য পরিবেশন করার আগে সততার সঙ্গে শ্রম করতে হবে এমন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা খুবই শক্ত কাজ। আর্থিক দৃষ্টিতে, অন্তত প্রারম্ভিক অবস্থায়, বর্তমানের বিনামূল্যে খাদ্য দেবার ব্যবস্থায় যা ব্যয় হয় তার তুলনায় খেতে দেবার আগে কাজ নেবার পরিকল্পনায় খরচ বেশি হবে। কিন্তু আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, দেশের অলস লোকের বর্ধমান সংখ্যাকে যদি আমরা জ্যামিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধি করতে না চাই তবে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সুলভতর হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-৮-২৫

কাজই দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতিকার

গ্রাম সেবক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি ভাষণে গান্ধীজী বললেন, আমাদের দেশের নগ্নদারিদ্র্য এবং কর্মহীনতা দেখে আমি বাস্তবিকই কেঁদে ফেলেছি কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের ঔদাসীন্য ও অজ্ঞানতা তার জন্য বহুলাংশে দায়ী। আমরা শ্রমের মর্যাদা বলে কিছু জানি না। সেজন্য একজন মুচি জুতা প্রস্তুত ব্যতীত অন্য কোন কাজ করবে না, অন্য সমস্ত শ্রমকে সে তার মর্যাদার পক্ষে অপমানকর বলে মনে করবে। এই মিথ্যা ধারণা চলে যাওয়া উচিত। যারা সততার সঙ্গে দৈহিক শ্রম করবে তাদের জন্য ভারতবর্ষে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। ঈশ্বর প্রত্যেককেই কাজ করবার এবং প্রতিদিনের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক উপার্জন করবার ক্ষমতা দিয়েছেন আর যে কেউ সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় তার কাছে কোন কাজই হীন নয়। কেবল এইটুকু দেখতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের যে হাত-পা দিয়েছেন সেগুলির ব্যবহার করতে আমরা যেন প্রস্তুত থাকি।

হরিজন, ১৯-১২-৩৬

গরীবদের জন্য ঘর

বাঙ্গালোর শহরের মিউনিসিপ্যালিটি ১৮ একরের একটি সুন্দর খোলা জায়গায় এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা খরচে তার সামান্য কর্মচারীদের জন্য দু'শ পঞ্চাশটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। বাড়ীগুলি প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা এবং প্রত্যেকটিতে আলো বাতাসের সুব্যবস্থা আছে। এই কলোনীতে একটি বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা থাকবে। গত ২৪শে জুন দেওয়ান এই কলোনীটির উদ্ঘাটন করেছেন।

গান্ধীজীকে এই কলোনীটি দেখার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে তার খুঁটিনাটি দেখলেন এবং বললেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি তার কর্মচারীদের জন্য এই ব্যবস্থা করায় যদিও তিনি আনন্দিত তবু ব্যবস্থা যে অপ্রচুর একথা না বলে তিনি পারছেন না। "কয়েকদিন আগে 'কোলার গোল্ড ফিল্ডের' কর্মীদের কুটিরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমি মন্তব্য না করে পারলাম না, কুটিরগুলি মানুষের বাসযোগ্য নয়। যখন মাইনিং কোম্পানি শতকরা ৩০-৪০ ভাগের মত মোট লভ্যাংশ ঘোষণা করছেন তখন এই লাভ যারা তুলে দিচ্ছে সেই শ্রমিকদেরই থাকার জন্য এরকম শোচনীয় কুটিরের ব্যবস্থাকে আমার কাছে নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলে মনে হয়। আপনারা এখানে যেসব কুটির নির্মাণ করেছেন তা অপেক্ষাকৃত ভাল, এগুলিতে আলোবাতাসের ভাল ব্যবস্থা আছে এবং ভাল জায়গাতেও এগুলি অবস্থিত। কিন্তু অবিবাহিতদের জন্য, বিবাহিত দম্পতির জন্য এবং যাদের ছেলে-মেয়ে আছে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ন্যূনতম নিয়ম হওয়া উচিত। আমাদের বোঝা উচিত যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এক সাথে একই ঘরে থাকা উচিত নয়। এই ঘর-গুলির মধ্যে কোন নিভৃত স্থানের ব্যবস্থা নেই। আমি বুঝতে পারি না যে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তাদের গরীব কর্মচারীদের জন্য এতটা বাড়তি জমি কেন দেয়! এই বাড়ীগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে আর একটি ঘর ও একটু বারান্দা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আমি আনন্দিত যে, হরিজন কর্মচারীদের জন্যও এই রকম ব্যবস্থা করার ইচ্ছা আপনাদের আছে। কিন্তু আমি প্রার্থনা করব যে, তাদের জন্য যখন আপনারা গৃহ নির্মাণ করবেন তখন যেন

এই পরামর্শগুলি স্মরণে রাখেন। বেদনাহত চিত্তে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এখনও বহু মিউনিসিপ্যালিটি আছে যারা তাদের নিম্নতম বেতনের কর্মচারীদের থাকার জন্য ঘরের সুবিধা করে দেয় নি। আমি জানি না যে, কবে আমরা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেবকদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা উপলব্ধি করব। অবিলম্বে তা যদি না করি তবে আমাদের সমাজের উপর শীঘ্রই সর্বনাশ এসে যাবে। সমাজ যদি নিজেই এর সংশোধন করে না নেয় তবে তার সর্বনাশ হওয়াই উচিত।"

হরিজন, ১১-৭-৩৬

গরীবদের জন্য আশ্রয়

গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা প্রবচনে এই পরামর্শ দিলেন যে, মুসৌরিতে এমন একটি স্থান থাকা উচিত যেখানে প্রয়োজন হলেই গরীবরা আসতে পারবে এবং পাহাড়ের জল-হাওয়ার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।…"আমি ইচ্ছে করেই নিজে হরিজন হয়ে গিয়েছি। সেই জায়গায় থাকতেই আমি পছন্দ করব যেখানে হরিজনরাও এসে থাকতে পারবে। যে হরিজন হয়ে জন্মেছে সে তার বর্ণ ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আমি নিজেই যখন ইচ্ছা করে হরিজন হয়েছি তখন তা কি করে করব? আমি কোন সঙ্কোচ না করেই সবর্ণ হিন্দুদের এই পরামর্শ দিয়েছি যে, যদি হিন্দুধর্ম থেকে জাত্যাভিমানের ক্ষত দূর করতে হয় এবং পৃথিবী থেকে হিন্দুধর্মকে মুছে ফেলতে না হয় তবে আজ তাদের অতিশূদ্র হতে হবে।" মুসৌরিতেও যদি এমন একটি স্থান থাকে যেখানে হরিজনরাও থাকতে পারে তবে তিনি সেখানে এসেই থাকবেন। পাঁচগণি পাহাড়েও গান্ধীজী অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পরামর্শে সাড়া দিয়ে লোকেরা সেখানে ঐ জাতীয় একটি স্থান নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। মুসৌরির নাগরিকদের মধ্যেও ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠনের কথাবার্তা চলছে, এই সংবাদটি তিনি উপস্থিত জনতাকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন।

হরিজন, ৯-৬-৪৬

গরীবদের ভুলে যেও না

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বললেন যে, তিনি শুনেছেন, মুসৌরিতে শ্রমিকদের থাকার জায়গার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারা ছোট, জনাকীর্ণ, নোংরা এবং তুর্গন্ধময় ঘরে বাস করে। কেউই এই বিষয়কে উপেক্ষা করতে পারে না। সব মানুষই সমান। আমরা যদি কেবল নিজেদের ঘরগুলিই পরিষ্কার করি এবং প্রতিবেশীদের ঘরগুলি উপেক্ষা করি তবে সেই উপেক্ষার মূল্য আমাদের মহামারী বা ঐ রকমের কোন বিপত্তির দ্বারা শোধ করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলি প্লেগ রোগ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। তিনি নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেছেন যে, জোহানস্‌বার্গ মিউনিসিপ্যালিটি কিরকম তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে প্লেগ রোগকে এমনভাবে রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল যে, সে রোগ আর কখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু ভারতবর্ষে তা বার বার দেখা দিচ্ছে—এ প্রায় এক স্থায়ী রোগে পরিণত হয়ে গিয়েছে। "প্রতিকার আমাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। কেবল নিজেদের দেহ সম্পর্কেই স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নীতি অনুসরণ করলে আমাদের চলবে না, আমাদের প্রতিবেশীরাও করছে কিনা তা আমাদের দেখতে হবে। এতে গাফিলতি করা এক পাপ এবং তার দণ্ড থেকেও আমরা অব্যাহতি পেতে পারি না। ধনিকরা যদি গরীবদের ভুলে না যায় এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পদ ভাগ করে নেয়, আর অপরের ক্ষতি করে বা অপরের ধনক্ষয় করে যদি সম্পদ সংগৃহীত না হয়ে থাকে তবে ধনিকের সম্পদের প্রতি আমি দ্বেষ করি না।"

হরিজন, ১৬-৬-৪৬

পাপের সিন্ধুক

সিমলার মত মুসৌরিতেও গান্ধীজী একাধিকবার লোকেদের পাপের সিন্ধুক খুলে দেখালেন। তিনি তাদের গরীব রিক্সাচালক ও মুটেদের কথা বললেন। এদের সম্বন্ধে সকলেরই চিন্তা করা উচিত। এরা ধনবানদের জীবন যাপন সম্ভবপর করে তোলে। তবু ধনবানরা এদের কাছ থেকে রিক্সা টানার মত অমানুষিক কাজ নিতে প্রস্তুত থাকলেও এরা কোথায় এবং কিভাবে থাকে, কি খায়, কি উপার্জন করে, সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করেন না। তিনি শুনেছেন যে, এই

সব লোকেরা উপযুক্ত আলোবাতাসহীন খুব ছোট ছোট ঘরে থাকে ; আর এই রকম ঘরে কতজন যে একসঙ্গে মাথা গুঁজে থাকে সে কথাও তারা জানাতে চায় না পাছে তাদের উৎখাত বা জরিমানা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তে এদের যে ছোট ভিড এসেছিল তা থেকেই দেখতে পাওয়া যে, এদের কাপড় চোপড় খুব ময়লা। কিন্তু বোধ হয় আর এক প্রস্থ কাপড় রাখার মত সাধনই এদের নেই। এদের অবস্থাও বোধ হয় বিহারের মেয়েদের মতই। তিনি যখন সেখানে প্রথম গিয়েছিলেন তখন একটি মেয়েকে চান করতে ও কাপড কাচতে বলায় সে কস্তুরবাকে উত্তর দিয়েছিল: "পরবার জন্ম আর একটি শাড়ীও যখন আমার নেই তখন আমি কি করে চান করতে পারি ?" ঈশ্বর যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়েছেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হল যাদের অভাব আছে তাদের জন্ম বাড়তি টাকা ব্যয় করা। তাঁকে বলা হয়েছে যে, এখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং তারা সর্বত্রই শ্রমিক বস্তিগুলি যাতে পুনর্নির্মিত হয় তা দেখবে। তারা যদি তা করে তবে তা ভাল কাজই হবে। আর এই কাজও তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্যের অতিরিক্ত কিছু নয়। অবশ্য তাতে যারা রিক্সা চড়ে তাদের কর্তব্যের দায়মোচন হবে না। ডাক্তাররা তাঁকে বলেছেন যে, এই হতভাগ্য লোকেরা চার বছর বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তাদের রিক্সা টানতে পারে এবং এই কাজ এত কঠিন যে, তার কিছু পরেই এরা ফুসফুস ও হৃদরোগে মারা যায়। রিক্সা ব্যবহারকারীরা কি করে এত হৃদয়হীন হতে পারে যে, এরা ভাল ঘর পেল কিনা, যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হল কিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক আছে কিনা এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করছে কিনা, সে সম্বন্ধে তারা লক্ষ্য করবে না ?

হরিজন, ১৬-৬-৪৬

দারিদ্র্যের মর্যাদা

গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় 'দারিদ্র্যের মর্যাদার' উল্লেখ করলেন। যে গানটি গীত হয়েছিল তাতেভ গবানকে গরীবদের বন্ধু বলা হয়েছিল। গান্ধীজী বললেন, "আমাদের দেশে দারিদ্র্যের এক মর্যাদা আছে। গরীব এখানে তার দৈন্তের জন্ম লজ্জিত নয়। ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা সে তার কুঁড়েঘরের বেশি কদর করে। এমন কি সে এতে গর্ববোধও করে। ভৌতিক বিষয়ে সে গরীব হলেও অন্তরে

সে গরীব নয়। সন্তোষই হল তার সম্পদ। সে তো নিজেকে এ কথাও বলতে পারত, 'যেহেতু আমরা সকলে ধনী হতে এবং প্রাসাদের মালিক হতে পারি না সুতরাং অন্তত ধনীদের প্রাসাদগুলি আমরা ভেঙ্গে ফেলি এবং ধনীদের আমাদের স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসি'। এতে তাদের বা অন্য কারও সুখ বা শান্তি হতে পারে না। আর ভগবান কখনই এই ধরনের গরীবদের বন্ধু ও সহায় হতে পারেন না। ধনসম্পদের অসাম্যজনিত দারিদ্র্য পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। একটি সীমা পর্যন্ত বোধ হয় তা অবশ্যম্ভাবী, কেন না বুদ্ধি বা প্রয়োজনের পরিমাপে সব মানুষ সমান নয়। আমেরিকার মত অত্যধিক ধনী দেশেও, যেখানে ধনকুবের ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করেছে সেখানেও অনেক গরীব লোক আছে। কবি মালাবারি, শা-আলমের কয়েকজন আত্মীয়কে রেঙ্গুনের রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখেছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। আমার হৃদয়কে তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এর ভাবার্থ হল যে, ভগবান যার বন্ধু ও সহায় সেই একমাত্র ধনী। ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের মানুষ আছে যারা তাদের প্রয়োজনকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে পারলে আনন্দ বোধ করে। তারা তাদের গামছায় সামান্য একটু আটা, এক চিমটি নুন ও লঙ্কা বেঁধে রাখে। তাদের কাছে একটি লোটা এবং কুয়া থেকে জল তোলার জন্য দড়ি থাকে। এর বেশি তাদের আর কিছু দরকার হয় না। তারা পায়ে হেঁটে ১০-১২ মাইল পথ অতিক্রম করে। তারা গামছাতেই আটা মেখে লেচি তৈরী করে, কাঠ-কুটা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালে আর তাতেই সেই লেচি সেঁকে নেয়। একে বাটি বলা হয়। আমি চেখে দেখেছি, এ খুবই সুস্বাদু। রসাস্বাদ খাদ্যের উপর নির্ভর করে না বরং ক্ষুধার উপর তা নির্ভর করে। যদি পরিশ্রম সাধু হয় এবং মনে সন্তুষ্টি থাকে তবে এই রকম ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই রকম মানুষ ভগবানকে তার সঙ্গী ও বন্ধুরূপে পায়। আর যে কোন রাজা বা সম্রাটের চেয়েও সে নিজেকে বেশী ধনী বলে মনে করে। যারা মনে মনে অপরের সম্পদের লালসা করে ভগবান তাদের সহায় হন না। প্রত্যেকেই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনির্বচনীয় শান্তি ও সুখ উপভোগ করতে পারে এবং অপরকেও তা দিতে পারে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি সম্পদের জন্য লালায়িত হয় তবে তাকে শোষণের আশ্রয় নিতেই হবে, যে-কোন নামই তার দেওয়া হোক না কেন। কিন্তু তাতেও কোটি কোটি লোক লক্ষপতি হতে পারবে না। প্রকৃত সুখ কেবল সন্তুষ্টি ও ভগবানের সান্নিধ্যের মধ্যেই নিহিত।"

হরিজন, ২১-৭-৪৬

একাদশ প্রকরণ ঃ সাম্যবাদ

আপনি কি শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার করতে পারেন ?

প্রশ্ন—আপনি..যদি মজতুর, কিষাণ ও কারখানার শ্রমিকদের উপকার করতে চান তবে কি আপনি শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার করতে পারেন ?

উত্তর—আমি নিশ্চয় তা করতে পারব ; অবশ্য লোকেরা যদি কেবল অহিংস পদ্ধতিই অনুসরণ করে। বিগত বারো মাস স্পষ্টরূপেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, অহিংসাকে কেবল উপায় হিসাবে গ্রহণ করলেও তার সম্ভাবনা কত। লোকেরা যখন একে আচরণের নীতিরূপে গ্রহণ করে তখন শ্রেণী সংগ্রাম অসম্ভব হয়ে যায়। আমেদাবাদে এই সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। তার ফলও খুব সন্তোষজনক হয়েছে এবং তার অকাট্য প্রমাণিত হবারও খুব সম্ভাবনা আছে। অহিংস পদ্ধতির দ্বারা আমরা পুঁজিপতিদের ধ্বংস করতে চাই না, আমরা পুঁজিবাদের ধ্বংস করতে চাই। পুঁজির সৃষ্টি, রক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য যাদের উপর পুঁজিপতিদের নির্ভর করতে হয় তাদের অছিরূপে নিজেদের মনে করতে আমরা পুঁজিপতিদের আহ্বান করি। পুঁজিপতিদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকদের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। পুঁজিতে যদি শক্তি থাকে তবে শ্রমেতেও আছে। উভয় শক্তিকেই ধ্বংসাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শ্রমিকরা যে মুহূর্তে তাদের শক্তি উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তেই তারা পুঁজিপতিদের দাসের পরিবর্তে সম-অংশীদার হয়ে যায়। নিজেরাই একমাত্র মালিক হওয়া যদি তাদের লক্ষ্য হয় তবে খুব সম্ভবত তারা যে মুরগী সোনার ডিম দেয় তাকেই মেরে ফেলবে। বুদ্ধির এবং এমন কি সুযোগের অসাম্য অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। নদীর তীরে যে লোকটি বাস করে সে শুষ্ক মরুভূমিবাসী লোকটির চেয়ে সব সময়েই ফসল উৎপাদনে বেশি সুযোগ পাবে। কিন্তু অসাম্য যদি থাকেই তবু অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাম্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক সামগ্রীর জন্য সমান অধিকার আছে, এমন কি পশু-পক্ষীরও সেই অধিকার আছে। আর যেহেতু প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গেই অনুরূপ কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যের কোন আঘাতকে

প্রতিরোধ করার জন্ম অনুরূপ প্রতিকার যুক্ত থাকে সেই হেতু মূলগত প্রারম্ভিক সাম্য প্রতিপাদনের জন্ম অনুরূপ কর্তব্য ও প্রতিকার খুঁজে বার করাটাই হল একমাত্র কাজ। সেই কর্তব্য হল নিজের শরীর দিয়ে শ্রম করা, সেই প্রতিকার হল নিজের শ্রমের ফলভোগে যে বাধা দেয় তার সঙ্গে অসহযোগ করা। আর আমি যদি পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মৌলিক সাম্যে বিশ্বাস করি, এবং আমি তা নিশ্চয় করব, তবে পুঁজিপতির বিনাশ কখনই আমার লক্ষ্য হতে পারে না। আমি অবশ্যই তার হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টা করব। তার সঙ্গে আমার অসহযোগ, তার কৃত অন্যায়ের প্রতি তার চোখ খুলে দেবে।

আমি যখন অসহযোগ করব তখন আমার স্থান আর কেউ নিয়ে নেবে, এই ভয় থাকাও আমার উচিত নয়। কেন না আমি আমার সহকর্মীদের এটুকু প্রভাবিত করার আশা রাখি যে, তারা মনিবের অন্যায় কাজে সাহায্য করবে না। সমস্ত শ্রমিকদের এই জাতীয় শিক্ষা যে ধীর গতিবিশিষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু এই প্রক্রিয়ার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী সেজন্ম এটি দ্রুততমও বটে। পুঁজিপতিদের বিনাশের অর্থ যে অন্তিমে শ্রমিকদের বিনাশ তা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। আর যেমন কোন মানুষই এত খারাপ নয় যে সে সংশোধনের অতীত, তেমনি কোন মানুষই এত পূর্ণ নয় যে, তাকে ভুলবশত সম্পূর্ণ খারাপ বলে যে মনে করছে তার বিনাশের অধিকার সে পেয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১

সাম্যবাদীদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা

[বোম্বাইয়ের শ্রমিক সভায় গান্ধীজী হিন্দীতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সার নিয়ে দেওয়া হল। এই সভায় কয়েকজন সাম্যবাদী যুবক বাধাসৃষ্টি করেছিলেন।]

আমি জানি যে, ভারতবর্ষে সাম্যবাদীরা আছে। কিন্তু মীরাট জেলের বাইরে আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই নি, এমন কি তাঁদের বক্তৃতাও শুনি নি। দু'বছর আগে উত্তরপ্রদেশে ভ্রমণের সময় আমি মীরাট জেলের বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রযত্ন করেছিলাম। এবং সেইভাবে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলাম। তাঁদের একজনের বক্তৃতা আমি আজ শুনে ছি। আমি

তাঁদের বলতে পারি যে, শ্রমিকদের স্বরাজের জন্য তাঁরা যতই দাবি তুলুন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে। এখনকার যে কোন যুবক-সাম্যবাদীর জন্মের বহু পূর্বেই আমি শ্রমিকদের স্বার্থকে নিজের করে নিয়েছি। আমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের জন্য কাজ করে অতিবাহিত করেছি। আমি তাদের সঙ্গে বাস করতাম এবং তাদের আনন্দ ও দুঃখের ভাগ নিতাম। সুতরাং আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলবার দাবি আমি কেন করি। আমি আপনাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং আপনারা যতটা খোলাখুলি ভাবে পারেন আলোচনা করতে আহ্বান করছি।

আপনারা সাম্যবাদী বলে নিজেদের দাবি করেন, কিন্তু সাম্যবাদী জীবন যাপন করতে আপনাদের দেখা যায় না। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, সাম্যবাদী আদর্শের সত্যকার অর্থ অনুসারে জীবন যাপন করবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আমি করে চলেছি।……আপনারা যদি দেশকে নিজেদের মতানুসারে পরিচালিত করতে চান তবে দেশকে যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে প্রভাবিত করবার যোগ্যতা আপনাদের থাকা উচিত। আপনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা তা করতে পারেন না। আপনারা দেশকে নিজেদের মতে আনার জন্য বিনাশের পথ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কতজনকে আপনারা বিনাশ করবেন? কোটি কোটি লোককে তো পারবেন না? আপনাদের সঙ্গে যদি লক্ষ লক্ষ লোক থাকে তবে কয়েক হাজারকে আপনারা মারতে পারবেন। কিন্তু আজ আপনারা মুষ্টিমেয়র অধিক নন। আমি বলি, যদি আপনারা পারেন কংগ্রেসকে পরিবর্তিত করুন এবং তাকে অধিকার করুন। নিজেদের মত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য কংগ্রেস আপনাদের কাছে উন্মুক্ত রয়েছে। যে কেউ সঙ্গতিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারে তার কথা শান্তভাবে শোনার মত সহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের আছে।

সন্ধি প্রস্তাবের দ্বারা শ্রমিকদের কোন ক্ষতি হয় নি। আমি দাবি করি যে, আমার কোন কাজের দ্বারা শ্রমিকদের কখনো ক্ষতি হয় নি বা হতে পারে না। কংগ্রেস যদি বৈঠকে (দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক—অনু) তার প্রতিনিধি পাঠায় তবে সে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বরাজ ব্যতীত অন্য কোন স্বরাজের জন্য চাপ দেবে না। কমুনিস্ট পার্টির সৃষ্টির অনেক আগেই কংগ্রেস স্থির করে নিয়েছিল যে, যে-স্বরাজ শ্রমিক ও কৃষকদের হবে না সেই স্বরাজের কোন অর্থ

নেই। বোধ হয় আপনাদের এখানে কোন শ্রমিক মাসিক কুড়ি টাকার কম বেতন পান না। কিন্তু আমি কেবল আপনাদের জন্যই নয় উপরন্তু সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী ও বেকার জনগণের স্বরাজের জন্য কাজ করছি যাদের এক বেলাও পেট-ভরা খাবার জোটে না এবং যাদের এক টুকরা বাসি রুটি ও একটু নুনের দ্বারাই জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু আমি আপনাদের প্রভাবিত করতে চাই না। আমি অবশ্যই আপনাদের সাবধান করে দেব যে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোন অনিষ্ট করার মনোভাব নেই, তাঁদের কোন ক্ষতি করার কথা আমি ভাবতে পারি না। তবে যন্ত্রণাভোগের দ্বারা আমি তাঁদের কর্তব্য বোধ জাগ্রত করতে চাই। আমি চাই তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হোক এবং তাঁদের চেয়ে কম ভাগ্যবান ভাইদের প্রতি তাঁরা ন্যায্য ব্যবহার করুন। তাঁরা মানুষ এবং তাঁদের প্রতি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না। জাপানের ইতিহাসে আত্মত্যাগী পুঁতিপতিদের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। গত সত্যাগ্রহের সময় বহুসংখ্যক পুঁজিপতি যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের কি আপনারা দূরে সরিয়ে রাখতে চান ? একই লক্ষ্যের জন্য তাঁদের সাথে এক সঙ্গে কাজ করতে কি আপনারা চান না ?

ভগবান আপনাদের বুদ্ধি ও যোগ্যতা দিয়েছেন। সেগুলিকে উপযুক্ত কাজে আপনারা প্রয়োগ করুন। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন যে, আপনারা আপনাদের বুদ্ধির দ্বার রুদ্ধ করবেন না। ভগবান আপনাদের সাহায্য করুন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-৩১

শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র

লাল কোর্তাদের কয়েকজন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা জানান যে, গান্ধীজীকে শারীরিক আঘাত করার কোন রকম ইচ্ছা তাঁদের কখনো ছিল না ; তাঁর জীবন ও স্বাস্থ্য অন্য যে কোন লোকের মতই তাঁদের কাছে সমান প্রিয়। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদও তাঁদের নীতি নয়। তবে অস্থায়ী সন্ধির সঙ্গে বিরোধে তাঁরা অটল। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই সন্ধি ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছুতেই তাঁদের পরিচালিত

করতে পারে না। গান্ধীজী স্নেহোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাদের বললেন, "কিন্তু আমার প্রিয় যুবকরা, তোমরা বিহারে যাও, সেখানে দেখবে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রজাতন্ত্র কাজ করছে। যেখানে দশ বছর আগে ভীতি ও দাসত্ব ছিল সেখানে আজ সাহস, বীর্য এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ দেখা যাবে। তোমরা যদি পুঁজির অবসান চাও অথবা ধনী লোকদের বা পুঁজিপতিদের বিনাশ চাও তবে তোমরা কখনই সফলকাম হবে না। পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমিকদের শক্তির প্রদর্শনই তোমাদের করতে হবে আর তা হলেই যারা তাঁদের জন্য শ্রম করে তাদের অছি হতে তাঁরা রাজী হয়ে যাবেন। শ্রমিক ও কৃষকরা যথেষ্ট পরিমাণে খেতে, পরতে ও থাকতে পাবে এবং আত্মসম্মানী মানুষের মত সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসবাস করবে। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। সেই অবস্থায় উপনীত হতে পারলে তাদের মধ্যে যারা বেশি বুদ্ধিমান তারা নিশ্চয় অন্যদের চেয়ে বেশি সম্পদ সংগ্রহ করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি যে, আমি কি চাই। আমি চাই ধনিকরা তাঁদের সম্পদ গরীবদের অছিরূপে রাখুক অথবা তাদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিক। তোমরা কি জান যে, আমি যখন টলস্টয় ফার্ম প্রতিষ্ঠা করি তখন আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি দিয়ে দিয়েছিলাম? রাস্কিনের 'আন টু দিস্ লাস্ট' বইটি আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সেই আদর্শ অনুসারে আমি আমার ফার্ম গঠন করি। এখন তো তোমরা স্বীকার করবে যে, বলতে গেলে তোমাদের কৃষক ও শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্রের আমি একজন 'প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য'। আর, সম্পদ ও শ্রমের মধ্যে কোনটিকে তোমরা বেশি মূল্যবান বিবেচনা কর? মনে কর গাড়ীভর্তি টাকাপয়সা নিয়ে সাহারা মরুভূমিতে আটকে পড়েছ। সেগুলি তোমাদের কোন্ সাহায্যে আসবে? কিন্তু তোমরা যদি শ্রম করতে পার তবে হয়ত তোমাদের ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। তা হলে ধনসম্পদকে শ্রমের চেয়ে বেশি ভাল কি করে মনে করা হবে? আমেদাবাদে গিয়ে নিজেদের চোখে সেখানকার শ্রমিক সঙ্ঘ দেখে এস; তোমরা দেখবে যে, সেখানে তারা নিজেদের এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে চেষ্টা করছে।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-৩১

আগ্রহশীল অনুসন্ধানী

এই যুবকরা সকলেই দেশ থেকে প্রায় নির্বাসিত * ছিলেন এবং ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন। আমার মনে হয় তাঁরা সকলেই গান্ধীজীকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁদের ধারণাতেই আসত না যে, সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আগ্রহ ও গরীবের জন্য চিন্তা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী কি করে তাঁদের মতে না এসে থাকতে পারছেন। বাবা এই বলে আরম্ভ করলেন, "আপনার ভাষা বুঝতে আমরা প্রায়ই অসুবিধা বোধ করি। কেন না আপনি যে কেবল একটি জাতিকেই নতুনভাবে গঠন করছেন তা নয়, ইংরেজী ভাষাকেও আপনি নতুনভাবে ছাঁচে ঢালছেন। আর আমরা প্রায়ই দেখি যে, আপনি হয়ত এক অর্থে কথা বললেন কিন্তু লোকেরা একেবারে ভিন্ন অর্থে তা বুঝল। সেজন্য, আমাদের বাহ্যিক মতভেদের পিছনে কোন সাধারণ ভূমিকা বার করা যায় কিনা তাই দেখতে আমরা এসেছি।" এই কথা বলে তাঁরা কিছুদিন আগে গান্ধীজীর কাছে যে বিরাট প্রশ্নমালা রেখে গিয়েছিলেন তা নিয়ে আরম্ভ করলেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর নিচে দেওয়া হল।

সুবিধাভোগী শ্রেণীর অবস্থা

প্রথম প্রশ্ন ছিল :

'ভারতীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার, মিলমালিক, মহাজন এবং অন্য মুনাফাখোররা কি করে ধনবান হয় বলে আপনি সত্যসত্যই মনে করেন?'

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, 'বর্তমানে জনগণকে শোষণ করে।'

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই শ্রেণীগুলি কি ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ না করে ধনী হতে পারে?'

গান্ধীজীর উত্তর, 'কিছুদূর পর্যন্ত পারে।'

'সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক, যাদের কাজের ফলে সম্পদের সৃষ্টি হয় তাদের চেয়ে বেশি আরামে থাকবার কোন সামাজিক অধিকার কি এই শ্রেণীগুলির আছে?'

---

* গান্ধীজী ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন সেখানে এই আলোচনা হয়েছিল—স।

গান্ধীজী সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন, 'কোন অধিকার নেই।' তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'আমার সমাজের কল্পনা হল, যে যদিও আমাদের সকলের জন্ম সমান অর্থাৎ সমান সুযোগের অধিকার আমাদের আছে তবু আমাদের সকলের ক্ষমতা সমান নয়। প্রকৃতির সৃষ্টিই এমন যে, ক্ষমতা সমান হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সকলে একই উচ্চতা, রং, বুদ্ধি ইত্যাদি পেতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতিগতভাবেই কারুর কারুর বেশি উপার্জন করার ক্ষমতা থাকবে আর অন্যদের কম। যাদের বুদ্ধি বেশি তাদের কাছে বেশি থাকবেই এবং তারা এই কাজেই তাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

যদি তারা সদয়ভাবে তাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে তবে তারা রাষ্ট্রের কাজ করবে। এই রকম লোকেরা অছি হয়েই থাকবে। অন্য কোন অভিধা তাদের দেওয়া যায় না। বুদ্ধিমান লোককে আমি বেশি উপার্জন করতে দেব, তার বুদ্ধি আমি রুদ্ধ করে দেব না। কিন্তু তার অধিকাংশ উপার্জন রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করতে হবে; যেমন পিতার রোজগারী ছেলেদের সমস্ত উপার্জন পরিবারের সাধারণ কোষে জমা হয়। তারা অছিরূপেই তাদের উপার্জন নিজেদের কাছে রাখবে। হতে পারে যে, আমি এতে সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হব। কিন্তু আমি সেই দিকেই চলেছি। আর "মৌলিক অধিকার" ঘোষণার মধ্যেও এই বিষয়টি নিহিত রয়েছে।'

শ্রেণী সংগ্রাম

এর পরেই, সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রার্থিত পরিবর্তনে 'শ্রেণী সংগ্রাম' একটি উপায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হল।

প্র—আপনি কি মনে করেন না যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত, তাতে তারা সমাজের পরগাছা শ্রেণীকে ভরণপোষণ করার বোঝা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে?

উ—না। আমি নিজে তাদের হয়ে বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ হল অহিংস বিপ্লব।

প্র—উত্তর প্রদেশে খাজনা কমাবার আন্দোলনের দ্বারা আপনি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে পারেন, কিন্তু আপনি এই প্রথার মূলে আঘাত করেন না?

উ—হাঁ। কিন্তু একসঙ্গে সব কিছু আপনারা করতে পারেন না।

প্র—আপনি তাহলে অছিবাদের প্রতিষ্ঠা কি করে করবেন? সমঝিয়ে বুঝিয়েই কি?

উ—কেবল মৌখিক অনুনয় বিনয়ের দ্বারাই নয়। আমি আমার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করব। কেউ কেউ আমাকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলে থাকেন। একথা মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে একজন বিপ্লবী—একজন অহিংস বিপ্লবী বলে মনে করি। আমার পদ্ধতি হল অসহযোগ। কোন লোকই সম্বন্ধিত লোকেদের স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক আদায়ীকৃত সহযোগিতা ছাড়া ধনসম্পদ সংগ্রহ করতে পারে না।

অছিরূপে সুবিধাভোগী শ্রেণী

কিন্তু এই আলোচনা তাঁদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করল না। কয়েকটি শ্রেণী আজকাল যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছেন তার মূলে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, 'পুঁজিপতিদের কে অছি নিযুক্ত করেছে? তারা কেন কমিশন নেবার অধিকারী আর আপনি সে কমিশনই বা কিভাবে নির্ধারণ করবেন?'

গান্ধীজী বললেন, 'কমিশন পাবার অধিকারী তাঁরা এই জন্যই যে, টাকাপয়সা তাঁদের দখলে রয়েছে। কেউ তাঁদের অছি নিযুক্ত করে নি। আজ যেসব লোক নিজেদের মালিক মনে করেন আমি তাঁদের অছি হতে আহ্বান করছি। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের অধিকারের দ্বারা মালিক হবেন না, যাদের তাঁরা শোষণ করেছেন তাদের দেওয়া অধিকারের দ্বারাই মালিক হবেন। তাঁরা কত কমিশন পাবেন তার নির্দেশও আমি করব না, কিন্তু যা ন্যায্য তাই নিতে আমি তাঁদের বলব। অর্থাৎ যাঁর একশত টাকা আছে তাঁকে আমি পঞ্চাশ টাকা নিতে ও বাকি টাকা শ্রমিকদের দিয়ে দিতে বলব। কিন্তু যাঁর কাছে এক কোটি টাকা আছে তাঁকে হয়ত বলব যে, শতকরা এক টাকা নিজের কাছে রাখুন। তাহলে আপনারা দেখছেন যে, আমার বর্ণিত কমিশন কোন একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক হবে না, কেন না তাতে নিদারুণ অন্যায়ের সৃষ্টি হবে।'

ব্যক্তি বনাম পদ্ধতি

পরের প্রশ্নমালা ছিল ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গান্ধীজীর মনোভাব সম্পর্কে। তার ফলে তিনি পদ্ধতি ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ পেলেন। প্রশ্নগুলি তাঁকে ভূমি ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় তাঁর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী উপস্থিত করতে সুযোগ দিল। তাঁরা বললেন, 'রাজা মহারাজা বা ভূস্বামীরা ব্রিটিশের পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি জনগণের মধ্যেই আপনার সমর্থন পান। আর জনগণ এঁদের শত্রু বলেই গণ্য করে। জনগণের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে তখন তারা যদি এঁদের ভাগ্য নির্ণয় করে তবে তাতে আপনার মনোভাব কী হবে?'

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, 'জনগণ আজ ভূস্বামী ও মুনাফাখোরদের তাদের শত্রু বলে মনে করে না। কিন্তু এই শ্রেণীগুলি তাদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে বোধ জাগ্রত করতে হবে। পুঁজিপতিদের শত্রু গণ্য করার শিক্ষা আমি জনগণকে দিই না। আমি তাদের এই শিক্ষাই দেই যে, তারা নিজেরাই তাদের শত্রু। অসহযোগীরা জনগণকে এ কথা কখনোই বলে নি যে, ব্রিটিশ বা জেনারেল ডায়ার খারাপ লোক। এঁরা একটি পদ্ধতির শিকার—এই কথাই তাঁরা বলেছিলেন। সুতরাং ব্যক্তির নয়, পদ্ধতিরই বিনাশ করতে হবে। এই কারণেই স্বাধীনতা-স্পৃহায় উত্তপ্ত জনসাধারণের মাঝে ব্রিটিশ অফিসাররা নির্ভয়ে থাকতে পারেন।'

আক্রমণ অব্যাহত রেখেই তাঁরা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যদি পদ্ধতিকেই আঘাত করতে চান তাহলে ভারতীয় পুঁজিপতি ও ইংরেজ পুঁজিপতির মধ্যে কোন ভেদ থাকতে পারে না। জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে দেওয়া আপনি কেন শুরু করেন না?'

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, 'জমিদার একটি পদ্ধতির যন্ত্র মাত্র। ব্রিটিশ পদ্ধতির বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করার প্রয়োজন নেই। দুটিকে আলাদা করা সম্ভবপর। কিন্তু জনসাধারণকেও আমাদের বলতে হয়েছিল যে, তারা যেন জমিদারদের টাকা না দেয়, কেন না সেই টাকা থেকেই জমিদাররা সরকারকে টাকা দিতেন। কিন্তু যতক্ষণ জমিদাররা রায়তদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন ততক্ষণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই।'

ভূমি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

প্রশ্ন—কৃষক ও শ্রমিকদের আপন ভাগ্য নির্ণয়ে সর্বাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য আপনার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কী ?

—কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে যে কর্মসূচীর অনুসরণ আমি করছি সেইটিই আমার কর্মসূচী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই আন্দোলনের ফলে আজ তাদের অবস্থা, স্মরণকালের মধ্যে যে অবস্থা তাদের ছিল, তার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমি এখন তাদের ভৌতিক অবস্থার কথা বলছি না। তাদের মধ্যে যে বিরাট জাগৃতি এসেছে এবং যার ফলে অন্যায় ও শোষণের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের হয়েছে, তারই উল্লেখ আমি করেছি।

—কৃষকদের পাঁচ কোটি টাকার ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি কী ব্যবস্থা করতে চান ?

—ঋণের ঠিক পরিমাণ কী তা কেউ জানে না ; কংগ্রেস যদি ক্ষমতা পায় তবে এই তথাকথিত দায়গুলি পরীক্ষা করবার ভার গ্রহণ করবে। অপসরণমান বিদেশী সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় সরকার যেসব দায় ও দায়িত্ব লাভ করবে সেগুলি পরীক্ষা করে নেবার আগ্রহ কংগ্রেসের আছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১১-৩১

সাম্যবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম

প্রশ্ন—যেসব সাম্যবাদী কংগ্রেসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন তাদের কাজকর্মের প্রতিরোধ আমরা কিভাবে করতে পারি ?

—দেখা যাচ্ছে যে, সাম্যবাদীরা গোলমাল সৃষ্টি করাকেই তাঁদের পেশা করে নিয়েছেন। সাম্যবাদীদের মধ্যে আমার কিছু বন্ধুও আছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার ছেলের মত। কিন্তু মনে হচ্ছে যে, তাঁরা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। তাঁরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপের বিবরণ এই অভিযোগকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। অধিকন্তু তাঁরা রাশিয়া থেকে নির্দেশ নেন বলেও মনে হয়। ভারতবর্ষের বদলে রাশিয়াকেই তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক নিকেতন বলে মনে করেন। কোন বহির্শক্তির কাছে এই নির্ভরতা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। এমন কি আমি এও বলেছি যে, আমাদের বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের সময়েও

রাশিয়ার গমের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বৈদেশিক দানের উপর নির্ভর না করে আমাদের দেশ যা উৎপন্ন করতে পারে তাতেই জীবন ধারণ করার মত যোগ্যতা ও সাহস আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত। অন্যথায় আমরা স্বাধীন দেশ রূপে বেঁচে থাকার যোগ্য হব না। বৈদেশিক আদর্শ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য; ততটুকু বৈদেশিক আদর্শ ই আমি স্বীকার করব যতটা আমি নিজে পরিপাক করতে এবং ভারতীয় পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারব। কিন্তু তাদের অধীন হতে আমি নিশ্চয় অস্বীকার করব।

সুতরাং সাম্যবাদীদের জন্য আমার নির্দিষ্ট নিয়ম হল যে, তাঁদের হাতে মৃত্যু বরণকেই আমি বেশি পছন্দ করব। কিন্তু তাঁদের উপর আমি প্রতিশোধ নেব না।

হরিজন, ৬-১০-৪৬

গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবে গান্ধীজী

कातो, समझबूझकर कातो.
कातने वे खादी पहने, पहननेवे
जरूर कातें.

२८-१-४५
सेवाग्राम

मो. क. गांधी

.সবাগ্রাম আশ্রমে গান্ধীজীব কুষ্ঠরোগী সেব

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি

উহার অর্থ ও স্থান

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ :
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মুখবন্ধ

'গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি' পুস্তিকাখানা আমি ১৯৪১ সালে লিখিয়াছিলাম। ইহা তাহারই সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ। এই পুস্তিকায় যে কয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি কোনও বিশিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া করা হয় নাই—বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী তো অবশ্যই সেগুলি সাজানো হয় নাই। যদি কোনও পাঠকের নিকট কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে এইরূপ মনে হয় যে, উহা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অথচ এই পুস্তিকায় উল্লেখ নাই, তিনি যেন এ কথা মনে করেন, ঐ বিষয় যে বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। আমার কৃত তালিকা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা মার্গ-প্রদর্শক বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি নূতন ও জরুরী বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, উহা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পাঠকগণ, কর্মীই হউন বা স্বেচ্ছাসেবক হউন বা অন্য হউন, যেন অবশ্য এ কথা বুঝেন যে, রচনাত্মক কার্যই হইতেছে সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথ। ইহার সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার মানেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এই রচনাত্মক কর্মপদ্ধতির লক্ষ্য হইতেছে—ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্যন্ত জাতি গঠন। মনে করুন, দেশের ৪০ কোটি লোকই সর্বতোভাবে সমস্ত রচনাত্মক কর্মগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিয়া গেল। ইহার দ্বারাই যে সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে—স্বরাজ বলিতে যাহা কিছু বুঝা যায় সে সমস্তই, বিদেশী শক্তিকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই যে এর দ্বারা সম্ভব—সে কথা কি আর কাহারও অস্বীকার করার পথ আছে? যখন সমালোচকেরা উক্ত প্রস্তাব লইয়া হাসাহাসি করেন, তখন তাঁহারা হয়ত এই কথাই বুঝাইতে চাহেন যে, ৪০ কোটি লোক কদাচ একযোগে এই গঠনমূলক কার্য করিতে স্বীকৃত হইবে না। এই পরিহাসের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কিন্তু ইহাই উত্তর যে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করার যোগ্য। একদল নিষ্ঠাবান কর্মী যদি দৃঢ়সংকল্প লইয়া বসে, তবে তাহারা দেখিবে যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা অন্য অনেক পরিকল্পনা অপেক্ষা সহজ।

সে যাহাই হউক, ভারতের স্বাধীনতা যদি অহিংস উপায়ে লাভ করিতে হয়, তবে আমার কাছে ইহার বদলে অন্য কিছুই দিবার মত নাই।

আইন অমান্য ব্যাপকভাবেই হউক অথবা ব্যক্তিগতই হউক, উহা দ্বারা রচনাত্মক কার্যের সহায়তা হয়। উহা সশস্ত্র বিরোধের বিকল্পে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে যেমন ট্রেণিং লাগে, তেমনি রচনাত্মক কার্যের জন্যও ট্রেণিং লাগে। পথই কেবল ভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্রোহাত্মক কাজ তখনই আরম্ভ হয়, যখন তাহার অবসর আসে। মিলিটারী বিদ্রোহের জন্য ট্রেণিং লইতে হইলে অস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়ত আণবিক বোমা পর্যন্ত পহুঁছিতে হয়। আর অপরদিকে আইন অমান্যের জন্য কেবল রচনাত্মক কার্যপদ্ধতিকে কেমন করিয়া কাজে আনা যায় তাহাই শিখিতে হয়।

এই হেতু কর্মীরা আইন অমান্য করার অবকাশ খুঁজিবেন না। যদি রচনাত্মক কর্মকে নিষ্ফল করার চেষ্টা চলে, তবেই তাঁহারা আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইবেন। দুই-একটা দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, কোন্ ক্ষেত্রে আইন অমান্য করা যায়, আর কোন্ ক্ষেত্রে যায় না। আমরা এ কথা জানি যে, রাজনৈতিক চুক্তি অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যখন কোনও চুক্তি নাই, তখন অপরের সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তো বন্ধ করা যায় না। এই ধরনের নিঃস্বার্থ ও অবিমিশ্র বন্ধুত্বই রাজনৈতিক চুক্তির ভিত্তি হইতে পারে। তেমনি আবার কেন্দ্রীভূত খাদি প্রচেষ্টা গবর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিষ্ফল করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য খাদি তৈরী ও ব্যবহার করা কোনও শক্তিই বন্ধ করিতে পারে না। খাদির উৎপাদন ও ব্যবহার জোর করিয়া লোকের উপর চাপানো উচিত নয়। কিন্তু লোকের পক্ষে আবার সুতা কাটা ও খাদি পরিধান করাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। গ্রামগুলিকে প্রাথমিক কর্মকেন্দ্র রূপে গড়িয়া তুলিলেই এই কার্য হইতে পারে। এই ধরনের কাজের প্রথম প্রবর্তকেরা বাধা-প্রাপ্ত হইতেও পারে। প্রবর্তকদিগকে জগৎ জুড়িয়া সর্বত্রই ক্লেশ স্বীকার করার অগ্নিপরীক্ষায় পার হইতে হয়। ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। যখন কার্যসিদ্ধির জন্য হিংসার আশ্রয় লওয়া হয়, তখন 'সত্য'ই সর্বাপেক্ষা পরিত্যাজ্য বস্তু হইয়া পড়ে, কিন্তু অহিংসায় উহাই চিরজয়ী হয়। অপরদিকে সরকার পক্ষের লোকদিগকেও শত্রু বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিবে না। ঐরূপ

করিলে অহিংসার বিরুদ্ধাচার করা হইবে। আমরা পৃথক হইয়া যাইবই কিন্তু তাহা হইবে বন্ধুরূপে।

যদি এই প্রাথমিক মন্তব্যগুলি পাঠকের মর্ম স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে তিনি রচনাত্মক কর্মপদ্ধতিকে গভীর আগ্রহ প্ররোচক বলিয়া মনে করিবেন। অন্ততঃ রচনাত্মক কর্মকে রাজনৈতিক কাজ বা বক্তৃতা করা অপেক্ষা অধিক রোচক এবং অধিকতর জরুরী ও কার্যকরী বলিয়া বুঝিবেন।

মোঃ কঃ গান্ধী

পুণা, ১৩-১১-১৯৪৫

ভূমিকা

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি কি, তাহা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা 'পূর্ণ স্বরাজের গঠন', অথবা বলা যায় যে ইহাই হইতেছে সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

হিংসার পথে অর্থাৎ অসত্যের পথে স্বাধীনতার গঠন যে কি, তাহা ত আমরা দুঃখের ভিতর দিয়া বেশ ভাল ভাবেই জানিতেছি। বর্তমান যুদ্ধে প্রতিদিন যেভাবে জীবন ও সত্যের সংহার করা হইতেছে, সেই দিকে দেখিলেই ইহা বুঝা যায়।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানে প্রত্যেকেরই স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের নগণ্যতম ব্যক্তিরও স্বাধীনতা লাভ। এই প্রকারে স্বাধীনতা মূলতঃ কাহাকেও বাদ দিয়া হওয়ার নয়। সেইজন্যই পারস্পরিক নির্ভরতার সহিত ইহা সম্পূর্ণই মিশ খাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তত্ত্বে যাহা থাকে কার্যত ততটা কখনও লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ইউক্লিড বর্ণিত জ্যামিতির সংজ্ঞা অনুসারে রেখা বলিতে যে জিনিস বুঝায় কোনও অঙ্কিত রেখাই সে জিনিস নয়। এই হেতু পূর্ণ স্বাধীনতা সেই পরিমাণে পূর্ণ হইবে, যে পরিমাণে আমরা কার্যতঃ সত্য ও অহিংসাকে কর্মে রূপায়িত করিতে পারিব।

পাঠক যদি মনে মনে গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির সমস্তটাই ছকিয়া ফেলেন, তবে তিনি আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, যদি এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যায়, তবে সে পরিণতির ফলে আমরা যে প্রকারের স্বাধীনতা চাই তাহাই পাইব। মিঃ আমেরীও কি এই কথাই বলেন নাই যে ভারতীয় দুইটি বড় বড় রাজনৈতিক দল যদি একমত হয়, অর্থাৎ আমার ভাষায়, যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্য হয়, তবে তাহাদের দাবি মানিয়া লওয়া হইবে? মিঃ আমেরীর আন্তরিকতায় আমাদের অবিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই, কেন না যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্য সততার পথে অর্থাৎ অহিংসার পথে লাভ করা যায়, তবে তাহার ভিতরেই এমন শক্তির উদ্ভব হইবে, যাহা সম্প্রদায়সমূহের সংযুক্ত দাবি মানিয়া লওয়াইতে বাধ্য করিবে।

অপরদিকে দেখা যাইবে হিংসার দ্বারা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তব্য, তাহার তাত্ত্বিক

বা ব্যবহারিক কোনও একটা পূর্ণ সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না। কেন না উহার ভিতর এই অবস্থাই ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, দেশের ভিতরের যে দলটা হিংসার সব চাইতে বেশী কার্যকরী প্রয়োগ করিতে পারিবে সেই দলেরই প্রাধান্য হইবে। উহাতে অর্থনৈতিক বা অন্যপ্রকার সম্পূর্ণ সমতাপ্রাপ্তির কল্পনাই করা যায় না।

আমার উদ্দেশ্য হইতেছে অহিংসা প্রণোদিত চেষ্টার ভিতর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা পাঠককে বুঝানো। ইহার জন্য একথা মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই যে হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। যদি পাঠকের ইচ্ছা হয় তবে এই বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন যে হিংসার পরিকল্পনায় নগণ্যতম লোকেরও স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব, কিন্তু এই বিশ্বাস তখনই উদিত হইতে পারে যখন তিনি স্বীকার করিবেন যে এইরূপ পরিকল্পনা সমগ্র জাতির পক্ষে পরিপূর্ণরূপে প্রতিপালন করা সম্ভব।

এক্ষণে গঠনমূলক কার্যের যে কয়টা বিধি আছে তাহার আলোচনা করা যাক।

১ ॥ সাম্প্রদায়িক ঐক্য

সাম্প্রদায়িক ঐক্য যে প্রয়োজন সে বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু সকলেই এ কথা জানেন না যে এইপ্রকার ঐক্য বাহির হইতে উপরে চাপাইয়া দেওয়া রাজনৈতিক ঐক্য মাত্র নয়। এই ঐক্য মানে একটা অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ের যোগ। এইপ্রকার ঐক্যলাভের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক কার্য হইতেছে প্রত্যেক কংগ্রেসীর, তিনি যে ধর্মেরই হউন না কেন, এই ভাব অনুভব করা যে তিনি প্রকৃতই একজন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা জরথুস্ত্রীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি ভাবিবেন যে, তিনি নিজের মধ্যে হিন্দু বটেন এবং হিন্দুত্বের বহিস্থঃ যত ধর্ম আছে সেই সব ধর্মীও বটেন। ভারতবর্ষের যে কোটি কোটি অধিবাসী আছে, তাহাদের সহিত নিজের একত্ব তাহার নিজের ভিতরে অনুভব করা চাই। এই অনুভূতি লাভের জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসীকেই অন্য ধর্মের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হয়। অন্য সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি তাহার ততটাই শ্রদ্ধা রাখা চাই, যতটা শ্রদ্ধা সে নিজের ধর্মের জন্য পোষণ করে।

যখন এইপ্রকার সৌভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তখন স্টেশনে স্টেশনে

এই কলঙ্কজনক ধ্বনি উচ্চারিত হইবে না—এটা 'হিন্দু জল', ওট 'মুসলিম জল,' এটা 'হিন্দু চা,' ওটা 'মুসলিম চা'। স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলিমের আলাদা জলপাত্র থাকিবে না এবং সাম্প্রদায়িক স্কুল-কলেজ বা হাসপাতাল থাকিবে না। কোনও রাজনৈতিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি না দিয়া, নীতি হিসাবেই কংগ্রেসীদিগকে এই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিতে হয়। সদাচার বলিয়াই এই নীতিপালন করিতেছেন, ইহাই মানিয়া লইতে হইবে। ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে রাজনৈতিক ঐক্য।

আমরা অনেকদিন ধরিয়া ইহাই ভাবিয়া আসিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, বিধানসভাই হইতেছে ক্ষমতার উৎস। আমি ত এই কথাই মানিয়া থাকি যে, ঐপ্রকার বিবেচনা করা বিষম ভ্রম। উহা গতানুগতিক অথবা একপ্রকার সম্মোহনেরই ফল। ব্রিটিশ ইতিহাস ভাসা ভাসা ভাবে পড়ার ফলে আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি যে, সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসাধারণে পঁহুছিয়া থাকে। কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, ক্ষমতার অধিষ্ঠান স্থান হইতেছে জনসাধারণ এবং জনসাধারণ যে সময় যাহাকে প্রতিনিধি করে, ক্ষমতা তখন তাহার হাতে বর্তায়। জনসাধারণকে বাদ দিয়া পার্লামেণ্টের কোনও ক্ষমতাই নাই, এমন কি উহার অস্তিত্বই নাই। গত একুশ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণকে এই সোজা কথাটা বুঝাইতে আমি চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আইন অমান্য হইতেছে শক্তির ভাণ্ডার ঘর। মনে করুন সমস্ত লোকই আইন সভায় পাস করা কোনও আইন পালন করিতে অনিচ্ছুক এবং আইন না মানার জন্য যে শাস্তি হউক তাহা লইতে তাহারা প্রস্তুত। এইরূপ অবস্থায় তাহারা সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন-যন্ত্রকে অচল করিয়া ফেলিবে। মিলিটারী বা বা পুলিস শক্তি সংখ্যালঘু লোকের দলকে, সেই দল যত শক্তিশালীই হউক না কেন, বাধ্য বা বশীভূত করার কাজে আসে। কোনও মিলিটারী বা পুলিস শক্তি একটা সমগ্র জনসম্প্রদায়ের দৃঢ় সঙ্কল্পকে বলপূর্বক বাধ্য বা বশীভূত করিতে পারে না, যদি তাহারা সমস্ত নির্যাতন শেষ পর্যন্ত সহ্য করা স্থির করে।

পার্লামেণ্টারী কার্যপদ্ধতি তখনই ভাল বলা চলে, যখন উহার সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছানুযায়ী চলেন। অন্যভাবে বলিলে সমধর্মীদের মধ্যেই ইহা মোটামুটি কার্যকর হয়।

বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শাসনযন্ত্র চালাইবার ভান করিতেছি। এই পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া

কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিরুদ্ধপক্ষসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। এইপ্রকার অস্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট দলসমূহকে একজোট করিয়া আমরা কখনও জীবন্ত ঐক্যলাভ করিতে পারিব না। এইপ্রকার আইন সভা কাজ করিতে পারে। তবে তাহা সত্যকার যাহারা শাসক তাহাদের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষমতার ক্ষুদ-কুঁড়া লইয়া কাড়াকাড়ির স্থান হইবে। এই সকল আইন সভা কঠোর দণ্ড প্রয়োগের দ্বারাই শাসন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহকে একে অন্যের টুঁটি চাপিয়া ধরা হইতে ঠেকাইয়া রাখে। আমি ত মনে করি এইপ্রকার হীনতার অবস্থা হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্ভব একেবারে অসম্ভব।

যদিও আমি এই দৃঢ়মত পোষণ করি, তথাপি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনে অবাঞ্ছিত প্রার্থী সভ্যপদের জন্য দাঁড়ায় ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করানো উচিত হইবে যাহাতে প্রগতি-বিরোধীরা এই সমস্ত পদে প্রবেশ করিতে না পারে।

২ ॥ অস্পৃশ্যতা বর্জন

আজিকার দিনে হিন্দুধর্মের এই কলঙ্ক দূর করার কথা বেশী করিয়া বলা অনাবশ্যক। কংগ্রেসীরা এইদিকে অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসী এই ব্যাপারকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য এ ধারণা অনেকে রাখেন না। যদি হিন্দু কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যতা বর্জন উহার নিজস্ব আবশ্যকতার জন্যই মানেন, তবে তাঁহারা তথাকথিত 'সনাতনী'দিগকে আজকের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এই বিষয়টা সনাতনীদের সহিত লড়াই করার বিষয় বলিয়া না লইয়া, অহিংসকের পক্ষে যে ভাব হওয়া উচিত—বন্ধুত্বের ভাব লইয়াই যেন গ্রহণ করেন। আর হরিজনদের সম্পর্কেও ইহাই আবশ্যক যে, প্রত্যেক হিন্দু তাহাদের সমস্যাকে নিজ সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন —তাহাদের ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন। হরিজনদের যে একাকীত্ব, দুনিয়ায় তাহার সমান এত বড় নিদারুণ একাকীত্ব আর দেখা যায় না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, এই কাজ করা কত কঠিন। কিন্তু স্বরাজের সৌধ নির্মাণ করিতে হইলে এই কাজ অবশ্য করণীয়। স্বরাজের পথ ত দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ। এই পথে অনেক পিচ্ছিল চড়াই ও গভীর খাদ আছে।

দৃঢ়পদে এই সকল সঙ্কট পার হইতে হইবে, তবে না আমরা স্বরাজশীর্ষে পঁহুছিতে পারিব ও সেখানকার স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে শ্বাস লইতে পারিব।

৩ ॥ মাদকতা নিবারণ

এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের মতই ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে যতটা আগ্রহ দেখানো উচিত, কংগ্রেসীরা তাহা দেখান নাই। যদি অহিংসার পথেই আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে হয়, তবে এই সহস্র সহস্র নরনারী যাহারা মদ্যপানাদি ও অহিফেনাদি নেশার কবলে পড়িয়া আছে, তাহাদের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ গবর্নমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না।

এই অন্যায় দূর করার কার্যে চিকিৎসকেরা বড় অংশ লইতে পারেন। মদ ও আফিম ইত্যাদির নেশার কবল হইতে লোককে উদ্ধার করার পথ তাঁহাদিগকে বাহির করিতে হইবে।

এই কার্যকে অগ্রসর করাইয়া দিতে নারীসমাজ ও ছাত্রসমাজের বিশেষ সুযোগ আছে। তাঁহারা প্রেমপূর্ণ সেবা দ্বারা, যাহারা নেশার কবলে পড়িয়াছে তাহাদিগকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহারা নেশা ছাড়িতে বাধ্য হয়।

কংগ্রেস কমিটিসমূহ বিশ্রামাগার খুলিতে পারেন, যেখানে ক্লান্ত শ্রমজীবীরা হাত-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিতে পারে এবং সস্তা ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলযোগ পাইতে পারে ও উপযুক্ত খেলাধূলা করিতে পারে। অহিংসার দৃষ্টিতে স্বরাজের দিকে লক্ষ্য করা একটা নূতন জিনিস। ইহাতে পুরানো মূল্য বদলাইয়া গিয়া নূতন মূল্যের সৃষ্টি হয়। হিংসার পথে এই ধরনের সংস্কারের কোনও স্থান নাই। যাঁহারা হিংসালভ্য স্বরাজে বিশ্বাসী, তাঁহারা তাঁহাদের অধীরতায় বা অজ্ঞতায় আখেরের দিন পর্যন্ত এই ধরনের সংস্কার ফেলিয়া রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, স্থায়ী ও স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তি ভিতর হইতেই আত্মশুদ্ধি দ্বারাই লভ্য।

গঠনমূলক কর্মীরা আইন দ্বারা মাদকতা তুলিয়া দিবার পথ যদি বা পরিষ্কার করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ আইনের প্রবর্তন সহজ ও আইন কার্যকরী তো করিতেই পারেন।

৪ ॥ খাদি

খাদি একটা বিতণ্ডার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে খাদির সুপারিশ করিয়া আমি ঝড়ের বিপরীত দিকে নৌকার পাল খাটাইতেছি এবং আমার হাতে স্বরাজ-নৌকা ডুবিবেই এবং খাদির পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আমি লোককে অন্ধকারের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি আজ খাদির প্রয়োজনীয়তার কথা লইয়া বিতর্ক করিতে বসি নাই। পূর্বে আমি ইহা লইয়া অনেক আলোচনাই করিয়াছি। আমি এখন ইহাই দেখাইতে চাই যে প্রত্যেক কংগ্রেসী, কংগ্রেসী কেন প্রত্যেক ভারতবাসীই খাদির জন্য কি করিতে পারেন। দেশের ভিতর সকলের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতালাভের মর্মই রহিয়াছে খাদিতে। আমি যাহা বলিতেছি প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষ নিজেই তাহা পরখ করিয়া দেখিয়া তাহার সত্যতা বুঝিতে পারেন। খাদির ভিতর যে অন্তর্নিহিত সত্যগুলি আছে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার মানেই হয় ষোল আনা স্বদেশী মনোভাব। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার সবটা ভারতেই পাওয়ার সংকল্প করা এবং তাহাও গ্রামের লোকের শ্রমের ও বুদ্ধির সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লওয়ার সংকল্প খাদি সংকল্পের অর্থ ধরা যাইতে পারে। উহা বর্তমান পদ্ধতির বিপরীত অবস্থার সূচনা করে। ভারতের ও বিলাতের মাত্র গুটিকতক শহর আজ ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের ধ্বংসের উপর পুষ্ট হইতেছে। খাদি মনোবৃত্তিতে তাহা না হইয়া এই সাত লক্ষ গ্রামই হইবে স্বাবলম্বী এবং তাহারা স্বেচ্ছায় ভারতের শহরগুলির সেবা করিবে, চাই কি ভারতের বাহিরের শহরেরও সেবা করিবে, যতক্ষণ তাহা উভয়তই কল্যাণকর হয়।

ইহা করিতে গেলে অনেকেরই মনোবৃত্তিতে ও রুচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক। কতকগুলি ব্যাপারে অহিংসার পথ যেমন সহজ, অপর কতকগুলিতে ইহা আবার তেমনি কঠিন। ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনকে গূঢ়ভাবে স্পর্শ করে এবং এমন একটা শক্তিতে তাহাকে মণ্ডিত করে, যাহা তাহার নিজের ভিতরেই সুপ্ত ছিল এবং যাহা তাহাকে ভারতীয় জনসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত নিজের একত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে। এই ধরনের অহিংসা মোটেই একটা শূন্য ফাঁকা জিনিস নয়, যুগ যুগ ধরিয়া আমরা ইহাকে ফাঁকা বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি। পরন্তু মানুষ যত রকমের শক্তির আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা তেজঃপূর্ণ শক্তি, যে শক্তির উপর মনুষ্য

সত্তার অস্তিত্বই নির্ভর করে। আমি ত এই শক্তিই কংগ্রেসের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং কংগ্রেসের মারফৎ সারা জগৎকে উপহার দিতে চাহিতেছি। আমার কাছে খাদি ভারতীয় মনুষ্যসমাজের ঐক্যের প্রতীক, উহা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও সমতার প্রতীক এবং এই হেতু জওহরলালের কাব্যময় ভাষায় ইহা "ভারতীয় স্বাধীনতার রাজপোশাক।"

খাদি মনোবৃত্তিতেই জীবনযাত্রার আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ ক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে। সেইজন্য এই রীতি চলিয়া আসিতেছে যে, প্রত্যেক গ্রামকেই নিজের আবশ্যক বস্ত্র উৎপন্ন করিতে হইবে এবং তাহার প্রয়োজন অপেক্ষাও কতকটা করিয়া বেশী উৎপন্ন করিতে হইবে।

বড় বড় শিল্পগুলিকে প্রয়োজনবশতই কেন্দ্রীকরণ ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনের জাতীয় অভিব্যক্তিতে তাহাদের স্থান নগণ্য থাকিবে।

খাদির ভিতরের নিহিত অর্থের পরিচয় দেওয়ার পর, এখন আমি দেখাইতে চাই যে কংগ্রেসীরা খাদির প্রসারের জন্য কি করিতে পারেন ও তাঁহাদের কর্তব্য কি।

খাদি উৎপাদনের ভিতর কাপাসের চাষ, কাপাসের ফসল তোলা, বীজ ছাড়ানো, সাফ করা, ধোনা, পাঁজ তৈয়ারী করা, সুতা কাটা, মাড় দেওয়া, রং করা, টানা দেওয়া, বোনা ও ধোলাই এই সবই পড়ে। এক রং করা ছাড়া বাকী সবগুলিই ইহার অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। ইহার প্রত্যেকগুলি গ্রামের ভিতর ঠিকভাবে কার্যকরী করা যায় এবং আজ অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের চেষ্টায় ভারতের বহুগ্রামে এই প্রক্রিয়া চলিতেছে। সর্বশেষ কার্য বিবরণীতে এই হিসাব পাওয়া যায়ঃ

১৯,৬৪৫ জন হরিজন ও ৫৭,৩৭৮ জন মুসলমান সমেত ২৭৫,১৪৬ জন গ্রামবাসী, যাহারা ১৩৪৫১ খানি গ্রামে বাস করে, সুতা কাটিয়া ও বস্ত্র বয়নাদি করিয়া ১৯৪০ সালে ৩৪,৮৫,৬০৯ টাকা উপার্জন করিয়াছে। যাহারা সুতা কাটে তাহাদের অনেকেই স্ত্রীলোক।

যদি কংগ্রেসীরা সদ্‌ভাবে খাদির কার্যক্রম হাতে লইতেন তবে যাহা করা যাইত, যাহা করা হইয়াছে তাহা তাহার শতাংশ মাত্র। যখন হইতে গ্রামের এই মূল শিল্পটি ও ইহার আনুষঙ্গিক শিল্পগুলি অবলীলায় ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন হইতেই আমাদের গ্রাম হইতে বুদ্ধি ও উজ্জ্বলতা অন্তর্হিত হইয়াছে। গ্রাম-

গুলিকে অন্তঃসারশূন্য, জ্যোতিহীন করিয়া গ্রাম্য অযত্নরক্ষিত পশুদের মত অবস্থাতেই তাহাদিগকে আনিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের খাদির আহ্বানে সত্যই সাড়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ হইতে সময় সময় খাদি পরিকল্পনায় তাঁহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য যে আবেদন আসে তাহা কার্যে পরিণত করিবেন। তথাপি আমি এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সন্নিবেশিত করিতেছি।

১। যাঁহাদের কিছুটা জমি আছে, এমন প্রত্যেক পরিবারই অন্ততঃ নিজের পরিবারের উপযোগী তুলা জন্মাইতে পারেন। তুলার চাষ করা সহজ। বিহারে আইনের জবরদস্তিতে কৃষকদের তাহাদের বিঘাপ্রতি তিন কাঠা করিয়া জমিতে নীল উৎপন্ন করিতে হইত। বিদেশী নীলকরদের স্বার্থের জন্য তাহাদের বাধ্য হইয়া ইহা করিতে হইত। তবে আমরা কেন আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের জমির কতকটা অংশে তুলা উৎপন্ন করিব না? পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, খাদি প্রক্রিয়ার শুরু হইতেই বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়। আজিকার দিনে তুলার চাষ কেন্দ্রীভূত এবং রেলে করিয়া তুলা ভারতের বিভিন্ন স্থানে লইতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার অনেকটা বৃটেনে ও জাপানে যাইত। যুদ্ধের পূর্বে এবং আজও তুলা দ্বারা কৃষক নগদ টাকা পায়। আর সেইজন্যই ইহা বাজারের উঠ্‌তি পড়্‌তির উপর নির্ভরশীল। খাদি পরিকল্পনা অনুসারে কাপাস উৎপাদন এই অনিশ্চয়তা ও জুয়ার ভাব হইতে মুক্ত। চাষী তাহার প্রয়োজন অনুরূপ উৎপাদন করিবে। চাষীর ত এই কথাই বুঝা দরকার যে তাহার প্রধান কর্তব্য হইতেছে নিজ প্রয়োজন অনুরূপ উৎপন্ন করা। যদি তাহাই করে, তবে বাজার মন্দা বলিয়া তাহার সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাই কমিয়া যায়।

২। যদি নিজের ঘরে কাপাস না থাকে, তবে সুতা কাটার জন্য প্রয়োজন মত কাপাস প্রত্যেক কাটুনীই খরিদ করিবে। আর সেই কাপাস সে সহজেই হাতে চালানো কেরকীতে ডলাই করিয়া লইতে পারে। তাহার নিজের যতটুকু প্রয়োজন তাহা ত একখানা কাঠের উপর একটা লোহার শিক রগড়াইয়াই ডলিয়া লইতে পারে। যেখানে ইহা করা সম্ভব নয়, সেখানে হাতে ডলাই করা কাপাসই কিনিয়া আনিয়া ধুনিতে হইবে। নিজের জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু তুলা ছোট একটা ধনুকেই ধুনিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ পরিশ্রম নাই। কাজটা যতই বিকেন্দ্রীকৃত হয়, ততই যন্ত্রগুলি সহজ ও সস্তা হইয়া পড়ে। পাঁজ করার পর সুতা কাটার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতা কাটার জন্য আমি

ধনুষ-তকলি ব্যবহার করিতে বলি। আমি আজকাল প্রধানত ইহাই ব্যবহার করিতেছি। চরখায় আমি যত দ্রুত সুতা কাটিতে পারি, ইহাতেও প্রায় তাহাই পারি। বরঞ্চ এই তকলির সুতা আর একটু সূক্ষ্ম হয় এবং বেশী শক্ত ও সমান হয়। তবে এ কথা সকলের পক্ষে না খাটিতে পারে। আমি ধনুষ-তকলি ব্যবহার করিতে বলি এই জন্য যে ইহা সহজেই তৈরী করা যায়। ইহা বেশ সস্তা ও চরখা মেরামতে রাখার যে হাঙ্গামা তাহা ইহাতে নাই। যদি মালদড়ি কেমন করিয়া করা হয় তাহা জানা না থাকে অথবা মালদড়ি পিছলাইলে কি করিতে হয় অথবা চরখা অচল হইলে কি করিয়া চালু করিতে হয় যদি জানা না থাকে, তবে চরখা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া যদি লাখ লাখ লোককে সুতা কাটিতে হয় তবে ধনুষ-তকলি সহজে নির্মিত ও ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বলিয়া কেবল ইহাই কার্য উপযোগী হইতে পারে। সাধারণ তকলি অপেক্ষাও ইহা তৈরী করা সহজ। একবার কল্পনা করুন, সমস্ত লোক কাপাস হইতে আরম্ভ করিয়া সুতা কাটার কার্য করিতেছে। তবে সমস্ত জাতির উপর উহার ঐক্য-বিধায়ক ও শিক্ষাপ্রদ প্রভাব কত বড হইবে। বিবেচনা করুন, ধনী-দরিদ্রের ভিতর একই শ্রমের মাধ্যমে যুক্ত হওয়ায় সমতার ভাব কত কার্যকরী হইবে।

এইভাবে প্রস্তুত সুতা তিনটি উপায়ে ব্যয় করা যাইতে পারে: দরিদ্রের সাহায্যের জন্য ইহা চরখা-সঙ্ঘকে দান করা যাইতে পারে। নিজের ব্যবহারের জন্য ইহা বুনাইয়া লওয়া যাইতে পারে, অথবা ইহার বদলে যতটা পাওয়া যায় ততটা খাদি লওয়া যাইতে পারে। এ কথা ত স্পষ্ট যে সুতা যত সূক্ষ্ম হইবে ও উৎকৃষ্ট হইবে উহার মূল্যও তত বেশী হইবে। যদি কংগ্রেসীরা এই কাজে মন লাগান, তবে তাঁহারা ব্যবহৃত যন্ত্রাদির উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন এবং অনেক কিছু আবিষ্কারও করিবেন। আমাদের দেশে শ্রমের সহিত বুদ্ধিশক্তির একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কর্মপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রম ও বুদ্ধির যদি অচ্ছেদ্য সংযোগ হয় এবং যদি উপরিউক্ত উপায়ে উহা সাধিত হয়, তবে উহা দ্বারা অপরিমেয় হিত হইবে।

জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই যে যান্ত্রিক সুতা কাটার পরিকল্পনা, তাহাতে সাধারণ নরনারী দৈনিক এক ঘণ্টা সময় দিলেই হইবে। ইহার বেশী আমি আশা করি না।

৫ ॥ অপর গ্রামীণ শিল্প

অপর সকল শিল্পের ভিত্তি খাদি হইতে ভিন্ন প্রকারের। ঐ সকল কাজে স্বেচ্ছামূলকভাবে খাটিবার ক্ষেত্র কম। প্রত্যেক শিল্পেই গুটিকতক লোকের শ্রমের আবশ্যক। এই সকল শিল্প খাদির সহায়কের স্থান লইয়া আছে। খাদি ছাড়া এগুলি বাঁচিতে পারে না। আর এগুলি না থাকিলে খাদির মর্যাদাও আবার অনেকখানি মলিন হইবে। গ্রাম্য অর্থনীতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি ততক্ষণ হইবে না, যতক্ষণ না মৌলিক গ্রাম্য শিল্পগুলির, যথা—হাতে তৈরী আটা, ঢেঁকিছাটা চাউল, সাবান তৈরী, কাগজ তৈরী, দেশলাই তৈরী, চামড়া পাকাই, ঘানিতে তেল তৈরী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কংগ্রেসীরা এই সকল শিল্পে মন দিতে পারেন। আর যদি তাঁহারা গ্রামবাসী হন অথবা গ্রামে বসিয়াই যান, তবে তাঁহারা এই সকল শিল্পকে নবজীবন এবং নূতন রূপ দিবেন। সকলেরই এই সৎ সঙ্কল্প লওয়া চাই যে, সব সময়ে সকল স্থানে কেবল গ্রামজাত বস্তুই ব্যবহার করিবেন। যদি চাহিদা হয় তবে এ বিষয় সন্দেহ নাই যে, আমাদের যাহা আবশ্যক তাহা গ্রাম হইতেই মিটিতে পারে। যখন আমরা গ্রামীণ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইব, তখন আমাদের পশ্চিমের নকল বস্তুর আবশ্যক হইবে না অথবা যন্ত্রনির্মিত দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না। পরন্তু তখন আমরা এমন একটা খাঁটি স্বদেশী রুচির পোষক হইব, যাহা নব ভারতের কল্পনার পরিপোষক হইবে—যে নব ভারতে বৃত্তিহীনতা, অনাহার এবং আলস্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে না।

৬ ॥ গ্রামের পরিচ্ছন্নতা

শ্রমের সহিত বুদ্ধির সহযোগিতার অভাব হওয়ায় গ্রামের উপর অমার্জনীয় অবহেলা উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য সুচারু গ্রামের শোভায় দেশ শোভিত না হইয়া আমরা দেখিতেছি কেবল আঁস্তাকুড়েরই সমাবেশ। অনেক গ্রামেরই প্রবেশপথ এমন যে, প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। এমনি আবর্জনা ও দুর্গন্ধ থাকে যে, লোকের চোখ বুজিয়া নাকে কাপড় চাপা দিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের কংগ্রেসীদের বেশীর ভাগই ত গ্রামে বাস করেন। যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের গ্রামগুলি পরিচ্ছন্নতার আদর্শ হইয়া থাকিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রামবাসীদের সহিত তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এক হইয়া যাওয়া যে কংগ্রেসীদের কর্তব্য তাহা তাঁহারা কখনও মানেন নাই।

জাতীয় বা সামাজিক পরিচ্ছন্নতার বোধ বলিয়া যে গুণ আছে, তাহা আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কোনও রকমে স্নানটা সারিয়া লই বটে, কিন্তু যে কূপে বা জলাশয়ে বা নদীতে আমরা স্নান করিয়া শুচি হই, সেই কূপ, পুকুর বা নদীতীর নোংরা করিতে আমাদের আটকায় না। এই ত্রুটি একটা বড় অপরাধ বলিয়া আমি মনে করি। এই কারণেই আমাদের গ্রামগুলি নিন্দনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে ও আমাদের পবিত্র নদীগুলির পবিত্র তটভূমিগুলি কলঙ্কিত হইতেছে এবং অপরিচ্ছন্নতাজনিত রোগ আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে।

৭ ॥ নূতন বা বনিয়াদি শিক্ষা

এই বিষয়টা নূতন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ইহাতে এতটা আগ্রহ দেখান যে, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে সম্মতির ছাপ দেন। এই সঙ্ঘ হরিপুরা কংগ্রেসের সময় হইতে কাজ করিয়া আসিতেছে। অনেক কংগ্রেসীর পক্ষে ইহার একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। এই শিক্ষা গ্রাম্য শিশুদিগকে আদর্শ গ্রামবাসী করার জন্য পরিকল্পিত। ইহা তাহাদের উপযোগী করিয়াই গঠিত। ইহার অনুপ্রেরণা গ্রাম হইতেই আসিয়াছে। যে সকল কংগ্রেসীরা স্বরাজের ইমারত ভিত্তি হইতে পাকা করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা শিশুদিগকে অবহেলা করিতে পারেন না। বৈদেশিক শাসন নিশ্চিতরূপে অথচ অলক্ষ্যে শিশুদিগের শিক্ষার ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিও একটা তামাশা বিশেষ। কিন্তু গ্রামের প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখা যাউক, আর শহরের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই দেখা যাউক, গ্রামের ছেলেই হউক আর শহরের ছেলেই হউক, বনিয়াদী শিক্ষা এই বালক-বালিকাদিগকে ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহার সহিত যোগযুক্ত করে। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশ হয় এবং শিশুকে তাহার জন্মস্থানের সহিত গভীর সম্বন্ধযুক্ত করে। ইহাতে একটা ভবিষ্যতের গৌরবময় কল্পনা লক্ষ্য করিয়া পঠদ্দশাতেই বালক বা বালিকা নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়। এই কাজ কংগ্রেসীরা খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন—আর যে ছেলেদের সংস্পর্শে তাঁহারা আসিবেন, তাহাদিগকেও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবেন। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন সেবাগ্রামে সঙ্ঘের কর্মসচিবের সহিত যোগযুক্ত হন।

৮ ॥ বয়স্কদিগের শিক্ষা

কংগ্রেসীরা এই কাজটি এত অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন যে তাহা দুঃখদায়ক। যেখানে অবহেলা করেন নাই, সেখানে অশিক্ষিতদিগকে কেবল লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি আমার হাতে বয়স্কদের শিক্ষার ভার থাকিত, তবে আমি শিক্ষার্থীদের মন খুলিয়া দিবার ব্যবস্থাই হাতে লইতাম এবং তাহাদিগকে বুঝিতে দিতাম যে, তাহাদের দেশ কত মহান ও কত বড়। গ্রামবাসীর ভারতবর্ষ ত তাহার কাছে তাহার গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ। সে যখন অন্য গ্রামে যায়, তখন সে তাহার নিজের গ্রামকেই তাহার গৃহ বলিয়া ভাবে, সেই গ্রামের গল্প করে। ভারতবর্ষ তাহার নিকট একটা ভূগোলের কথা মাত্র। গ্রামবাসীদের ভিতর যে কি পরিমাণ অজ্ঞতা আছে, সে বিষয় কোনও ধারণাই আমাদের নাই। বিদেশী শাসন ও তাহার দুঃখ-দায়ক পরিণামের বিষয় গ্রামবাসী কিছুই জানে না। যে সামান্য জ্ঞান এই বিষয়ে সে সংগ্রহ করে, তাহাতে বিদেশীকে দেখিয়া সে ভয়ে অভিভূত হয় এবং নিজের অসহায়তার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়। ফলে বিদেশীর প্রতি ও তাহার শাসনপদ্ধতির প্রতি ভীতি ও ঘৃণার ভাব উপস্থিত হয়। ইহা হইতে কিসে মুক্তি হইতে পারে, সে ধারণাই তাহাদের নাই। তাহারা এ কথা জানে না, বিদেশীরা যে এখানে আছে তাহা তাহাদেরই দুর্বলতার জন্য এবং বিদেশী শাসন দূর করার সামর্থ্য যে তাদের নিজেদেরই আছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই সেই শাসন চলিতেছে। এই হেতু আমার পরিকল্পিত বয়স্কদের শিক্ষা মানে কথায় কথায় তাহাদিগকে সত্যকার রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া। এই জিনিসটা সুপরিকল্পিত করা যাইতে পারে বলিয়া নির্ভয়ে এই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, আজকার দিনে কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই ধরনের শিক্ষা প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। যদিও ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তবে তাহা দূর করার জন্য এবং এই প্রাথমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িতেই হইবে—আর ইহা না করিতে পারিলে স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। অবশ্য যাহা কিছু আমি লিখিতেছি, তাহার ভিতর খোলাখুলি কাজ করার কথাই রহিয়াছে। অহিংসা ভয়কে ঘৃণা করে এবং সেই হেতু গোপনীয়তাও বর্জন করে। মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁথিগত বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা স্বয়ংই একটা বিশেষ বিষয়। অক্ষর শিক্ষাকাল যাহাতে কমানো

যায়, তাহার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষজ্ঞদের একটা সাময়িক বা স্থায়ী বোর্ড গঠন করিতে পারেন, যাহাতে উপরের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার পথ পাওয়া যায় ও কর্মীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়। এ কথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, যাহা কিছু আমি বলিলাম উহাতে কেবল পথই দেখানো হইতেছে, কিন্তু সাধারণ একজন কংগ্রেসী কি করিয়া সে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহা বলা হইতেছে না। আবার সকল কংগ্রেসীই এই বিশেষজ্ঞের কাজের যোগ্যও নহেন। কিন্তু যেসব কংগ্রেসীদের বৃত্তিই শিক্ষকতা, তাঁহাদের পক্ষে উপরের কল্পনা অনুযায়ী একটা শিক্ষাক্রম স্থির করা কঠিন হইবে না।

৯ ॥ নারীজাতির উন্নয়ন

গঠনমূলক কার্যের ভিতর আমি নারীজাতির উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কেন না যদিও সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারীদিগকে অন্ধকার হইতে এমন ভাবে টানিয়া বাহির করিয়াছে যে আর কিছুতেই এত অল্প সময়ে তাহা সম্ভবপর হইত না, তথাপি কংগ্রেসীবা সে প্রেরণা অনুভব করেন নাই, যাহাতে তাঁহারা নারীদিগকে স্বরাজের জন্য যুদ্ধে পুরুষের সমান অংশগ্রহণকারিণী বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। তাঁহারা এ কথা অনুভব করেন নাই যে, সেবার ব্রতে নারীই পুরুষের সত্যকার সহায়ক। পুরুষের রচিত আচার ও নিয়মের শৃঙ্খলে নারীদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল নিয়ম গঠনে নারীদের কোনই হাত ছিল না। অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার পরিকল্পনায় পুরুষের পক্ষে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণের যতটা স্বাধীনতা আছে, নারীদের পক্ষে তাহাদের লক্ষ্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের ঠিক ততটা অধিকারই রহিয়াছে। আবার অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত সমাজে প্রত্যেক অধিকারই কোনও কর্তব্যপালনের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই কথাই দাঁড়ায় যে, সামাজিক আচরণের নিয়ম উভয়ের সহযোগিতায় ও পরামর্শ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল নিয়ম কদাচ বাহির হইতে চাপানো যায় না। পুরুষেরা নারীদের প্রতি ব্যবহারে এই সত্যটা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাহারা নিজদিগকে নারীদের প্রভু, কর্তা প্রভৃতি মনে করিয়াছে। বন্ধু ও সহকর্মী এই দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখে নাই। কংগ্রেসীদের এখন গৌরবময় কর্তব্য হইতেছে নারীদিগকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া। নারীদের অবস্থা সেকালের সেই ক্রীতদাসের মত,

যাহারা এ কথা কখনো ভাবিতেও পারিত না যে কোনও দিন তাহারা স্বাধীন হইতে পারে। তারপর যখন স্বাধীনতা আসে, তখন ক্রীতদাসেরা সাময়িকভাবে নিজদিগকে অসহায় মনে করে। নারীদিগকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা পুরুষের দাসী। কংগ্রেসীদের কর্তব্য হইতেছে ইহা দেখা যে নারীরা তাহাদের পূর্ণ দায়িত্বের বোধ পায় এবং পুরুষের সঙ্গে সমানে তাহাদের যোগ্য স্থান অধিকার করে।

যদি মন তৈরী থাকে তবে এই ধরনের বিপ্লব সহজেই সংঘটিত হয়। কংগ্রেসীরা এই কাজটা তাঁহাদের নিজেদের গৃহেই আগে আরম্ভ করিয়া দিন। স্ত্রীদিগকে খেলার পুতুল ও আমোদের পাত্রী না বানাইয়া তাহাদিগকে সেবার ক্ষেত্রে মাননীয়া সহযোগিনীর স্থান তাঁহারা দিন। এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা ভাল শিক্ষা পান নাই, তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীদের নিকট হইতে যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রাপ্ত হউন। একই নীতি যথাযোগ্য পরিবর্তনসহ মাতা ও কন্যাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

এ কথা স্বীকার করা অনাবশ্যক যে আমি ভারতীয় নারীদের অসহায় অবস্থার একদেশদর্শী চিত্রই আঁকিয়াছি। আমি এ কথা বেশ জানি যে গ্রামে সাধারণত নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষভাবে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রভুত্বও করে। কিন্তু নিরপেক্ষ কোনও দ্রষ্টার নিকট আইনগত ও আচারগতভাবে এখানকার নারীসমাজের অবস্থা বস্তুতই সর্বথা খারাপ এবং উহার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

১০ ॥ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-জ্ঞান

গ্রামের পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে একবার বলিয়া আবার স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কথা অবতারণার মানে কি এ কথা উঠিতে পারে। গ্রাম পরিচ্ছন্নতার সহিত এই বিষয় একযোগে আলোচিত হইতে পারিত। কিন্তু পদ বা বিষয়ের বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। কেবল পরিচ্ছন্নতার উল্লেখই স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিজের শরীর সুস্থ রাখা ও শরীর পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও ব্যবহারে পরিণত করা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। সুগঠিত সমাজে নাগরিকেরা স্বাস্থ্যের ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম জানে ও পালন করে। এ কথা অবিসংবাদীভাবে সত্য যে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানের অভাববশত অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের ভিতর মৃত্যুসংখ্যার আধিক্যের হেতু যে আমাদের

তীব্র দারিদ্র্য, সে কথা সত্য। তবুও উহা কতকটা কমানো যাইত, যদি লোক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান পাইত।

সুস্থ দেহ সুস্থ মনের বাসভূমি, ইহা মানুষের প্রথম আবিষ্কৃত নিয়ম এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মন ও শরীরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সংযোগ আছে। যদি আমরা সুস্থ মনের অধিকারী হই, তবে আমরা স্বতই হিংসা বর্জন করিব এবং স্বভাবত স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিয়া আমরা বিনা প্রয়াসে সুস্থ দেহসম্পন্ন হইব। সেইজন্য আমি আশা করি কোনও কংগ্রেসীই গঠনমূলক কার্যের এই পদটি অবহেলা করিবেন না। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়মগুলি সহজ এবং শিক্ষাও সহজেই করা যায়। উহা পালন করা কঠিন। সেইগুলি এই:

পবিত্রতম চিন্তা করিবে ও সমস্ত অলস ও অপবিত্র চিন্তা বর্জন করিবে।

রাত্রিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে।

শারীরিক ও মানসিক কর্মে সমতা বজায় রাখিবে।

সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, সোজা হইয়া বসিবে এবং প্রত্যেক কাজকর্মে পরিচ্ছন্ন থাকিবে। তোমার বাহ্য শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা যেন তোমার আভ্যন্তরীণ শুচিতার পরিচায়ক হয়।

জনসাধারণের সেবায় বাঁচিয়া থাকার জন্যই আহার করিবে। নিজের ব্যসন চরিতার্থ করার জন্য আহার করিবে না। সেই হেতু তোমার শরীর ও মন যথাযোগ্য সুস্থ রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটা আহার করিবে। মানুষ যেমনটি খায় তেমনটি গড়িয়া উঠে।

তোমার ব্যবহারের খাদ্য, পানীয় ও হাওয়া যেন পরিচ্ছন্ন হয়। কেবল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না, পরন্তু নিজে যে ত্রিবিধ পরিচ্ছন্নতা চাও, তোমার আবেষ্টন সেই পরিচ্ছন্নতায় পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

১১ ॥ প্রাদেশিক ভাষা

আমাদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার প্রতি অধিক প্রীতির জন্য আমাদের শিক্ষিত ও রাজনৈতিক মনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, আর ভারতের ভাষা দরিদ্রতর হইয়াছে। আমরা মাতৃভাষায় কোনও জটিল চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার বৃথা চেষ্টায় গোলে পড়িয়া যাই। বৈদেশিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ পাই না। ইহার ফল বিষম হইয়াছে। জনসাধারণ বর্তমান যুগের চিন্তাধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে।

ভারতবর্ষের মহান ভাষাগুলির অবহেলা দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, বর্তমান সময়ে তাহা আমরা ঠিকমত মাপ করিতে পারিতেছি না। যদি আমরা এই অন্যায়ের প্রতিকার না করি, তবে জনসাধারণের মন অজ্ঞতায় রুদ্ধ হইয়া থাকিবে এ কথা বুঝা সহজ। জনসাধারণ তাহা হইলে স্বরাজের প্রতিষ্ঠায় কোনও বড় সাহায্য করিতে পারিবে না। অহিংসার উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ইহা অন্তর্নিহিত সত্য যে প্রত্যেক লোকই স্বাধীনতার আন্দোলনে তাহার নিজ অংশ গ্রহণ করিবে। যদি তাহারা প্রত্যেকটি বিষয় ও তাহার ভিতরের অর্থ না বুঝে তবে জনসাধারণ ভাল করিয়া এই কাজ করিতে পারিবে না। তাহাদের নিজেদের ভাষায় ইহা না বুঝাইলে, তাহারা বুঝিতেও পারিবে না।

১২ ॥ রাষ্ট্রভাষা

তাহা ছাড়া সারা ভারতের চিন্তা বিনিময়ের জন্য আমাদের ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্য হইতে একটা ভাষা চাই, যাহা অধিক সংখ্যক লোক বর্তমানে জানে এবং যাহা অপর সকলে সহজেই শিখিতে পারে। এই ভাষা অবিসংবাদীভাবেই হিন্দী ভাষা। উত্তর ভারতের হিন্দু মুসলমানেরা এই ভাষা বুঝে ও ইহাতে কথা বলে। পার্শী অক্ষরে লিখিলে ইহাকে উর্দু বলা হয়। ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে কংগ্রেস এক বিখ্যাত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই সর্বভারতীয় ভাষাকে 'হিন্দুস্থানী' নাম দেন। সেই হইতে অন্ততঃ নিয়মানুযায়ী এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। আমি 'নিয়মানুযায়ী' এই জন্য বলিতেছি যে, সকল কংগ্রেসীরাও ইহা কার্যত যতটা করা উচিত, ততটা প্রয়োগ করেন নাই। ১৯২০ সালে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির একটা সঙ্কল্পিত প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। আবার সারা ভারতের জন্য একটা সাধারণ ভাষা গ্রহণের চেষ্টাও চলে, যে ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কথা বলিতে পারেন ও বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকালে যে ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। এই রাষ্ট্রীয় ভাষা উভয় প্রকার কথন পদ্ধতিতে বলিতে ও উভয় লিপিতে (নাগরী ও উর্দু) লিখিতে শিখাইবে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসী এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য আমাদের লজ্জাকর দৃশ্য দেখিতে হয় যখন কংগ্রেসীগণ ইংরাজী বলিতে জেদ করেন এবং অপরেও তাঁহাদের সুবিধার

জন্য ইংরাজী যাহাতে বলে তাহাতে বাধ্য করেন। ইংরাজী ভাষা যে মোহে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা এখনো ভাঙ্গে নাই। আর এই মোহে অভিভূত হইয়া থাকায় ভারতের পক্ষে নিজ লক্ষ্যে পঁহুছিবার চেষ্টায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইতেছি। জনসাধারণের জন্য আমাদের ভালবাসা খুবই ভাসা ভাসা বলিয়াই প্রমাণিত হইবে, যদি আমরা ইংরাজী শিখিতে যত বৎসর ব্যয় করি হিন্দুস্থানী শিখিতে সেই কয়টা মাসও দিতে না চাই।

১৩ ॥ আর্থিক সমতা

অহিংসার পথে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এই শেষোক্ত বিষয়টি প্রধান চাবিকাঠি স্বরূপ। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা মানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে আবহমান কালের যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা শেষ করা। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যে মুষ্টিমেয় ধনীসমূহ জাতীয় ধনসম্পদের মালিক হইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থার সঙ্কোচ করা এবং অপরপক্ষে ক্ষুধাপীড়িত নগ্ন জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন করা। যতদিন পর্যন্ত ধনী ও ক্ষুধিত কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়া যাইবে, ততদিন অহিংসার পথে শাসনপ্রথার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব থাকিবে। নয়াদিল্লীর প্রাসাদাবলীর সহিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের কুটিরের অসামঞ্জস্য স্বাধীন ভারতে একদিনও বরদাস্ত হইবে না, কেন না সেই ভারতের রাজ্যশাসনে দরিদ্রেরাও ধনীদের মত সমান ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে। ধনীরা তাহাদের ধন ও ধন হইতে উৎপন্ন ক্ষমতা যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করে এবং তাহাদের সম্পদ যদি সাধারণের কল্যাণের জন্য বাঁটিয়া না দেয়, তবে রক্তাক্ত ও হিংস্র বিপ্লব যে একদিন দেখা দিবে সে কথা নিশ্চিত।

আমি ট্রাস্টি বা অছিত্বের নীতির বিষয় যে কথা বলিয়াছি, সেই ধারণার উপর যদিও অনেক বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে তবুও আমি তাহাই আজিও মানি। একথা সত্য যে ঐ অবস্থা লাভ করা কঠিন। আমরা ১৯২০ সালেই এই সঙ্কটময় পর্বত উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্প লই। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার জন্য চেষ্টা করা ভাল। ইহার ভিতর অহিংসার প্রয়োগের জন্য প্রতিদিনের ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। আশা করা যায় যে কংগ্রেসীরা অনুসন্ধান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলা হয় তাহার যুক্তি নিজে নিজে বুঝিয়া অহিংসা কেন ও কি তাহা স্থির করিবেন। তাঁহারা নিজেদিগকেই প্রশ্ন করিবেন যে বর্তমান অসমতা কেমন করিয়া দূর করা যায়—হিংসার পথেই

হউক অথবা অহিংসার পথেই হউক। আমার মনে হয় হিংসার পথে কি করা যায়, তাহা আমরা জানি। কোনও জায়গায় হিংসা দ্বারা কাজ হাসিল হয় নাই।

আমাদের অহিংসার পথের পরীক্ষা এখনো গড়িয়া উঠিতেছে। লোককে দেখাইবার মত আজ তেমন কিছু একটা আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি দেখিতেছি যে এই প্রথা কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও খুবই ধীরে তবুও ধনসমতার দিকে ইহা কার্যকরী হইতেছে। অহিংসার পথ হৃদয় পরিবর্তনের পথ বলিয়া যদি পরিবর্তন একবার ঘটে, তবে তাহা স্থায়ীই হইবে। যে সমাজ বা জাতি অহিংসার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর ভিতর বা বাহিরের আঘাত সে সহিয়া উঠিতে পারিবে। আমাদের কংগ্রেস সংস্থায় অর্থশালী লোক আছেন। তাঁহাদেরই পথপ্রদর্শক হইতে হয়। এই সংগ্রাম আমাদের শেষ সংগ্রাম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই হেতু প্রত্যেক কংগ্রেসীর ব্যক্তিগতভাবে আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে কোনোকালে আমাদিগকে ধনসমতা লাভ করিতে হয়, তবে এখন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। যাঁহারা এ কথা মনে করেন যে বড বড সংস্কারগুলি স্বরাজ লাভের পরে হইবে, তাঁহারা অহিংস স্বরাজ সক্রিয় করিবার প্রাথমিক সূত্রের সম্পর্কে নিজেদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। একদা কোনও শুভপ্রাতঃকালে এই প্রকার স্বরাজ আকাশ হইতে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে না। উহা দিনে দিনে যেমন রাজমিস্ত্রী ইটের উপর ইট গাঁথে, তেমনি করিয়া সংঘবদ্ধ আত্মপ্রয়াস দ্বারা লাভ করিতে হইবে। আমরা উহার পত্তনের দিকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখনো অনেক দীর্ঘ ক্লান্তির পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে—যাহার পর আমরা গৌরবের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত স্বরাজের দর্শনলাভ করিতে পারিব। প্রত্যেক কংগ্রেসীই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে ধনসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজে কি করিয়াছেন।

১৪ ॥ কিষাণ

এই কর্মপদ্ধতির বিবরণে সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ধরা হয় নাই। স্বরাজের কাঠামো বিশাল। আশী কোটি হাতের শ্রমে উহা গড়িয়া উঠিবে। ইহাদের মধ্যে কিষাণ অর্থাৎ চাষীরাই সর্বাধিক সংখ্যক। বস্তুত তাহাদের অধিকাংশই (অনুমান শতকরা ৮০ ভাগের বেশী) কিষাণ বলিয়া কিষাণেরাই কংগ্রেস হইবে,

কিন্তু তাহারাও আজ কংগ্রেস নয়। যখন তাহারা তাহাদের অহিংস শক্তির বিষয় অবহিত হইবে, তখন জগতের কোনও শক্তিই তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পদাধিকারের জন্য কিষাণদিগকে ব্যবহার করা উচিত হইবে না। আমি ইহা অহিংস পন্থার বিপরীত বলিয়া মনে করি। যাঁহারা কিষাণ সম্পর্কে আমার প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা চম্পারণ আন্দোলনটা বুঝিয়া দেখিতে পারেন। সেইখানেই সর্বপ্রথম ভারতে সত্যাগ্রহ পরীক্ষিত হয় এবং তাহাতে যে ফল হয় তাহা সকলেই জানেন। উহা একটা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। উহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। প্রায় বিশ লক্ষ কিষাণ ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সংগ্রামটা এমন একটা বিশেষ অন্যায় সম্পর্কে করা হইয়াছিল, যাহা এক শতাব্দীকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কয়েকবার হিংস্র বিপ্লব হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক-বারই উহা দমিত হয়। অহিংস বিপ্লব কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। চম্পারণের কৃষকেরা কোনও বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীতই রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে। তাহাদের দুঃখ অপনোদনের ব্যাপারে অহিংসার ক্রিয়া-শীলতার যে পাঠ কিষাণেরা পায়, তাহাই তাহাদিগকে কংগ্রেসে আকৃষ্ট করে। শ্রীব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্রবাবুর অধিনায়কত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে তাহারা নিজেদের স্বার্থকতার পরিচয় দেয়।

পাঠকগণ খেড়া, বারদৌলী ও বোরসাদের কিষাণ আন্দোলন বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়াও লাভবান হইতে পারেন। ইহার কৃতকার্যতার মূল হইতেছে এই যে, কিষাণদিগকে তাহাদের নিজ ব্যক্তিগত ও অনুভূত অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত রাজনৈতিক কারণে নিয়োজিত করা হইতে বিরত থাকা। একটা বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থার অবলম্বন বিষয়ে তাহারা বুঝিতে পারে। অহিংসা সম্পর্কে উপদেশাবলী তাহাদের জন্য প্রয়োজন হয় না। তাহারা এমন একটা কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োগ করে, যাহা তাহারা নিজেরা বুঝিতে পারে। তাহার পর যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত পন্থাই অহিংস পন্থা, তখন তাহারা উহাই অহিংস বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে সমস্ত কংগ্রেসী ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝিয়া লইতে পারিবেন যে, কিষাণদের মধ্যে কেমন করিয়া কি কাজ করা যাইতে পারে। আমি এ কথা মানি যে, কতক কংগ্রেসী যেভাবে কিষাণদিগকে সংগঠিত

করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের ভাল কিছুই হয় নাই—হয়ত বা তাহাদের অনিষ্টই হইয়াছে। এই ধরনের কতক কর্মীর এইজন্য প্রশংসা করা যায় যে, তাঁহারা সাফ সাফ স্বীকার করেন যে তাঁহারা অহিংসার পথে বিশ্বাস করেন না। এই ধরনের কর্মীদের প্রতি আমার এই পরামর্শ যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেসের নাম ব্যবহার না করেন এবং কংগ্রেসী বলিয়া পরিচয় না দেন।

পাঠক এক্ষণে বুঝিবেন যে, আমি কেন কিষাণ ও মজুরদিগকে অখিল ভারত সংস্থাভুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে নামি নাই। আমি ত কতই ইচ্ছা করি যে, সকল হাতই যেন এক দিকেই নৌকা ঠেলে। কিন্তু আমাদের দেশের মত এত বড় বিস্তীর্ণ দেশে হয়ত উহা অসম্ভব। সে যাহাই হউক, অহিংসার ভিতর কোনও বল প্রকাশের অবসর নাই। এক দিকে সাফ যুক্তি এবং অপর দিকে অহিংসাপ্রসূত কর্মের দৃষ্টান্তের উপর কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ভর করিতে হইবে।

আমার অভিমত এই যে যেমন মজুরদের জন্য আছে, তেমনি কিষাণদের জন্যও কংগ্রেসের ভিতর একটি বিভাগ থাকা চাই, যাহাতে কিষাণদেব বিশেষ সমস্যাগুলি বিবেচিত হইবে।

১৫ ॥ শ্রমিক

আমার এই অভিমত যে আমেদাবাদের মজুর ইউনিয়ন সারা ভারতের জন্য আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উহার ভিত্তি হইতেছে অহিংসা, বিশুদ্ধ অবিমিশ্র অহিংসা। উহার কর্মকালে কোনও বিপর্যয় এ পর্যন্ত হয় নাই। উহা শক্তি হইতে অধিকতর শক্তির পথে বিনা আড়ম্বরে অগ্রসর হইয়াছে। এই সংস্থার হাসপাতাল আছে, মজুরদের, বালকবালিকাদের বিদ্যালয় আছে, বয়স্ক-দিগকে পড়াইবার ক্লাস আছে, নিজস্ব ছাপাখানা ও খাদিভাণ্ডার আছে এবং নিজেদের বাসের বাড়ী আছে। সমস্ত শ্রমিকদেরই ভোট আছে এবং নির্বাচন কি হইবে তাহার নিয়ন্তা তাহারাই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় তাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়। এই সংস্থা কংগ্রেসের দলগত রাজনীতিতে কখনও অংশ গ্রহণ করে নাই। শহরের মিউনিসিপ্যাল নীতি ইহারা প্রভাবিত করে। ইহাদের দ্বারা খুব সার্থকতার সহিত ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অহিংসমূলক ছিল। মিল মালিক ও মজুরগণের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে স্বেচ্ছামূলক মধ্যস্থতার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। যদি আমার দ্বারা সম্ভব হইত, তবে আমি ভারতের সমস্ত

শ্রমিক সংস্থা আমেদাবাদের আদর্শে পরিচালিত করিতাম। ইহা কখনো অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিতর মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করে নাই এবং ঐ কংগ্রেস দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। আশা করি একদিন আসিবে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে আমেদাবাদের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে এবং আমেদাবাদের সংস্থা অখিল ভারত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, কিন্তু আমি সেজন্য ব্যগ্র নহি। যখন সময় আসিবে তখনই সেইদিন আসিবে।

১৬ ॥ আদিবাসী

'রাণীপরজ' শব্দটির মত 'আদিবাসী' শব্দটিও নূতন সৃষ্ট। 'রাণীপরজ' মানে 'কালিপরজ' অর্থাৎ কৃষ্ণকায় লোক—যদিও তাহাদের গায়ের রং অন্য কাহারও অপেক্ষা বেশী কালো নয়। এই শব্দটি, আমার মনে হয় জুগতরাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আদিবাসী শব্দের মানে আদিম অধিবাসী। ভীল, গণ্ড অথবা পাহাড়ে লোক বা আদিম অধিবাসী বলিয়া বিধৃত লোকদিগকে আদিবাসী বলা হইয়াছে। 'আদিবাসী' এই শব্দটি আমার বিশ্বাস ঠক্করবাপা তৈরী করিয়াছেন।

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ভিতর আদিবাসীদিগকে সেবা করাও একটা পদ। যদিও এই পুস্তিকার বিষয়ক্রমে ইহা ষোড়শ স্থান লইয়াছে, তথাপি প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে ইহার স্থান নিম্ন নহে। আমাদের দেশটা এত বড় এবং এত বিভিন্ন প্রকারের জাতি ইহাতে বাস করে যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা খুব বেশী জানেন, তাঁহারাও এদেশের সকল লোকের কথা ও তাহাদের অবস্থার কথা জানেন না। যখন কেহ এই কথাটা নিজে নিজে উপলব্ধি করেন তখনই বুঝেন যে, আমাদের দেশকে একটা নেশন বলিয়া দাবি করাটাকে সত্য করিয়া তোলা কত কঠিন। যদি প্রত্যেকটি অংশের অপর সকলের সহিত একাত্ম বোধটা জীবন্ত হয়, তবেই উহা সম্ভবপর।

সারা ভারতে দুই কোটি আদিবাসী আছে। গুজরাটী ভীলদের ভিতরে বাপা বহু বৎসর পূর্বে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালের কাছাকাছি শ্রীযুক্ত বালাসাহেব খের থানা জেলায় এই অতি আবশ্যকীয় সেবাকার্যে তাঁহার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতার সহিত নিজেকে নিয়োজিত করেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অপর কর্মীরাও আছেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় খুবই কম। সত্য বলিতে কি "ফসল ত পাওয়া যায় খুব, কিন্তু মজুরের সংখ্যাই

কম"। এই সমস্ত সেবাকার্য যে কেবল জনহিতকর নয় পরন্তু নিরেট রাষ্ট্রীয় কাজ এবং এই সকল কাজই যে আমাদিগকে সত্যকার স্বাধীনতার দিকে আগাইয়া আনে, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন ?

১৭ ॥ কুষ্ঠরোগী

কুষ্ঠরোগী কথাটার মধ্যেই একটা গ্লানি আছে। কেবল মধ্য আফ্রিকা ব্যতীত ভারতবর্ষেই সব চেয়ে বেশী কুষ্ঠরোগীর বাস। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম, তাঁহারা সমাজের যতটা অংশ ইহারাও ততটাই। কিন্তু যাঁহারা বড় তাঁহারাই আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেন—যদিও এই মনোযোগের আবশ্যকতা তাঁহাদের সব চাইতে কম। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা যদিও খুব রহিয়াছে, তবুও তাহারাই ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার বস্তু হইয়া আছে। আমি এই ব্যবহারকে হৃদয়হীন বলিয়া মনে করি এবং অহিংসার দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই হৃদয়হীনতা। মিশনারীদের সম্পর্কে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া এ কথা বলা যায় যে, তাঁহারাই ইহাদের জন্য চিন্তা ও যত্ন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে যে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা ওয়ার্ধার নিকটে অবস্থিত ও শ্রীযুক্ত মনোহর দিওয়ান কর্তৃক পরিচালিত। ইহা শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশাধীনে চলিতেছে। যদি ভারত আজ নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইত, যদি আমরা সকলে অতি দ্রুত উপায়ে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য একাগ্র হইতাম, তবে ভারতবর্ষে আজ একজনও কুষ্ঠরোগী বা ভিক্ষুক অযত্নে এবং বেহিসাবে থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি ইচ্ছাপূর্বক কুষ্ঠরোগীদের কথা গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির আওতার ভিতর ফেলিয়াছি। ইহার হেতু এই যে, যদি আমরা নিজেদের দিকে ভাল করিয়া তাকাই তবে দেখিব যে, ভারতবর্ষের কুষ্ঠরোগীরা যে স্থান লইয়া আছে, আধুনিক সভ্য জগতে ভারতবর্ষও সেই স্থান লইয়া আছে। যদি মহাসাগরের অপর পারের আমাদের ভাইদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

১৮ ॥ ছাত্র

শেষে ছাত্রদের কথা বলা বাকী আছে। আমি তাহাদের সহিত বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াছি। তাহারা আমাকে জানে এবং আমি তাহাদিগকে জানি। তাহারা আমাকে সেবা দিয়াছে। অনেক ভূতপূর্ব কলেজের ছাত্র আমার সম্মানিত সহকর্মী। আমি জানি যে ছাত্রেরাই ভবিষ্যতের আশার স্থল। অসহযোগের খুব উৎসাহের দিনে তাহাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে আমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল। কতক প্রফেসর ও ছাত্র কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়া আছেন এবং দেশের ও নিজের জন্য অনেক কিছু লাভ করিয়াছেন। সেই ডাক পুনর্বার দেওয়া হয় নাই, কেন না দেশের হাওয়া উহার অনুকূল নয়। অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়াছে যে, বর্তমান শিক্ষা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হইলেও, দেশের যুবকদের পক্ষে উহার প্রলোভন এড়ানো কঠিন। কলেজে শিক্ষা পাইলে জীবনযাত্রার একটা পথ হয়। একটা মোহবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র ঐখানেই পাওয়া যায়। জ্ঞানলাভের সাধারণ পিপাসাও কলেজের মধ্য দিয়া না গেলে মিটানো যায় না। মাতৃভাষার পরিবর্তে একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য কতকগুলি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না। উহার মধ্যে যে পাপাচরণ রহিয়াছে তাহা তাহাদের অনুভূতিতেই আসে না। তাহারা ও তাহাদের শিক্ষকেরা এই বিষয়ে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, দেশী ভাষা আধুনিক চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করাইতে সম্পূর্ণ অপারগ। কিন্তু আমার আশ্চর্য ঠেকে জাপানীরা কেমন করিয়া কাজ চালাইতেছে। কারণ তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে জাপানী ভাষার সাহায্যে দেওয়া হয় বলিয়াই জানি। ওদিকে চীনের প্রধান সেনাপতি খুব কমই ইংরাজী জানেন, উহা না জানার মতই।

কিন্তু এই সকল ছাত্র ও যুবক-যুবতীদের মধ্য হইতেই জাতির ভবিষ্যৎ নেতাগণের উত্থান হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা সকল রকম প্রভাব দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। অহিংসা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে না। একটা চড়ের বদলে আর একটা দেওয়া অথবা একটার বদলে দুইটা ঘা দেওয়ার কথাটা তাহারা সহজে বুঝে। উহাতেই আপাতত ফল লাভ হইতে দেখা যায় যদিও উহা ক্ষণিকের জন্য। কাজটার ভিতর অনন্তকাল ধরিয়া পশুবলের শক্তিপরীক্ষা রহিয়া গিয়াছে—যেমনটা আমরা পশুদের মধ্যে দেখিতে পাই অথবা যেমনটা

যুদ্ধে দেখিতে পাই—যে যুদ্ধ আজ সর্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। অহিংসার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানে ধৈর্যের সহিত অনুসন্ধিৎসা এবং আরো অধিক ধৈর্যের সহিত কঠিন প্রয়োগ আরম্ভ করা। ছাত্রদিগকে হাতে পাওয়ার জন্য আমি প্রতিদ্বন্দিতায় নামি নাই। আমি নিজেই তাহাদের একজন সতীর্থ। কেবল আমার বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভিন্ন। তাহাদের প্রতি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য, গবেষণা কার্যে আমার সহিত যোগ দেওয়ার জন্য আমার স্থায়ী আমন্ত্রণ রহিয়াছে। উহার শর্তগুলি এই :

১। ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিতে যোগ দিবে না। তাহারা ছাত্র, তাহারা অনুসন্ধিৎসু, তাহারা রাজনীতিক নহে।

২। তাহারা রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগ দিবে না। তাহাদের অবশ্য প্রিয় আদর্শ বীর থাকিবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি আনুগত্য, তাহারা তাহাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অনুকরণ করিয়াই দেখাইবে। যদি তাহাদের সেই আদর্শ বীরের জেল হয় অথবা মৃত্যু হয় অথবা চাই কি ফাঁসি হয়, তবে তাহাদের সেজন্য ধর্মঘট করা চলিবে না। যদি তাহাদের বেদনা অসহনীয় হয় এবং সকলেই উহা সমভাবে অনুভব করে, তবে সেই সকল ঘটনায় অধ্যক্ষের সম্মতি লইয়া স্কুল বা কলেজ বন্ধ করা যাইতে পারে। যদি অধ্যক্ষেরা না শুনেন, তবে ছাত্রেরা ভব্যভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে পারে, যে পর্যন্ত না ব্যবস্থাপকেরা অনুশোচনা করেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় ডাকেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাহারা অসহযোগীদের উপর অথবা কর্তৃপক্ষের উপর জবরদস্তি করিতে পারে না। তাহাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে যদি তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আচরণে সম্ভ্রম রক্ষা করে, তবে তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৩। তাহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুতা কাটিবে। তাহাদের যন্ত্রাদি পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় থাকিবে। সম্ভব হইলে সুতা কাটার যন্ত্রাদি তাহারা নিজ হাতেই করিয়া লইবে। তাহাদের সুতা স্বভাবতই উচ্চ গুণবিশিষ্ট হইবে। তাহারা সুতা কাটা সম্পর্কীয় সাহিত্য পাঠ করিবে ও উহার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বুঝিবে।

৪। তাহারা সর্বদা খাদি ব্যবহার করিবে এবং অনুরূপ বিদেশী দ্রব্য বা কলের দ্রব্যের বদলে কেবল গ্রামের তৈরী দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

৫। তাহারা অপরের উপর বন্দেমাতরম বা জাতীয় পতাকা চাপাইবে না। তবে তাহারা জাতীয় পতাকা অঙ্কিত চিহ্ন নিজ দেহে ধারণ করিতে পারে।

অপরকে ঐরূপ করিতে জোর করিতে পারিবে না।

৬। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার যে অর্থ, তাহা তাহারা নিজের মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। তাহারা অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িকতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে না। তাহারা অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণ ও হরিজনগণের সহিত সত্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে।

৭। প্রতিবেশীদের ভিতর কেহ অকস্মাৎ আহত বা পীড়িত হইলে, তাহারা তাহাদের প্রাথমিক সেবা করিবে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ময়লা সাফাই-এর কাজ করিবে এবং গ্রামের শিশু ও বয়স্কদিগের শিক্ষা দেওয়ার কাজ পর্যন্ত করিবে।

৮। তাহারা রাভষ্ট্রাষা শিক্ষা করিবে। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভাষা বর্তমান দুইপ্রকার হরফেই, হিন্দি ও উর্দুতে শিখিবে। হিন্দী বা উর্দুতে কথাবার্তায় স্বাভাবিকভাবে যোগ দিতে পারার মত শিখিবে।

৯। তাহারা নূতন যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা তাহাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিবে এবং তাহারা যখন গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক সফরে বাহির হইবে, তখন সেই জ্ঞান বিতরণ করিবে।

১০। তাহারা গোপনে কিছুই করিবে না। তাহাদের সমস্ত ব্যবহারই ন্যায়মণ্ডিত ও খোলাখুলি হইবে। তাহারা সংযমময় পবিত্র জীবনযাপন করিবে। সমস্ত ভয় বর্জন করিবে এবং তাহাদের সতীর্থদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহা-দিগকে রক্ষা করিবে এবং কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়া অহিংস উপায়ে তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিবে। আর যখন লড়াইয়ের চরম পর্যায় উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা তাহাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে এবং আবশ্যক হইলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিবে।

১১। তাহাদের সহ-ছাত্রীদের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ও বীরোচিত ব্যবহার করিবে।

আমি যে কর্মপদ্ধতি দিলাম, ইহা অনুসরণ করিতে হইলে ছাত্রদিগকে এজন্য সময় দিতে হইবে। আমি জানি, তাহারা অনেকটা সময় আলস্যে কাটায়। খুব হিসাব করিয়া চলিলে তাহারা অনেক ঘণ্টা করিয়া সময় বাঁচাইতে পারে। কিন্তু কোনও ছাত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাহা আমি চাই না। আমি সেইজন্য দেশপ্রেমিক ছাত্রদিগকে এই উপদেশ দিব, তাহারা যেন একটা বৎসর এইজন্য ব্যয় করে—একেবারে একসঙ্গে নয় তবে সমস্ত শিক্ষাকালের ভিতর যেন এইজন্য একটা বৎসর সময় দেয়। তখন তাহারা দেখিবে যে, ঐ এক বৎসর

এইদিকে যে তাহারা দিয়াছে সে সময়টা তাহাদের বৃথা যায় নাই। এই প্রচেষ্টায় তাহাদের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের শিক্ষাকালেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বৃহৎ দান তাহাদের দ্বারা হইয়া যাইবে।

১৯ ॥ আইন অমান্যের স্থান

এই পুস্তিকায় আমি বলিয়াছি যে, যদি দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা গঠনমূলক কার্যে পাওয়া যায়, তবে অহিংসপথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আইন অমান্য করিতেই হইবে এমনটি নাও হইতে পারে। কিন্তু এইপ্রকার সৌভাগ্য ব্যক্তি বা জাতির অদৃষ্টে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য দেশজোড়া অহিংস প্রচেষ্টার ভিতর আইন অমান্যের স্থান কোথায়, তাহা জানা দরকার।

আইন অমান্য তিনটি নির্দিষ্ট কর্ম-অভিমুখী হইতে পারে :

১। ইহা কোনও স্থানীয় অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

২। কোনও বিশেষ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কোনও বিশেষ অন্যায় বা দোষস্থালনের জন্য আত্মবলি দ্বারা স্থানীয় জাগৃতি সৃষ্টি করাব জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। চম্পারণে আমি যে আইন অমান্য করি, তাহাতে এইপ্রকার কি ফল হইবে তাহা দেখি নাই এবং ইহা ভালভাবে বুঝিয়াই করিয়াছিলাম যে হয়ত লোকেরাও এ বিষয়ে আগ্রহহীন থাকিবে। ইহার পরিণাম যে অন্যপ্রকার হইয়াছিল, তাহার হেতু, রুচি অনুযায়ী বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরের কৃপায় অথবা অদৃষ্ট ভাল বলিয়া।

৩। গঠনমূলক কার্যে পূর্ণভাবে সাড়া না পাওয়া গেলেও বর্তমানে অন্যতর ব্যবস্থা হিসাবে যেভাবে আইন অমান্য আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ করা যাইতে পারে। যদিও ইহা স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টার একটা অঙ্গ, তথাপি ইহা ইচ্ছা করিয়াই এক বিশেষ প্রতিকারকল্পে—বাক্‌স্বাধীনতা অর্জনের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে।* আইন অমান্য কখনও একটা সাধারণ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না—যেমন ধরুন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কিসের জন্য করা হইতেছে সে জিনিসটা নির্দিষ্ট হওয়া চাই, যাহা সকলে

* যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলার জন্য গান্ধীজী ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করেন। ইহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে।—অনুবাদক

সহজে বুঝিতে পারে এবং যাহা প্রতিপক্ষের স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার শক্তির মধ্যে পড়ে। যদি এই পদ্ধতি ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে শেষ লক্ষ্যে ইহা দ্বারা অবশ্যই পৌছানো যাইবে।

আইন অমান্তের পূর্ণ প্রয়োগ ও উহার ক্ষমতা আমি এস্থলে বিচার করি নাই। আমি ইহার ততটুকু অংশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, যাহাতে পাঠক গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও আইন অমান্তের ভিতর যে সম্পর্ক আছে তাহা ধরিতে পারেন। প্রথমোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে কোনও ব্যাপক গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু আইন অমান্তই যখন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অস্ত্ররূপে পরিকল্পিত হয়, তখন যাহারা ঐ যুদ্ধে রত তাহাদের সাক্ষাৎভাবে ও জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত কর্মপ্রচেষ্টা উহার পিছনে থাকা চাই। এইজন্য 'আইন অমান্য' পদ্ধতি হইতেছে একদিকে সংগ্রামে নিরত লোকদের পক্ষে কর্মের প্রেরণাস্বরূপ এবং অপরদিকে প্রতিপক্ষের—বর্তমান ক্ষেত্রে গবর্নমেণ্টের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান-স্বরূপ। স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীভূত আইন অমান্য করিতে হইলে, তাহাতে যদি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া সহযোগিতা না থাকে, তবে সে আইন অমান্য কেবল বৃথা আড়ম্বর এবং একেবারেই অন্তঃসারশূন্য বস্তু, একথা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হওয়া চাই।

উপসংহার

এই লেখা কংগ্রেসের বা কেন্দ্রীয় অফিসের অনুরোধে লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ নহে। সেবাগ্রামে কয়েকজন সহকর্মীর সহিত আমি যে আলোচনা করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল। গঠনমূলক কার্যের সহিত আইন অমান্তের যোগ কোথায় এবং কেমন করিয়াই বা গঠনমূলক কর্ম করা যায়, এই বিষয়ে তাঁহারা আমার একটা কিছু লেখার অভাব বোধ করিতেছিলেন। সেই অভাব এই পুস্তিকা দ্বারা আমি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা বিশদ আলোচনা নহে, কিন্তু কিভাবে কর্মপদ্ধতি প্রযুক্ত হইবে তাহার জন্য ইহাতে যথেষ্ট পথ দেখানো হইয়াছে।

যে কয়টি কর্মপদ্ধতির কথা বলা হইল, উহার কোনও একটিকেও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে বলিয়া পরিহাস করার ভুল যেন পাঠকেরা না করেন। অনেক লোক ছোট বড় অনেক কিছু কাজ স্বাধীনতার বা অহিংসার সহিত যোগযুক্ত না করিয়া তাহা করিয়া থাকে। সেগুলির

প্রত্যাশিত, সীমাবদ্ধ মূল্য আছে। একই লোক যদি সাদা পোশাকে নাগরিক-রূপে আসে, তখন তাহার কোনও মূল্য না দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যখন সে সেনানায়ক হিসাবে আসে, তখন সে একটা মস্ত লোক। তাহার হাতে লক্ষ লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে। তেমনি এক বেচারী গরীব কাটুনীর হাতে চরখা তাহাকে এক আধ পয়সা পাওয়াইয়া দেওয়ার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু জওহরলালের হাতে সেই চরখাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের যন্ত্র হয়। পদই বস্তুর মর্যাদা দেয়। গঠনমূলক কর্মকেও তাহার পদই অসামান্য মর্যাদা ও শক্তি দান করিয়া থাকে। আমার ত ইহাই অভিমত। হইতে পারে ইহা পাগলের কথা। যদি কংগ্রেসীদের নিকট ইহার কোনও মূল্য না থাকে, তবে আমাকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। কেন না গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি বাদ দিয়া আমার দ্বারা আইন অমান্য করানো মানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া একটা চামচে উঠাইবার প্রচেষ্টা করা।

পুণা, ১৩-১১-১৯৪৫

স্বদেশী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ:

শ্রীরঘুনাথ মাইতি বৈদ্যশাস্ত্রী

স্বদেশী জীবনের ধর্ম

আশ্রমে আমরা মনে করি যে, স্বদেশী সর্বদেশের ও সর্বকালের নিয়ম। মানুষের প্রথম কর্তব্য তার প্রতিবেশীর সম্বন্ধে। এতে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা স্বদেশ-বাসীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বোঝায় না। আমাদের সেবা করার শক্তির স্বভাবতই একটা সীমা আছে। প্রতিবেশীর সেবার জন্যও আমাদের কিছু প্রয়াস করতে হয়। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করত, তবে পৃথিবীতে যাদের সাহায্য পাওয়া দরকার, তাদের কেউই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হত না। সেইজন্যই প্রতিবেশীর সেবা করলে বিশ্বেরও সেবা করা হয়। বস্তুত স্বদেশীতে আপন পর ভেদ করবার উপায় নাই। প্রতিবেশীর সেবা করা মানেই বিশ্বের সেবা করা। বস্তুত বিশ্বকে সেবা করার এই একমাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। যিনি 'বসুধৈবকুটুম্বকম্,' নিজের জায়গা থেকে না সরেই তাঁর বিশ্বের সেবা করার শক্তি থাকা উচিত। কেবলমাত্র প্রতিবেশীর সেবা করেই তিনি এই শক্তির প্রয়োগ করতে পারেন। টলস্টয় আরও বেশী দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে চড়ে থাকি, ঘাড় থেকে নেমে গেলেই অনেক উপকার করা হয়। এতেও সেই একই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। অন্যের সেবা করলে নিজের হিত না হয়ে যায় না। যে অন্যের সেবা না করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধন করতে চায়, সে নিজেরও ক্ষতি করে, বিশ্বেরও ক্ষতি করে। কারণটি খুব স্পষ্ট। সমস্ত প্রাণীরই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই যে-কোন লোকের যে-কোন কাজই বিশ্বের পক্ষে হয় হিতকর, আর না হয় ত অহিতকর হবে। আমাদের দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, তাই এ জিনিস আমরা দেখতে পাই না। পৃথিবীর উপরে কোন লোকের কোন একটি কাজের ফল নগণ্য হতে পারে, কিন্তু নগণ্য হলেও সে ফল কাজ করে। এই সত্যটি উপলব্ধি করলে আমরা দায়িত্বশীল হয়ে উঠব।

কাজেই স্বদেশীর মধ্যে বিদেশীর কোন অমঙ্গল নিহিত নাই। তবুও স্বভাবের নিয়মেই স্বদেশী সর্বব্যাপী হতে পারে না। বিশ্বের সেবা করতে গিয়ে লোকে বিশ্বেরও সেবা করতে পারে না, এমন কি, প্রতিবেশীর সেবাও করতে পারে না। প্রতিবেশীর সেবা করলে কার্যত বিশ্বের সেবা করা হয়। যে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করেছে, কেবলমাত্র সেই বলতে পারে, 'সকলেই আমার আত্মীয়বৎ'। কিন্তু যদি কোন লোক বলে, 'সকলেই আমার আত্মীয়ের মত',

অথচ প্রতিবেশীকে অবহেলা করে সে কেবলমাত্র আত্মতৃপ্তিসাধন করে, তার জীবনধারণ ত কেবল নিজের সুখেরই জন্য।

কিছু কিছু ভাল লোক আমরা দেখি, যাঁরা নিজের দেশ ছেড়ে দেশবিদেশের লোকের সেবা করে, পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁরা দোষের কিছু করেন না এবং তাঁদের কাজ স্বদেশীধর্মের ব্যতিক্রমও নয়। তাঁদের সেবা করার শক্তি যে বেশি, এতে কেবলমাত্র তাই বোঝা যায়। একজনের কাছে পাশের বাড়ির লোকই প্রতিবেশী। আর একজনের কাছে তার গ্রামটাই প্রতিবেশিত্বের সীমানা। অপর একজনের পক্ষে হয়ত এই সীমানা দশখানি গ্রাম নিয়ে বিস্তৃত। প্রত্যেকেই তার শক্তি অনুযায়ী সেবা করে। সাধারণ লোকে অসাধারণ কাজ করতে পারে না। কেবলমাত্র সাধারণ লোকের কথা বিবেচনা করেই সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়। মৌলিক অর্থের বিরোধী নয় এমন সকল জিনিসই এই সংজ্ঞায় পড়ে। স্বদেশীধর্ম পালন করার সময় সাধারণ লোকে মনে করে না যে, সে কারও সেবা করছে। সে তখন কেবল প্রতিবেশী-উৎপাদকের সঙ্গে আদান-প্রদান করে, কেন না তাই তার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু কখনও কখনও এ জিনিস অসুবিধাজনক হয়ে পড়তে পারে। যে ব্যক্তি স্বদেশীকে জীবনের ধর্ম বলে মনে করে, অসুবিধাজনক হলেও সে তা পালন করবে। আমরা অনেকেই এখন ‘ভারতে প্রস্তুত জিনিসপত্র’ ভাল হয় নি বলে মনে করি এবং বিদেশী জিনিস ক্রয় করতে প্রলুব্ধ হই। সেজন্য একথা উল্লেখ করা দরকার যে, স্বদেশী কেবল-মাত্র আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার নয়। এটা জীবনের ধর্ম। বিদেশীকে বিদ্বেষ করবার কোন কথা এতে নাই। অন্যের অহিতের ইচ্ছা করা বা অহিত করা কখনও কারও কর্তব্য হতে পারে না।

স্বদেশী

[এক]

দূরের চেয়ে কাছের সেবা ও তাকে কাজে লাগানোর যে মনোভাব তারই নাম স্বদেশী। এই সংজ্ঞা মেনে নিলে ধর্মের ক্ষেত্রে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমাদের অতি নিকটে ধর্মের যে বাতাবরণ আছে এই ভাবে সেটি আমরা কাজে লাগাই। যদি নিজের ধর্মের কোন ত্রুটি দেখতে পাই, তা হলে সেই ত্রুটি দূর করে তার সেবা করতে হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে

স্বদেশী মানে দেশের শাসন ব্যবস্থায় দোষ থাকলেও তা মেনে নেওয়া এবং তার দোষ শুধরাবার চেষ্টা করা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশী মানে আমাদের কাছের প্রতিবেশীর তৈরী জিনিসই আমরা ব্যবহার করব এবং তার কোন খুঁত থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করব। স্বদেশীর এই নিয়ম মেনে চললে সত্যযুগের রাস্তা খোলা হবে। হয়ত আমাদের জীবনে তা হবে না। কিন্তু অনেক পুরুষ ধরে চেষ্টা করলে তবেই স্বদেশীর উদ্দেশ্য সফল হবে—এই ভেবে যেন পিছিয়ে না যাই।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না। ধর্মকে বাদ দিয়ে যে রাজনীতি তা বাসি মড়ার মত, তাকে কবর দেওয়াই উচিত। আমার মনে হয়, ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করার যে চেষ্টা এখন দেখতে পাওয়া যায়, তা যদি না করা হত তা হলে বর্তমানের মত রাজনীতির এমন অধঃপতন হত না। দেশের রাজনৈতিক জীবন সুখের একথা কেউই বলেন না। স্বদেশীর যে ধারণা আমার আছে তা থেকেই দেশীয় সংস্থা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছি। ভারতবর্ষ সত্যসত্যই একটা প্রজাতান্ত্রিক দেশ এবং সেইজন্যই এ পর্যন্ত অনেক আঘাত সহ্য করতে পেরেছে। দেশী বা বিদেশী রাজা-মহারাজারা বিরাট জনগণকে বিশেষ নাড়া দিতে পারেন নি, তাঁরা শুধু কর আদায় করে গেছেন। প্রজারা রাজার প্রাপ্য রাজাকে দিয়েছে এবং বাকী আর সব ব্যাপারে অনেকটা খুশিমত কাজ করেছে। দেশে যে বিরাট বর্ণ-ব্যবস্থা ছিল, তাতে যে শুধু সমাজের ধর্মতৃষ্ণাই মিটেছে তা নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়েছে। গ্রামের লোকেরা বর্ণ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যে অদ্ভুত সঙ্ঘশক্তি দেখিয়েছিল তা অবজ্ঞা করা যায় না।

স্বদেশী ভাবনা থেকে সাংঘাতিকভাবে সরে যাওয়ার জন্য আমাদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। আমরা শিক্ষিত লোকেরা একটা বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করেছি। কাজেই জনগণের উপর আমাদের কোন প্রভাব পড়ে নি। আমরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, কিন্তু পারি না। তারা সাহেবদের যে চক্ষে দেখে, আমাদেরও প্রায় সেই চক্ষেই দেখে। কোন পক্ষের কাছে তাদের মনের কথা ধরা পড়ে না। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের থেকে পৃথক। সেইজন্যই একটা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনের অভাব যে আছে তা নয়। আমরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করি তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই।

প্রধানত অর্থনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী না মানার ফলেই ভারতের জনসাধারণের এই সর্বনেশে দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে। যদি বাহির থেকে একটিও বাণিজ্যদ্রব্য ভারতে না আনা হত, তা হলে এখন দেশে দুধক্ষীরের বন্যা বয়ে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। আমরা যেমন লোভী, ইংলণ্ডও তেমনই। ইংলণ্ড ও ভারতের সম্পর্ক একটা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ভুল করে ভারতে আছে (১৯১৬ সাল) এমন নয়। তার ঘোষিত নীতি হচ্ছে যে, ভারতের স্বার্থের জন্যই ভারতকে পরাধীন করতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে ল্যাঙ্কাশায়ারকে একপাশে সরে দাঁড়াতে হত। আর যদি স্বদেশীর নীতি একটা খাঁটি নীতি বলে গণ্য হয়, তাহলে ল্যাঙ্কাশায়ার নিজের ক্ষতি না করেও সরে দাঁড়াতে পারে। হয়ত তাকে সাময়িকভাবে একটু ধাক্কা পেতে হবে।

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিদেশী বর্জন করে স্বদেশী চালাতে হবে সে কথা আমি বলি না। স্বদেশীকে আমি একটা ধার্মিক কর্তব্য মনে করি। সকলকেই সেই কর্তব্য করতে হবে। আমি অর্থনীতিবিদ্ নই। কিন্তু আমি কিছু কিছু বই পড়ে জেনেছি যে, ইংলণ্ড ইচ্ছা করলে নিজের সমস্ত দরকারী জিনিস নিজের দেশেই তৈরী করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এটা হয়ত একটা হাস্যকর প্রস্তাব মাত্র এবং একথা যে সত্য নয় তার সব চেয়ে ভাল প্রমাণ সম্ভবত এই যে, পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ডই সব চেয়ে বেশী জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করে। কিন্তু তা হলেও ভারতবর্ষ আগে নিজেকে না বাঁচিয়ে ল্যাঙ্কাশায়ার বা অন্য কোন দেশকে বাঁচাতে পারে না। আর ভারত যদি নিজের সীমার মধ্যে সব দরকারী জিনিস তৈরী করে নেয় এবং তৈরী করার সুযোগ তাকে দেওয়া হয়, তাহলেই সে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

এসব হয়ত বোকামি বলে মনে হতে পারে। আচ্ছা ধরে নিলাম ভারত বোকার দেশ। কোন দয়ালু মুসলমান নির্মল পানীয় জল দিতে চাইলেও, যে তা নিতে অস্বীকার করে এবং পিপাসায় গলা শুকিয়ে ফেলে, সে বোকা। তবু হাজার হাজার হিন্দু মনে করে মুসলমানের বাড়ীতে জল খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এই সব বোকা লোকদের যদি একবার বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কেবল ভারতে তৈরী খাদ্য খাওয়া এবং ভারতের কাপড় পরাই ধর্মসঙ্গত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাই করিবে। লর্ড কার্জন এদেশে চা খাওয়া ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে চা খেয়ে শত শত স্ত্রীপুরুষের পরিপাক-শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং তাঁদের সামান্য পুঁজির উপর আরও একটা ট্যাক্স বসেছে। লর্ড

হার্ডিঞ্জ ইচ্ছা করলে স্বদেশীর ফ্যাসানও ধরিয়ে দিতে পারেন, তাতে প্রায় সমগ্র ভারত বিদেশী জিনিস ত্যাগ করবে। ভগবদ্গীতায় একটা শ্লোক আছে তার মোটমাট অর্থ, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা করেন জনসাধারণও তাই করে"। যদি চিন্তাশীল লোকেরা সাময়িক ক্ষতিস্বীকার করেও স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ করেন, তাহলে এই অনর্থের প্রতিকার করা সহজ হবে।

একথা প্রায়ই বলা হয় যে, ভারতবর্ষ অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী নীতি গ্রহণ করতে পারবে না। যাঁরা এই সব আপত্তি করেন, তাঁরা স্বদেশীকে জীবনের একটা নীতি বলে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে স্বদেশী একটা দেশপ্রীতিসূচক কার্যমাত্র। তাতে যদি আত্মসুখের হানি হয় ত সে চেষ্টা না করাই ভাল। এখানে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাতে স্বদেশী হল একটা ধর্ম-সাধনার অঙ্গ। এই সকল দৈহিক কষ্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেও এই সাধনা করতে হবে। স্বদেশীর জন্য অনুরাগ থাকলে, সুচ বা আলপিন দেশে হয় না বলে তার অভাবে আমরা দুঃখ পাব না। স্বদেশীভাবাপন্ন ব্যক্তি এখন যা না হলে চলে না, এমন শত শত জিনিস বাদ দিয়ে কাজ চালাতে শিখবেন। তাছাড়া যারা অসম্ভব মনে করে স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতে চায় না, তারা ভুলে যায় যে, একটানা চেষ্টা করে গেলেই স্বদেশী লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। বিনয় ও ভাল-বাসার নীতির সঙ্গে স্বদেশী মতবাদই খাপ খায়।

পাদরী সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ, মাদ্রাজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬

স্বদেশী

[দুই]

গত বৎসর আমার রোগমুক্তির ঠিক পরে অথবা এই বৎসরের গোড়ার দিকে স্বদেশী সম্পর্কে যাঁদের খুব উৎসাহ আছে এমন কয়েকজন বন্ধু আমাকে স্বদেশীর একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করতে বলেন, যাতে তাঁরা উপস্থিত সমস্যাগুলির উত্তর পান। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে স্বদেশী শব্দের যে নানাস্তরের সংজ্ঞা ছিল সে সব আমাকে মনে রাখতে হয়েছিল। যতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়েছিল সবগুলি আমি একত্র করলাম। শ্রীশিবরাও, শ্রীজলভাই নৌরোজী ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আমি পত্রালাপ করি। সব জায়গায় লাগানো যায় এমন একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারা গেল না। বুঝলাম যে, সর্বব্যাপক সংজ্ঞা নির্ণয় করা

অসম্ভব। আমি তখন দেশের দূর-দূরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কাজেই তখন অনেক জিনিস লক্ষ্য করবার ও স্বদেশী সংস্থাগুলি কিভাবে কাজ চালাচ্ছিল তা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, বর্তমানে স্বদেশীর নামে অজ্ঞাতসারে জনসাধারণের সঙ্গে জুয়াচুরি করাই চলছে এবং অনেক দক্ষ কর্মী নিষ্ফল প্রয়াসে নিজেদের শক্তির অপব্যয় করছেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রতারণাই করছেন। এই প্রকারের কড়া ভাষা প্রয়োগ করে আমি স্বদেশী সংস্থাসমূহের কর্মীদের উপর কটাক্ষপাত করছি না, নিজের মনোভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করছি মাত্র। তাঁরা অবশ্য নিজেদের সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু একথা তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, তাঁরা একটা পাপচক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং আত্মপ্রবঞ্চনাই করছেন।

আমি কি বলতে চাচ্ছি তা বুঝিয়ে বলি। আমরা এমন সব জিনিসের প্রদর্শনী করে বেডাচ্ছি যা বিক্রয় করার জন্য বিশেষ সাহায্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলে, হয় সে-সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে অথবা উন্নতিশীল অথচ পরস্পর-প্রতিযোগী কারখানা-গুলির মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর লড়াই বেধে যাবে।

আমরা কাপড়ের কল, চিনির কল ও চালের কলগুলিকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে গিয়ে হয়ত যথাক্রমে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির সর্বনাশ করব, যথা গ্রামের চরকা, তাঁত ও তদুৎপন্ন খাদি, গ্রামের আকমাড়াই কল ও তজ্জাত দ্রব্য গুড়, যা খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ ও পুষ্টিকর এবং হস্তচালিত যাঁতা, ঢেঁকি ও তজ্জাত দ্রব্য আকাঁড়া চাল, যার বহিরাবরণের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে এবং সেই বহিরাবরণ এই সব পেষণ-যন্ত্রের দ্বারা আদৌ নষ্ট হয় না। কাজেই আমাদের পরিষ্কার কর্তব্য হচ্ছে এমন উপায় বাহির করা যাতে গ্রামের চরকা, আকমাড়াই কল, যাঁতা ও ঢেঁকি ইত্যাদি বেঁচে থাকে। সেজন্য ঐসব জিনিসের স্বপক্ষে প্রচারকার্য করতে হবে, হস্তজাত দ্রব্যের গুণ আবিষ্কার করতে হবে, শিল্পীদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে হবে, যন্ত্রশক্তিচালিত কলের প্রচলন হেতু তাদের মধ্যে কত লোক কর্মচ্যুত হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে এবং ঐ সকল কুটীর-যন্ত্রের উন্নতির পথও বাহির করতে হবে ও সেই সঙ্গে এইগুলির গ্রাম্য ভাব বজায় রেখে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐগুলিকে সমর্থ করে তুলতে হবে। আমরা কি সাংঘাতিকভাবেই ঐগুলিকে অবহেলা করেছি এবং তাতে কী ভীষণ অপরাধই না করেছি! কাপড়ের কল, চিনির কল বা চালের কলের শত্রুতা

করার কথা এখানে আসছে না। ঐসব কলের জিনিস নিশ্চয়ই বিদেশজাত সেই সেই জিনিসের চেয়ে ভাল। যদি বিদেশী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্ত ঐগুলির ধ্বংস আসন্ন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ঐগুলিকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু ঐগুলির প্রকৃতপক্ষে সেরূপ অবস্থা ত নয়। বিদেশী প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ত ঐগুলির উন্নতি হচ্ছে। বরং গ্রামের শিল্প ও শিল্পীদিগকে শক্তিচালিত কলের সর্বনাশা প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তা সে-কল এদেশের বা বিদেশের যেখানকার হউক না কেন। আমি যতদূর জানি, এক খাদি ছাড়া অন্তান্ত কুটীর শিল্প যথা, আকমাড়াই বা ধানভানা ইত্যাদির দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী জীবিকার্জন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হয় নি। নিশ্চয়ই এই বিষয়টিতে এত কাজ করবার আছে যে অসংখ্য দেশসেবককে এতে লাগানো যেতে পারে। পাঠক হয়ত বলবেন, এ খুব শক্ত কাজ। আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু এ কাজ সব চেয়ে দরকারী এবং তদ্রূপ চিত্তাকর্ষকও বটে। আমার দাবি এই যে, এই কাজই খাঁটি দরকারী ও ষোল আনা স্বদেশী।

কিন্তু আমি এযাবৎ সমস্যাটির সামান্ত অংশই স্পর্শ করেছি। আমি কেবল নমুনা হিসাবে তিনটি বড় সংঘবদ্ধ শিল্পের কথা বলেছি ও দেখিয়েছি যে, স্বয়ং-সেবক স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত গ্রামের শিল্পের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ঐ সব কুটীরশিল্প স্বেচ্ছাপ্রসূত, বুদ্ধিযুক্ত ও সংঘবদ্ধ সাহায্যের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। পল্লীর, এমন কি নগরেরও আরও এমন সব শিল্প আছে, যেগুলির সাহায্যে হাজার হাজার শিল্পী নিজেদের জীবিকানির্বাহ করে। এইসব শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। এইদিকে যেটুকু কাজই করা হোক না কেন, তার দাম আছে। এজন্ত যে সময় দেওয়া হবে, তার প্রতিটি ঘণ্টার অর্থ হচ্ছে কতকগুলি যোগ্য শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা করা।

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, যদি এ বিষয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করা হয় তাহলে যে বিভাগ এই কাজ করবে তা স্বাবলম্বী হবে, নূতন প্রতিভার স্ফুরণ হবে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার লোকেরা অন্ত কাউকে কর্মচ্যুত না করেই কাজ পাবে এবং প্রতি বৎসর আমাদের দেশে, যেখানে দারিদ্র্য ক্রমে বেড়েই চলেছে, সেখানে কোটি কোটি টাকা জমবে।

এক্ষেত্রে যথেষ্ট লাভজনক ও আনন্দকর কাজ আছে যা সমস্ত স্বদেশী

সংঘ একত্র হলেও শেষ করতে পারবে না। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির স্বদেশী সম্পর্কে সাম্প্রতিক প্রস্তাবের * অর্থ ঐ সব ত বটেই, তাছাড়া আরও অনেক কিছু। এতে দেশের সংগঠনী প্রতিভার উপযোগী অফুরন্ত কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের লোকেরা অন্য সব কাপড় ছেড়ে দিয়ে কেবল হাতে কাটা ও হাতে বুনা খাদি ব্যবহার করবেন ও অন্যকে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করবেন।

কাপড ব্যতীত অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কংগ্রেসের সমস্ত সংস্থাকে পথ দেখাবার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র গ্রহণ করছে :

"কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মত এই যে, স্বদেশী সম্পর্কে কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান-গুলির কাজ ভারতবর্ষের কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। ঐগুলিকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। মূল্যনির্ধারণ, শ্রমিকদের মজুরী ও হিতাহিত সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠান-গুলি কংগ্রেসের পরিচালনাই মেনে নেবে।

"এই সূত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে কংগ্রেস দেশে নিরন্তর স্বদেশীর যে মনোভাব জাগিয়ে এসেছে বা সকলকে শুধু স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের যে নির্দেশ দিয়ে এসেছে তার কোন পরিবর্তন করা হল।

"এই সূত্র দ্বারা মাত্র এইটুকু স্বীকার করা হল যে, যে-সব বৃহৎ ও সংঘবদ্ধ শিল্প সরকারী সাহায্য পায় বা পেতে পারে, সেগুলির জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের বা চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই।"

হরিজন, ১০-৮-৩৪

* ১৯৩৪ সালের ৩০এ জুলাই কাশীতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

"স্বদেশী সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি কি সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করায় কংগ্রেসের অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আইন-অমান্যের সময় যা করা হয়ে থাকুক না কেন, কংগ্রেসের সভায় ও কংগ্রেসী প্রদর্শনীতে কলের কাপড এবং হাতে কাটা ও হাতে বোনা খাদির মধ্যে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা করতে দেওয়া হবে না। আশা করা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের লোকেরা অন্য সব কাপড় ছেড়ে দিয়ে কেবল হাতে কাটা হাতে বোনা খাদি ব্যবহার করবেন ও অন্যকে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করবেন।"

ষোল আনা স্বদেশী

প্রশ্ন : আপনার এই নূতন স্বদেশীর সঙ্গে পুরানো স্বদেশীর তফাৎ কোথায় ?

উত্তর : পুরানো স্বদেশীতে জিনিসটা দেশে তৈরী কিনা তাই ভাল করে দেখা হত, তার উৎপাদন-প্রণালী বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মাথা ঘামানো হত না। আমি সংঘবদ্ধ শিল্পগুলিকে স্বদেশী সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছি। তার কারণ এই নয় যে, সেগুলি স্বদেশী নয়। কারণ এই যে সেগুলিকে সমর্থন করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, সেগুলি নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের জাগৃতির বর্তমান অবস্থায় সেগুলির সহজে কাট্‌তি হতেও পারে। স্বদেশীর নূতন সংজ্ঞায়, যদি একে নূতনই বলা যায়—আমি স্বদেশী সংস্থাগুলিকে শুধু পল্লীশিল্প সম্পর্কে সচেতন হতে বলব। আমরা এমন সব রসায়নবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কাজ করব যারা গ্রামবাসীদের সেবার জন্য তাদের জ্ঞানের উপযোগ করতে প্রস্তুত হবে। আমরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গ্রাম-শিল্পীদের তৈরী জিনিস পরীক্ষা করাব এবং ঐ সব জিনিসের উন্নতিসাধনের জন্য পরামর্শ দিব, এবং যদি তারা আমাদের শর্তে রাজী হয় ত ঐগুলির বিক্রীর ব্যবস্থা করব।

প্রশ্ন : আপনি কি সব শিল্পই গ্রহণ করবেন ?

উত্তর : সব শিল্পই নিতে হবে এমন নয়। আমি প্রত্যেক শিল্প পরীক্ষা করে দেখব, পল্লীজীবনের অর্থনীতিতে তার স্থান কোথায় তা বিচার করব এবং যদি বুঝতে পারি যে, নিজস্ব যোগ্যতার জন্যই তাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার ত তাই করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমি গ্রামের ঝাড়ুর পরিবর্তে আধুনিক ঝাড়ু বা বুরুশ আমদানি করতে রাজী হব না, আমি শ্রীমতী গান্ধী ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের জিজ্ঞাসা করব, ঐ দুয়ের মধ্যে সুবিধা-অসুবিধা কোথায়। মনে রাখবেন—আমি সব দিক থেকে বিচার করব, যেমন গ্রামের ঝাড়ুকে আমি পছন্দ করব, কারণ ব্যবহারকালে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের প্রতি কোমলতা ও দয়া প্রকাশ করে, আর বুরুশ তাদের নির্মমভাবে ঝেঁটিয়ে দেয়। এইভাবে আমি ঝাড়ুর পিছনে একটা সম্পূর্ণ দর্শনই খুঁজে পাব, কারণ আমার মতে সৃষ্টিকর্তা ক্ষুদ্র কীট ও (তাঁর গণনায়) ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।

এইভাবে আমি এমন সব গ্রাম-শিল্পে হাত দিব, যেগুলি মরতে বসেছে এবং নিজস্ব মূল্য ও অন্যান্য কারণে যেগুলির পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। এইরূপে আমি

আবিষ্কার করে চলব। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সামান্য দাঁতনের কথা ভাবুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বোম্বাই শহরের অধিকাংশ লোককে দাঁতন থেকে বঞ্চিত করলে তাদের দাঁতের ক্ষতি হবে। দাঁতনের স্থানে আধুনিক দাঁতের বুরুশ চালাবার কথা আমি ত ভাবতেই পারি না। এই সব বুরুশ অস্বাস্থ্যকর। একবার ব্যবহারের পর সেগুলি ফেলে দেওয়া উচিত। সেগুলিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য যত জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার কর না কেন, সেগুলি কখনো নূতন হয়ে যাবে না। কিন্তু বাবলা বা নিমের দাঁতন একবার মাত্র ব্যবহার করা হয়, আর তাতে প্রচুর সঙ্কোচক শক্তি আছে, আর তা জিভছোলারও কাজ করে। ভারতীয় দাঁতনের মত স্বাস্থ্যসম্মত জিনিস বাহির করতে পশ্চিমের এখনো দেরি আছে। আপনারা হয়ত জানেন না যে, দক্ষিণ আফ্রিকার এক ডাক্তার দাবি করতেন যে, বান্টু জাতীয় খনির মজুরদের মধ্যে এই দাঁতন প্রচলন করেই তিনি যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রিত করতেন। আধুনিক টুথব্রাশ ভারতে তৈরী হলেই তার বিজ্ঞাপন দেওয়া আমার কাজ হবে না। আমি দাঁতনের স্বপক্ষেই প্রচারকার্য করব। ওটা ষোল আনা স্বদেশী। যদি আমি ওর খবর করি ত বাকী সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। যদি সমকোণের সংজ্ঞা আমাকে দিতে বলেন ত আমি সহজেই দিতে পারি, কিন্তু স্থূলতম ও সূক্ষ্মতম কোণের মধ্যে যে সব কোণ হয় সেগুলির সংজ্ঞা আমাকে দিতে বলবেন না। যদি সমকোণের সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাহলে দরকারমত যে কোনও কোণ আমি করে নিতে পারি। যদিও স্বদেশী শব্দ তার সংজ্ঞা সূচনা করতে সমর্থ, তবু আমার স্বদেশীকে আমি 'ষোল আনা স্বদেশী' বলছি, কারণ স্বদেশীর শ্রাদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত। 'ষোল আনা স্বদেশী' আমাদের সেবার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাকেও যথেষ্ট সুযোগ দিতে পারে এবং সর্ববিধ প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশ দিতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কি এর পরিণামে স্বরাজ দেখতে পাচ্ছেন ?

উত্তর : নয় কেন ? এক সময়ে আমি বলেছিলাম, চরখায় স্বরাজ আসবে, পরে আমি বলি, মাদকবর্জনে স্বরাজ আসবে। এইভাবে আমি বলব ষোল আনা স্বদেশীতেই স্বরাজ লুকিয়ে আছে। অবশ্য এ হচ্ছে অন্ধদের হাতী দেখার মত। সকলেই ঠিক কথা বলে, অথচ সম্পূর্ণ ঠিক বলতে পারে না। যদি আমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করি, তাহলে আমার বিশ্বাস, আমরা এককালে যেমন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পন্ন ছিলাম আবার তেমনি হতে পারব। যদি আমরা আলস্য ত্যাগ করি এবং কোটি কোটি লোকের অলস মুহূর্তকে কাজে লাগাতে

পারি, তাহলে আমরা আবার সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি। আমাদের শুধু পরিশ্রমী হতে হবে—যন্ত্রের মত নয়, কর্মব্যস্ত মৌমাছির মত। আপনারা জানেন, আমি এখন যাকে নির্দোষ মধু বলি, তার বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রশ্ন : সে আবার কি ?

উত্তর : বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে দক্ষ মৌমাছি-পালকদের দ্বারা সংগৃহীত মধু। তারা মৌমাছিগুলিকে পালন করে এবং তাদের নষ্ট না করেই তাদের দ্বারা মধু সংগ্রহ করায়। এজন্যই একে আমি নির্দোষ বা অহিংস মধু বলি। এই শিল্প যত ইচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে।

প্রশ্ন : কিন্তু একে কি আপনি সম্পূর্ণ অহিংস বলতে পারেন ? বাছুরকে দুধ থেকে বঞ্চিত করার মত আপনি ত মৌমাছিকে মধু থেকে বঞ্চিত করছেন।

উত্তর : আপনার কথা ঠিক, কিন্তু জগৎটা কেবল ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মে চলে না। বেঁচে থাকতে হলে কিছু হিংসা এসে পড়ে কিন্তু আমাদের সর্বাপেক্ষা কম হিংসার পথ বেছে নিতে হবে। নিরামিষ আহারেও হিংসা আছে। নেই ? সেইরূপ যদি আমাকে মধু সংগ্রহ করতেই হয়, আমার উচিত মৌমাছির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া এবং সে যতটা মধু দিতে পারে ততটা দিতে দেওয়া। উপরন্তু বিজ্ঞানসম্মত মক্ষিপালনে মৌমাছির সমস্ত মধু কেড়ে নেওয়া হয় না।

হরিজন, ২৮-৯-৩৪

গ্রামোদ্যোগ জিনিসটা কি ?

জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু সেদিন অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন :

"আপনি গ্রামশিল্পের কাজ সম্পর্কে কি বলতে চান তার সম্পূর্ণ চিত্র আমার মনে অঙ্কিত হয় নি।" প্রশ্নটি ভালই, আরও অনেকের মনে হয়ত এই প্রশ্ন উঠেছে। আমি তাঁর কাছে যা লিখেছি তার মর্ম এই :

সংক্ষেপে, আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করি, সেগুলি গ্রামে তৈরী হলেই আমরা কিনব। হয়ত সেগুলির গঠন বিশ্রী। আমরা সেগুলির চেহারা ভাল করবার জন্য উৎসাহ দিব। কিন্তু বিদেশী জিনিস, এমন কি শহরের বড় বড় কারখানায় তৈরী জিনিস দেখতে আরও ভাল হলেও গ্রামের তৈরী জিনিসকে তুচ্ছ করব না। অন্য কথায় বলতে হলে, আমরা গ্রামবাসীদের শিল্পপ্রতিভা স্ফুরণের সহায় হব। এইভাবে আমরা তাদের ঋণ কতকটা শোধ করব। এই চেষ্টায় কখন সফলকাম হতে পারব না পারব, সে চিন্তায় আমরা ভীত হয়ে

পড়ব না। আমাদের নিজেদের কালেই এমন সব ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, যেক্ষেত্রে কাজের কঠিনতা দেখে আমরা পেছিয়ে যাই নি, কারণ জাতির অগ্রগতির জন্ম সেগুলি অত্যাবশ্যক বলে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। কাজেই আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারি যে, ভারতীয় গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কেবল সেই উপায়েই আমরা অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন করতে পারি এবং ধর্ম বা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে নিজদিগকে এক বলে ভাবতে পারি, তাহলে আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে ও গ্রামবাসীদের সামনে শহুরে জীবনধারা না ধরে, গ্রামগুলিকে আমাদের আদর্শ করে তুলতে হবে। যদি এই চিন্তাধারা ঠিক হয়, তাহলে আমরা যথাসম্ভব নিজেদের নিয়েই কাজ আরম্ভ করব এবং এইভাবে কলের কাগজের বদলে হাতে তৈরী কাগজ, ফাউণ্টেন-পেন বা পেন-হোল্ডারের বদলে গ্রামের নল-খাগড়া, বড় বড় কারখানায় তৈরী কালির বদলে গ্রামের তৈরী কালি ইত্যাদি ব্যবহার করব। এই রকমের বহু জিনিসের উল্লেখ করতে পারি। বাড়ীতে যে সব জিনিস ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে এমন জিনিস কমই আছে যা গ্রামবাসীরা আগে তৈরী করে নি বা এখন তৈরী করতে পারে না। যদি আমরা মনের চাবিকাঠি ঘুরিয়ে ঐ সব জিনিসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা গ্রামবাসীদের পকেটে লাখ লাখ টাকা দিতে পারি। এখন কিন্তু আমরা গ্রামবাসীদের শোষণই করি, প্রতিদানে দেবার মত কিছুই দিই না। এই শোচনীয় অবস্থার অবসান করবার সময় এসেছে। আমার কাছে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান বলতে ক্রমে এই জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাদের অস্পৃশ্য বলে অভিহিত করা হয়, তাদের উপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্পৃশ্যতা দূর করা আর তত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। শহরবাসীর কাছে গ্রাম অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে। সে গ্রামের বিষয় কিছু জানে না, সে গ্রামে বাস করে না, যদি দৈবাৎ গ্রামে যায় ত সে সেখানে শহুরে চালচলন চালু করতে চায়। এটাও সহ্য করা যেত, যদি আমরা ৩০ কোটি মানুষকে স্থান দিতে পারে এতগুলি শহর তৈরী করতে পারতাম। কুটির-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং প্রধানতঃ বাধ্য হয়ে বেকার বসে থাকার কারণে আমাদের যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য তা দূর করা অপেক্ষা গ্রামগুলিকে শহরে পরিণত করা অনেক বেশী অসম্ভব।

হরিজন, ৩০-১১-৩৪

গ্রামীণ-শিল্প

গ্রামীণ-শিল্প সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবের* রচয়িতা এবং সে উদ্দেশ্যে যে সংঘ গঠিত হচ্ছে তার পথপ্রদর্শক হিসাবে আমার উচিত, আমার মনে এই সব শিল্প সম্পর্কে যে সমস্ত চিন্তা সর্বদা উদিত হয় এবং ঐগুলির মধ্যে নীতি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির যে সম্ভাবনা আছে তা জনসাধারণের মধ্যে যথাসম্ভব প্রচার করা।

গ্রামোদ্যোগ সংঘ গড়বার কল্পনা 'হরিজন' যাত্রার সময় মালাবারে প্রবেশকালে একটা নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে। এক খাদি কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বুঝলাম, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শহরবাসীরা যে সম্পদ নির্দয়ভাবে ও নির্বোধভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে, তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারে এমন একটা সংস্থা হওয়া কত দরকার। গ্রামবাসীদের মধ্যে সব চেয়ে অধিক ধাক্কা খেয়েছে হরিজনরা। যে সব শিল্পে গ্রামবাসীদের অধিকার আছে তন্মধ্যে অল্প কয়েকটাই তাদের জন্য খোলা। কাজেই যখন তাদের হাত থেকে ঐ শিল্পগুলি চলে যায় তখন তাদের অদৃষ্ট গৃহপালিত পশুর মত অসহায় হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সব পশুর অদৃষ্ট তাদের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা।

কিন্তু অন্যান্য গ্রামবাসীর অবস্থাও আজকাল বিশেষ ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে তারা কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। তাতে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন হয়। অল্প লোকেই এ কথা জানেন যে, ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

---

* ১৯৩৫ সালের ২৭শে অক্টোবর, বোম্বাই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়: "যেহেতু কংগ্রেসকর্মীদের সাহায্যে বা সাহায্য ব্যতিরেকেই দেশের সর্বত্র স্বদেশী প্রচারের দাবি নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেহেতু স্বদেশীর খাঁটি সংজ্ঞা সম্পর্কে জনগণের মনে যথেষ্ট সংশয় বিদ্যমান, যেহেতু শুরু থেকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে একাত্ম হয়ে যাওয়া, যেহেতু গ্রাম পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপনই কংগ্রেসের গঠন কর্মসূচীর অন্যতম অংশ, যেহেতু এরূপ পুনর্গঠন বলতে নিশ্চয়ই চরখা-শিল্প ও অন্যান্য মৃত ও মুমূর্ষু পল্লীশিল্পগুলিকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা ও উৎসাহ দেওয়া বোঝায়, যেহেতু এই কাজ সূতা কাটা পুনঃপ্রবর্তনের মত কেবল এরূপ সংহত ও বিশেষ প্রযত্নের দ্বারাই সম্ভব যা কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হবে না, সেই হেতু শ্রীযুক্ত জোসেফ কর্ণেলিয়স কুমারাপ্পাকে এতদ্বারা গান্ধীজীর পরামর্শ ও পরিচালনাক্রমে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ নামক একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুমতি দেওয়া হল। এই সংঘের কাজ কংগ্রেসেরই কাজের অংশ বলে গণ্য হবে। এই সংঘ উক্ত শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন ও প্রোৎসাহনের জন্য এবং গ্রামের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করবে এবং নিজের গঠনতন্ত্র রচনা করবে—টাকা তুলতে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্যান্য সকল কাজ করতে পারবে।"

জমিতে কৃষিকার্য মোটেই লাভজনক নয়। গ্রামবাসীরা নির্জীবের মত বেঁচে আছে। তাদের জীবন ধীরে ধীরে মরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা ঋণে ডুবে আছে। মহাজন ধার দেয়, কারণ ধার না দিলে তার চলে না। যদি না দেয় ত তাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। গ্রামের ঋণপদ্ধতি কিরূপ তদন্ত করেও তাহা সম্যক জানা যায় না। খুব তোড়জোড় করলেও সে সম্পর্কে আমরা ভাসা ভাসা রকমের কিছু জানতে পারি মাত্র।

গ্রামের শিল্প নষ্ট হয়ে গেলে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ হবে।

আমি যেসব প্রস্তাব দিয়েছি, খবরকাগজে তার সমালোচনা দেখেছি। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ তার উদ্ভাবনী প্রতিভার বলে যেসব প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করেছে, সেগুলির সাহায্যে উদ্ধারলাভের কথাই যেন আমি ভাবি। সমালোচকরা বলেন যে জল, বায়ু, তেল ও বিদ্যুত-শক্তি অগ্রগামী পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেরূপ পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে আমাদের দেশেও সেরূপ হওয়া উচিত। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতির গোপন শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য করার ফলেই প্রতি আমেরিকাবাসীর এখন ৩৩ জন ক্রীতদাস আছে।

ভারতে যদি ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহলে আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে, তাতে প্রতি ভারতবাসী ৩৩ জন করে ক্রীতদাস পাওয়ার পরিবর্তে বর্তমান অপেক্ষা ৩৩ গুণ অধিক দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবে।

কাজের তুলনায় প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যা যখন কম থাকে, তখনই যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু ভারতে যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক লোক বিদ্যমান সেখানে তা ক্ষতিকর। কয়েক বর্গগজ জমি চষবার জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করা যায় না। আমাদের সমস্যা এই নয় যে, আমাদের গ্রামগুলিতে যে অসংখ্য নরনারী বাস করে, তাদের জন্য বিশ্রাম দরকার। সমস্যা এই যে, তারা যে সময়টা অলসভাবে বসে থাকে বছরে প্রায় ছয় মাস কাল, সে সময়টা কি ভাবে কাজে লাগানো যায়। কথাটা অদ্ভুত মনে হলেও কলমাত্রই গ্রামবাসীদের বিপদের কারণ। সঠিক হিসাব না নিলেও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, কলের এক-একজন শ্রমিক অন্ততঃ দশজন গ্রামবাসী শ্রমিকের কাজ করে। অন্য কথায়, সে আগে গ্রামে যা আয় করত, কলে এখন তার দশগুণ আয় করছে অন্য দশজন গ্রামবাসীর ক্ষতি করে। এইভাবে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার

কলগুলি একটা প্রয়োজনীয় জীবিকা থেকে গ্রামবাসীদের বঞ্চিত করছে। তারা সস্তায় ভাল কাপড় তৈরী করে (সত্য তাই করে কিনা জানি না) এ কথা বললে আমার কথার ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না, কারণ কলগুলি হাজার হাজার লোকের কাজ কেড়ে নিয়েছে বলে, সব চেয়ে সস্তা কলের কাপড়ও গ্রামের বোনা সব চেয়ে দামী খাদির চেয়ে মহার্ঘ। কয়লাখনির মজুরের কাছে কয়লা মাগ্‌গি নয়, কারণ সে হাতের কয়লাই ব্যবহার করতে পারে। তেমনি যে-গ্রামবাসী খাদি তৈরী করে তার কাছে খাদি মাগ্‌গি নয়। কিন্তু একমাত্র কলের কাপড়ই যে গ্রামের লোকের কাজ কেড়ে নিচ্ছে তা নয়, চালের কল ও ময়দার কলগুলিও হাজার হাজার গরীব মেয়ের কাজ কেড়ে নিচ্ছে ত বটেই, তার উপর লাভের মধ্যে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যও নষ্ট করছে। যেখানকার লোকে মাংস খায় এবং তার পয়সা জোটাতে পারে, সেখানে কলের ময়দা বা ছাঁটা চাল হয়ত কোন ক্ষতি করবে না, কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক মাংস খায় না, খেতে আপত্তি না থাকলেও পয়সার অভাবে খেতে পারে না, সেখানে যাঁতার আটা বা আকাঁড়া চালের মত পুষ্টিকর খাদ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা পাপ। ডাক্তারদের ও অন্য লোকদের এখন মিলিতভাবে কলের ময়দা ও কলের ছাঁটা চালের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে।

গ্রামবাসীদের কাজ দেওয়ার পথ যে কলকারখানার ভিতর দিয়ে নয়, পরন্তু যে সব শিল্পকার্য তারা এযাবৎ করে এসেছে সেইগুলির পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই তা সম্ভব, এই কথা বোঝাবার জন্যই আমি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাত্র।

আমার মতে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের কাজ হওয়া উচিত বর্তমান শিল্পগুলিকে উৎসাহ দেওয়া এবং যেখানেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় সেখানেই মৃত ও মুমূর্ষু পল্লী-শিল্পগুলিকে পল্লীর উপযোগী প্রণালীতে পুনরুজ্জীবিত করা অর্থাৎ গ্রামবাসীরা যেমন অনাদিকাল থেকে নিজেদের কুটিরে বসে কাজ করে আসছে, তাদের তাই করতে দিতে হবে। এই সব সরল কাজের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা যায়। হাতে তুলার বীজ ছাড়ানো, হাতে তুলা পেঁজা, হাতে সুতা কাটা ও হাতে তাঁত বোনার সম্পর্কে অনুরূপ উন্নতিসাধন করা হয়েছে।

এক সমালোচক আপত্তি করে বলছেন যে, প্রাচীন ধারা পুরাপুরি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং তাতে কখনো সমবায় জীবন গড়ে উঠতে পারে না। আমার কাছে এই মত খুব ভাসা ভাসা মনে হয়। যদিও গ্রামবাসীরা তাদের নিজ নিজ কুটিরে

পণ্য উৎপাদন করবে, তবু সেগুলিকে একত্র করে বাজারে উপস্থিত করা যায় ও তার লাভ সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যায়। গ্রামবাসীরা একই পরিচালকের অধীনে এবং পরিকল্পনা-মত কাজ করতে পারে। কাঁচামাল সাধারণ ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে। যদি সমবায় প্রণালীতে কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত করে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রমবিভাগ, সময় বাঁচানো ও কাজের পটুতা বাড়ানো ইত্যাদির সুযোগ যথেষ্ট পাওয়া যাবে। আজ নিখিল ভারত চরখা সংঘ ৫০০০এর উপর গ্রামে এই সব কাজই করছে।

হরিজন, ১৬-১১-৩৪

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ—অর্থ ও লক্ষ্য

[গান্ধী-সেবা-সংঘের সদস্যদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ]

আপনাদের কেউ কেউ বোধ হয় জানেন, গ্রামোদ্যোগ সংঘ কিভাবে জন্মলাভ করে। গত বছর বহুদূরব্যাপী হরিজন-যাত্রার সময় আমি পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারি যে, আমরা যেভাবে খাদির কাজ করছি তা খাদিকে সার্বজনীন করার বা গ্রামকে সঞ্জীবিত করার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। আমি দেখতে পাই যে, খাদির কাজ খুব অল্পলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যাঁরা কেবল খাদিই ব্যবহার করেন তাঁদের ধারণা এই যে, তাঁদের আর কোন কর্তব্য নেই এবং অন্যান্য জিনিস যেখানে যেভাবে তৈরী হোক না, তার ব্যবহার করতে তাঁদের কোন বাধা নেই। এইভাবে খাদি একটি নির্জীব প্রতীকমাত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমি বুঝলাম, যদি এই অবস্থা আরও চলতে দেওয়া হয় তবে হয়ত খাদি নিছক অবসাদের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র খাদির জন্য একটা সংহত ও প্রগাঢ় চেষ্টা করলে যে সফলতা পাওয়া যাবে না তা নয়। কিন্তু সে সংহতি নাই, সে প্রগাঢ়তাও নাই। সকলেই তাদের সবটুকু অবসর সময় চরখা বা তকলির জন্য দিয়েছে তা নয়, আর সকলেই শুধু খাদিই ব্যবহার করে তাও নয়, যদিও এমন লোকের সংখ্যা কাটুনীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। বাকী সকলেই চুপচাপ বসে থাকে। অসংখ্য লোকের হাতে কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। বুঝলাম এরূপ অবস্থা আমাদের বিনাশের দিকেই নিয়ে যাবে। কারণ স্বেচ্ছাপ্রসূত ও বাধ্যতামূলক উভয়বিধ আলস্যের জন্য তারা চিরকাল দেশী ও

বিদেশী শোষকদের শিকার হয়ে থাকবে। শোষকগণ ভারতের বাহির থেকেই আসুক বা ভারতের শহরগুলি থেকেই আসুক, গ্রামবাসীদের অবস্থা হবে একই রূপ—তারা স্বরাজ পাবে না। কাজেই ভাবলাম, এইসব লোককে আর কিছু করতে বলা যাক। তাদের যদি খাদি ভাল না লাগে, তবে তারা আর কিছু করুক, যা তাদের পূর্বপুরুষরা করত, কিন্তু যা এখন লোপ পেয়ে গেছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের যোগ্য এমন অনেক জিনিস আছে, যা তারা কিছুকাল আগে নিজেরাই তৈরী করত, কিন্তু সেগুলির জন্য তারা এখন গ্রামের বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নগরবাসীরা আগে বহু জিনিসের জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করত, কিন্তু এখন গ্রামবাসীরা সেগুলির জন্য বড় বড় শহরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যখনই গ্রামবাসীরা তাদের সমস্ত অবসর সময় কিছু না কিছু দরকারী জিনিস তৈরীর কাজে লাগবে এবং শহরবাসীরা পল্লীর সেই সব জিনিস ব্যবহার করতে কৃতসঙ্কল্প হবে, তখনই গ্রামবাসী ও শহরবাসীর ভিতরকার ছিন্নসূত্র আবার জোড়া লাগবে। মৃত বা মুমূর্ষু পল্লীশিল্পগুলির মধ্যে কোন্‌গুলিকে বাঁচিয়ে তোলা হবে সে সম্পর্কে যতক্ষণ না আমরা গ্রামে বসে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ ইত্যাদি চালাব, ততক্ষণ নিশ্চয় করে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু দুটো খুব দরকারী জিনিস আমি বেছে নিয়েছি, খাওয়ার জিনিস ও পরার জিনিস। খাদির কাজ চলেছে। খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমরা দ্রুত পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। মাত্র কয়েক বছর আগে আমরা নিজেদের ধান নিজেরা ভানতাম এবং নিজেদের গম নিজেরা ভাঙতাম। আপাততঃ স্বাস্থ্যের প্রশ্ন বাদই দিলাম। এটা ত সকলেই স্বীকার করেন যে, চালের কল ও ময়দার কল লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ কেড়ে নিয়েছে এবং কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকার্জনের যেটুকু পথ ছিল তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছে। চিনি দ্রুত গুড়ের জায়গা দখল করছে এবং বিস্কুট ও মিঠাইমণ্ডা ইত্যাদি তৈরী খাবার গ্রামের ভিতর যথেষ্ট চালু হচ্ছে। এর অর্থ এই যে, সমস্ত পল্লীশিল্পই ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর হাত থেকে খসে যাচ্ছে এবং শোষকদের জন্য কাঁচামাল তৈরী করাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কেবল দিয়েই যাচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই পাচ্ছে না। কাঁচামালের জন্য অল্প যা কিছু পায়, তাও সে চিনির বেপারী ও কাপড়ের বেপারীকে ফিরিয়ে দেয়। তার শরীর ও মন অনেকটা তার চিরসঙ্গী পালিত পশুগুলির মতই হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আজকার গ্রামবাসী ৫০ বছর আগের গ্রামবাসীর তুলনায় অর্ধেক বুদ্ধিমান

বা সঙ্গতিবানও নয়। কারণ একালে গ্রামবাসীরা শোচনীয়ভাবে পরনির্ভরশীল ও অলস হয়ে পড়েছে, কিন্তু সেকালের গ্রামবাসীরা তাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্য দেহ ও মন খাটাত এবং ঘরেই প্রয়োজনের জিনিসগুলি তৈরী করত। আজকার পল্লীশিল্পীরাও অন্যান্য গ্রামবাসীদের মত সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছে। গ্রামের ছুতারের কাছে গিয়ে একটা চরখা তৈরী করে দিতে বলুন, আপনাকে নিরাশ হতে হবে। এই হচ্ছে বর্তমানের শোচনীয় অবস্থা। এর প্রতিকারের জন্যই গ্রামোদ্যোগ সংঘের কল্পনা করা হয়েছে।

কোন কোন সমালোচক বলেন, 'গ্রামে ফিরে চল' এই ধ্বনির অর্থ হচ্ছে উন্নতির কাঁটাকে উল্টোদিকে চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু সত্যই কি তাই? এটা কি গ্রামে ফিরে যাওয়া, না গ্রামের যা ন্যায্যবস্তু তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া? আমি শহরবাসীকে গ্রামে গিয়ে বসতে বলছি না, আমি কেবল তাদের বলছি যে, তারা যেন গ্রামের প্রাপ্য গ্রামকে দেয়। এমন একটাও কি কাঁচামাল আছে যা শহরবাসীরা গ্রামবাসী ছাড়া অন্যের কাছ থেকে পায়? তাই যদি হয়, তবে তাকে আগের মত কাজে লাগতে শেখান না কেন? শহরের দ্বারা শোষণক্রিয়া চালালে তারা ত কাজে লেগে থাকতো।

কিন্তু গ্রামবাসীর এককালে যা নিজস্ব ব্যাপার ছিল, তাতে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা বড় সোজা কথা নয়। আমি ভেবেছিলাম যে, একটা গঠনতন্ত্র তৈরী করে খুব শীঘ্র শ্রীযুত কুমারাপ্পার সাহায্যে সংঘের কাজ চালু করতে পারব। কিন্তু যতই আমি একাজে ডুব দিচ্ছি ততই তলিয়ে যাচ্ছি। এক দিক দিয়ে এ কাজ খাদির চেয়ে অনেক বেশী শক্ত, কারণ খাদিতে এর মত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। বিদেশী ও কলের তৈরী কাপড় বর্জন করতে পারলেই খাদিকে নিরাপদ ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যায়। কিন্তু পল্লীশিল্পের ক্ষেত্র এত বিশাল এবং সেখানে এত অসংখ্য প্রকারের শিল্প নিয়ে কারবার করতে ও সংগঠন করতে হয় যে, আমাদের সমুদয় ব্যবসায়-বুদ্ধি, বিশেষজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কঠোর শ্রম, অবিরাম চেষ্টা এবং সমস্ত ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য প্রয়োগ ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি কয়েকজন বিখ্যাত উপাধিধারী ডাক্তার ও রসায়নবিদের কাছে একটা প্রশ্নগুচ্ছ পাঠিয়েছিলাম, তাদের বলেছিলাম—পালিশ করা চাল ও আকাঁড়া চাল, চিনি ও গুড় ইত্যাদি খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে কোনটায় কিরূপ খাদ্য-উপাদান আছে। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাচ্ছি যে,

অনেক বন্ধু অবিলম্বে উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেবল স্বীকার করেছেন যে, আমি যেসব তথ্য জানতে চেয়েছি, তার অনেকগুলি সম্পর্কে এখনো কোন গবেষণা হয় নি। গুড়ের মত একটা সাধারণ জিনিসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ কোন বৈজ্ঞানিকই আমাকে দিতে পারলেন না, এটা কি দুঃখের কথা নয়? আর কিছু নয়, আমরা গ্রামবাসীর কথা মোটেই ভাবি নি। মধু সম্পর্কীয় কথাই ধরুন। আমি শুনেছি যে অন্যান্য দেশে মধুকে এত ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে, যে-মধু একটা বিশেষ বিশ্লেষণে উত্তম বলে বিবেচিত না হয়, তাকে বাজারে ছাড়া হয় না। ভারতবর্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মধু তৈরীর বিপুল সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমাদের সে বিষয়ে তেমন ব্যবহারিক জ্ঞান নাই। এক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বন্ধু লিখেছেন যে, তাঁর হাসপাতালে পালিশ করা চাল নিষিদ্ধ। ইন্দুর ও অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঐ মসৃণ চাল অনিষ্টকর। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসক সম্প্রদায় মিলিতভাবে ঘোষণা করেন নি কেন যে, এই চালের ব্যবহার নিশ্চিত হানিকর? আমি মাত্র দু-একটি কথা বলে আমার অসুবিধা জানালাম। কিরূপ প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলব? পরীক্ষাগারে কিরূপ গবেষণা আমাদের চালাতে হবে? আমাদের একদল বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক দরকার—যাঁরা শুধু যে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন তা নয়, পরন্তু আমাদের পরীক্ষাগারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনা মাহিনায় উপরোক্ত প্রণালীতে প্রয়োগ চালিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে আমাদের কাজের বিবরণী বাহির করতে হবে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তদন্ত করে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের সুপারিশও করতে হবে। আর এও দেখতে হবে, গ্রামবাসী একদিকে শিল্প বা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে বাহিরে পাঠিয়ে দিচ্ছে কিনা এবং সস্তায় তার পরিবর্তে বিদেশী জিনিস খরিদ ও ব্যবহার করছে কিনা। আমাদের দেখতে হবে, যাতে গ্রামবাসী আগে নিজের অভাব মিটিয়ে নেয় ও পরে শহরবাসীর চাহিদা মিটাতে যায়। এই কার্যের জন্য আমাদের প্রতি জেলায় একটি করে সংস্থা গডতে হবে। আর যেখানে জেলার আয়তন এত বড যে কাজ করা কঠিন, সেখানে তাকে কতকগুলো অংশে বিভক্ত করে নিতে হবে। এইভাবে প্রায় আডাইশ কেন্দ্র হবে। প্রত্যেকটির জন্য একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। তিনি প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অনুসারে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পাঠাবেন। এইসব প্রতিনিধিকে সর্বসময়ের এবং একনিষ্ঠ কর্মী হতে হবে। আর তাদের এই কার্যতালিকায় জীবন্ত বিশ্বাস থাকা চাই এবং

নিজেদের দৈনন্দিন জীবনকে অবিলম্বে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে নিতে প্রস্তুত থাকাও চাই। এ কাজে অবশ্য টাকার দরকার হবে, কিন্তু টাকার চেয়ে বেশী দরকার এমন সব কর্মীর যাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও আন্তরিক ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন: খাদির কাজ এখনও অসম্পূর্ণ, তাকে গ্রামোদ্যোগ সংঘের এই কাজ ব্যাহত করবে না ত?

উত্তর: না, খাদি কেন্দ্রস্থলে থাকবেই, খাদি সমগ্র শিল্পসৌরজগতের সূর্য হয়ে থাকবে। আর সব শিল্প খাদি-শিল্প থেকে উত্তাপ ও জীবনীশক্তি লাভ করবে।

প্রশ্ন: কোন্ কোন্ শিল্পকে আমরা আবার বাঁচিয়ে বা জাগিয়ে তুলব?

উত্তর: আমি ত তার আভাস দিয়েছি। কিছুকাল আগে যে সব শিল্প প্রচলিত ছিল এবং যেগুলি নষ্ট হওয়ায় লোকে বেকার হয়ে পড়েছে এমন সমুদয় দরকারী শিল্পকেই জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন: চালের কল এবং ময়দার কলগুলোকে কি বয়কট করা দরকার?

উত্তর: বয়কট করার দরকার নাই। শুধু লোকেদের বলতে হবে, তারা যেন নিজেদের ধান নিজেরা ভানে এবং নিজেদের গম নিজেরা পিষে নেয়। আর ঢেঁকিছাটা চাল ও যাঁতায় পেষা আটা যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল খাদ্য, আমাদের ক্রমাগত তা প্রচার করে যেতে হবে। শুধু আমাদের কুঁড়েমিকে বয়কট করলেই চলবে।

প্রশ্ন: এ কাজের জন্য আমরা কি কংগ্রেস কমিটিগুলোকে কাজ লাগাব?

উত্তর: নিশ্চয়ই, আমরা সকলেই কাজে লাগব এবং সকলের কাছ থেকে সাহায্য নেব। আমরা রাজনীতি বা দলাদলির ভিতর থাকব না।

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকলে কেন্দ্রীকরণ হবে ত না?

উত্তর: ঠিক তা হবে না, জেলাগুলি হবে কাজের কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সমগ্র ভারতের জন্য নিয়ন্ত্রক-মণ্ডলীরূপে কাজ করবে না, শুধু পাহারাদারের কাজ করবে, আর মধ্যে মধ্যে পরামর্শ দেবে। এই কার্যালয়টির মারফৎ বিভিন্ন প্রতিনিধিরা পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। আমরা পরিচালনার কেন্দ্রীকরণটাই বর্জন করতে চাই। কিন্তু ভাব চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ আমরা চাই-ই।

হরিজন, ৭-১২-৩৪

ভারতীয় শিল্প

প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়—ভারতীয় শিল্প কাকে বলে? সাধারণতঃ ভারতীয় প্রদর্শনীগুলির প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে। আগে এরূপ দাবি করা হত যে, ভারতবর্ষে পরিচালিত শিল্পমাত্রেই ভারতীয় শিল্প। এই যুক্তিতে এমন সব শিল্পকেও ভারতীয় শিল্প বলা হত যেগুলি অভারতীয় ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত, যেগুলির মূলধন, কলকব্জা ও দক্ষ কারিগর ইত্যাদি বিদেশ থেকে আনা—যদিও সেগুলির দ্বারা জনসাধারণের ক্ষতি হচ্ছে একথা প্রমাণ করা খুবই সম্ভব ছিল। আমরা সেই অবস্থা থেকে অনেক অগ্রসর হয়ে এসেছি। কোন শিল্পকে ভারতীয় বলে আখ্যা দিতে হলে স্পষ্ট করে দেখাতে হবে যে, তাতে জনসাধারণের লাভ হচ্ছে, তার দক্ষ ও অদক্ষ দুই রকমের শ্রমিকরাই ভারতীয়, তার শ্রমিকরা জীবনধারণের উপযোগী মজুরী পায় ও আরামে থাকতে পায়, আর সেই সঙ্গে মজুরদের সন্তানদের কল্যাণ সম্পর্কেও নিযোক্তারা নিশ্চয়তা দেন। এই হল ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সংজ্ঞা। কেবল নিখিল ভারত চরখা সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘই বোধ হয় কোনপ্রকারে এই সংজ্ঞামত কাজ করে, কারণ এই সব সংঘকে ত আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। তথাপি তাদের অব্যবহিত লক্ষ্য হচ্ছে ভারতীয় শিল্পকে এই সংজ্ঞামত সম্পূর্ণভাবে রূপ দেওয়া। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের এই সংজ্ঞা এবং ১৯২০ সালের আগে কংগ্রেসে উহার যে সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল, এ দুইয়ের মাঝামাঝি ধরনের অনেক সংজ্ঞা চালু হয়েছে। কংগ্রেসের সংজ্ঞায় সাধারণতঃ কলের কাপড় ছাড়া ভারতে উৎপন্ন অন্য সকল জিনিসকে স্বদেশী বলা হত। বড় বড় কাপড়ের কলগুলিকে সাধারণভাবে ভারতীয় শিল্প বলা যায়। কিন্তু জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহা এমন একটি শিল্প যা জনগণকে শোষণ করে ও তাদের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেয়। খাদির তুলনায় ভারতীয় কাপড়ের কলের সাফল্য যত অধিক, উহার দারিদ্র্য বাড়াবার শক্তিও তত অধিক। সর্বপ্রকারে যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের জন্য বর্তমানে যে উন্মত্ততা এসেছে, তাতে আমার মতকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে না দিলেও সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এরূপ বলা হয় যে, যন্ত্রশিল্পের প্রসার করতে গেলে লোকে দরিদ্র হয়ে পড়বে—তা ঠেকানো যাবে না, কাজেই সহ্য করে নিতে হবে। আমি কিন্তু এই অমঙ্গল সহ্য করা ত দূরের কথা, একে অনিবার্য বলে মনে করি না। নিখিল ভারত চরখা সংঘ হাতে-

কলমে কাজ করে দেখিয়েছে যে, গ্রামবাসীরা কেবল অবসর সময়ে সুতা কেটে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ করে ভারতের চাহিদা-মত সমস্ত কাপড় তৈরী করতে পারে এ সম্ভাবনা আছে। অসুবিধা শুধু একটা জায়গায়—সে হচ্ছে জাতিকে কলের কাপড়ের ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করা। কি ভাবে তা করা যায়, সে বিষয় আলোচনার স্থান এ নয়। এই লেখার উদ্দেশ্য ছিল, কোটি কোটি গ্রামবাসীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা ও তার স্বপক্ষে আমার যুক্তি দেখানো। সকলের এটা বোঝা উচিত যে, জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীগুলি কেবল সেই সব শিল্পদ্রব্য নিয়ে করা কর্তব্য, যেগুলি সর্বপ্রকারে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীতে সেই সব শিল্প রাখা উচিত নয়, যেগুলি আমাদের সহায়তা ছাড়াই প্রসারলাভ করছে এবং যেগুলির জন্য নিজ নিজ প্রদর্শনীর স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও আছে।

হরিজন, ২৩-১০-৩৭

খাঁটি স্বদেশী

আমি যদি স্বদেশী শব্দের আগে খাঁটি এই বিশেষণ বসাই, তা হলে কোন সমালোচক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'তা হলে কি মেকী স্বদেশীও আছে?' দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে উত্তর দিতে হবে 'হাঁ'। খাদির সময় থেকে স্বদেশী সম্পর্কে আমার মত প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। সেজন্য পত্রলেখকরা আমার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন তুলে থাকেন। ফলে আমি দুরকম স্বদেশীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। যদি বিদেশী মূলধনের সঙ্গে স্বদেশী মূলধনের যোগ থাকে অথবা যদি বিদেশী বুদ্ধি-কৌশল স্বদেশী প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তা হলে কি ঐ প্রতিষ্ঠানকে স্বদেশী বলা যায়? অন্যান্য প্রশ্নও আছে। কিন্তু সেদিন আমি একজন মন্ত্রীকে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তাই এখানে তুলে দেওয়া ভাল: "যে জিনিস কোটি কোটি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে, তা তৈরী করতে বিদেশী মূলধন ও প্রতিভা লাগলেও তা যদি ভারতীয়দের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে এমন জিনিস মাত্রেই স্বদেশী।" এভাবে বিচার করলে নিখিল ভারত চরখা সংঘের সমস্ত মূলধন ও বিশেষজ্ঞ যদি বিদেশ থেকে আনাও হয় অথচ সে সকলই ভারতীয় বোর্ডের দ্বারা নিয়োজিত হয়, তা হলেও উহা খাদি সংঘের সংজ্ঞা অনুসারে খাঁটি স্বদেশীই হবে। অন্যপক্ষে বাটা কোম্পানীর সমস্ত শ্রমিক ও

মূলধন ভারতীয় হলেও তার তৈয়ারী রবারের জুতা বা অন্য যে কোন জুতা বিদেশী বলেই গণ্য হবে। তার উৎপন্ন পণ্য বিদেশীর ও বিদেশী। কারণ তার পরিচালনাই বিদেশীদের হাতে এবং তার তৈয়ারী জিনিস যত সস্তাই হোক না কেন, তাতে যারা গ্রামের চামড়া কষায় তাদের বেশীর ভাগকে এবং গ্রামের মুচিদের সবাইকে বেকার হতে হবে। ইতিমধ্যেই বিহারের মুচিরা এই ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার কুফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বাটার জুতায় ইউরোপ বাঁচতে পারে। তাতে কিন্তু আমাদের গ্রামের মুচিরা ও যারা চামড়া কষায় তারা মরবে। আমি দুটো জলন্ত দৃষ্টান্ত দিলাম। দুটোই অংশত কাল্পনিক। কারণ নিখিল ভারত চরখা সংঘের সমস্ত মূলধনই দেশীয়, সমস্ত প্রতিভাও দেশীয়। তথাপি পাশ্চাত্যের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা যদি বর্তমানের চরখা অপেক্ষা একটা ভাল চরখা তৈরী করে দিতে পারে, তা হলে আমি খুশীই হব, যদিও অন্তরে অন্তরে আমার বিশ্বাস আছে যে, দেশীয় প্রতিভার দ্বারা চরখার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা কোনক্রমে অবজ্ঞার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি।

আমার আশা এই যে, মন্ত্রীরা বা অন্য যাঁরা জনগণের পথপ্রদর্শক বা সেবক তাঁরা খাঁটি ও মেকী স্বদেশীর মধ্যে পার্থক্য দেখবার অভ্যাস অর্জন করবেন।

হরিজন, ২৫-২-৩৫

শুধু খাদি কেন ?

অধ্যাপক কুমারাপ্পার আমার বিরুদ্ধে একটা নালিশ এই যে, যদিও আমি নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের স্থাপয়িতা ও পথপ্রদর্শক, তবু আমি যেন ঐ সংঘের সঙ্গে বিমাতার মত ব্যবহার করছি। আমি জবাব দিয়েছি যে, ঐ আপত্তিটা অগভীর বিচারের ফল। তিনি কিন্তু অত সহজে হার মানবার পাত্র নন। তিনি পুনঃ পুনঃ ঐ অভিযোগ করে আসছেন এবং আমি যতক্ষণ না জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করি যে, অন্যান্য কুটিরশিল্পের গুরুত্ব খাদির ঠিক সমান, ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। আমার কাছে ঐ বিষয়টা এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, তার ব্যাখ্যা করা দরকার মনে হয় নি। কিন্তু অধ্যাপক কুমারাপ্পা ব্যবহারিক দিক থেকে ঠিক কাজই করছেন। লোকে কেবল সিদ্ধান্তের দ্বারাই চালিত হয় না। যেমন কয়েকজন লোক সম্প্রতি আমার কাছে এই নালিশ করেছেন যে, তাঁরা এমন সব লোকের কথা জানেন, যাঁরা খাদি ব্যবহার করেন অথচ গ্রামজাত অন্য

দ্রব্য ব্যবহার করেন না। তাঁরা বলতে চান যে, অনেক কংগ্রেসী কেবল নিয়মতন্ত্রের বশবর্তী হয়েই খাদি পরেন, কিন্তু তাঁদের এতে বিশ্বাস নেই বলে তাঁরা অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য সম্পর্কে নিজেদের সুবিধার দিকটাই ভাল করে দেখেন। একে আমি বলি 'ভাবের গলা টিপে মেরে ভাষা বাঁচিয়ে চলা' অর্থাৎ ভাবের ঘরে চুরি করা। আর, যেখানে ভাব নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে ভাষা মৃতদেহের মত অসার। আমি অনেক সময় বলেছি যে, খাদি হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী সূর্য—যার চারদিকে অন্যান্য কুটিরশিল্প গ্রহদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, আর খাদিও অন্যান্য কুটিরশিল্প ছাড়া টিকতে পারে না। এরা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যাপার এই যে, আমাদের দুটো জিনিসের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। যে-সব পল্লী ভারতের ন্যায়ই প্রাচীন, সেই পল্লীময় ভারত অথবা যে-সব নগর বৈদেশিক শাসনের সৃষ্টি সেই নগরময় ভারত —এর মধ্যে কোন্‌টা আমরা চাই? আজ শহরগুলিই প্রাধান্য লাভ করে গ্রামগুলিকে শোষণ করছে। ফলে গ্রামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। খাদি মনোবৃত্তি থাকার জন্য আমার মনে হয় যে, যখন সেই শাসনের অন্ত হবে তখন নগরগুলি গ্রামগুলির সহায়কই হবে। গ্রামগুলিকে শোষণ করা সংঘবদ্ধ হিংসার দ্বারা চলছে। আমরা যদি চাই যে, অহিংসার ভিত্তিতে স্বরাজের কাঠামো গড়ে তুলব, তাহলে গ্রামগুলিকে উপযুক্ত স্থান দিতেই হবে। যদি দেশী বা বিদেশী শহরের কারখানাজাত জিনিসের বদলে গ্রামের জিনিস ব্যবহার করে আমরা গ্রাম-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করি, তাহলে কখনো আমরা এই কাজ করতে পারব না। এখন বোধ-হয় একথা পরিষ্কার হল, কেন আমি খাদিকে অহিংসার সঙ্গে সমান করে দেখি। খাদিই গ্রাম-শিল্পগুলির মধ্যে প্রধান। খাদিকে মেরে ফেললে গ্রামকে ও সেই সঙ্গে অহিংসাকে মেরে ফেলা হবে। আমি একথা হয়ত তথ্য ও অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই পড়ে আছে।

হরিজন, ২০-১-৪০

বিদেশী বনাম স্বদেশী

প্রশ্ন: কাপড় ব্যতীত অন্য বিদেশী জিনিস ভারতবর্ষে আমদানি করা সম্পর্কে আপনার মত কি? এমন কোন বিদেশী জিনিস আছে কি যার আমদানি নিষিদ্ধ করা এখন আপনি দরকার মনে করেন? ভবিষ্যতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য কিভাবে চলবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আমি কাপড় ব্যতীত অন্য বিদেশী জিনিসের কারবার সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। বিদেশী বলেই সব বিদেশী জিনিস বর্জন করতে হবে একথা আমি কখনো বলি নি। আমার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এই যে, যেসব বিদেশী জিনিস দেশের স্বার্থের হানিকর, সেগুলির আমদানি একেবারে বন্ধ করা উচিত। এর মানে এই যে, আমরা যেন কোন ক্ষেত্রে এমন কোন জিনিস বিদেশ থেকে না আনাই যা আমাদের দেশ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুণে ভাল হলেও অস্ট্রেলিয়া থেকে গম আনা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু ভারতবর্ষে ওট্‌ (যই) জন্মায় না, সুতরাং স্কট্‌ল্যাণ্ড থেকে ওট্‌ মিল (যইএর আটা) আনা বিশেষ দরকার বলে বুঝলে আমি তাতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করব না। অর্থাৎ বিদ্বেষ বা অপ্রীতির ভাব থেকে আমি একটিও বিদেশী দ্রব্যের বর্জন সমর্থন করব না। অপর পক্ষে আবার ভারতে প্রচুর পরিমাণে চামড়া উৎপন্ন হয়। কাজেই আমার কর্তব্য হবে কেবল ভারতীয় চামড়ার তৈরী জুতা পরা, যদিও সে জুতা বিদেশী জুতার চেয়ে দামে বেশী এবং গুণে খারাপ হয়। ঠিক সেইরূপে ভারতে যদি আমাদের দরকারমত যথেষ্ট গুড় তৈরী হয়, তা হলে বিদেশ থেকে তা আমদানি করার আমি নিন্দাই করব। উপরে যা লেখা হল তা থেকে একথা পরিষ্কার হবে যে, ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি-সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা উচিত তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল একটা সাধারণ সূত্র বাহির করেছি যা আমরা এরূপ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারি। আর ভবিষ্যতেও এই নিয়ম ততদিন গ্রহণযোগ্য হবে, যতদিন আমাদের দেশের উৎপাদনশক্তি বর্তমানের মত থাকবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১১-২৮

খাদি ও স্বদেশী

অনেক সময় আমরা ভাবি যে, খাদি নিয়েই আমরা স্বদেশীর বাণী পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করে তুলেছি। আমরা খদ্দর পরাকে অভারতীয় জিনিস ব্যবহার করবার ও প্যারিসের সব চেয়ে আধুনিক ফ্যাশন আমদানির একটা ছাড়পত্র বলে মনে করি। এটা স্বদেশীর অপপ্রয়োগ ও খাদির অন্তর্নিহিত বাণীর অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। খাদি পরা ভারতে অবশ্য কর্তব্য—সেই সঙ্গে যেখানে সম্ভব ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করা—তা বিদেশী পণ্যের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও। বাজারে কতকগুলি স্বদেশী জিনিস আছে যা উৎসাহ না পেলে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সেগুলি হয়ত ভালভাবে তৈরী নয়, তবু আমাদের উচিত সে সব ব্যবহার করা ও যারা সে সব তৈরী করে তাদের ঐ সকলের সম্ভবমত উন্নতিসাধন করতে বলা। সব চেয়ে ভাল দেখে ও সব চেয়ে সস্তা দেখে জিনিস কেনার নীতি সব্ সময় সাচ্চা নয়। আমরা যেমন উৎকৃষ্টতর জলবায়ুর জন্য স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাই না, সেইরূপ বিদেশী জিনিস বেশী সস্তা বা সুন্দর হলেও দেশী জিনিস বর্জন করা আমাদের কর্তব্য নয়। যে স্বামী নিজের স্ত্রী সুন্দর নয় বলে অন্য সুন্দরী স্ত্রীলোকের সন্ধানে যায়, সে যেমন স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি স্বদেশী জিনিসের চেয়ে ভাল বলে বিদেশী জিনিস পছন্দ করে সে তার দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রতি দেশের উন্নতির নিয়ম এই যে, সেই দেশের অধিবাসীরা স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্য অধিক পছন্দ করবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৫-২৯

কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন : আপনি বলেন যে, যন্ত্রই মানবসভ্যতার শত্রু। তাহলে আপনি রেলে বা মোটরে চড়েন কেন ?

উত্তর : এমন কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলেও সহসা ত্যাগ করা যায় না। এই যে মাটির ভাণ্ডটা (শরীর) যাতে আমি আবদ্ধ আছি, এটা ত আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কিন্তু আমার বন্ধু ত জানেন যে, আমি একে নিয়ে চলতে বাধ্য এবং একে প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। যন্ত্রযুগই যে বিগত যুদ্ধের সংঘবদ্ধ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এ সম্পর্কে তিনি কি

সত্যসত্যই সন্দেহ করেন? বিষবাষ্প ও অন্যান্য ঘৃণ্য জিনিস আমাদিগকে উন্নতির পথে এতটুকুও অগ্রসর করে দেয় নি।

প্রশ্ন: সব চেয়ে সস্তা ও সব চেয়ে ভাল জিনিস ক্রয় করা উচিত—অর্থনীতির এই নিয়ম কি ভুল?

উত্তর: আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌রা যেসব সূত্র প্রচার করেন এটি তার মধ্যে সব চেয়ে অমানুষিক। আর আমরা যে সব সময় এইরূপ লুব্ধ দৃষ্টি নিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করি তাও নয়। ইংরেজরা সস্তায় ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগের কথা না ভেবে বিলাতের কয়লাখনিতে ইংরেজ মজুরকেই বেশী মজুরী দেয়—এটা তারা ঠিকই করে। বিলাতে অল্প মাহিনার বিদেশী মজুর আমদানির চেষ্টা করলে বিপ্লব দেখা দেবে। কম পয়সায় আরও ভাল কাজের লোক পাওয়া গেলেও, আমার খুব বিশ্বাসী ভৃত্যকে বিদায় দেওয়া, (যদি অপর ব্যক্তি তার মত বিশ্বস্ত হয়ও) আমার পক্ষে পাপের কাজ হবে। যে সব অর্থনীতি মানুষের মনের গতি ও নীতিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু চিন্তা বা বিবেচনা করে না, তা মানবীয় ব্যাপারকে ঠিক মোমের পুতুলের মত মনে করে—যা দেখতে খুব জীবন্ত কিন্তু যার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। কিন্তু প্রতিসঙ্কটের সময় কার্যক্ষেত্রে এই সব নূতন নূতন অর্থনীতির নিয়ম অচল প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি বা জাতি এই সব নিয়মকে জীবন-ধর্ম বলে স্বীকার করে তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান ধর্মসম্মতভাবে প্রস্তুত খাদ্যের জন্য বেশী দাম দেয় বা হিন্দু শুচিশুদ্ধ না হলে খাদ্য গ্রহণ করতে চায় না—এই সংযমের মধ্যে একটা মহত্ত্ব আছে। আমরা যখনই বিলাতের বা জাপানের সস্তা বাজারে কাপড় কিনতে শুরু করলাম, তখনই হল আমাদের পরাজয়। আমরা যখন ধর্মবোধে আমাদের প্রতিবেশীদের হাতে তৈরী কাপড় ক্রয়ের প্রয়োজন বুঝতে পারব, তখন আমরা আবার বাঁচব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-১০-২১

যান্ত্রিক প্রণালী

লেখক যখন যন্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত ও হস্তশিল্পকে অজ্ঞজনোচিত বলেছেন, তখনই তার মধ্যে একটা গলদ থেকে গেছে। হাতের বদলে যন্ত্র আমদানি করলে সব সময়ই কল্যাণ হয়, এ কথা এখনও প্রমাণিত হয় নি। আর এ কথাও সত্য নয় যে, সোজা জিনিস মাত্রেই কঠিন জিনিসের চেয়ে ভাল। পরিবর্তন

মাত্রেই মঙ্গলজনক এবং পুরানো জিনিস মাত্রকেই বিদায় করতে হবে, একথা আরও অধিক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

আমার বিশ্বাস, যখন লক্ষ লক্ষ হাত বেকার হয়ে আছে এবং সেগুলিকে কাজে লাগানো দরকার, তখন যন্ত্র আমদানি করা অনিষ্টকর। প্রায় ১৯০০ মাইল লম্বা ১৫০০ মাইল চওড়া এই ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের অধিবাসীরা রোজ যেমন তাদের খাদ্য তৈরী করে নেয় তেমনই তাদের কাপড়ও তৈরী করে নিক, এ ব্যবস্থা সর্ব সময়ই শ্রেয়স্কর ও নিরাপদ। এই সব গ্রাম অনাদি কাল থেকে যে স্বাধীনতা উপভোগ করে এসেছে সে স্বাধীনতা তারা রাখতে পারবে না, যদি না জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির উৎপাদন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা তাড়াতাড়ি এই যুক্তি দেখায় যে, পাশ্চাত্য দেশের পরিবেশের মধ্যে যা সত্য, পাশ্চাত্য থেকে নানা দিক দিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র এই ভারতবর্ষের পক্ষেও তাই সত্য হবে। অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলি সর্বত্র একরূপ খাটে না। অবস্থানুসারে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

যান্ত্রিক প্রণালী নিশ্চয়ই সহজ, কিন্তু সেজন্য তা যে কল্যাণকর এমন কথা বলা যায় না। উপর থেকে নীচে পড়ে যাওয়া সোজা, কিন্তু বিপজ্জনক। অন্ততঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে হাতের কাজ কঠিন বলেই কল্যাণকর। যদি যন্ত্রের জন্য এই পাগলামি চলতে থাকে, তাহালে খুব সম্ভব এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা এমন অক্ষম ও দুর্বল হয়ে পড়বো যে, ভগবানের দেওয়া জীবন্ত যন্ত্রগুলির অর্থাৎ হাত-পায়ের ব্যবহার ভুলে যাওয়ার জন্য নিজদিগকে ধিক্কার দিতে থাকব। লক্ষ লক্ষ লোক ত খেলাধূলা ও কুস্তি-কসরৎ করে নিজেদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না। আর তারা উৎপাদনমূলক প্রয়োজনীয় শ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে নিষ্ফল, অকেজো এবং ব্যয়বহুল খেলাধূলা ও ব্যায়ামের আশ্রয় নিতে যাবে কেন? পরিবর্তন ও অবসর-বিনোদনের জন্য এসব ভাল। কিন্তু যে খাদ্য উৎপাদনে আমাদের শ্রম নাই সেই খাদ্য গ্রহণের জন্য যাতে ক্ষুধা পায়, কেবল এই উদ্দেশ্যে ব্যায়াম আদি করলে অত্যন্ত বিসদৃশ হয়ে দাঁড়াবে।

আর শেষ কথা হচ্ছে, পুরানো জিনিস মাত্রেই খারাপ এ আমি বিশ্বাস করি না। সত্য অতি পুরাতন ও কঠিন। অসত্য নানাভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু আমি সানন্দে সত্যের সেই স্বর্ণ যুগেই ফিরে যেতে চাই। সাদা ময়দা, যা কলে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পুষ্টিশক্তি খুইয়ে বসে তার চেয়ে যাঁতায় ভাঙ্গা বাদামী রংএর আটা সব সময়েই ভাল। পুরানো অথচ আজও

ভাল এমন জিনিসের তালিকা যত খুশি বাড়ানো যায়। চরখা ঐরূপ একটা জিনিস—অন্ততঃ ভারতের জন্য।

ভারতবর্ষ যখন আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবে, যখন সে নিজে লোভ ও শোষণের পথ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে, তখন পূর্ব অথবা পশ্চিমের কোন শক্তির লোভের বা আকর্ষণের বস্তু সে থাকবে না। তখন অস্ত্রসজ্জার বিপুল ব্যয়ভার বহন না করেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। তার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিই তাকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৭-৩১

যন্ত্রশিল্পবাদ

"ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার সম্পর্কে আপনার মত কি ?"

"আমার আশঙ্কা এই যে, যন্ত্রশিল্পের প্রসার মনুষ্যজাতির পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হতে যাচ্ছে। এক জাতের দ্বারা অন্য জাতের শোষণ চিরকাল চলতে পারে না। বিদেশের বাজার দখল করা সম্ভব হলে এবং কোন প্রতিযোগী না থাকলে, আপনার শোষণ করবার ক্ষমতা কতখানি তারই উপর যন্ত্রশিল্পের সাফল্য নির্ভর করে। ইংলণ্ডের বেলায় এই সব সুবিধা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে, তাই তার বেকারের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। ভারত কর্তৃক বিলাতী পণ্য বর্জন এর মধ্যে একটা মশার কামড় মাত্র। যদি ইংলণ্ডেরই এই অবস্থা হয়, তা হলে ভারতের মত একটা বৃহৎ দেশ নিশ্চয়ই যন্ত্রশিল্পের দ্বারা লাভবান হতে পারে না। ভারতে যখন যন্ত্রশিল্পের প্রসার হবে তখন তাকে অন্য দেশ শোষণ করতেই হবে—তখন ভারত সত্যসত্যই অন্য দেশের পক্ষে একটা অভিশাপ এবং জগতের পক্ষে একটা ভীতিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। আর অন্য জাতিকে শোষণ করবার জন্য ভারতে যন্ত্রশিল্প প্রসারের কথা আমি ভাবতে যাব কেন ? আপনারা কি এই শোচনীয় ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছেন না যে, ভারত যেখানে তার ত্রিশ কোটি বেকারকে কাজ দিতে পারে, সেখানে ইংলণ্ড তার মাত্র ত্রিশ লক্ষ বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে পারছে না এবং এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার সমাধান করতে সে দেশের সব চেয়ে বুদ্ধিমান লোকও হালে পানি পাচ্ছে না। যন্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানী ইংলণ্ডের খুব শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের অল্পসংখ্যক কলও তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতের লোকেদের ভিতর যেরূপ জাগরণ এসেছে, আফ্রিকার লোকেদের মধ্যেও একদিন সেরূপ আসবে। আর সেখানকার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ এবং জনসম্পদ ভারতের চেয়ে অনেক বেশী। আফ্রিকার শক্তিশালী জাতিগুলির কাছে শক্তিশালী ইংলণ্ডকে বামনের মত ক্ষুদ্র দেখায়। আপনারা বলবেন তারা একটা সরল অসভ্য জাতি ছাড়া আর কি? তারা নিশ্চয়ই সরল, কিন্তু অসভ্য নয়। হয়ত আর কয়েক বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিরা দেখবে যে তাদের মালপত্র আফ্রিকার বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয়ের সুযোগ আর থাকবে না। পাশ্চাত্য জাতিদের পক্ষেই যদি যন্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে কি তা আরও অন্ধকারময় নয়?"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১

যন্ত্রের সমর্থনে

এক সমাজতান্ত্রিক বন্ধু যন্ত্রশিল্পের খুব সমর্থক। তিনি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমস্ত যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা কিনা।

গান্ধীজী তখন সুতা কাটছিলেন। তিনি প্রতিপ্রশ্ন করে বললেন, "এই চরখাটা কি যন্ত্র নয়?"

"আমি এরূপ যন্ত্রের কথা বলছি না, বড় বড় যন্ত্রের কথাই বলছি।"

"আপনি সিংগারের সেলাইকলের কথা বলছেন কি? গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন একেও বাঁচাতে চায়। বস্তুতঃ যেসব যন্ত্র বহুলোকের হাতের কাজ কেড়ে নেয় না, যা শিল্পীকে সাহায্য করে ও তার দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়, আর যা মানুষ ইচ্ছামত চালাতে পারে অথচ তার গোলাম হয়ে পড়ে না, এমন সব যন্ত্রকেই রক্ষা করা হবে।"

"কিন্তু বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধে কি করা হবে? আপনি ত বিদ্যুৎ-শক্তিকে বোধ হয় আমল দেবেন না?"

"কে বলেছে সে কথা? যদি গ্রামের প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়, তা হলে গ্রামের লোকেদের বিদ্যুতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তখন গোচারণ-ক্ষেত্রের মত বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিও পল্লী-পঞ্চায়েত বা সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। কিন্তু যেখানে বিদ্যুৎও নাই বড় বড় যন্ত্রও নাই, সেখানে বেকার হাতগুলি করবে

কি ? হাতগুলিকে আপনারা কাজ দেবেন, না হাতের মালিকদের বলবেন যে, কাজ যখন নাই হাতগুলো কেটে ফেল।

"সকলের হিতের জন্য বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করছে তার মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সব আবিষ্কার সমান নয়। বহু লোককে একসঙ্গে হত্যা করার জন্য যে শ্বাসরোধক বাষ্প আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রতি আমার এতটুকুও মমতা নাই। জনহিতকর কার্যের জন্য যে ভারী ভারী যন্ত্রের দরকার হয়, মানুষ সে সব দৈহিক শ্রমের দ্বারা নির্মাণ করতে পারে না। এরূপ যন্ত্রের ত দরকার আছেই, কিন্তু সে সবই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে এবং সম্পূর্ণভাবে জনগণের হিতের জন্য ব্যবহৃত হবে। যে-যন্ত্র বহুর ক্ষতিসাধন করে অল্প কয়েকজনকে ধনী করে তোলে বা যা অকারণ বহুজনের হাতের কাজ কেড়ে নেয়, তেমন যন্ত্রের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই।

"দেখুন, একজন সমাজতন্ত্রী হিসাবে আপনিও নির্বিচারে যন্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করবেন না। মুদ্রাযন্ত্রের কথা ধরুন। সেগুলি ত চলবেই। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির কথা ধরুন সেগুলি ত হাতে তৈরী করা যায় না। সেই সব তৈরীর জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতির দরকার।" এই সময় তাঁর চরখাটি দেখিয়ে গান্ধীজী বললেন, "কিন্তু আলস্য দূর করবার জন্য এ ছাড়া আর কোন যন্ত্র নাই। আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময়ও আমি একে চালাচ্ছি এবং সেইভাবে দেশের সম্পদ কিছু না কিছু বাড়াচ্ছি। এই যন্ত্র কেউ কেড়ে নিতে পারে না।"

২২-৬-৩৫

শিক্ষা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ :

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবে গান্ধীজী

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান্ধীজী ও কস্তুরবাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

॥ এক ॥

বর্তমান শিক্ষার অপূর্ণতা

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি

আজ পর্যন্ত যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তার দ্বারা আমাদের কি কোন কল্যাণ হয়েছে ? যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কি এর জন্য আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে কদাচিৎ চিন্তা করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তো আরও কম চিন্তা করা হয়। অধিকাংশ লোকের কাছেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সরকারী চাকুরির জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকেরা শিক্ষা পাবার পরই নিজ পারম্পরিক বৃত্তি ও পেশা বর্জন করেন। তারপর তাঁরা চাকুরি খুঁজতে থাকেন। কারণ শিক্ষিত হবার পর তাঁদের মনে ধারণা জন্মায় যে চাকুরি করলে নিজ সম্প্রদায়ের অপর সকলের কাছে তাঁদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে রাজমিস্ত্রি কর্মকার সূত্রধর দর্জি মুচি প্রভৃতি অনেক রকম বৃত্তি অবলম্বনকারী পরিবারের ছাত্র আছে। কিন্তু শিক্ষা পাবার পর নিজ নিজ পরম্পরাগত বৃত্তির মান উন্নত করে আরও ভালভাবে সেই পেশা চালানোর পরিবর্তে তারা নিজেদের কাজকে হীনজ্ঞান করে ছেড়ে দেয় ও কেরানীর চাকুরি পাওয়াকে মর্যাদাকর মনে করে। ছাত্রদের অভিভাবকদের মনেও এই অলীক মর্যাদাজ্ঞান ক্রিয়াশীল।...

শিক্ষা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়—শিক্ষা একটি বিশেষ লক্ষ্য-সিদ্ধির সাধন। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই কেবল যথার্থ শিক্ষার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেউ আজ এমন কথা বলতে পারেন না যে আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা পূর্বোক্ত লক্ষ্যসাধনে সক্ষম। পক্ষান্তরে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তরুণ-তরুণীরা তাদের চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী হারিয়েছে। জনৈক নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখক একবার বলেছিলেন, বিদ্যালয় ও ছাত্রের বাড়ীর মধ্যে যতদিন না সমন্বয় সাধিত হচ্ছে ছাত্ররা ততদিন দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। বিদ্যালয়ে তারা যা শেখে তার সঙ্গে বাড়ির শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নেই। বিদ্যালয়ের জীবন গৃহের জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যে শিক্ষা

দেওয়া হয় তা মেকী উপদেশে পর্যবসিত হয়। এসব উপদেশ লোকসমাজে বিতরণ করার জন্য, আচরণের জন্য নয়। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এইসব জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় সে সম্বন্ধে অভিভাবকেরা অজ্ঞ এবং এ অজ্ঞতা দূর করার ইচ্ছাও তাঁদের মধ্যে নেই। পড়াশুনার জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় তাকে অপ্রয়োজনীয় মেহনত মনে করা হয়—বাৎসরিক পরীক্ষার খাতিরে যা না করলেই নয়। একবার পরীক্ষা চুকে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব শেখা বিষয় ভুলে যাওয়াই হল রেওয়াজ। কোন কোন ইংরেজ সমালোচক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে আমরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির নিছক অনুকরণকারী এবং এ অভিযোগ অসত্য নয়। সমালোচকদের মধ্যে একজন আমাদের ব্লটিং কাগজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ব্লটিং কাগজ যেমন অতিরিক্ত কালিটুকু চুষে নেয় আমরাও তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝড়তি-পড়তিটুকু অর্থাৎ কেবল খারাপ অংশই গ্রহণ করে থাকি। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচনা বহুলাংশে সত্য।

"সমালোচক", অক্টোবর, ১৯১৬

অক্ষর-জ্ঞান সম্বন্ধে

শুধু লিখতে পড়তে শেখাকেই আমি কখনও চরম মোক্ষ জ্ঞান করি নি। আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে শুধু স্বাক্ষরতা মানবের নৈতিক স্তরকে তিলমাত্র উন্নত করে না এবং চরিত্র-গঠন এক পৃথক বস্তু। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে সরকারী বিদ্যালয়গুলি আমাদের অমানুষ করে ফেলেছে এবং এর ফলে আমরা অসহায় ও অপদার্থ হয়ে পড়েছি। এর প্রভাবে আমরা অতৃপ্ত স্বভাবের হয়ে গেছি এবং এই অসন্তোষ দূরীকরণের কোন পন্থা নির্দেশ না করার জন্য আমরা নৈরাশ্যবাদের শিকার হয়েছি। এ শিক্ষার অভিসন্ধি পূর্ণ হয়েছে। আমাদের জাতি কেরানী ও দোভাষীর জাতি হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-১৯২১

অক্ষর-জ্ঞানের মূল্যায়ন

অক্ষর-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। লিখতে পড়তে শেখা প্রয়োজন। তবে এই-ই সব নয়। অক্ষর-জ্ঞান কোন অন্তিম লক্ষ্য নয়। এ হল লক্ষ্যে পৌছাবার একটি সাধন। কারও হয়ত বোধশক্তি আছে অক্ষর-জ্ঞান নেই, তাতেই বা কিসের ক্ষতি? পৃথিবীর অনেক ধর্মগুরু ও সংস্কারকের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। খ্রীষ্ট ও মহম্মদ লিখতে পড়তে জানতেন না। বুয়রদের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার সাহেব এত সামান্য লেখাপড়া জানতেন যে অনেক কষ্টে তিনি তাঁর নাম সই করতেন। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব আমীরেরও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু এঁরা সকলেই অসীম বোধশক্তির অধিকারী ছিলেন।

কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন যে আমি অসাধারণ মানুষদের উদাহরণ দিচ্ছি। একথা ঠিক। তবে এইসব উদাহরণ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে অক্ষর-জ্ঞান ছাড়া চলা মোটেই অসম্ভব নয়। এমন কি আজও পৃথিবীর বহু-সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর, তবে তাদের যে বোধশক্তি নেই তা নয়। প্রত্যুত জীবন-ধারণের জন্য আমাদের এই সব নিরক্ষর মানুষের উপরই নির্ভর করতে হয়।

নবজীবন, ১৫-১-১৯২২

মেকলের স্বপ্ন

জনৈক বন্ধু "মেকলের জীবনচরিত ও চিঠিপত্র" নামক গ্রন্থ থেকে আমার কাছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটুকু পাঠিয়েছেন:

> "১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক স্থির করেন যে 'ব্রিটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্য হবে ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসীদের ভিতর ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো'। কমিটি অফ পাবলিক ইনসট্রাকশান থেকে অবসরপ্রাপ্ত দুইজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ এবং কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় নূতন সদস্যকে এর জন্য নিয়োগ করা হল। এই মণ্ডলীর সভাপতি হলেন মেকলে। যে রকম উদ্যম ও অভিনিবেশ সহকারে মেকলে এই কাজ করেন তাতে অভ্রান্ত ভাবে বোঝা যায় যে নূতন কাজ তাঁর মনঃপূত হয়েছিল।
>
> "মেকলে বলেছিলেন, 'আমাদের ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি চমৎকার ভাবে প্রগতি করছে। যত ছাত্র এ শিক্ষা পেতে চায় তাদের সবাইকে

এ সুযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কোন কোন ক্ষেত্রে তো অসম্ভব মনে হচ্ছে। হুগলী শহরে চৌদ্দশত ছেলে ইংরাজী শিখছে। হিন্দুদের উপর এই শিক্ষার আশ্চর্য পরিণাম হচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন হিন্দুর আর নিজধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরক্তি থাকছে না। কেউ কেউ যদিও নিছক প্রথা হিসাবে এখনও হিন্দুধর্ম আচরণ করছে অধিকাংশই কিন্তু শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা যদি চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছর পর বাংলা দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ভিতর আর একজনও পৌত্তলিকতাবাদী থাকবে না। ধর্মান্তরিত করার জন্য কোনরকম পরিশ্রম না করে, কারও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যে তিলমাত্র বাধা সৃষ্টি না করে, নিছক জ্ঞান ও মননশক্তির অনুশীলন দ্বারাই এরকম করা সম্ভবপর হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আমি উল্লাস বোধ করছি'।"

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দেবেন—মেকলের এই স্বপ্ন সফল হয়েছে কিনা আমি জানি না। তবে আমরা একথাও জানি যে তাঁর আর একটি স্বপ্ন ছিল তা হল ভারতবর্ষের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কেরানী ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মচারী সরবরাহ করা। মেকলের সে স্বপ্ন আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৩-১৯২৮

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণদের সংখ্যাধিক্য

জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন :

"বোম্বাই প্রদেশে গত বৎসর ৯,০০০ ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিল। এ বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,০০০। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৬,০০০ হবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এদের অর্ধেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাহলে বোম্বাই প্রদেশে ৭,০০০ এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ২৮,০০০ ছাত্র এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে : এই ২৮,০০০ ছাত্রের জন্য চাকুরি খালি আছে কি? তা যদি না থাকে তাহলে নিজেদের

জীবিকা অর্জনের জন্য এরা কি করবে ? বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় এইসব ছাত্রদের খরচ এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে পড়াশুনা শেষ করার পর তাদের পক্ষে অল্প-স্বল্প আয়ে নিজেদের খরচ চালানো অসম্ভব মনে হয়। তাদের চশমা কলার নেকটাই থিয়েটার সিনেমা কাব্য উপন্যাস ওষুধ সুগন্ধী তেল চিরুনি বুরুশ ইত্যাদি সব কিছু চাই। সুতরাং তাদের নিজ আয়ের বেশ একটা অংশ এই সব অবান্তর জিনিস কেনার জন্য খরচ করতে হয়। মাসে বিশ-তিরিশ টাকা মাইনের চাকুরিতে এসব হবে কোথা থেকে ? এ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। নচেৎ আর দশ বছরের মধ্যে ব্যাপার এমন গুরুতর হয়ে উঠবে যে আপনার শ্রেষ্ঠতম নিদানেও আর কোন কাজ হবে না। আর স্বভাবতই এরা রাজস্ব বা রেলওয়ে বিভাগের মত যেখানে দু পয়সা উপরি আছে সেখানে চাকুরি খুঁজবে।"

প্রশ্নকর্তা অতীব সমীচীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।·· সরকারী ডিগ্রী পাবার অথবা পরীক্ষায় পাস করার মোহ আমাদের মধ্যে দাস মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে দাসত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হয়। এইজন্যই আমি সরকারী বিদ্যানিকেতন বর্জন করার কর্তব্যের উপর জোর দিয়েছি। কিন্তু এই সম্মোহনপাশ থেকে ছাত্রদের মুক্ত করবে কে ? সরকারী ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট না পেলে কি করে সে চাকুরি যোগাড় করবে এবং সর্বোপরি ঘুষ ইত্যাদি বেআইনী রোজগারের পথ খুলে যাবে ? আমাদের ছাত্রসমাজ যতদিন না শরীর-শ্রমকে অভিনন্দন জানাতে শিখছে এবং যতদিন না একথা বুঝছে যে দৈহিক শ্রম করার শক্তি চারুচর্চামূলক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান, ততদিন তারা এই মোহের শৃঙ্খলবন্ধন চূর্ণ করতে সক্ষম হবে না। চরখার উপর আমি যে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি তার অন্যতম কারণ হল এই। চরখা হল শরীর-শ্রমের আদর্শকে স্বীকার করার প্রতীক।··দেশের জনসাধারণ চরখাকে গ্রহণ করলে শরীর-শ্রম ও স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য তাদের জীবনে স্বতঃই যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে চরখার দ্বারাই সকলকে নিজ জীবিকা অর্জন করতে হবে। তবে এ কথা অবশ্যই বলব যে কোন-না-কোন রকমের উৎপাদক শ্রমের দ্বারা সকলে নিজ নিজ অন্ন উপার্জন করবে। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং পশ্চিমাগত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করার সম্বন্ধে বলব যে এর জন্য শিক্ষালয়ের পরিবেশ দায়ী। কদাচিৎ কোন ছাত্র এই ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

নবজীবন, ২৬-৮-১৯২৮

ইংরাজী শিক্ষা

লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ইংরাজীনবীশ করার চেষ্টার অর্থ তাদের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করা। মেকলে যে শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন, তা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে কোন অভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে তিনি এরূপ করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর কার্যের পরিণাম এই রকম হয়। আমরা যে হোমরুল প্রাপ্তির কথাও এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করছি—একি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নয়?

এ ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়রা যে শিক্ষা-প্রথা বাতিল করে দিয়েছে আমরা তাকেই অভিনব আখ্যা দিয়ে এদেশে প্রবর্তন করছি। ও দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। আর আমরা অজ্ঞের ন্যায় তাঁদের দ্বারা বাতিল করা প্রথা আঁকড়ে আছি। প্রতিটি অঞ্চলের আত্মোন্নতির জন্য তাঁরা সচেষ্ট। ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, তবু ওয়েল্‌স্‌বাসীদের ভিতর ওয়েলিস্ ভাষা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। ওয়েল্‌সের শিশুরা যাতে ওয়েলিস্ ভাষায় কথাবার্তা বলে তার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ মহাশয় বিরাট আন্দোলন করছেন। আর আমাদের দশা কি? পরস্পরকে আমরা ভুল ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখি এবং আমাদের দেশের এম. এ. পাস ব্যক্তিরাও এ দোষমুক্ত নন। আমাদের দেশের মনীষীরা স্বীয় মনীষার অভিব্যক্তি ইংরাজীর মাধ্যমে করেন। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যকলাপ চলে ইংরাজীতে। ইংরাজী এদেশের সেরা সংবাদপত্র-সমূহের রচনার বাহন। দীর্ঘদিন যাবৎ যদি এই ব্যবস্থা চলে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তরকাল এর জন্য আমাদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেবে।

আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা জাতিকে পরশাসনপাশে আবদ্ধ করেছি। ছলনা, চাতুরী এবং অত্যাচারের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা এদেশবাসীকে প্রতারণা করতে ও তাদের আতঙ্কের বন্যা বওয়াতে পশ্চাৎপদ হন নি। আজ যদি আমরা দেশ-বাসীর জন্য কিছু করে থাকি, তবে তাঁদের কাছে আমাদের যে ঋণ তার একাংশ পরিশোধ করছি ছাড়া আর কিছু নয়।

এটা কি একটা পরিতাপের বিষয় নয় যে ন্যায়বিচারের জন্য ন্যায়াধীশের

কাছে উপস্থিত হলে আমাকে নিজ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করার জন্য ইংরাজীর শরণ নিতে হবে? এটা কি পরিতাপের বিষয় নয় যে ব্যারিস্টার হলে আমার আর নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার উপায় থাকবে না এবং তৃতীয় একজন এসে আমার-ই মাতৃভাষাকে আমার জন্য ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেবেন? এসব কি চূড়ান্ত বাতুলতার লক্ষণ নয়? এ কি দাসত্বের নিদর্শন নয়? এর জন্য ইংরাজদের দোষ দেব, না নিজেদের অপরাধী সাব্যস্ত করব? আমরা এইসব ইংরাজীনবীশ ভারতীয়দের দলই এদেশকে পরাধীন করে রেখেছি। এ পাপের দায়ভাগী ইংরেজ নয়, আমরা।

আমি প্রথমেই আপনাকে জানিয়েছি যে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি হ্যাঁ এবং না বলব। হ্যাঁ কেন বলেছি, তা এযাবৎ ব্যাখ্যা করেছি। এবার না বলার কারণ বলব।

সভ্যতা-ব্যাধি দ্বারা আমরা এমন তীব্রভাবে আক্রান্ত যে আমাদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব। ইতোমধ্যে যাঁরা ইংরাজী শিখেছেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা এর সদুপযোগ করবেন। ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করার কালে এবং আমাদের যেসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সময় এবং স্বয়ং ইংরেজদের নিজ সভ্যতার প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা এসেছে জানার জন্য আমরা ইংরাজী শিখিতে পারি বা এর প্রয়োগ করতে পারি। ইংরাজী শিক্ষিতরা নিজ সন্তান-সন্ততিদের মাতৃভাষার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেবেন এবং তাদের অন্য কোন একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবেন। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা ইংরাজী শিক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের অন্তিম লক্ষ্য হবে এর প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তিকরণ। এর দ্বারা অর্থোপার্জনের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হতে হবে। এইরূপ সীমিত মাত্রায় ইংরাজী শিক্ষা করার পরও আমরা এর মাধ্যমে কি শিখব আর শিখব না, তা স্থির করতে হবে।

কেরানী সৃষ্টির শিক্ষা

মাদ্রাজ তথা সমগ্র ভারতের ছাত্রগণ! তোমরা কি এমন শিক্ষা গ্রহণ করছ যা তোমাদের পূর্বোক্ত মহান্ আদর্শ সাধনে সহায়তা দেবে এবং তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণরাজীর বিকাশ ঘটাবে, না তোমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু সরকারী কর্মচারী ও সওদাগরী অফিসের কেরানী সৃষ্টি করার যন্ত্রস্বরূপ? সরকারী বা বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরি সংগ্রহ করাই কি শুধু তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য? এই যদি তোমাদের শিক্ষার আদর্শ হয় এবং একে যদি তোমরা নিজ জীবনের আদর্শরূপে বরণ করে থাক, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে কবির (রবীন্দ্রনাথ: সম্পাদক) মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে কল্পনা ছিল, তা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তোমরা হয়ত শুনেছ বা আমার রচনাবলী দ্বারা অবগত হয়েছ যে আমি আধুনিক সভ্যতার প্রবল বিরোধী। ইউরোপে যা চলেছে, আমি তার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে বর্তমান সভ্যতার পদভারে ইউরোপ ত্রাহি রব ছাড়ছে, তাহলে সেই সভ্যতাকে আমাদের মাতৃভূমিতে আমদানি করার আগে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বজদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে আমাকে কেউ কেউ একথাও বলেন যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতা এ দেশে আমদানি করার ফলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কোরো না। এক মুহূর্তের জন্যও আমি একথা মনে করি না যে নিজেরা দীক্ষিত হতে না চাইলে আমাদের শাসকরা সে সভ্যতাকে আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে পারেন এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতাকে আমার সম্মুখে পেশ করলেন, তাহলেও আমি বলব যে আমাদের ভিতর এমন শক্তি আছে, যার বলে শাসকদের বাতিল না করেও আমরা সে সভ্যতাকে বাতিল করতে পারি।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ২৭-৪-১৫

ইংরেজী শিক্ষাপ্রসঙ্গে

আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, যেভাবে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীরা পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছেন। এই শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয় ছাত্রদের স্নায়বিক কর্মোদ্যমকে ভীষণভাবে ভারগ্রস্ত করেছে এবং আমাদের নকলনবীশে পরিণত করেছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দেওয়া ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অধ্যায়। প্রধানতঃ ইংরাজীতে চিন্তা করা ও ইংরাজীর মাধ্যমে নিজ ভাব প্রকাশ করা-রূপী অসুবিধার ভিতর দিয়ে যদি শুরু করতে না হত, তবে রামমোহন রায় আরও উচ্চকোটির সমাজ-সংস্কারক হতেন এবং লোকমান্য

তিলকের মনীষা আরও গভীর হত। জনসাধারণের উপর এই দুই মনীষীর প্রভাব অবশ্য ব্যাপক ছিল; কিন্তু তাঁরা যদি আর একটু কম অস্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর মানুষ হতেন, তবে এ প্রভাব আরও কত সুদূরপ্রসারী হত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এঁরা উভয়েই সুসমৃদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বহু রত্ন আহরণ করে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু এ সব তো তাঁদের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই তাঁদের কাছে সহজলভ্য হওয়া উচিত ছিল। কোন দেশ দলে দলে অনুকরণকারী সৃষ্টি করে এক মহান্ জাতিতে পরিণত হতে পারে না। ইংরাজীতে যদি বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ না থাকত, তাহলে ইংরাজ জাতির কি অবস্থা হত কল্পনা করুন। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিংহ, শিবাজী এবং প্রতাপ প্রভৃতি রামমোহন বা তিলক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমি জানি যে এজাতীয় তুলনা অপ্রীতিকর ব্যাপার। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলেই মহান্। কিন্তু এঁদের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষদের তুলনায় জনসাধারণের ভিতর রামমোহন বা তিলকের প্রভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী ও অগভীর। অবশ্য রামমোহন বা তিলককে যে বাধা-বিপত্তি জয় করতে হয়েছিল, তার কথা চিন্তা করলে বলতে হবে যে তাঁরা অসীম প্রতিভার আকর ছিলেন। কিন্তু যে পদ্ধতির ছত্রচ্ছায়ায় তাঁরা শিক্ষালাভ করেছিলেন, তা যদি ত্রুটিমুক্ত হত তাহলে এই দুই মহাপ্রাণ কর্তৃক উপলব্ধ পরিণাম ব্যাপকতর হত। আমি একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে রাজা এবং লোকমান্য চিন্তার ক্ষেত্রে যে অবদান দিয়েছিলেন, ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে তা দিতে সক্ষম হতেন না। ভারতবর্ষ যেসব কুসংস্কার দ্বারা আক্রান্ত, তার শিরোমণি হচ্ছে এই কথা বিশ্বাস করা যে স্বাধীনতার ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হবার জন্য এবং চিন্তার যথার্থতা গড়ে তোলার জন্য ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিগত অর্ধশতাব্দী কাল যাবৎ দেশে একটিমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি চলেছে এবং একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে দেশবাসীর উপর একটিমাত্র ভাবপ্রকাশের মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা ছাড়া আমরা যে কি হতাম, তা প্রমাণ করার মত মাল-মশলা আমাদের কাছে নেই। তবে এ কথা অবশ্য সর্বজনবিদিত যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় আজকের ভারত দরিদ্রতর এবং আত্মরক্ষায় অধিকতর অপটু। ভারতের সন্তান-সন্ততিদের জীবনীশক্তি আজ পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ। আমি একথা শুনতে চাই না

যে শাসনব্যবস্থার ত্রুটির কারণে এসব ঘটেছে। শিক্ষাপদ্ধতিই এর সর্বাপেক্ষা বিকৃত অংশ।

এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা এবং জন্ম সবই ভ্রমাত্মক। কারণ ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায় মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করতেন যে, এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে অপদার্থ। ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতিকে পাপের মধ্যে লালনপালন করা হয়েছে। কারণ সদা-সর্বদা এর গতিপ্রকৃতি ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের দেহ মন ও আত্মাকে খর্ব করণাভিমুখে সঞ্চালিত হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৪-২১

ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে

এর ত্রুটির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়া এর জন্য মূলতঃ দায়ী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এতগুলি বৎসরে ছাত্ররা যে সাধারণ জ্ঞান পায় তার পরিমাণ একেবারেই যৎসামান্য। তাছাড়া আমাদের ভবিষ্যতের কাজের সঙ্গে আমরা এ জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করি না। অর্থাৎ এ জ্ঞানকে আমরা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাই না। এ না করে আমাদের উদ্যমের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় ইংরাজী ভাষা ভাল করে শেখার জন্য। অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত এই যে প্রবেশিকা মান পর্যন্ত ছাত্রদের যা পড়ানো হয় তা যদি তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো হত তাহলে অন্ততঃ পাঁচ বছর সময়ের সাশ্রয় হত। এই হারে হিসাব করলে বৎসরে যে দশ হাজার ছেলেমেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের লোকসান হয়ে থাকে। এ এক গুরুতর পরিস্থিতি এবং সকলের পক্ষেই এ দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। শুধু এই নয়, এর ফলে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে দরিদ্র করে ফেলি। ··বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা বিভেদ সৃষ্টি করছে। আমাদের পিতামাতা পরিবার-পরিজন এবং নারীসমাজ ইত্যাদি যাদের সঙ্গে আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় তাদের কাছে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা গুপ্তধনের মত। এ তাদের কোনই কাজে লাগে না।···

আমাদের কলেজী শিক্ষা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কলেজে যে কয় বছর কাটাতে হয় সে সময় স্কুল-জীবনে লব্ধজ্ঞানের ভিত্তিকে আরও মজবুত করায়

কথা। কিন্তু হয় বিপরীত। কারণ এই সময় আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলতে শুরু করি। অনেকের মনে নিজ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব জাগ্রত হয়। আমাদের কাজকারবার ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সহস্র ভুলে কণ্টকিত ইংরাজীর মাধ্যমে করা আরম্ভ করি। আমাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের যথার্থ পরিভাষা আমরা এখনও রচনা করি নি এবং ইংরাজী পরিভাষাও আমরা ভাল করে বুঝতে পারি নি। কলেজের শিক্ষা শেষ হতে হতে আমাদের বুদ্ধির তেজ ও তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের স্বাস্থ্য হয়ে পড়ে দুর্বল।···

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতীব নৈরাশ্যজনক চিত্র অঙ্কন করলেও এই নিরাশার মধ্যেই আশার বীজ বিদ্যমান। আমি এ কথা বলছি না যে ভারতীয়েরা ইংরাজী শিখবেন না। রাশিয়া যা করেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জাপান ইত্যাদি যা করতে চলেছে আমাদেরও তা-ই করতে হবে। জাপানে বাছাই করা কিছু লোক ইংরাজী ভাষার উচ্চজ্ঞান অর্জন করে সে ভাষার ভাল ভাল জিনিস সহজ করে নিজের ভাষায় অনুবাদ করেন। এইভাবে তাঁরা দেশের অগণিত জনসাধারণের ইংরাজী শেখার নিরর্থক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেন।···

"সমালোচক", অক্টোবর, ১৯১৬

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে

কবি সম্ভবত জানেন না যে আজকাল ইংরাজী অধ্যয়ন করা হয় এর আর্থিক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক মূল্যের কারণ। আমাদের ছেলেরা মনে করে—অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে এরকম মনে করা যুক্তিযুক্তও বটে—যে ইংরাজী না জানলে তারা সরকারী চাকুরি পাবে না। মেয়েদের ইংরাজী শিখতে হয় বিবাহের ছাড়পত্র পাবার জন্য। একাধিক ক্ষেত্রে আমি শুনেছি যে ইংরেজদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে পারবেন বলে মহিলারা ইংরাজী শিখতে চান। এমন অনেক স্বামীর কথা শুনেছি যাঁদের স্ত্রী তাঁদের ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে পারেন না বলে তাঁরা দুঃখিত। এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে ইংরাজীকে মাতৃভাষায় পরিণত করা হচ্ছে। বহু যুবক মনে করেন যে ইংরাজীর জ্ঞান না পেলে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া একরকম অসম্ভব। এই দুষ্টক্ষত এমন গভীরভাবে সমাজদেহে অনুপ্রবেশ করেছে যে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার অর্থ কেবল ইংরাজী ভাষার জ্ঞান। আমার কাছে এসব আমাদের

দাসত্ব ও অধোগতির নিদর্শন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে যেভাবে পদদলিত করা হয়েছে এবং যেভাবে এগুলিকে উপবাসী রাখা হয়েছে—এ আমার কাছে অসহনীয়। পিতামাতা সন্তানকে এবং স্বামী স্ত্রীকে, নিজ নিজ মাতৃভাষায় নয়, ইংরাজীতে পত্র লিখছে—এ অবস্থা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। আমার বিশ্বাস কবিবরের মত আমিও স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত রাখার নীতিতে আস্থাশীল।

নিজের ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে আমি জানলাগুলি বন্ধ করে দিতে চাই না। সমস্ত দেশের সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব বিনাবাধায় আমার গৃহের চারিদিকে সঞ্চালিত হোক—এ আমি চাই। তবে কেউ যে নিজের পায়ের নীচের মাটি থেকে আমাকে উৎখাত করবে, তাতে আমি রাজী নই। বৃথা গর্ব করার জন্য বা অনিশ্চিত সামাজিক সুবিধা পাবার জন্য আমার ভগ্নীদের ইংরাজী শেখার জন্য অহেতুক চাপ দিতে আমি গররাজী। সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন আমাদের যুবক-যুবতীরা যত খুশী ইংরাজী বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষা শিখতে পারেন এবং তারপর একজন বসু, রায় বা ঠাকুরের মত তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন। তবে একজন ভারতবাসীকেও আমি তার মাতৃভাষাকে ভুলতে, অবহেলা করতে বা তার জন্য লজ্জা অনুভব করতে দেব না, আর কেউ যে তার মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তাসমূহ প্রকাশ করতে অসমর্থ—একথাও আমি তাদের অনুভব করতে দেব না। কারাগারের ধর্ম আমার লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিরও স্থান এখানে আছে। তবে এ হচ্ছে রূঢ়তা এবং জাতিগত ও বর্ণগত গর্বের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বর্ম-স্বরূপ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১-২১

ইংরাজী থেকে অনুবাদ করাই যথেষ্ট

ইংরাজী শিক্ষার জন্য বর্তমানাপেক্ষা অল্প সময় ব্যয়ের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করার সময় ইংরাজী অধ্যয়ন দ্বারা তাঁরা যে আনন্দ পেতে পারেন, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার অভিসন্ধি আমার মনে থাকে না। আমার অভিমত এই যে এতদপেক্ষা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে স্বল্পতর ব্যয়ে ও পরিশ্রমে তাঁরা সমপরিমাণ আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। পৃথিবী বহু অমূল্য সাহিত্যরত্নের আকর; কিন্তু এর সবগুলিই ইংরাজী নয়। অন্যান্য ভাষাও

সঙ্গতভাবে এবম্বিধ রত্নের গর্ব করতে পারে। দেশের সর্বসাধারণের জন্য সবগুলি সহজলভ্য করতে হবে এবং আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় এসবের অনুবাদ করলে এ আশা সফল হবে।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ২০-২-১৯১৮

॥ দুই ॥

শিক্ষার আদর্শ

শিক্ষার লক্ষ্য

আমাদের দেশে আজ স্বরাজের দাবি উঠেছে। কেবল দাবি করলেই যদি স্বরাজ পাওয়া যেত তবে অনেক আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে যেতাম। সুতরাং স্বরাজের দাবি করা প্রয়োজন হলেও কেবল তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। পৃথিবীতে যেখানেই লোকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের সেই সাফল্যের একটা পূর্ব-প্রস্তুতির কাল ছিল। তারা প্রথমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, চলতে ও আচরণ করতে শিখেছে। আমরা দেখতে পাব যে সেই সব দেশে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কাজ স্বয়ং জনসাধারণ করেছে। আমাদের দেশে কিন্তু আমরা বিপরীত দিশায় চলছি বলে আমার আশঙ্কা হয়। আমাদের দেশবাসী স্বরাজের জন্য দাবি করলেও আমাদের স্বাধীন চিন্তার বিশেষ কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখা যায় না। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ষোল আনা বিদেশী। বর্তমান প্রবন্ধে আমি আমাদের উপর এই বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ও তজ্জনিত সমস্যাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা করতে চাই। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিরর্থক প্রতিপাদিত হবে। আজ অথবা পরে যখনই আমরা স্বরাজ পাই না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যে, জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে সে স্বরাজকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর ছাড়া আর বাদবাকী শিক্ষা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় প্রথম পাঁচ বছর শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় মুখ্যতঃ অতি সাধারণ স্তরের

শিক্ষকদের উপর। এর পর ইংরেজী আরম্ভ হয়। এই পর্যায়ে শিশুদের যেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে যেতে হয়। এই শিক্ষার সঙ্গে বাড়ীর জীবনের কোন সম্বন্ধই থাকে না। এযাবৎ যে সব শিশুরা খুশী মনে মেঝেতে বসে লেখা-পড়া করেছে তাদের এর পর বেঞ্চে বসতে হয়। অথচ আজও অধিকাংশ ঘরে মেঝেতে বসারই রেওয়াজ। হিন্দু ছেলে হলে এযাবৎ সে ধুতি কুর্তা ও আংরাখা পরত আর মুসলমান হলে পরত ধুতির বদলে পাজামা। এবারে সে কোট পাতলুন পরা ধরে। এযাবৎ তার বাড়ীর তৈরী কলমে চলত কিন্তু এখন থেকে স্টীলের নিবওয়ালা কলম চাই। এই ভাবে তার বাহ্য জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তার বাড়ীর জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের জীবনের দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে এই পরিবর্তন তার আভ্যন্তরীণ জীবনেও অনুপ্রবেশ করা শুরু করে। ছেলেদের বাড়ী ও আত্মীয়স্বজনের উপর ছেলেদের বাহ্য ও অন্তর্জীবনের এই পরিবর্তনের কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে? ছেলে কি ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার মা-বাবার মনে কোন ধারণা নেই এবং সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর তাদের বিশ্বাস অকিঞ্চিৎকর।

মা-বাবা শুধু এইটুকু জানেন যে এই শিক্ষা তাঁর ছেলেকে অর্থোপার্জনে সাহায্য করবে। আর এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। এই অবস্থা বেশী দিন চললে আমরা সবাই বিদেশী হয়ে যাব। আর এর চেয়েও খারাপ কথা হল এই যে, যে স্বরাজের জন্ম আমরা সংগ্রাম করছি শেষ অবধি তা পাবার পর দেখব যে তা বিদেশী বস্তু। এর পরিণামে বর্তমানে আমরা যে বোঝার চাপে নিষ্পেষিত তা হয়ত স্বরাজের পর রয়েই যাবে। এই বিপদের হাত এড়াবার একটিমাত্র পন্থা বিদ্যমান। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। জাতীয় শিক্ষার চারিত্র্যধর্ম হবে নিম্নরূপ:

১. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

২. শিশুর বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে।

৩. দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন-পূর্তির ব্যবস্থা এতে থাকবে।

৪. প্রথম বর্ষ থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে যোগ্য ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫. শিক্ষা হবে অবৈতনিক।

৬. শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের হাতে থাকবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টির জন্য যে প্রমাণ চাই এ অতি পরিতাপের বিষয়। ইংরাজীর মোহে আমাদের চোখ যদি ধাঁধিয়ে না যেত তাহলে এই সুস্পষ্ট সত্যকে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন ঘটত না।…

শিশুর বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। এর কারণও অতীব স্পষ্ট। বর্তমানে এতদুভয়ের মধ্যে এ জাতীয় কোন সামঞ্জস্য নেই। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের দেখতে হবে যে এ জাতীয় সামঞ্জস্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে।

এর পর আমরা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার তৃতীয় চারিত্র্যধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করব। এটি হল : **দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন-পূর্তির ব্যবস্থা এতে থাকবে।** আমাদের অধিকাংশ স্বদেশবাসী কৃষিজীবী। সুতরাং গোড়া থেকেই যদি আমাদের ছেলেদের কৃষি এবং তাঁত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত এবং শুরু থেকেই তারা যদি এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সচেতন হত ও তার কারণ এরা নিজ নিজ পেশা সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হত, আজ তাহলে আমাদের দেশের কৃষক সমাজ সুখী ও সমৃদ্ধ হত। তাহলে আমাদের গৃহপালিত পশুগুলি বর্তমানের মত দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হত না। বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণ কৃষকদের যেভাবে ঋণভারে জর্জরিত হতে হচ্ছে তাও তাহলে ঘটত না। আমাদের দেশের উৎপন্ন কাঁচা মাল তাহলে বিদেশে গিয়ে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য পাকা মাল হয়ে এদেশে ফিরে আসত না। আজকের অবস্থায় আমরা লজ্জা বোধ করি। সুতী কাপড় কেনার জন্য ইংলণ্ডকে বছরে ৮৫ কোটি টাকা দেবার প্রয়োজন নেই। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের প্রভু করার পরিবর্তে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করেছে।

প্রথম বর্গ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগ্য ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে শিশুই মানুষের পিতা। আমাদের দেশেও অনুরূপ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতে শিশু যেমন হবে দোলনায় শোওয়া অবস্থাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যে বয়সে শিশুর মনে সব বিষয়ের ছাপ সব চেয়ে গভীর ভাবে পড়ে থাকে সেই বয়সটায় তাকে অযোগ্য শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিলে সে যে বড় হলে সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের হবে— এমন আশা পোষণ করার আর অধিকার থাকে না। এ হল নিমের বীজ পুঁতে আম খাবার সাধের মত। যতই ব্যয় হোক না কেন শিশুদের জন্য সেরা

শিক্ষক সংগ্রহ করা উচিত। পুরাকালে জ্ঞানী ও পণ্ডিত মুনি-ঋষিদের কাছে শিশুরা শিক্ষা পেত।

জাতীয় শিক্ষার পঞ্চম চারিত্র্যধর্ম হল এই যে **শিক্ষা হবে অবৈতনিক**। শিক্ষাকে যেন **অর্থনির্ভর** হতে না হয়। সূর্য যেমন সকলকে সমান ভাবে কিরণ দেয় এবং বৃষ্টিধারা যেমন সবার জন্যই ঝরে পড়ে, শিক্ষাও তেমনি সকলের কাছে সহজলভ্য হবে।

সর্ব শেষ প্রশ্ন হল: **শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের কর্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে থাকবে**। আর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার ভিতরই শিক্ষা নিহিত। এ হলে শিশুদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের তার উপর আস্থা থাকবে ও তারা এর প্রতি নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে। যখন আমরা এই পর্যায়ে উন্নীত হব এবং দেশের জনসাধারণের জীবনে শিক্ষা যখন গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে তখন বিনা আয়াসে স্বরাজ অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সেইজন্য আমাদের কর্তব্য হল এই জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত করা। সরকারের কাছে এ জাতীয় শিক্ষার দাবি করার অধিকারও আমাদের আছে। তবে আমরা নিজেরা কিছুটা কাজ শুরু করার পরই সরকারের কাছে দাবি করা শোভন হবে।

মারাঠী মাসিক 'আত্মোদ্ধার' থেকে

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু

শিক্ষাক্ষেত্রে যখন চরিত্রগঠনের চেয়ে অক্ষরজ্ঞানের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তখন "সানডে স্কুল ক্রনিক্ল"-এ প্রকাশিত অধ্যক্ষ জ্যাক্স্-এর নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি পাঠে সকলে উপকৃত হবেন:

> "আমাদের জীবন চিরন্তন গতির মত এবং এই জীবনে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনই এর প্রয়োগজনিত চূড়ান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা যেখানে পৌঁছাই আমাদের দায়িত্বের সীমারেখা তার চেয়েও খানিকটা এগিয়ে থাকে। পশ্চাদ্ধাবনকারী তার গতিবেগ যতটা বাড়ায় পলাতক বাড়ায় তার চেয়ে বেশী। বিজ্ঞান যে দায়িত্বের সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারে না, এর মূলে রয়েছে এর সীমাবদ্ধতা। ফলিত বিজ্ঞান আপনাকে বন্দুক তৈরীর কৌশল শেখাবে কিন্তু কখন কার উপর গুলি চালাতে হবে—একথা ফলিত

বিজ্ঞান বলতে পারে না। বলবেন এ হল নীতিবিজ্ঞানের এলাকা। আমার উত্তর হল এই যে বন্দুকের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ সম্বন্ধে বলার সময় নীতিবিজ্ঞান বন্দুকের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিও ইঙ্গিত করবে এবং যেহেতু সময় সময় বন্দুকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের চেয়ে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা আমার স্বার্থ অধিকতর পরিমাণে সাধিত হবার সম্ভাবনা সেইজন্য আমার প্রতিবেশীদের গুলি খাবার এবং লুণ্ঠিত হবার নূতন আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হবে। নীতিবিজ্ঞান দ্বারা সজ্জিত খারাপ লোকের অপর নাম হল শয়তান। মেফিস্টোফেল্‌সের* যদি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-বিজ্ঞানে পরীক্ষা নেওয়া হত তাহলে সে নিশ্চয় সব পুরস্কারগুলি পেত। এ ব্যাপারে নীতিবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একই পথের পথিক। বিজ্ঞান যে পলাতককে কখনই ধরতে পারে না তার নাম কি দেব? আমি একে জীবন বলি। কেউ কেউ একে বলেন চৈতন্য বা আত্মা কিংবা চিৎশক্তি অথবা হয়ত ইচ্ছাশক্তি। তবে আমার মনে হয় যে যতক্ষণ আমরা এর অস্তিত্ব স্বীকার করি ও বুঝি যে মানবসমাজের যাবতীয় সম্পদ এর করায়ত্ত ততক্ষণ নামে কিছু আসে যায় না। শিক্ষা যেন এই দিকে দৃষ্টি দেয়। মানবীয় দায়িত্বের এই সীমারেখায় শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় প্রচেষ্টা উদ্ভাসিত হয়। আর সব ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে মানুষের দায়িত্ব গ্রহণের এই ক্ষেত্রে যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের দুঃখভোগ করতে হবে।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৬

---

* গ্যেটের ফাউস্ত-এ বর্ণিত শয়তান। (সম্পাদক)

॥ তিন ॥

নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পূর্বাভাস

জাতীয় বিদ্যালয়ের চারিত্র্যধর্ম

প্রশ্ন : রুজি-রোজগারের ব্যাপারে আজকে দেশবাসীর যে অসুবিধা তার থেকে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি মুক্ত হবে ?

উত্তর : হওয়া উচিত। প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও যা দিতে পারে না, তা শিক্ষানামের অযোগ্য। সত্যকার শিক্ষা ছাত্রদের আর্থিক সমাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার স্বাদ দেবে। এই ত্রিবিধ স্বাধীনতার প্রথমটির যে পায় নি, দ্বিতীয়টিও সে পেতে পারে না।

প্রশ্ন : সকল রকমের স্বার্থ-ভাবনা বর্জন করা কি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্তব্য নয় ?

উত্তর : অবশ্যই। আমার বিশ্বাস স্বার্থ ছাড়তে না পারলে দেশের সেবক হওয়া যায় না।

প্রশ্ন : স্নাতকরা কি দেশের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করবেন না ?

উত্তর : এ নীতি সর্বদা কার্যকরী হবে না। জাতি যখন শেষ অবধি সঠিক পন্থায় গড়ে উঠবে তখন যাঁরাই সৎ ও নির্ভীকভাবে জীবনযাপন করবেন, তাঁরা সবাই দেশের সেবা করছেন ধরে নিতে হবে।

প্রশ্ন : আমরা বিশ্বাস করি সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পুঁথিগত বিদ্যা শেখানো হলেও চরিত্র গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এর অর্থ কি এই হয় না যে জাতীয় বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠনকে প্রথম স্থান দেওয়া হবে ?

উত্তর : হ্যাঁ, এর অর্থ তাই। তবে চরিত্র গঠনের জন্য জ্ঞানদান করা হবে। জ্ঞান হল মাধ্যম এবং লক্ষ্য হল চরিত্র গঠন।

প্রশ্ন : তাহলে আপনি কি মনে করেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচ্চরিত্র হওয়া অত্যাবশ্যক ?

উত্তর : নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : তবে কি ধরে নিতে হবে যে মদ্যপ ও ধূমপানকারী শিক্ষকের জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থান নেই ?

উত্তর : নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যেখানে এটা মোটামুটি সর্বজনমান্য যে মদ্যপানকারী শিক্ষকের হাতে

ছাত্রদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধূমপান করার অভ্যাস সম্বন্ধে একই কথা বলার সাহস আমার নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে ধূমপানকারীও অন্যান্য বিষয়ে আদর্শচরিত্র হতে পারেন। চরিত্রবিচারের সময় আমরা যেন হৃদয়হীন বিচারকে পরিণত না হই।

প্রশ্ন: প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে ছাত্রদের শরীর উচ্ছন্নে যায় এবং বি. এ. পাস করতে করতে তাদের দেহ-মন দুই-ই ধ্বংস হয়ে যায়—এটা কি একটা শোচনীয় ব্যাপার নয়?

উত্তর: আমার ক্ষমতা থাকলে ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের ছাত্রদের আমি কোন-রকম শিক্ষা পেতে দিতাম না।

প্রশ্ন: জাতীয় শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সমস্ত শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশ কি বাঞ্ছনীয় নয়?

উত্তর: এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার কাছে একথা অতীব যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে দেহ সুস্থ হলে মনও সুস্থ হবে এবং মন সুস্থ হবার অর্থ আত্মাও সুস্থ হওয়া।

প্রশ্ন: জাতীয় বিদ্যালয়ে চূড়ান্ত শাস্তির স্থান আছে কি?

উত্তর: না, চূড়ান্ত শাস্তির স্থান নেই।

প্রশ্ন: ছাত্রদের যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ভাল না লাগে তাহলে এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন?

উত্তর: সাধারণ দোষ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকেরই দোষ বেশী।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন না যে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যতগুলি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশী?

উত্তর: একই গোষ্ঠীর একাধিক ভাষা শিখতে চাপ পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ যে-কেউ সহজেই হিন্দুস্থানী গুজরাতী মারাঠী ও বাঙলা শিখতে পারেন। কিন্তু ইংরেজী গ্রীক লাতিন ও আরবী একসঙ্গে শেখা কঠিন। কারণ এগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা, এদের ভিতর সাধারণ তত্ত্ব বলতে কিছু নেই।

প্রশ্ন: শিক্ষকের মর্যাদা কি মন্ত্রীর চেয়ে উর্ধ্বে নয়? তাহলে বড়লাটের এক হাজার টাকা মাইনে হলে শিক্ষকের বেতন কি দুই হাজার টাকা হওয়া উচিত নয়?

উত্তর: বড়লাটের কাজের হিসাব ও পরিমাপ করা সম্ভব কিন্তু শিক্ষকদের

কাজ অমূল্য। এইজন্য শিক্ষককে দারিদ্র্য বরণ করে নিতে হবে। আমি বরং বলব যে শিক্ষক-সমাজ যেন স্রেফ পেটে-ভাতে কাজ করেন। বড়লাট তাঁর কাজের প্রতিদান চাইতে পারেন। কিন্তু প্রতিদান চাইলে শিক্ষকের কাজ নিরর্থক হয়ে যাবে।

নবজীবন, ২০-১০-১৯২১

ভবিষ্যৎ জীবন ও শিক্ষা

আমার মতে শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানকে অর্থ উপার্জন করার জন্য নিয়োগ করা উচিত নয়। জীবিকার সাধন হবে কাপড় বোনা, ছুতার মিস্ত্রি ও দর্জির কাজ ইত্যাদি কোন না কোন রকমের উৎপাদনমূলক শারীরিক শ্রম। আমার মতে জাতি হিসাবে আমাদের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল চিকিৎসক আইনজীবী এবং শিক্ষক ইত্যাদি কর্তৃক অর্থোপার্জনের জন্য নিজ নিজ পেশার অনুশীলন। তবে এ হল একটা আদর্শ স্থিতির কথা এবং বাস্তব জীবনে এর সম্পূর্ণ রূপায়ণ কোন দিনই সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু তাহলেও আমরা যতটা এই আদর্শের কাছাকাছি যেতে পারব আমাদের ততটা কল্যাণ হবে। এই বিদ্যাপীঠ সম্পূর্ণভাবে এই আদর্শকে গ্রহণ না করলেও দেশের সেবাকে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে বরণ করেছে। সুতরাং জ্ঞানকে যেখানে দেশসেবার জন্য উৎসর্গ করার কথা সেখানে "ভবিষ্যৎ জীবন"-এর কথা ওঠে না এবং অর্থোপার্জনও সেখানে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবজীবন, ১-৬-১৯২৪

সূতা কাটা ও বিজ্ঞান

আমি একথা বলতে চাই না যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল সূতা কাটা ও বুনাইএর কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তবে সূতা কাটা ও বুনাইকে আমি জাতীয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করি। এর জন্য ছাত্রদের সমগ্র শিক্ষাকাল আমি নিতে চাই না। দক্ষ ভিষকের ন্যায় আমি শুধু রোগগ্রস্ত অঙ্গের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। কারণ আমি জানি যে এই হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গগুলির প্রতি মনোযোগ দেবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। শিশুর হস্ত মস্তিষ্ক এবং আত্মার বিকাশ আমার লক্ষ্য, বর্তমানে শিশুদের হস্তগুলি পুষ্টির অভাবে

পঙ্গুপ্রায় হয়ে গেছে। আত্মাকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হয়েছে। অতএব দিবারাত্র আমি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধন করার জন্ত চীৎকার করেছি। আমাদের শিশুরা প্রত্যহ আধ ঘণ্টা সুতা কাটলে তাদের উপর কি খুব একটা চাপ পড়ছে বলতে হবে? এর ফলে কি মানসিক পক্ষাঘাত হবে?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে শিক্ষাদান কার্যকে আমি উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি। তবে আমাদের ছেলেদের যতই রসায়ন পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শেখানো হোক না কেন, তাকে কখনও বাড়াবাড়ি বলা যেতে পারে না। তবে যে-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত বলে বলা হয়, সেখানে এ সকল বিষয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিতে না পারার কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা এর উপযুক্ত অধ্যাপক সংগ্রহ করতে পারি নি এবং বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্ত ব্যয়বহুল গবেষণাগার প্রয়োজন। উপরি-উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের এই প্রারম্ভিক ও অনিশ্চিত অবস্থায় এর সংস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-১৯২৫

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষাব প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি বড বেশী বহ্বাডম্বর ভাব এবং আত্মপ্রতারণা-প্রবণতা ও অহেতুক আনুগত্যের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। শিক্ষাক্ষেত্র হচ্ছে দেশবাসীর ভবিষ্যতের আধার-শিলা। সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য মার্গ অনুসরণার্থ এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্ত আত্যন্তিক সততা ও নির্ভয় বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন। তবে এ জাতীয় প্রচেষ্টা সদা-সর্বদা সুবিবেচিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবে এবং নবীন গবেষকদের জীবন ধূপশিখার মত সেবাধর্মী হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিক্ষানবীশের অবশ্য এজাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার থাকবে না। সুবিবেচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ত এক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে, তবে স্বর্ণ-শিকারীদের মত এর অবিবেচনা-প্রসূত ও পরিকল্পনাবিহীন ভুরুপযোগ হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-২৬

জাতীয় বনাম সরকারী শিক্ষা

আমাদের একটি ছাত্র বরদৌলীর ব্যাপারে কারাবরণ করেছে এবং আরও অনেকে তার অনুগামী হবে। এরা বিদ্যাপীঠের গৌরব। আমাদের ছাত্রদের মনে এই জাতীয় ইচ্ছা উদিত হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কি কল্পনাতেও এর ঠাঁই দিতে পারে? তোমাদের মত বরদৌলীতে গিয়ে বল্লভভাইকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। তারা শুধু গোপনে সহানুভূতি পোষণ করতে পারে। জাতীয় জীবনের সংকট-মুহূর্তে যদি আমাদের আবদ্ধ ও বন্দী করে রাখে, তাহলে চারুচর্চামূলক শিক্ষার মূল্য কি? জ্ঞান বা চারুচর্চামূলক শিক্ষা দ্বারা পুরুষত্বহীন করার ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

ওদের এবং আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আমরা ওদের মত করে ইংরেজী শেখাই না। কাজ চলা গোছের ইংরেজী জ্ঞান আমরা দিতে পারি। কিন্তু জাতিগতভাবে আত্মহত্যা না করলে নিজের মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশকরতঃ ইংরেজীকে আমরা আমাদের চিন্তার বাহন করতে পারি না। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এই ক্ষতিকর প্রথার সংশোধন করতে চাই। শিক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের গুজরাতীর মাধ্যমে শিখতে হবে। একে সমৃদ্ধ করে আমরা সর্বপ্রকারের চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলব। কুত্রাপি আমরা এ দেশের মত ব্যাপার দেখি না। এই কয় বৎসর ইংরেজীর মাধ্যমে সব কিছু শিক্ষা করার জন্য আমাদের উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। আমরা কর্তব্যচ্যুত হয়েছি।

এর পর অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রণালীর কথা ধর। সরকারী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পদ্ধতি আতঙ্কজনক। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থশাস্ত্র রয়েছে। জার্মান পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবাধ বাণিজ্যাধিকার ইংলণ্ডের বাঁচার উপায় হতে পারে আমাদের কাছে এ কিন্তু মৃত্যুতুল্য। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র রচনা করার কাজ এখনও বাকী আছে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। কোন ফরাসী দেশীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখলে নিজের মত করে তা লিখবেন। ইংরেজরা আবার পৃথক ভাবে তা লিখবেন। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লেখক অনুসারে ভিন্ন হবে। কোন ভারতীয় দেশপ্রেমিক কর্তৃক মূল সূত্রাবলম্বনে লিখিত ইতিহাস কোন আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ইংরেজলিখিত ইতিহাস হতে পৃথক হবে, যদিও দুজনেই হয়ত ইতিহাস রচনা ব্যাপারে সততা অবলম্বন

করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ব্যাপারে ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে আমরা প্রচণ্ড ভুল করেছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তোমাদের ও তোমাদের শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণা করার বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে।

এমন কি আমাদের গণিতের মত বিষয়ের শিক্ষা-প্রণালীও পৃথক হবে। আমাদের গণিত-শিক্ষকেরা ভারতীয় পরিবেশ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করবেন। এইভাবে তিনি গণিত শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভূগোলও শিখিয়ে ফেলবেন।

তাছাড়া আমরা শরীরচর্চা এবং শিল্প শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছি। একথা মনেও ঠাঁই দিও না যে এতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হয়ে যাবে। আমাদের মস্তিষ্ককে কতকগুলি ঘটনাকে আটকে রাখার গুদাম বানাবার জন্য বোধশক্তির উন্মেষ হয় না। সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য অধ্যয়ন করার চেয়ে বুদ্ধি-সহকারে শিল্প শিক্ষা করলে মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে তা অধিকতর সহায়ক হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৬-১৯২৮

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাণী

সংখ্যা-গৌরবে উল্লসিত হয় ভীরু। শৌর্যবানের গৌরব একক সংগ্রামে এবং আপনারা সকলে সেই শৌর্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এসেছেন। আপনারা এক বা একাধিক যাই হন না কেন, মনের এই সাহসিকতাই হচ্ছে আসল বীরত্ব এবং আর সব কিছু মিথ্যা। আর ত্যাগ দৃঢ়তা বিশ্বাস ও বিনয় ছাড়া মনের এই সাহসিকতা অর্জন করা যায় না।

আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে আমরা এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছি। অহিংস অসহযোগ এর একটি অঙ্গ। অহিংস ও অসহযোগের এই 'অ'-এর অর্থ হচ্ছে, হিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছু অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যতদিন না আমরা 'অস্পৃশ্য' ভাইদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, যতদিন না বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ভিতর হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতদিন না দেশের জনগণের সুমহান মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চরখা ও খদ্দরকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, ততদিন এই নঙর্থক পূর্ব সংযোজনাটি সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। সে অসহযোগ অহিংসা-ভিত্তিক না হয়ে

ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। গঠনমূলক নির্দেশ ছাড়া শুধু নেতিবাচক বিধান হচ্ছে প্রাণহীন দেহের মত এবং অগ্নিতে অর্পণ করলেই এর সদুপযোগ হবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সাত হাজার রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। এই সাত হাজার জনপদকেও আমরা চিনি বলে দাবি করতে পারি না। রেল স্টেশন থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলি সম্বন্ধে আমরা শুধু ইতিহাসের বই থেকে সংবাদ পেয়ে থাকি। এই সব গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-সাধনকারী একমাত্র প্রেমবন্ধন হচ্ছে চরখা। এই মৌলিক সত্য যাঁরা এখনও বোঝেন নি, তাঁদের এখানে থাকা নিরর্থক হয়েছে। যে শিক্ষা ভারতের এই কোটি কোটি বুভুক্ষু জনতার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে না ও এদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় না, তাকে 'জাতীয়' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে না। কর সংগ্রহের পর সরকারের সঙ্গে গ্রামের আর সম্পর্ক থাকে না। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চরখার দ্বারা তাদের সেবার সূচনায়। তবে সেখানেই কিন্তু তার পরিসমাপ্তি নয়। চরখা হচ্ছে এই সেবাকার্যের কেন্দ্রবিন্দু। আপনাদের আগামী অবকাশ যদি কোন সুদূর গ্রামে কাটান তবে আমার কথার যথার্থতা বুঝতে পারবেন। দেখবেন যে সেখানকার অধিবাসীরা নিরানন্দ ও ভয়ভীত। বহু ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেখবেন। বৃথাই আপনারা কোনরকম স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত বা ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা খুঁজে বেড়াবেন। পশুগুলির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখবেন; কিন্তু তবুও সেখানে দৃঢ়মূল আলস্য চোখে পড়বে। লোকে আপনাদের জানাবে যে বহুদিন আগে ঘরে ঘরে চরখা ছিল; তবে আজ তারা চরখা বা অন্য কোন কুটিরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। তাদের ভিতর আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। ইচ্ছা করলেই মরা যায় না বলে তারা বেঁচে আছে। আপনারা যদি সূতা কাটেন, তাহলেই তারা সূতা কাটা ধরবে। ৩০০ জন অধ্যুষিত কোন গ্রামের ১০০ জনও যদি সূতা কাটে তাহলে তারা যে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা রোজগার করতে পারে, এটা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই অতিরিক্ত উপার্জনের ভিত্তিতে পল্লী-সংস্কারের স্থায়ী বুনিয়াদ স্থাপিত হতে পারে। আমি জানি যে এ কথা বলা সহজ; কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। বিশ্বাস থাকলে এ কাজ সহজে হতে পারে। মোহ আমাদের কানে কানে বলবে, 'আমি একা হাতে সাত লক্ষ গ্রামে কি করতে পারি?' এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করুন যে একটিমাত্র গ্রামে কাজ আরম্ভ করে তা সফল হলে

বাদবাকী সব আপনি হবে। তাহলে কাজের প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। এই বিদ্যালয় আপনাদের ঐ জাতীয় কর্মীরূপে গড়তে চায়। এ কাজে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এ বিদ্যালয় আনন্দবিহীন এবং একে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-১৯২৬

॥ চার ॥

নবীন শিক্ষার ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষা

বর্তমান শিক্ষার আধার-শিলারূপী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণাদর্শ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ এডিনবরা ও লণ্ডন থেকে আমদানি করা। নিঃসন্দেহে এসব বিদেশজ এবং এসবকে বাতিল না করলে কোনক্রমেই জাতীয় শিক্ষার শিলান্যাস হতে পারে না। ভারতবর্ষ ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়া বাঁচতে পারে কি না, সে সমস্যা সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করছি না। (তবে এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে আমাদের মতে ইংরেজী পদ্ধতি পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ।) ইউরোপ আজ নিজ সৃষ্ট মারণাস্ত্রে যেভাবে আত্মঘাতী যুদ্ধে জড়িত ও যান্ত্রিকতা পুঁজিবাদ জঙ্গীবাদ ইত্যাদি যেভাবে সে দেশে তাদের করাল বদন ব্যাদান করছে, ভারত যদি নিজ সন্তানসন্ততিদের এই জাতীয় কাজের নায়ক মেকী ইউরোপীয়তে রূপান্তরিত করতে চায়, অর্থাৎ সৈনিক, মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক, বিজ্ঞানের ব্যভিচারী এবং ঈশ্বরদ্রোহী সৃষ্টি করা যদি তার লক্ষ্য হয়, তবে যে-কোন বিপর্যয় আসুক না কেন তাকে সজ্ঞানে অকম্পিত চরণে বর্তমান পথ ধরে এগিয়ে চলতে হবে। সে অবস্থায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াই এগিয়ে যাবার জন্য তাকে মনস্থির করতে হবে। কারণ জাতীয় শিক্ষায় পূর্বোক্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না, জাতীয় শিক্ষা তার সন্তানসন্ততিদের ঐ প্রকার কার্যসাধনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে না। একটি বিষয় আপনাদের স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ভারতে বহু প্রাচীন ও সুবিন্যস্ত অখণ্ড ধারা প্রবাহিত থাকায় একদা এদেশে এক নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এবং তাই শুধু একেই 'জাতীয়' আখ্যায়

অভিহিত করা চলতে পারে। পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় এবং তথাকথিত জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে এর এক মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান। তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, শেষবারের মত স্পষ্টভাবে জাতীয় ও বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর যে-কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এবার শিক্ষার আসল ও নকল, শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং সাধ্য ও সাধনের মাঝে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে। এযাবৎ এ কাজ শুরু হয় নি বললেই চলে। আমরা একরকম নিশ্চিত যে এই ভাবে বাছবিচার করার প্রয়োজনীয়তাই হয়ত তেমন কেউ উপলব্ধি করেন নি। এ বিষয়ে যতদিন এই গণ্ডগোল চলবে 'জাতীয়' শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হবে না। এর কারণও অতীব স্পষ্ট। সরকার একপ্রকার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং এই ক্ষেত্রে কোন বেসকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাই উঠতে পারে না। সরকারী সংগঠন তুলনায় বিশালায়তন, এর কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক বেশী অর্থ ও তাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে সমর্থ। আমাদের বিশ্বাস মৌলিক স্থিতি সম্বন্ধে পূর্বাপর সুস্পষ্টভাবে চিন্তা না করা পর্যন্ত এই বনিয়াদী স্ব-বিরোধ অপনোদিত হবে না। সতর্কভাবে বিচার-বিবেচনার পর আমরা যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে জনগণকে অতঃপর জানিয়ে দেওয়া হবে যে ভবিষ্যতে আমরা সরকারী স্কুল-কলেজের অক্ষম অনুকরণমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা না চালিয়ে একেবারে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির রূপায়ণ করব, তাহলে জনসাধারণ অবশ্যই আমাদের কথা শুনবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে পীড়িত, যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী এবং যৌবনশক্তির অপচয় দৃষ্টে যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা পরিত্রাণের একটি পথ পেয়ে ধন্য ধন্য করবেন। জাতীয় ও সামাজিক ঐতিহ্য পুনঃপ্রবর্তনের অপরিহার্য বিপ্লবের অগ্রদূতদের হাতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে।

এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা ভীষণ দৃশ্যগোচর অভিশাপ হচ্ছে (এটা আবার আরও একটি গভীর ত্রুটির দ্যোতক) এই যে, এ শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সুশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যুগকে পূর্বসূরীদের সম্পদ-ভার বহনে উপযুক্ত করা এবং সমগ্র সমাজ-জীবনকে অসংহতি ও দুর্বিপাকের হাত থেকে বাঁচিয়ে সজীব রাখা। সমাজ-জীবনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ভার অবিচ্ছিন্ন এবং তাই কোন সময় সমাজ যদি তার পূর্বসূরীদের কর্মপ্রচেষ্টা ও

সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধবিবর্জিত হয়ে যায় বা কোন কারণে নিজ সংস্কৃতির জন্য লজ্জা বোধ করে, তাহলে তার সমাধি রচিত হয়েছে বলতে হবে। কতিপয় সুমহান্ আনুগত্য-শক্তি সমাজকে ধারণ করে আছে। বিশ্বাস-বৃত্তি পিতামাতা পরিবার ও ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে এই আনুগত্য-শক্তি প্রকট হয়। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা অবিসম্বাদীরূপে আত্মগরিমা ও সেবার সেই সনাতন ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছিল। আবার আধুনিক বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষা যে তরুণসম্প্রদায়কে জীবনের যে-কোন প্রয়োজনীয় অভীষ্ট সাধনের অযোগ্য করে ফেলে—এ কথাও সমপরিমাণে সত্য। ইংরেজী স্কুলে যাঁরা নিজ সন্তান-সন্ততিদের পাঠান তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাসী কৃষিজীবী নরনারী। একথা সন্দেহাতীত যে এই সব নব্য যুবক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করলে দেখা যায় যে তারা কৃষির বিন্দুবিসর্গ জানে না এবং বস্তুতঃ তাদের হৃদয়ে নিজ জনকের পেশার প্রতি গভীর অনুকম্পাভাব বিদ্যমান। তারা এ কথাও ঘোষণা করে যে তারা সকল প্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে গেছে এবং তাঁর সর্ব-কল্যাণকর সত্তায় তাদের আস্থা নেই। এই বিয়োগান্তক ঘটনার সর্বনাশা পরিধি সরকারের কৃপাশ্রিত নির্দিষ্ট গুটিকয়েক কেরানী ও হাকিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভেবে বাস্তব পরিস্থিতিকে গোপন করা যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক 'রিফর্ম' বা সংস্কার হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিচারের জন্য কত শত কমিশন বসেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা হয়েছে; কিন্তু কদাপি স্বপ্নেও এ কথা চিন্তা করা হয় নি যে সমগ্র জাতির জীবন ও বিকাশের উপায় অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে বলে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই পাপে পরিপূর্ণ। এই প্রথাকে সমূলে বাতিল করতে হবে। লর্ড মেকলে তাঁর প্রাণঘাতী রায় দেবার পূর্বে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হবারও পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ কি ছিল, সে সম্বন্ধে অবিলম্বে তত্ত্ব-তল্লাস করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্বরিৎগতি একান্ত অপরিহার্য, কারণ প্রাচীন গুরুবংশ প্রায় বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গেই হয়ত তাঁদের পদ্ধতি বিস্মৃতি-সাগরে চিরবিলীন হয়ে যাবে। সেই সব পাঠ্যক্রম পুনঃপ্রবর্তনের অর্থ হয়ত আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভূগোলের বিলুপ্তিকরণ, কিন্তু এ সম্ভাবনায় আমরা তিলমাত্র বিচলিত নই। অন্ততঃ দেশের একটি কোণে আমরা প্রাচীন পাঠ্যক্রম সৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা করছি এবং মুক্ত বিবেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমরা ঘোষণা করেছি যে এর পরিণাম ইউরোপের সর্বাধুনিক অবদান অপেক্ষা বহুগুণ কর্মকুশল

ও সন্তোষজনক। তবে একথাও আমরা স্বীকার করছি যে এ অভিমত কোন বিশেষজ্ঞের নয়। এইজন্য আমরা চাই যে বিশেষজ্ঞেরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করুন। এ সম্ভব হলে এবং তার পরিণাম গ্রহণে আমরা প্রস্তুত হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এদেশের অধিবাসীবর্গ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৩-১৯২৪

সংস্কৃতির পরিপন্থী

প্রায় একেবারে প্রথম থেকেই আজকালকার পাঠ্যপুস্তকসমূহে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে যার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের গৃহ-পরিবেশের কোন সম্বন্ধই নেই। প্রত্যুত এসব বিষয় তাদের কাছে একেবারে অপরিচিত। গার্হস্থ্য জীবনের কোন্‌টি উচিত এবং কোন্‌টি অনুচিত, তা কোন বালক পাঠ্য-পুস্তক মারফৎ শেখে না। তাকে কদাচ নিজ পরিবেশের জন্য গর্ব অনুভব করতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ে যতই সে উচ্চ শ্রেণীতে ওঠে ততই তাকে ক্রমাগত গৃহ-পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা সমাপ-নান্তে সে নিজ পরিবেশের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে ওঠে। নিজ গৃহের জীবনযাত্রায় সে কাব্য-সুষমা দেখতে পায় না। গ্রাম্য দৃশ্যাবলী তার কাছে এক বন্ধ-প্রচ্ছদপট গ্রন্থের মত প্রতীয়মান হয়। তার নিজস্ব সভ্যতাকে মনীষা-হীন বর্বর ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং বাস্তব জীবনে একেবারে অপ্রয়োজনীয়রূপে তার কাছে চিত্রিত করা হয়। নিজ সনাতন সংস্কৃতির প্রতি তাকে বিরূপ ভাবা-পন্ন করার জন্য বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক যে পরিপূর্ণভাবে জাতীয় ঐতিহ্য-বিবর্জিত নয়, তার রহস্য হচ্ছে এই যে আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির বিকাশের পরিপন্থী শিক্ষা-ব্যবস্থা যুবকদের উপর চাপিয়ে দিলেও সেই সংস্কৃতি তাদের মনে এমন গভীরভাবে দৃঢ়মূল যে সম্পূর্ণ-ভাবে তার মূলোৎপাটন করা অসম্ভব। ক্ষমতা থাকলে আমি নিঃসন্দেহে আজকালকার পাঠ্যপুস্তকরাজির অধিকাংশ বিনষ্ট করে ফেলতাম এবং এমন সব পাঠ্যপুস্তক লেখাবার ব্যবস্থা করতাম, যাতে ছাত্রদের গৃহের পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধও সম্পূর্ণ থাকবে এবং এর ফলে ছাত্র শিক্ষালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সন্নিকটস্থ পরিবেশে সেই শিক্ষার প্রয়োগ করতে পারবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১

পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই এবং তার ফলে জাতির যে অতিমাত্রায় স্বল্পসংখ্যক বালক-বালিকা শিক্ষা পায়, তারা এই পরিবেশকে এক রকম তিলমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না বললেই চলে।

হরিজন, ২৩-৫-৩৬

শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবন

যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন ইংরেজ শিক্ষকদের পক্ষে ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রয়োজনের পার্থক্য পূর্ণতঃ অনুধাবন করা অসম্ভব। আমাদের দেশের জল-বায়ুতেও সে দেশের মত স্কুল-ভবন ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে না। এ ছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েরা মূলতঃ গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হয় বলে তাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ ইংরেজ ছেলেদের মত হবে না।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমাদের ছেলেদের শ্লেট পেনসিল বা বইএর প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না। তাদের এমন সব সরল গ্রাম্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, যা তারা সহজে চালাতে পারে ও যাতে তাদের কিছু উপার্জন হয়। এর অর্থ হচ্ছে—শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত না হলে আর কোন উপায়েই শিক্ষাকে দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য সহজলভ্য করা যাবে না।

একথা স্বীকার করা হয় যে বর্তমানে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে তথা-কথিত লেখা, পড়া ও গণিত সম্বন্ধে যে সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়, বালক-বালিকা-দের ভবিষ্যৎ জীবনে তার প্রয়োজন অতি অল্পমাত্রাতেই পড়ে। স্রেফ চর্চার অভাবে এর অধিকাংশই তারা এক বৎসরের মধ্যে বিস্মৃত হয়। তাদের গ্রামীণ পরিবেশে এর প্রয়োজন ঘটে না।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশের অনুকূল বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে তার ফলে শুধু শিক্ষাকালীন ব্যয়নির্বাহ-ব্যবস্থাই হবে না, পক্ষান্তরে সে শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে। যদি কোন বিদ্যালয়ে সূতা কাটা এবং বুনাই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে ও তার সঙ্গে যদি

কাপাস চাষের জন্য খানিকটা জমি থাকে, তবে আমার মনে হয় বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমি যে পরিকল্পনার আভাস দিলাম তাতে চারুচর্চামূলক শিক্ষাকে বর্জন করা হয় নি। লিখতে পড়তে এবং মোটামুটি গণিত না জানলে কোন রকম প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল বলা চলবে না। প্রাথমিক পর্যায়ের শেষ বৎসরে যখন বালক-বালিকারা সত্যসত্যই সঠিকভাবে বর্ণপরিচয়ের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তাদের লিখতে পড়তে শেখানো হবে। হস্তলিপি একটি চারুকলা। শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের মত প্রত্যেকটি হরফকে সঠিকভাবে ও সযত্নে অঙ্কন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রথম মোটামুটি অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা দিলে তবে এ সম্ভব। এই ভাবে বিদ্যালয়ে অধিকাংশ সময় কারিগরী বিদ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ মুখে-মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক ইতিহাস, ভূগোল এবং গণিত শিক্ষাদানের কার্য-ক্রম চলতে থাকবে। মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করার কলা তারা শিখবে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পাঠ নেবে এবং এই সব তারা তাদের গৃহে মূর্ত করে নীরব বিপ্লবীতে পরিণত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৭-২৯

অন্তরের শিক্ষা

অন্তরের শিক্ষার বিষয়ে একটি কথা বলব। এ যে পুঁথিপত্রের দ্বারা দেওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মাত্র শিক্ষকের প্রাণময় সাহচর্যে এ শিক্ষা-প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক কারা? তাঁরা কি বিশ্বাস ও চারিত্র্য-শক্তির আকর? তাঁরা কি স্বয়ং এই হৃদয়ের শিক্ষণ লাভ করেছেন? তাঁদের হাতে যে সব ছেলেমেয়েদের সঁপে দেওয়া হয়, তাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁদের হাতে হবে—এ আশা কি পোষণ করা যায়? প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ-পদ্ধতি কি চরিত্র গঠনের পথে সফল বাধা নয়? শিক্ষকরা কি কোনমতে জীবন ধারণ করার মতও পারি-শ্রমিক পান? এ ছাড়া আমরা জানি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন-কালে স্বদেশহিতৈষণার কথা স্বপ্নেও মনে ঠাঁই দেওয়া হয় না। যাঁদের কোন গতি নেই, তাঁরাই এ পথে আসেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১

অন্তরের পবিত্রতা অপরিহার্য

সুষ্ঠু শিক্ষার সৌধ রচনার্থ ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতা এক অপরিহার্য শর্ত। আমি সহস্র সহস্র ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাই ও প্রতিনিয়ত ছাত্রদের নিকট থেকে অজস্র পত্র পাই এবং এই অবকাশে তারা পরম বিশ্বাসভরে আমার কাছে তাদের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে থাকে। ছাত্রমানসের এই রকম অভিজ্ঞতার আলোক আমি স্পষ্টতঃ দেখতে পাই যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতার জন্য এক্ষেত্রে বহু কিছু করণীয় বাকী আছে। আমার বিশ্বাস, তোমরা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারছ। আমাদের ভাষায় ছাত্র শব্দটির একটি চমৎকার প্রতিশব্দ আছে। ছাত্রের অপর নাম ব্রহ্মচারী। বিদ্যার্থী শব্দটি যেন জোর করে করা এবং ব্রহ্মচারী শব্দের সঙ্গে এর তুলনাই চলতে পারে না। আমি আশা করি যে তোমরা ব্রহ্মচারী শব্দটির তাৎপর্য জান। এর অর্থ ঈশ্বর-সন্ধানী, এর অর্থ সংক্ষিপ্ততম সময়ের ভিতর ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ মানসে উৎসর্গীত জীবন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মমতের ভিতর অন্য বিষয়ে যতই মতদ্বৈধতা থাকুক না কেন, এই মৌলিক বিষয়ে তারা একমত যে অশুচিহৃদয় নরনারী কোনক্রমেই তাঁর মহান্ শ্বেতশুভ্র সিংহাসনের ছায়াতলে শরণ পেতে পারে না। হৃদয় পবিত্র করতে না শিখলে বেদোচ্চারণ বা সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক ইত্যাদির শুদ্ধ জ্ঞান—সবই অযথা। চরিত্র-গঠনই হবে সকল প্রকার শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৯-২৮

স্বাধীনতা কিন্তু শৃঙ্খলার অধীন

ছাত্রদের পথিকৃৎ-বৃত্তি থাকবে। রতাদে কেবল অনুকরণকারী হলে চলবে না। নিজেদের জন্য চিন্তা ও কাজ করতে তারা শিখবে। তবে তাদের ভিতর পূর্ণ-মাত্রায় আনুগত্য ও শৃঙ্খলা-বোধ থাকবে। চূড়ান্ত স্বাধীনতার ভিতর অত্যুগ্র শৃঙ্খলা ও বিনম্রতা অন্তর্নিহিত। নিয়মানুবর্তিতা ও নম্রতাজাত স্বাধীনতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বল্গা-বিহীন স্বেচ্ছাচার অশ্লীলতাদ্যোতক এবং এ সমভাবে স্বয়ং ও প্রতিবেশী—উভয়েরই অহিতকারক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৬-২৬

শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার সপক্ষে

গুজরাতের আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় দেখেছি যে বহুসংখ্যক ছাত্র আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশের পরিধানেই মলিন ও নোংরা পোশাক দেখেছি। অনেক টুপিতে ঘাম আর ময়লার একটা পুরু আস্তর পড়েছিল এবং ফলে তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল যে সেই সব ছাত্রদের স্পর্শ করা কারও পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পরনে বিচিত্র ধরনের পোশাক ছিল। কোন কোন ছাত্র আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত জামা কাপড় গায়ে চাপিয়েছিল। কেউ কেউ আবার এমন প্যাণ্ট পরে এসেছিল যাতে বোতামের বালাই নেই। কারও কারও পোশাক আবার শতছিন্ন। ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ছাত্রদের যেমন বিদ্যালয়ে আসতে দেওয়া হয় না আমার মতে তেমনি অপরিষ্কার দেহ ও পরিচ্ছদ এবং ছিন্নভিন্ন পোশাক-পরিধানকারী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। প্রশ্ন উঠবে : এই রকম আদর্শ ছেলের দল কোথায় এবং কার কাছে তারা সৌন্দর্য জ্ঞান এবং ভব্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা পাবে? এর প্রতিবিধান খুবই সহজ। শিক্ষক সর্বপ্রথম এই রকম ছাত্রদের স্নানাগারে নিয়ে গিয়ে স্নান করাবেন। এর পর তাদের কাপড কাচতে বলা হবে এবং তাদের নিজেদের কাপড় যখন শুকাতে থাকবে তখন তারা বিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা কাপডচোপড় পরবে। তাদের নিজেদের কাপড় শুকিয়ে গেলে বিদ্যালয়ের পোশাক কেচে তারা ফেরত দেবে। যদি মনে হয় যে এ প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে এমন একটা খরচ হবে যা মেটাবার সঙ্গতি বিদ্যালয়ের নেই তাহলে এইরকম ছেলেদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং কেন তাদের ফেরত পাঠানো হল তার কারণ একটি কাগজে লিখে তাদের হাতে দিতে হবে। তবে স্নান করে এলে আবার তাকে ক্লাসে নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ভব্য আচার-ব্যবহারের পাঠ দেওয়া হবে। ছাত্রদের একরকমের পোশাক পরে আসতে বাধ্য করা যদি নেহাৎ কঠিন মনে হয় তবু ছেঁড়াখোড়া নোংরা অথবা অভব্য পোশাক পরাকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না।

এই ভাবে ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজের উপর মনোযোগ দিতে হবে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এর সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিকভাবে চলা বসা ও দাঁড়ানোর নিয়ম ছেলেরা জানবে। হাজার হাজার ছেলে একসঙ্গে চললেও তারা যাতে পরস্পরের পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে তার শিক্ষা

তাদের দিতে হবে। পিঠ কুঁজো করে একজন নিস্তেজ হয়ে বসে আছে, আর একজন বসে আছে পা ছড়িয়ে, তৃতীয়জন হাই তুলছে এবং চতুর্থজন কেঁদেই চলেছে—কোন ভাল বিদ্যালয়ে এরকম দৃশ্যের অবতারণা হতে দেওয়া চলে না। এই ভাবে ছাত্রদের যদি যথেচ্ছ চলতে দেওয়া যায় তাহলে হাজারে হাজারে এক সঙ্গে এক তালে চলবে কি করে? ছেলেদের একেবারে গোড়া থেকে এসব শেখাতে হবে। এর ফলে তাদের ভিতর শিষ্টতাবোধ জাগবে। তাদের ঝরঝরে ও চটপটে দেখাবে। বিদ্যালয়ের মর্যাদাবৃদ্ধি হবে এবং সেখানে উৎফুল্লকর পরিবেশ গড়ে উঠবে। এইভাবে প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা চালিত ছাত্রদের তখন হাজারে হাজারে একসঙ্গে বাইরে নিয়ে গেলেও আমাদের আজকের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে যেমন গোলমাল অথবা গণ্ডগোল হয়ে থাকে, সে রকম কিছু হবে না। দুই একটি এমন বিদ্যালয়ও আমি দেখেছি যেখানে বাঁশীর আওয়াজ শোনার তিন মিনিটের ভিতর ৯০০ ছাত্র নিঃশব্দে নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হল এবং কাজ সারা হতেই তেমনি নিঃশব্দে আবার নিজ ক্লাসে ফিরে গেল—যেন তারা আদৌ আসে নি।

আমার মতে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পোশাক হওয়া উচিত শার্ট প্যান্ট ও একটি টুপি। এই-ই যথেষ্ট। পোশাক পরিষ্কার থাকলে শত শত ছেলে এই রকম পোশাক পরে আছে—এ দৃশ্য দেখতে সুন্দর। কোন কোন ছেলে দেখা যায় এর উপর একটি জ্যাকেট এবং লম্বা বা খাট কোট পরে বেশ গর্ব অনুভব করছে। এইভাবে নিজেদের বোকা প্রতিপাদন করার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।

আমি একথা ভাল ভাবেই বুঝি যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়ামে দক্ষতা ইত্যাদি শিশুর শিক্ষার একটি গৌণ অঙ্গ—কোনমতেই একে শিক্ষার সব কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। তাদের চরিত্রবলে বলীয়ান হবার শিক্ষা দিতে হবে এবং লিখতে পড়তেও শেখাতে হবে। তবে যত গৌণই হোক না কেন, শিক্ষার কোন অঙ্গকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। শরীর মন ও আত্মা—তিনেরই বিকাশের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এর মধ্যে যেটি অবিকশিত থেকে যাবে ভবিষ্যতে সেটিই ছাত্রের অসুবিধার কারণ হবে। শিক্ষা এবং গড়ে ওঠার প্রথম দিকে এই সব ত্রুটির কথা জানতে পারলে ছাত্ররা তার জন্য অনুতপ্ত হবে। শুধু তাই নয় সমাজের উপরও এর যথেষ্ট কুপ্রভাব পড়বে। আজও আমরা অবিবেচনাপ্রসূত শিক্ষাব্যবস্থার কুপ্রভাবের ফলভোগ করছি। আমাদের

এমন বহু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস আছে যার কারণ আমরা প্লেগ ইত্যাদি মহামারীর হাত থেকে এখনও নিষ্কৃতি পাই নি। আমাদের শহরগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। আদর্শ নাগরিক নিয়মগুলিও আমরা জানি না এবং যে কটি নিয়ম জানি, তা আমরা পালন করি না।

নবজীবন, ২৬-৪-১৯২৫

শ্রীমতী মন্তেসরীকে

শিশুদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক ভালবাসার কারণ আপনি যেমন আপনার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ শিশুদের শিক্ষা দেবার ও তাদের সদগুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা করেছেন, তেমনি আমিও আশা করি যে শুধু সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-ই নয়, নিতান্ত দরিদ্রের ঘরের শিশুও জাতীয় শিক্ষা পাবে। আপনি যথার্থ ই বলেছেন যে, আমরা যদি এই বিশ্বে সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ করা আমাদের অভীষ্ট হয়, তাহলে শিশুদের নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করতে হবে। শিশুরা যদি স্বাভাবিক সারল্যের ভিতর বেড়ে ওঠে তাহলে আমাদের এত সব বাদ-বিসম্বাদের সম্মুখীন হতে হবে না, নিষ্ফল দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করারও প্রয়োজন পড়বে না। প্রেম হতে উচ্চতর প্রেমে এবং শান্তি হতে অধিকতর শান্তিতে বিচরণ করতে করতে আমরা অবশেষে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করব যখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশেও সকলের চেতন ও অচেতন ইচ্ছার প্রতিবিম্ব অসীম শান্তি ও প্রেমের লীলাভূমি রূপে প্রতিভাত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১১-৩১

শিক্ষার উপকরণ

জনসাধারণের সম্মুখে কোন পাঠ্যপুস্তক পেশ করার পূর্বে আমি হাজারবার চিন্তা করব। শিশুদের জন্য আমি একখানি চটি বই লিখেছি।...এই পুস্তকটি লেখার পিছনে যে আদর্শ রয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এই আদর্শ হল এই যে শিক্ষক প্রধানতঃ মুখে মুখে শেখাবেন। কেবল পুস্তক অথবা পাঠ্যপুস্তকের মারফতই যে জ্ঞান দেওয়া যায়—এরকম মনে করা ভুল। পড়ার জন্য একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করলে শিশুদের মনে তার এক বিচিত্র প্রভাব পড়ে। এই সমস্ত বই

তাদের মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে থাকে যে তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অসংখ্য শিশুদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিজ্ঞতায় এবং বহু শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আধারে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকালীন আমি সদাসর্বদা আমার চোখ কান খোলা রাখতাম এবং সব কিছুকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতাম। কঠিন সংগ্রামের সময় আমি যখন জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বিচরণকারীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি তখনও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। এমন দুটি বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি যার মধ্যে একটির শিক্ষকেরা অজস্র পাঠ্যপুস্তক পড়ান এবং অপরটিতে কোন পাঠ্যপুস্তকই পড়ানো হয় না, তাহলে দেখা যাবে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই সমপরিমাণ যোগ্য হলে দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের অর্থাৎ যেখানে কোন পাঠ্যপুস্তকই পড়ানো হয় না সেখানকার শিক্ষকেরা শেষ অবধি প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল ভাবে ছাত্রদের গড়বেন। শিশুদের উপর আমি পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপাতে চাই না। প্রয়োজন বুঝলে শিক্ষকেরা পাঠ্যপুস্তকে পড়তে পারেন। সুতরাং আমরা শিক্ষকদের মার্গদর্শিকা (guide book) হিসাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারি। কিন্তু শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখলে শিক্ষকেরা যন্ত্রে পর্যবসিত হবেন। এর ফলে শিক্ষদের মৌলিকতা ও অভিক্রম বিনষ্ট হবে।...

...সরকার কি করে দেশের সাত লক্ষ গ্রামে বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করবে? দেশের সাত লক্ষ গ্রামের তিন লক্ষ গ্রামেই কোন বিদ্যালয় নেই। অবস্থা যখন এত শোচনীয় তখন সরকারী বিদ্যালয় খুলে কি হবে? বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ীঘর না হলেও আমাদের চলবে, প্রয়োজন কেবল চরিত্রবান শিক্ষকের। পুরাকালের গুরুরা ছিলেন এমনি শিক্ষক। তাঁরা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের খরচ চলত ভিক্ষা করে।... এই শিক্ষকেরা ভাল না হলে ছাত্ররা ভাল শিক্ষা পেত না, আর শিক্ষক ভাল হলে শিক্ষাও হত উচ্চশ্রেণীর। আজকে সেই ধরনের শিক্ষক অদৃশ্য। বিদ্যালয়ের ভাল ঘর-বাড়ী থাকলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না।

নবজীবন, ৩-৮-১৯২৪

পাঠ্যপুস্তক

ভারতবর্ষে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে বিপুলসংখ্যক গ্রাম্য শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা। সুতরাং ভারতে পাঠ্য পুস্তকের অর্থ হওয়া উচিত মুখ্যতঃ শিক্ষকের পাঠ্য পুস্তক, ছাত্রের নয়। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ যে মৌখিক উপায়ে দেওয়া উচিত নয়—একথা আমি দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারব না। প্রারম্ভিক সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পূর্বে সুকুমারমতি শিশুদের উপর বর্ণ-পরিচয় ও পঠনের বোঝা চাপিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে তরুণ অবস্থা থেকে তাদের মৌখিক শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, রামায়ণ পড়তে না শেখা পর্যন্ত কি একটি বছর সাতেক বয়সের ছেলেকে রামায়ণ শেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে? শহরে যে কয়েক লাখ লোক থাকেন তাঁদের কথা বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ ভারতবাসীর পটভূমিকায় চিন্তা করলে সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৯-২৬

শিক্ষক-সম্প্রদায় ও পাঠ্য পুস্তক

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষতঃ শিশুদের জন্য যে সব পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত, তার অধিকাংশই যদি একেবারে হানিকারক নাও হয়, তবে নিঃসন্দেহে অপ্রয়োজনীয়ের পর্যায়ভুক্ত। এদের মধ্যে অনেকগুলিই যে দক্ষতা সহকারে লিখিত, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এমন কি যাদের জন্য ও যে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি লিখিত, তাতে হয়ত এই সব পাঠ্য পুস্তককে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব ভারতীয় পরিবেশ বা ভারতীয় ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত নয়। কোন কোন বই দেখে যদিও মনে হয় যে সেগুলি ভারতীয়দের জন্য লিখিত, বস্তুতঃ সেগুলি সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশের পুস্তকাবলীর অপক্ক অনুকরণ এবং ছাত্রদের প্রয়োজনপূর্তির ব্যবস্থা এগুলিতে থাকে না বললেই চলে। এদেশে ছাত্রদের প্রদেশ ও শ্রেণী হিসাবে প্রয়োজনের তারতম্য করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজন অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে পৃথক।

এইজন্য আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের কাছে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন অধিক এবং ছাত্রদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে উপলব্ধ মাল-মশলা দ্বারা প্রাত্যহিক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। আর এও তিনি করবেন নিজ শ্রেণীর (ক্লাসের) বিশেষ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে।

যথার্থ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের সদ্বৃত্তির সম্যক. বিকাশ। ছাত্রের মগজে অপ্রয়োজনীয় এলোমেলো তথ্য বোঝাই করে এ অভীষ্ট লাভ করা যায় না। এ পদ্ধতি ছাত্রের যাবতীয় স্বকীয়তা বিনষ্টকারী পাষাণভাররূপে পরিগণিত হয় ও এর ফলে ছাত্র জড়যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। স্বয়ং আমরা যদি এই কুপ্রথার শিকার না হতাম, তবে বহুদিন পূর্বেই আমরা বিশেষ-ভাবে ভারতবর্ষের মত দেশে পাইকারী ভাবে শিক্ষাদানের আধুনিক প্রক্রিয়ার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হতাম।

বহু প্রতিষ্ঠান অবশ্য নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা করেছেন এবং এতে অল্পাধিক সাফল্যও অর্জন করেছেন। তবে আমার মতে এই সকল পাঠ্যপুস্তক এদেশের একান্ত জরুরী প্রয়োজন-পূর্তিতে অক্ষম।

এখানে যে অভিমত ব্যক্ত করেছি, তা যে একেবারে আমার স্বকীয় প্রতিভার অভিনব নিদর্শন—একথা আমি বলতে চাই না। হরিজন বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকবর্গের উপকারার্থ এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হল। তাঁদেব সম্মুখে গুরু দায়িত্বভার বিদ্যমান। জড়বৎ শুধু নিয়মমাফিক কাজগুলি করে আত্মতৃপ্তি বোধ করলে তাঁদের চলবে না। তাহলে তাঁদের অধীনস্থ বালক-বালিকাগুলি বেগার শোধ করার মনোভাব নিয়ে তোতাপাখীর মত যেন তেন প্রকারেন নির্বাচিত বইগুলি মুখস্থ করবে। হরিজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরি-চালকবর্গ এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ অছির কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন এবং সাহসিকতা মেধা ও সততা প্রয়োগে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এ কর্তব্য কঠিন, তবে শিক্ষক ও পরিচালকেরা সর্বান্তঃকরণে এ কাজে লেগে গেলে যতটা কঠিন মনে হচ্ছে, তা আর মনে হবে না। নিজেদের তাঁরা ছাত্রদের পিতাস্বরূপ বিবেচনা করলে অন্তঃপ্রেরণার বলে তাদের চাহিদা জানতে পারবেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সচেষ্ট হবেন। নিজের সে ক্ষমতা না থাকলে তিনি সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবেন। ছেলেমেয়েদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেবার নীতি মেনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে হরিজন ছাত্রদের

—শুধু তাই বা কেন, যে কোন শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষকবর্গকেই অসাধারণ বুদ্ধি-চাতুর্য বা অত্যধিক বহির্বিশ্বের জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে না।

এতদ্ব্যতিরেকে আমরা যদি স্মরণ রাখি যে চরিত্র-গঠনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ এই হওয়া উচিত, তাহলে শিক্ষকদের হতাশ হবার কারণ নেই।

হরিজন, ১-১২-৩৩

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা

শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নিত্য পরিবর্তনশীল পাঠ্যপুস্তকের বাতিক আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। পাঠ্যপুস্তককে যদি শিক্ষার বাহন বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে শিক্ষকের প্রাণবন্ত কথার আর বিশেষ মূল্য থাকে না। যে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ান তিনি তাঁর ছাত্রদের মৌলিকতার পাঠ দিতে সমর্থন নন। তিনি স্বয়ং পাঠ্যপুস্তকের ক্রীতদাস হয়ে পড়েন এবং মৌলিক হবার কোন সুযোগ বা অবকাশ তিনি পান না। তাই মনে হয় যে পাঠ্যপুস্তক যত কম হবে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে ততই মঙ্গল। পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ের পণ্য হয়ে গেছে। যেসব গ্রন্থকার ও প্রকাশক পুস্তক রচনা ও প্রকাশনকে অর্থাগমের মাধ্যমে পরিণত করেছেন প্রতিনিয়ত পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাঁদের খুব আগ্রহ। বহুক্ষেত্রে শিক্ষক ও পরীক্ষকরাই স্বয়ং পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা। তাই পাঠ্যপুস্তকের কাটতি হওয়া স্বভাবতঃই তাঁদের স্বার্থের অনুকূল। আবার পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন কমিটিতেও এঁরা রয়েছেন। এইভাবে দুষ্টচক্র সম্পূর্ণ হয়। আর অভিভাবকদের পক্ষে প্রত্যেক বছর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা গাদা গাদা পাঠ্যপুস্তকের বোঝা বয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে—এই শোচনীয় দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। সমগ্র প্রথাটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ব্যবসায়িক বৃত্তিকে একেবারে বাদ দিতে হবে এবং কেবল জ্ঞানার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে আজকের পাঠ্যপুস্তকসমূহের শতকরা পঁচাত্তর ভাগকেই হয়ত বাতিল করে আবর্জনার গাদায় ফেলে দিতে হচ্ছে। ক্ষমতা থাকলে আমি প্রধানতঃ শিক্ষকদের সহায়ক হিসাবেই পাঠ্যপুস্তক রাখতাম, ছাত্রদের জন্ম নয়। আর ছাত্রদের জন্ম যে কয়টি পাঠ্যপুস্তক একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হয় সেগুলি অন্তত

কয়েক বৎসরের জন্য চালু রাখতে হবে যাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভবপর হয়। এতদভিমুখী প্রথম পদক্ষেপ সম্ভবতঃ এই যে সরকারকে পাঠ্যপুস্তক ছেপে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে হবে। এর পরিণামে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বতঃই বন্ধ হয়ে যাবে।

হরিজন, ৩-৯-১৯৩৯

আত্মনির্ভরশীলতা

গুরুকুল-প্রেমিক হিসাবে এবার আমি এর পরিচালন-সমিতি ও অভিভাবকদের কয়েকটি পরামর্শ দেব। গুরুকুলের ছেলেদের আত্মপ্রত্যয়শীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের মত যে দেশে শতকরা পঁচাশিজন কৃষিজীবী এবং সম্ভবত শতকরা আরও দশজন কৃষককুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত, সেখানে আমার মতে কৃষিকার্য ও বুনাই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতিটি যুবকের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। হাতের কাজে হাতিয়ারপত্র ঠিকভাবে চালাতে শিখলে বা একটুকরা কাঠকে সোজাসুজি চিরতে জানলে অথবা ঠিকমত গুনিয়া টেনে স্থায়ী দেওয়াল গাঁথতে পারলে তো আর কোন ক্ষতি নেই। এই রকমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ছেলে জীবন-সংগ্রামে কোন দিন নিজেকে অসহায় বোধ করবে না এবং সে কখনও বেকার থাকবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শিশুপালন সম্বন্ধেও গুরুকুলের ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার। এখানকার মেলার সাফাইএর ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। মক্ষিকাবাহিনী দেখলেই সব কথা বোঝা যায়। এই সব দুর্দম সাফাই-কার্য পরিদর্শকের দল আমাদের চোখে আঙুলে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাফাইয়ের ব্যবস্থা ত্রুটিশূন্য নয়। এরা আমাদের সোজাসুজি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে ভুক্তাবশিষ্ট এবং আবর্জনাসমূহ ঠিকভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। আমার এই কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিল যে মেলার বাৎসরিক দর্শকদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেবার এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু এ কাজের সূচনা করতে হবে ছেলেদের দিয়েই। তাহলে কর্তৃপক্ষ এর পর বাৎসরিক সম্মেলনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনশত সাফাই-বিজ্ঞান-শিক্ষক পাবেন। সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, অভিভাবকবৃন্দ এবং পরিচালন-সমিতি যেন তাঁদের

ছেলেদের ইউরোপীয় পোশাকের অন্ধ অনুকরণ করতে দিয়ে ও আধুনিক বিলাস দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে তাদের ধ্বংসের পথ না খুলে দেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা এ সবের ফলে কষ্ট পাবে এবং এসব আচরণ ব্রহ্মচর্যনীতিবিরুদ্ধও বটে। আমাদের মধ্যে যেসব কুপ্রথা বিদ্যমান তার বিরুদ্ধেই তাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হবে। তাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে সে সংগ্রামকে আমরা যেন কঠোরতর না করি।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী

শরীর-শ্রম

তোমরা প্রশ্ন করতে পার,"আমরা নিজেদের হাতে কাজ করব কেন ? অশিক্ষিত-রাই তো দৈহিক শ্রমমূলক কাজ করবে। আমরা তো সাহিত্য ও রাজনৈতিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সময়ের সদ্ব্যবহার করব।" আমার মনে হয় আমাদের শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে। কোন ক্ষৌরিক বা চর্মকার ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে গেলে তার জন্য তার নিজেব পেশা বর্জন করার প্রয়োজন নেই। আমার মতে ক্ষৌরিকের জীবিকা চিকিৎসকের মতই ভাল।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ১৬-২-১৬

শ্রমেব মর্যাদা

অন্য দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, ভারতে অন্ততঃ মোট জনসংখ্যার শতকরা আশী ভাগেরও অধিক কৃষিজীবী ও শতকরা দশজন শ্রমশিল্পজীবী। এদেশে তাই শিক্ষাকে স্রেফ পুস্তক-আধারিত করা ও এইভাবে ছেলে-মেয়েদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে শরীর-শ্রমের অনুপযুক্ত করে ফেলা এক ভীষণ অপরাধ। জীবিকা অর্জনের জন্য নিজ সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করি বলে বস্তুতঃ আমার মতে দেশের শিশুদের বাল্যাবস্থা থেকে ঐ জাতীয় শ্রমের মর্যাদা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের শিশুদের যেন শ্রমকে হেয়জ্ঞান করতে শিক্ষা না দেওয়া হয়। কোন কৃষকের পুত্র বিদ্যালয়ে যাবার পর আজকের মত কেন যে কৃষিজীবী শ্রমিক হিসাবে অপদার্থ হয়ে যাবে, এর কোন কারণ খুঁজে পাই না। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শরীর-শ্রমের প্রতি শুধু বিরস বদনে নয়, কেমন ঘৃণাভরে কেন যে দৃষ্টিপাত করে, তার কারণ খুঁজে পাই না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২২

স্বাশ্রয়ী হবার জন্য চরখা

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি সুতা কাটা প্রবর্তন করা হয়, তাহলে শিক্ষাব্যয় সম্বন্ধীয় আমাদের প্রাচীন ধারণায় বিপ্লব সাধিত হবে। প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা কাল পঠন-পাঠন চালিয়ে আমরা ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষা দিতে পারি। কোন ছাত্র যদি দৈনিক চার ঘণ্টা সুতা কাটে তাহলে প্রত্যহ সে দশ তোলা সুতা কাটতে পারবে এবং এইভাবে সে বিদ্যালয়ের জন্য প্রত্যহ এক আনা উপার্জন করতে সক্ষম হবে। ধরে নেওয়া যাক যে প্রথম মাসে তার উৎপাদন খুব কম হল এবং বিদ্যালয় মাসে মাত্র ছাব্বিশ দিন খোলা থাকে। তবুও প্রথম মাসের পর সে মাসিক এক টাকা দশ আনা রোজগার করতে পারবে। ক্লাসে ত্রিশটি ছাত্র থাকলে দ্বিতীয় মাস থেকে মাসিক আটচল্লিশ টাকা বারো আনা রোজগার হবে।

পুঁথিপত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি। মোট ছয় ঘণ্টার দুই ঘণ্টা এ কাজের জন্য দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কোন প্রযত্ন বিনাই প্রতিটি বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য জাতি অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে চরখা। সুতা কাটা জনপ্রিয় হলে এর জন্য হাজার হাজার চরখা দরকার। সৌভাগ্যক্রমে প্রত্যেক গ্রাম্য সূত্রধর সহজেই এ যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম। বিভিন্ন আশ্রম বা অন্যত্র থেকে এগুলি আনানো প্রচণ্ড ভুল। সুতা কাটার মজা হচ্ছে এই যে এ কাজ অতীব সহজ, অনায়াসে শেখা যায় ও গ্রামে চরখা প্রবর্তন স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

এখানে যে কার্যক্রমের উল্লেখ করলাম, তা শুধু এই আত্মশুদ্ধি ও শিক্ষানবিশীর বৎসরের জন্য। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এবং স্বরাজ অর্জিত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সুতা কাটার জন্য দিয়ে বাকি পুঁথিপত্রের শিক্ষার জন্য দেওয়া যেতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-১৯২১

মাদক বিক্রয়ের রাজস্ব

বিনম্রভাবে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে দেশের শিশুদের মাদকদ্রব্য বিক্রয়-খাতে অর্জিত রাজস্বে শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই অতীব অপমানজনক বিষয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষতি করে যদি আমরা

মাদকদ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করার সুবুদ্ধির পরিচয় না দিই, তাহলে উত্তরকাল আমাদের অভিশাপ দেবে। তবে এতটা ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হবে না। আমি জানি যে আপনাদের ভিতর অনেকে আমাদের স্কুল-কলেজসমূহে সুতা কাটা প্রবর্তন করে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনাকে বিদ্রূপ করেন। আমি জোর দিয়ে আপনাদের বলতে পারি যে সুতা কাটা শিক্ষণ-ব্যয়ের সমস্যার সমাধান করে এবং অন্য কোন কিছুর এ ক্ষমতা নেই। দেশ নূতন কোন করের বোঝা বইতে সক্ষম নয়। এমন কি প্রচলিত কর-ভারই অসহনীয়। অচিরে জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে আমাদের শুধু মাদকদ্রব্য-খাতে আমদানি রাজস্ব বিসর্জন দিলেই চলবে না, অন্যান্য খাতে উশুলিকৃত রাজস্বের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৬-১৯২১

শিক্ষার ব্যয়-সংস্থান

একথা কার অবিদিত যে সন্তানের শিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ মানসে পিতা অনেক অসঙ্গত কার্য করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে আমাদের ভাগ্যে এর চেয়েও চরম সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। দেশের বিশাল শিশু-সমুদ্রের মাত্র এক ক্ষীণতম অংশকে আমরা স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছি। এদের অধিকাংশই শিক্ষার আলোক-বর্জিত। এইসব শিশুদের পিতামাতার আগ্রহের অপ্রতুলতা এর কারণ নয়, এর মূলে রয়েছে তাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মত দরিদ্র-ভূমিতে অভিভাবকদের যদি এতগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে হয় এবং অবিলম্বে কোন রকম প্রতিদানের আশা না করে তাদের জন্য ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে এ প্রথার মূলে কোন মারাত্মক গলদ আছে। শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থা থেকেই শিশুরা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কাজ করলে আমি তাতে কোন অন্যায় দেখি না। নিঃসন্দেহের সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সকলের নিকট রুচিকর ও সরলতম হস্তকর্ম হচ্ছে সুতা কাটা ও তার পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াসমূহ। এই কার্য আমাদের শিক্ষায়তনে প্রবর্তন করলে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের মনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বিকাশও ঘটবে

এবং তৃতীয়তঃ বিদেশী বস্ত্র ও সূতার পূর্ণমাত্রায় বয়কট হবে। এতদ্ব্যতিরেকে এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা হয়ে গড়ে উঠবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৬-১৯২১

সার্বত্রিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যয়

আমরা যদি আশা করি যে (এবং করা উচিতও) প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের ছেলেমেয়ে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, তা হলে দেখা যাবে প্রচলিত শিক্ষাবিধির শরণ নিলে সকলের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করার সাধ্য আমাদের নেই। এছাড়া লক্ষ লক্ষ অভিভাবকদের পক্ষে আজকালকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতনের সংস্থান করাও অসম্ভব। অতএব শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য অবৈতনিকও করতে হবে। আমি বলতে পারি যে আদর্শ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আমরা বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের প্রতিটি বালক-বালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য দুই শত কোটি টাকা ব্যয় করতে পারব না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সর্ববিধ শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের অংশতঃ বা পূর্ণমাত্রায় শ্রম দ্বারা তার ব্যয়ের সংস্থান করতে হবে। আমার মতে সূতা কাটা ও বস্ত্র-বয়ন ছাড়া এবম্বিধ প্রয়োজনীয় অথচ সার্বজনীন শ্রম আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্য আমরা সূতা কাটা প্রবর্তন করি বা অন্যবিধ শ্রম করার ব্যবস্থা রাখি, আমি যে কথা সিদ্ধ করতে চাইছি তার জন্য এই পার্থক্যে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হচ্ছে এই শ্রমের সদুপযোগ করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৃত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন বিকল্প ব্যবস্থা বাস্তব, লাভজনক ও ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করার মত হবে না।

আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে শরীর-শ্রম প্রবর্তন করলে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। একদিকে এর দ্বারা শিশুদের শিক্ষণ-ব্যয়ের সংস্থান হবে এবং অন্যদিকে শিশুরা এর ফলে এমন একটি উপজীবিকা শিক্ষা করতে পারবে, ইচ্ছা করলে যার উপর তারা ভবিষ্যৎ জীবনে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে পারবে। এবম্বিধ প্রথা নিঃসন্দেহে আমাদের শিশুকুলকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে। জাতীয় মেরুদণ্ড ভঙ্গ করার জন্য শ্রমকে অবজ্ঞা করার চেয়ে শক্তিশালী সাধন আর কিছু নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-১৯২১

পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

আমার বিশ্বাস হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্যক অনুশীলন দ্বারাই শুধু বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ শিক্ষা সংসাধিত হতে পারে। অর্থাৎ বিবেচনা সহকারে শিশুর দেহযন্ত্রের উপযোগ-ই হচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সর্বোত্তম এবং দ্রুততম পন্থা। কিন্তু যুগপৎ যদি দেহ ও মনের বিকাশ আত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে না হয় তাহলে শুধু দেহ ও মনের বিকাশ একেবারে একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষণ বলতে আমি অন্তরের শিক্ষণ বুঝি। সুতরাং মনের সমুচিত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য এর পূর্বভূমিকা হিসাবে শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ বিধান সমানভাবে আবশ্যক। উভয় ব্যাপার এক এবং অবিচ্ছেদ্য। অতএব এরা পৃথক ভাবে পরস্পরের সম্পর্ক-নিরপেক্ষ অবস্থায় বিকাশলাভ করতে পারে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথা মনে করা প্রচণ্ড ভ্রান্তির পরিচায়ক।

দেহ মন ও আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির ভিতর পারস্পরিক সমবায় ও সৌহার্দের অভাবের সাংঘাতিক পরিণাম অত্যন্ত স্পষ্ট। এর নিদর্শন আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে। আমরা শুধু আমাদের বর্তমান বিকৃত যোগসূত্রের কারণ এর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। আমাদের গ্রাম্মীণ জনতার উদাহরণ নিন। শৈশব থেকে আরম্ভ করে আহোরাত্র মাঠেঘাটে তাদের কঠিন পরিশ্রমের পালা আরম্ভ হয়। তারা যে গৃহপালিত পশুগুলির মাঝে বাস করে, শুধু তাদের সঙ্গেই এদের এই কঠোর শ্রমমূলক জীবনের তুলনা চলে। এদের অস্তিত্বের অর্থই হচ্ছে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা এবং যান্ত্রিক গতানুগতিকতার অক্ষদণ্ড কেন্দ্র করে নীরস অবিশ্রান্ত আবর্তন। এর ভিতর বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষণপ্রভার ঔজ্জ্বল্য বা জীবনের উচ্চতর ভাবাদর্শের সামান্য রেখারও স্থান নেই। মন ও আত্মাকে ঊর্ধ্ব লোকচারী করার কোন উপায় তাদের সামনে নেই বলে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের কাছে জীবন এক পীড়াজনক কুকর্মের বোঝাস্বরূপ এবং তাই তারা কোনমতে এর ভিতর দিয়ে স্খলিত চরণে পার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আজকাল শহরের স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে যা চলে, প্রকৃতপক্ষে তা বৌদ্ধিক লাম্পট্য ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক শিক্ষায়তনসমূহে বৌদ্ধিক শিক্ষণকে শরীর-শ্রম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক বস্তু মনে করা হয়। কিন্তু সুস্থ থাকার জন্য কথঞ্চিৎ শরীর-শ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে এতদুদ্দেশ্যে তারা কৃত্রিম ও নিষ্ফল পদ্ধতির শরীর-চর্চা করে থাকে। এ ব্যাপার যেমন কিম্ভূতকিমাকার,

এর পরিণামও তেমনি শোকাবহ। এই প্রথায় জারিত যুবক শারীরিক সহনশীলতার দিক থেকে কোনক্রমেই একজন সাধারণ শ্রমিকের কাছে দাঁড়াতে পারে না। সামান্য খাটুনিতেই তার মাথা ধরে। এক লহমা রৌদ্রে থাকলে তার শরীর ঘুলাতে থাকে। আর আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, এ সবকে অতীব "স্বাভাবিক" আখ্যা দেওয়া হয়। হৃদয়-বৃত্তির বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয় যে হয় তাদের বে-লাগাম ছেড়ে বংশ বিস্তার করে হাউই-এর মত নিমেষে বিলীন হতে দেওয়া হয়, আর নচেৎ তারা বন্য বিশৃঙ্খলতা সহকারে যেন তেন প্রকারেণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অরাজকতা। আর একেই একটা প্রশংসনীয় অবস্থা বিবেচনা করা হয়।

অন্যদিকে প্রথমাবস্থা থেকে যে শিশুটির ভিতর হৃদয়ের শিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে তার উদাহরণ নিন। ধরে নেওয়া যাক যে শিক্ষার জন্য তাকে সুতা কাটা ছুতারের কাজ বা কৃষি ইত্যাদি কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হল এবং সেই সুবাদে তাকে যেসব ক্রিয়া করতে হবে তার পূর্ণমাত্রায় ও বিশদ তথ্যমূলক শিক্ষা তাকে দেওয়া হল। যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে, তার উৎপাদন ও ব্যবহার-পদ্ধতিও যেন তাকে শেখানো হল। এতে শুধু সে সুন্দর ও সুগঠিত দেহী হয়ে-ই গড়ে উঠবে না, উপরন্তু এ প্রক্রিয়ায় সে গভীর জ্ঞান ও প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের আকর হবে। এই জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য কেবল পুঁথিগত হবে না, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার আলোকে এ জ্ঞান হবে জীবনের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ। তার বৌদ্ধিক শিক্ষার ভিতর গণিত থাকবে এবং নিজের জীবিকা সমুচিত ও সুসঙ্গতভাবে চালাবার জন্য বিজ্ঞানের যেসব বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন, তাও তার পাঠ্যক্রমের ভিতর সন্নিবিষ্ট করা হবে। মনোরঞ্জনের জন্যে এর সঙ্গে সাহিত্য যুক্ত হলে তার জন্য সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে বলা যাবে। এ পদ্ধতিতে বুদ্ধি শরীর ও আত্মার বিকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকবে এবং এ সবের সমবায়ে সে স্বাভাবিক ও একাবয়ব পরিপূর্ণ সত্তায় পরিণত হবে। মানুষ শুধু বুদ্ধি বা কেবল স্থূল জৈবিক দেহ নয়, অথবা তাকে স্রেফ হৃদয় বা আত্মা আখ্যা দেওয়া চলে না। পরিপূর্ণ মানবের রূপায়ণের জন্য এই ত্রিবিধের সমুচিত ও সুসঙ্গত সমন্বয় প্রয়োজন এবং শিক্ষার যথার্থ অর্থশাস্ত্রও এই।

হরিজন, ৮-৫-১৯৩৭

উৎপাদনমূলক কাজ ও শিক্ষা

উৎপাদনমূলক কাজের আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া উচিত এবং আমাদের দেশে এর সপক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাহলে বিদ্যালয়গুলি ছেলেদের শিক্ষাকালীন কাজ থেকে নিজের খরচ চালাবার মত যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবে। কটকে চামড়ার কারখানা শুরু করার পিছনে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসের মনে এই বিচারধারা ক্রিয়াশীল ছিল। পরিকল্পনাটিও ছিল ভাল। কিন্তু এই জাতীয় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখার অনুকূল মনোবৃত্তি দেশে না থাকায় শ্রীযুক্ত দাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সূত্রধরের কাজ আমাদের উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হবে না কেন? আর বুনাই-শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে সূর্যবিহীন সৌরজগতের মত। এই সমস্ত হস্তশিল্প যেখানে যথোচিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ছাত্রদের সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয় নির্বাহের মত যথেষ্ট রোজগার করতে পারা উচিত। ছাত্রদের থাকবে দৈহিক যোগ্যতা এবং কাজ করার ইচ্ছা। অবশ্য শিক্ষকদেরও নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। দৈহিক ও মানসিক—উভয় ক্ষেত্রেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একজন তাঁতী যদি কবীর হতে পারেন তাহলে অন্যান্য তাঁতীরা কবীর না হলেও গিদওয়ানী কৃপালনী ও কালেলকার হতে পারবে না কেন? একজন চর্মকার যদি শেক্‌স্‌পীয়র হতে পারেন তাহলে অপরাপর চর্মকাররা মহাকবি হতে না পারলেও ভাল রসায়নবিজ্ঞানী বা অর্থশাস্ত্রী হতে পারবেন না কেন? আমাদের বুঝতে হবে যে হাতের কাজ ও বৌদ্ধিক জ্ঞানের ভিতর বিরোধ আছে বলে অহেতুক কল্পনা করে নিয়ে আমরা জনসাধারণের প্রগতিকে খুবই ব্যাহত করছি।

নবজীবন, ২৩-৯-১৯২৮

শিক্ষা হস্তশিল্প কেন্দ্রিক হবে

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রাচীন শিল্পসমূহ শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সংশয়ের অবকাশ নেই। ভারতের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে যা চলে, আমি তাকে শিক্ষা আখ্যা দিই না। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সর্বোত্তম অভিপ্রকাশ এর লক্ষ্য নয়। এ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির লাম্পট্য। বর্তমান প্রথা কোনপ্রকারে কতকগুলি তথ্য মগজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে

প্রথম হতে মূলতঃ গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে মনকে প্রশিক্ষিত করলে তার পরিণামে মনের যথার্থ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ ঘটবে এবং এর ফলে বৌদ্ধিক ও এমন কি আধ্যাত্মিক শক্তির অপচয় নিবারিত হবে।

হরিজন, ৫-৬-১৯৩৭

॥ পাঁচ ॥

বনিয়াদী শিক্ষা

বুদ্ধির বিকাশ না বুদ্ধির লাম্পট্য ?

ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজের আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় যেসব ছাত্র ও "বুদ্ধিজীবীদের" সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশের ভিতর বৌদ্ধিক বিকাশের পরিবর্তে বৌদ্ধিক লাম্পট্যের নিদর্শন দেখেছি। এই ত্রুটির মূল রয়েছে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর যা এই দুষ্ট প্রবণতাকে প্রোৎসাহিত করে, মনকে করে বিপথগামী। এর ফলে মনের বিকাশ হবার পরিবর্তে তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেগাঁও-এ শিক্ষা নিয়ে আমি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তার ফলে আমার পূর্বোক্ত ধারণার পরিপুষ্টি ঘটেছে।...

আমি বিশ্বাস করি যে একমাত্র হাত পা চোখ কান নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের দ্বারাই বুদ্ধির যথার্থ শিক্ষণ সম্ভবপর। অর্থাৎ শিশুর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার তার বুদ্ধির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম ও দ্রুততম পন্থা। তবে মন ও দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে যদি আত্মার স্ফুরণ না হয়, তাহলে কেবল দেহ ও মনের বিকাশ একাঙ্গী ব্যাপার হবে। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বলতে আমি হৃদয়ের শিক্ষার কথা বলছি। সুতরাং মনের যথোচিত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রশিক্ষণ হয়। দেহ মন ও আত্মার প্রশিক্ষণ অবিভাজ্য। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী একথা মনে করা একেবারেই ভুল যে এ তিনের পৃথক পৃথক বা পরস্পর অসম্পৃক্তভাবে বিকাশ ঘটা সম্ভবপর।

শরীর মন ও আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে যথোচিত পরস্পর সমন্বয় ও সুসংগতি

না থাকার কুপ্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর। এর নিদর্শন আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল আমাদের বর্তমানের বিকৃত অনুষঙ্গের কারণ এর অনুভূতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের গ্রামবাসীদের কথা ধরুন। শৈশব থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত তারা তাদের কৃষিক্ষেত্রে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তাদের এই পরিশ্রমের সঙ্গী হল তাদের গৃহপালিত পশুগুলি, যাদের সাহচর্যে তাদের জীবন কাটাতে হয়। গ্রামবাসীদের অস্তিত্বের অর্থ হল শ্রান্তিবিহীন বিরক্তিকর যান্ত্রিক শ্রম, যার মধ্যে এমন একটু যতি বা ক্ষান্তি নেই যখন বুদ্ধির একটা ক্ষীণ ঝলক অথবা জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধের অভিব্যক্তি ঘটবে। মন ও আত্মার বিকাশের সর্ববিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের কাছে জীবন হল এক দুঃখদ প্রমাদ এবং কোন রকমে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে চলে। অন্যদিকে দেশের শহরের স্কুল-কলেজে শিক্ষা নামে যা চলে বাস্তবপক্ষে তা হল বৌদ্ধিক লাম্পট্য। এইসব তথাকথিত শিক্ষায়তনে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনকে শারীরিক বা দৈহিক কাজের সঙ্গে একেবারে অসম্পৃক্ত একটা জিনিস বলে মনে করা হয়। কিন্তু কিছুটা শরীরচর্চা না হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে তারা কোন কৃত্রিম অথবা অনুৎপাদক দেহচর্চার শরণ নেয়। তবে তার পরিণামও এমন যে সমগ্র ব্যাপারটা একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এই পদ্ধতিতে যে যুবকটি গড়ে ওঠে দৈহিক সহশক্তির দিক থেকে কোনমতেই সে কোন সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। একটুখানি পরিশ্রম করলেই তার মাথা ধরবে, সামান্য একটু রোদ লাগলেই তার মাথা ঘুরবে। আর এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে এ-সবকে "স্বাভাবিক" মনে করা হয়। হৃদয়ের বৃত্তিসমূহের কথা ধরলে দেখা যাবে হেলায় অশ্রদ্ধায় সেগুলিকে নষ্ট হতে দেওয়া হয় অথবা বড় বেশী হলে সেগুলি যেমন তেমন করে বিশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে। এর পরিণাম হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নৈরাজ্য। আর একেই শ্লাঘনীয় একটা কিছু বিবেচনা করা হয়।

এর সঙ্গে সেই শিশুটির তুলনা করুন যার হৃদয়ের শিক্ষার প্রতি প্রথমাবধি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ধরুন তাকে শিক্ষার জন্য সুতা কাটা ছুতারের কাজ কৃষি ইত্যাদি কোন প্রয়োজনীয় বৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এইজন্য এই সব বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রক্রিয়ার বিশদ জ্ঞান ও তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব প্রক্রিয়ায় যেসব হাতিয়ারপত্র ব্যবহার করতে হয় তাকে চালানো এবং সেগুলি বানানোর পদ্ধতিও সুষ্ঠুভাবে সে শিখেছে। এই রকম ছেলের শরীরই কেবল

সুস্থ ও সুগঠিত হবে না, তার বুদ্ধিও হবে চৌকস ও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। এ বুদ্ধি কেতাবী নয়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সে বুদ্ধি ভালভাবে যাচাই করা ও তার ভিতর দৃঢ়নিবদ্ধ। গণিত-শাস্ত্র এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে ও যোগ্যতাসহকারে তার পেশার অনুশীলন করার জন্য আর যেসব বিজ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন সে সবই তার বৌদ্ধিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হবে। চিত্তবিনোদনের জন্য এর সঙ্গে যদি সাহিত্য যুক্ত হয় তাহলে সে আদর্শ সুসম এবং সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—যে শিক্ষায় বুদ্ধি শরীর ও আত্মা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে এক স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয় সেই শিক্ষা পাবে। মানুষ নিছক বুদ্ধিবৃত্তি নয় অথবা কেবল স্থূল জৈব দেহটি নয় কিংবা সে শুধু হৃদয় বা আত্মাও নয়। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর জন্য তিনের যথোচিত এবং সুসমঞ্জস সমন্বয় প্রয়োজন আর এই হল শিক্ষার সত্যকার অর্থশাস্ত্র।

হরিজন, ৮-৫-১৯৩৭

অক্ষরজ্ঞান চাই না?

জনৈক বিজ্ঞ পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন যে আমি অক্ষরজ্ঞানকে অবহেলা করার অপরাধে অপরাধী এবং এই প্রবন্ধে আমি তাঁর অভিযোগের কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করব। এযাবৎ আমি যা লিখেছি তাতে এমন কিছু নেই যাতে পূর্বোক্ত ধরনের কথা মনে হতে পারে। কারণ আমি কি এ কথা বলি নি যে আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে ছাত্ররা হাতের কাজের মাধ্যমেই সব কিছু শিখবে? এই সব কিছুর ভিতর অক্ষরজ্ঞানও পড়ে। আমার পরিকল্পনায় হরফ লেখার বা নকল করার পূর্বে শিশুর হাত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবে। চোখগুলি পৃথিবীর আর পাঁচটা জিনিস দেখার মত অক্ষর ও বাক্যের ছবি দেখে চিনবে, কান বিভিন্ন জিনিসের নাম ও মানে শুনে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের তাৎপর্যও বুঝতে পারবে। সমগ্র প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি হবে স্বাভাবিক ও অনুরণন-সৃষ্টিকারী। খরচের দিক থেকেও এ হবে সর্বাপেক্ষা সস্তা। অতএব আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা লিখতে শেখার অনেক পূর্বেই পড়তে শিখবে। আর তারা যখন লেখা আরম্ভ করবে তখন (আমার শিক্ষকদের দৌলতে) আমি এখনও যেমন "কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং" মার্কা হরফে লিখি তেমন লিখবে না। তারা সঠিকভাবে হরফগুলি লিখবে যেমন নিখুঁতভাবে তারা আঁকবে তাদের দেখা

নানারকমের জিনিসগুলি। আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয় যদি কোনদিন বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে আমি সাহস করে বলতে পারি যে তার ছাত্ররা দ্রুত পড়ার ব্যাপারে অতীব উন্নত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারবে। আর লেখার ব্যাপারেও আজকের অধিকাংশ ক্ষেত্রের মত ভুল বা খারাপ হাতের লেখা নয়, ভাল ও শুদ্ধ হাতের লেখা যদি মানদণ্ড হয় তাহলে তারা কম যাবে না।

হরিজন, ২৮-৮-১৯৩৭

স্বাবলম্বী শিক্ষাপ্রসঙ্গে আলোচনা

যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে মাদক বর্জনের কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য স্বাবলম্বী শিক্ষার পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে—এই ধারণার বিরুদ্ধে গান্ধীজী একটি প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "দুটিরই স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের কাজ শুরু করতে হবে যে রাজকোষে অর্থ আসুক বা না-ই আসুক, শিক্ষা হোক বা না-ই হোক সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের শুরু করতে হবে যে ভারতবর্ষের গ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে তাকে স্বাবলম্বীও হতে হবে।".

যে শিক্ষাবিদ্ ভদ্রলোক আলোচনা করছিলেন তিনি বললেন, "এর মধ্যে প্রথম বিশ্বাসটি আমার হৃদয়ে দৃঢ়মূল। আমার কাছে মাদকবর্জন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ লক্ষ্য এবং একে আমি স্বয়ংশিক্ষার একটি মহান্ কর্মসূচী বলে বিবেচনা করি। সুতরাং মাদকবর্জনকে সফল করার জন্য শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বাসটি আমার ভিতরে নেই। এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা যায়।"

গান্ধীজী বললেন, "এখানেও আমি আপনাকে ঐ বিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করতে বলছি। একে কাজে রূপায়িত করা শুরু করলে এর উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। আমার দুঃখ হচ্ছে যে বড় বেশী বয়সে এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম। নচেৎ আমি নিজেই এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম। তবে ঈশ্বরের করুণা হলে এ যে সম্ভব সেকথা প্রমাণ করার জন্য আমি যতটা পারি চেষ্টা করব। তবে বিগত কয়েক বৎসর অন্যান্য কাজে আমার সময় গেছে এবং

সম্ভবতঃ সে-সব এ কাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেগাঁও-এ এসে বসবাস আরম্ভ করার পরই স্বাবলম্বী শিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়েছে। এতাবৎকাল আমরা শিশুর মনকে নানারকম তথ্যে ভারাক্রান্ত করেছি, তার মনকে অনুপ্রেরিত ও বিকশিত করার দিকে নজর দিই নি। এবার যেন আমরা এতে ক্ষান্তি দিয়ে শরীর-শ্রমের মাধ্যমে শিশুর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করি। এই শ্রম কোন অতিরিক্ত কর্মসূচী হবে না, হবে বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের প্রধান সাধন।"

"এটা হয়ত সম্ভব। কিন্তু এর দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের কথা ওঠে কেন?"

"এর সারবত্তার কষ্টিপাথর এই। সাত বছরের শিক্ষার পর চোদ্দ বছর বয়সে সমাজের উপার্জনকারী সদস্য হিসাবে শিশু বিদ্যালয় থেকে বেরোবে। আজও গরীবদের ছেলেমেয়েরা স্বতঃই নিজেদের বাপ-মাকে সাহায্য করে থাকে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজ না করলে তাঁরা কি খাবেন এবং আমাকেই বা কি খাওয়াবেন—এই মনোবৃত্তি তাদের ভিতর কাজ করে। এই মনোবৃত্তি স্বয়ং এক শিক্ষা। এইভাবে সাত বছর বয়সে রাষ্ট্র শিশুর দায়িত্ব নিয়ে চোদ্দ বছর বয়সের ভিতর তাকে উপার্জনক্ষম করে পরিবারের কাছে ফেরত দেয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়। শিশুদের কোন না কোন ধরনের কাজের শিক্ষা দিতে হবে। সেই বিশেষ বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করে শিশুর মন ও শরীরের প্রশিক্ষণ হবে, তার হাতের লেখা ও শিল্প-বোধের উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং তার অন্যান্য বৃত্তি পুষ্ট হবে। যে হাতের কাজ সে শিখবে শিশু তাতে পারঙ্গম হবে।"

"ধরুন কোন ছাত্র খাদি উৎপাদনের কলা ও বিজ্ঞান শেখা আরম্ভ করল। আপনি কি মনে করেন এই হাতের কাজটিতে পারঙ্গম হতে তার সাত বছর সময় লাগবে?"

"হ্যাঁ। নিছক যান্ত্রিকভাবে না শিখলে অবশ্যই এই সময় লাগবে। ইতিহাস কিংবা ভাষা শেখার জন্য আমরা বছরের পর বছর সময় দিই না? পূর্বোক্ত যেসব বিষয়ের উপর অদ্যাবধি কৃত্রিম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার চেয়ে কোন হাতের কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ কিসে?"

"কিন্তু আপনি যখন প্রধানতঃ সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কথা চিন্তা করছেন তখন মনে হয় যে আপনি নিশ্চিতভাবে আপনার পরিকল্পিত সব

বিদ্যালয়কে বুনাই বিদ্যালয়ে পর্যবসিত করতে চান। কোন শিশুর বুনাই-এর প্রতি আকর্ষণ না থেকে অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ থাকতে পারে।"

"ঠিক বলেছেন। সেরকম অবস্থায় আমরা তাকে অন্য কোন হাতের কাজ শেখাব। তবে এ কথাও আপনাদের জানতে হবে যে একটি বিদ্যালয়ে অনেক রকম হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে না। আমার পরিকল্পনা হল পঁচিশজন ছাত্র পিছু একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখা। সুতরাং শিক্ষকদের সংখ্যা অনুসারে পঁচিশজন হিসাবে ছাত্র নিয়ে যতগুলি ইচ্ছা ক্লাস বা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সব বিভিন্ন বিদ্যালয় সূত্রধর কর্মকার চর্মকার অথবা মুচি ইত্যাদিদের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজে পারদমতা লাভ করবে। আপনাদের শুধু এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে এই সব হাতের কাজের মাধ্যমে আপনাদের শিশুর মনের বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটি বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই। শহরগুলিকে ভুলে গিয়ে আপনাদের গ্রামের উপর জোর দিতে হবে। গ্রামগুলি হল সমুদ্রের মত আর শহর সমুদ্রের বিন্দুর চেয়ে বেশী নয়। সেইজন্য ইঁট গড়ার মত বিষয়কে মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। কোন ছেলেকে যদি বাস্তুকার বা যন্ত্রবিৎ হতেই হয় তাহলে সাত বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করে তাকে বিশেষ পাঠ্যক্রমের পাঠ নেবার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতর মহাবিদ্যালয়ে যেতে হবে।"

"আর একটি বিষয়ের উপর জোর দেব। শিক্ষাকে বাডীর শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি বলে কুটীরশিল্পের প্রতি তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। শরীর-শ্রমকে একটা হীন কাজ বিবেচনা করা হয় এবং বর্ণপ্রথার বীভৎস বিকৃতিসাধন করে সুতা কাটা কাপড বোনা ছুতার অথবা চর্মকারের কাজকে আমরা নীচ জাতি—নিঃস্বদের পেশা বলে মনে করি। হাতের কাজকে দক্ষতা বিবর্জিত হীন একটা কিছু মনে করার এই পাপপ্রথার জন্য আমাদের ভিতর ক্রম্‌পটন অথবা হারগ্রীভ-এর মত যন্ত্রবিৎ-এর আবির্ভাব হয় নি। এই সব পেশাকে যদি লেখাপড়া শেখার মতই স্বাধীন ও সম্মানজনক বৃত্তি বলে মনে করা হত তাহলে আমাদের শিল্পীদের ভিতর থেকেও মহান্ আবিষ্কারকের উদ্ভব হত। অবশ্য 'স্পিনিং জেনি'-এর ফলে বাষ্পশক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট সহস্র সহস্র শ্রমিককে বেকার করে দেবার অন্যান্য জিনিসের আবিষ্কার হয়। আমার মতে সে-সব দানবীয় ব্যাপার। গ্রামের উপর জোর দিয়ে আমরা দেখব যে-কোন হাতের কাজ খুঁটিয়ে শেখার ফলে যে ব্যাপক দক্ষতা অর্জিত হবে তা সামগ্রিক

ভাবে গ্রামের কল্যাণসাধনের বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হবে ও গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়-তার পরিপূর্তি করবে।"

হরিজন, ১৮-৯-১৯৩৭

ওয়ার্ধার শিক্ষাসম্মেলন

ক

[সম্মেলনে বিবেচনার জন্য গান্ধীজী নিম্নোদ্ধৃত মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন]

১॥ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি কোনক্রমেই দেশের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। উচ্চশিক্ষার প্রতিটি শাখায় জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ইংরেজী হওয়াতে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর বিভেদের এক স্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। এই কারণে এঁদের কাছ থেকে পরিস্রাবিত হয়ে জনসাধারণের কাছে জ্ঞান পৌছবার পথে বহু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজীর উপর এইভাবে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপর এত অধিক মাত্রায় চাপ পড়েছে যে প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের মানসিক শক্তি পঙ্গু হয়ে গেছে এবং তাঁরা নিজভূমে পরবাসীতে পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পের শিক্ষণ সন্নিবিষ্ট না থাকাব জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎপাদনমূলক কার্যের পক্ষে একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েছেন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর ফলে তাঁদের হানি হয়েছে। আজ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে ব্যয় হচ্ছে, তা একেবারেই নিরর্থক। কারণ ছাত্রদের যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, অত্যল্পকালের ভিতরই তারা তা বিস্মৃত হয় এবং শহর ও গ্রামের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিক্ষার মূল্য এক কানা-কড়িও নয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা যতটুকু লাভ হয়, দেশের করদাতৃবর্গের অধিকতম অংশ তার ফলভোগ করতে পারে না। তাদের শিশুদের কপালে কিছুই জোটে না বললেই চলে।

২॥ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অন্যূনপক্ষে সাত বৎসরের হওয়া উচিত। এই সময়ের ভিতর ছাত্রদের অন্ততঃ প্রবেশিকার মান অবধি সাধারণ জ্ঞান পাওয়া প্রয়োজন। নূতন পরিকল্পনায় অবশ্য ইংরেজী থাকবে না। তার পরিবর্তে কোন এক সুষ্ঠু শ্রমশিল্প ছাত্রকে শেখানো হবে।

৩॥ বালক-বালিকাদের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব সমগ্র

শিক্ষা কোন-না-কোন শিল্পের মাধ্যমে দেওয়া উচিত ও এর ফলে ছাত্ররা অধ্যয়নকালেই কিছু-না-কিছু উপার্জন করতে সক্ষম হবে; অর্থাৎ আমার বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে শিল্প দ্বারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। প্রথমতঃ ছাত্র সেই শিল্প দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ও নিজ পরিশ্রমের সাহায্যে নিজ শিক্ষার ব্যয় উপার্জন করবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিল্প দ্বারা বালক ও বালিকাদের আদর্শ নর ও নারী হবার উপযুক্ত সর্ববিধ গুণ এবং শক্তির পূর্ণ বিকাশ হওয়া প্রয়োজন।

পাঠাশালার জমি, ঘর-দুয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাবদ ব্যয় ছাত্রদের পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্তির কল্পনা করা হয় নি।

কাপাস, রেশম এবং পশমের সাফাই থেকে আরম্ভ করে ধুনাই, কাতাই, রঞ্জন, মাড় দেওয়া, তানা করা, দোসুতি করা, বোনা ও নানারকম নক্শা করা ইত্যাদি শিল্প প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ ছাড়া সূচী-শিল্প সেলাই কাগজ তৈরী করা ও কাটা, দপ্তরী ও ছুতারের কাজ, খেলনা তৈরী করা, গুড় উৎপাদন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্প অতীব সহজে শেখা যায় এবং বিদ্যালয়ে এই সব কাজ শুরু করার জন্য খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

এই প্রকার প্রাথমিক শিক্ষার ফলে বালক-বালিকারা নিজ জীবিকা উপার্জন করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। যে শিল্পের শিক্ষা তারা পাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেই সব শিল্পে তাদের নিযুক্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে। অথবা রাষ্ট্র-নির্ধারিত মূল্যে সরকার তাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করবে।

৪॥ উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়, প্রযুক্তি-শিল্প রম্যরচনা ও চারু-কলার ক্ষেত্রে জাতির চাহিদা পূরণের দায়িত্ব থাকবে বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর।

রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিছক পরীক্ষা নেবার প্রতিষ্ঠান হবে এবং তাদের খরচ চলবে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরীক্ষাশুল্ক থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যক্রম তৈরী ও অনুমোদনের দায়িত্বও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চলবে না। দক্ষ এবং যোগ্য লোকেরা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়লে সহজেই তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাবে। একথা ধরে নেওয়া হবে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা

দপ্তর পরিচালনা করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের কোন অতিরিক্ত ব্যয় হবে না।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

খ

[দ্বিতীয় দিনে সমিতির খসড়া প্রস্তাবসমূহ সম্মেলনের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলির মর্ম নিম্নরূপ :]

১॥ এই সম্মেলন মনে করে যে সমগ্র জাতিকে সাত বছর ব্যাপী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

২॥ শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

৩॥ সাত বছরের এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন রকম উৎপাদনমূলক শরীর-শ্রমকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হবে—মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাব এই সম্মেলন অনুমোদন করছে। এই সম্মেলন তাঁর এই বক্তব্যও সমর্থন করছে যে শিশুর সব রকমের যোগ্যতার বিকাশ এবং তার প্রশিক্ষণের জন্য তার পরিবেশ-নির্ভর কোন হাতের কাজের সঙ্গে যথাসম্ভব তার অন্তরঙ্গ সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

৪॥ সম্মেলন আশা করে যে এই শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমশঃ শিক্ষকদের বেতন উপার্জন করা সম্ভবপর হবে।

হরিজন, ৩-১০-১৯৩৭

গ

তিনি (গান্ধীজী) বলেন যে শিক্ষার পূর্বোক্ত মূলসূত্র প্রাথমিক এবং কলেজের শিক্ষা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে তাঁদের প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে ধরছেন। কারণ আমাদের গ্রামের যে অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষার স্বাদ পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডির উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এই সব গ্রাম্য ছেলেমেয়ে যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, তাদেরই প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ করে তিনি বলছিলেন।...

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

তাঁর দৃঢ় অভিমত এই যে বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি কেবল অপচয়মূলক নয়, ক্ষতিকারকও বটে। নিজের পিতামাতা ও বংশগত বৃত্তির দিক থেকে অধিকাংশ ছেলের নামই খরচের খাতায় লেখা। তারা কুঅভ্যাস শেখে, শহুরে আদব-কায়দাদুরস্ত হয় এবং এমন বিষয় সম্বন্ধে তাদের ভাসা-ভাসা জ্ঞান হয় যা আর যাই হোক অন্ততঃ শিক্ষা নয়। তাঁর মতে এর প্রতিকার হল হাতের কাজ বা শরীর-শ্রম মারফৎ শিক্ষা দেওয়া।

তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হাতের কাজটি নয়, হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি সব রকমের জ্ঞান শরীর-শ্রমের মারফৎ দিতে হবে। কথা উঠতে পারে যে মধ্যযুগে তো এ ছাড়া আর কিছু শেখানো হত না। কিন্তু তখন যে বৃত্তি শেখানো হত তার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এ যুগে বিভিন্ন বৃত্তির লোকেরা কেরানীর চাকরি নেওয়ায় নিজেদের বংশগত বৃত্তি ভুলে যাচ্ছেন এবং গ্রামও তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাচ্ছে না। এর ফলে দেশের যে অঞ্চলেই যান না কেন কোন সাধারণ গ্রামে ভাল ছুতোর বা কামার দেখতে পাওয়া যায় না। হস্তশিল্প প্রায় উচ্ছন্নে গেছে এবং চরখাকে উপেক্ষা করায় ল্যাঙ্কাশায়ারে গিয়ে তা ইংরেজদের উদ্ভাবনী শক্তির দৌলতে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সকলেরই চোখের সামনে রয়েছে। যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সত্ত্বেও তিনি একথা বলছেন।

তকলী—একটি উৎপাদনকারী খেলনা

প্রত্যক্ষভাবে কোন হাতের কাজের কলা ও বিজ্ঞান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মারফৎ শিক্ষা দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে। উদাহরণস্বরূপ তকলীতে সুতা কাটতে শেখানোর মানেই হল বিভিন্ন ধরনের তুলা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মাটি, এদেশের হস্তশিল্পের ধ্বংসের ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের বিবরণ-সহ এর রাজনৈতিক কারণ ও গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।…

তিনি যে তকলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার একাধিক কারণ আছে। তাঁরা তাহলে তাঁকে (গান্ধীজীকে) তকলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। কারণ তকলীর সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ এবং এর শক্তি ও রহস্যের স্বাদ তিনি পেয়েছেন। এ ছাড়া একমাত্র বস্ত্র তৈরীর কলাকেই সর্বত্র শেখানো যায় ও তকলীতে বিশেষ কোন খরচ নেই।…

তিনি যে সাত বছরের পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করেছেন তার ফলে তকলীর শিক্ষা শেষ পর্যন্ত রঙাই নক্শা তোলা সহ বুনাই-এর বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যন্ত যাবে।...

শিক্ষাকে দেশের কোটি কোটি শিশুর কাছে সহজলভ্য করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় ছাত্রদের শরীরশ্রমে উৎপন্ন পণ্যের দ্বারা শিক্ষকের ব্যয় নির্বাহের উপর তিনি এত জোর দিচ্ছেন। যতদিন না প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হচ্ছে অথবা যতদিন না বড়লাট সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করছেন কিংবা এই জাতীয় আর কোন আশায় অপেক্ষা করা যেতে পারে না। শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি এই কথা মনে রাখতে বললেন যে সাফাই স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি খাদ্যবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রাথমিক তত্ত্ব এবং নিজের কাজ নিজে করে নেওয়া ও বাড়ীতে বাবা-মায়ের কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি এই প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ হবে। এ যুগের ছেলেরা সাফাই সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিজের কাজ নিজেরা করতে পারে না এবং তাদের স্বাস্থ্য একেবারেই শোচনীয়। তিনি তাই সঙ্গীত সমন্বিত কুচকাওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে ছেলেদের শরীরচর্চা করাবেন।

একমাত্র পন্থা

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে তিনি পুঁথিপত্রের শিক্ষার বিরোধী। এ অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। তিনি কেবল দেখিয়ে দিতে চান যে কোন্ পন্থায় এই শিক্ষা দিতে হবে। তাঁর পরিকল্পনার স্বাবলম্বনের দিকটিকেও আক্রমণ করা হয়েছে। একদিকে বলা হল যে আমাদের পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে। অন্যদিকে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমরা শিশুদের শোষণ করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ কেউ আশঙ্কা করেন যে এ পরিকল্পনায় জাতীয় সম্পদের অপচয় হবে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এ আশঙ্কা অমূলক। শিশুদের শোষণ করা অথবা তাদের ভারাক্রান্ত করা সম্বন্ধে তিনি বলতে চান যে শিশুকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার নাম কি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া? তকলী একটি ভাল খেলনা। আর আজও শিশুরা তাদের মা-বাবাকে কিছুটা সাহায্য করে। সেগাঁওএর শিশুরা বাবার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করে বলে কৃষিকার্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান তাঁর চেয়ে ভাল। শিশুকে সুতা কাটতে প্রোৎসাহিত করে তার পিতার কৃষি থেকে

প্রাপ্ত আয়ের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করে পিতাকে সাহায্য করতে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে সে কেবল নিজ পিতামাতা অথবা গ্রামের নয়, সে সমগ্র দেশেরও এবং তাই দেশবাসীর প্রতি তার কিছু কর্তব্যও আছে। এই একমাত্র পন্থা। মন্ত্রীদের তিনি বলতে চান যে খয়রাত হিসাবে শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের তাঁরা অসহায় করে ফেলবেন। নিজেদের শিক্ষার ব্যয় নিজেদের পরিশ্রমে উপার্জন করতে শেখালে ছাত্ররা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে গড়ে উঠবে।

এই শিক্ষাব্যবস্থা হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকলের জন্ত। তিনি ধর্মীয় শিক্ষার উপর কেন জোর দিচ্ছেন না—তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। সকলকে বাস্তব ধর্ম—স্বাবলম্বনের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন বলে এর প্রয়োজনীয়তা নেই।

বাধ্যতামূলক সেবা

গান্ধীজী আরও বললেন: এইভাবে শিক্ষিত প্রতিটি ছাত্রকে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। এদের জন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সমস্যার সমাধানকল্পে অধ্যাপক শাহ্ বাধ্যতামূলক সেবার প্রস্তাব গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। ইতালী এবং অন্যান্ত দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি এই প্রস্তাবের মূল্য দেখাবার প্রয়াস করেছেন। মুসোলিনী যদি ইতালীর যুবসম্প্রদায়কে দেশসেবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করে থাকেন তাহলে আমরাই বা পারব না কেন? নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন শুরু করার পূর্বে এক বছর বা আরও কিছু বেশী সময়ের জন্ত তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক সেবা নেওয়াকে কি দাসত্ব আখ্যা দেওয়া ন্তায়সঙ্গত হবে? বিগত সতের বছরে দেশের যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতার আন্দোলনের সাফল্যের জন্ত বহু ত্যাগস্বীকার করেছেন। গান্ধীজী তাই স্বেচ্ছায় তাঁদের জাতির সেবার জন্ত আরও একটি বছর দেবার জন্ত আহ্বান জানাবেন। এ ব্যাপারে যদি আইন প্রণয়ন করতে হয় তবে তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার বলা চলবে না। কারণ আমাদের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের অনুমোদন না থাকলে সে আইন বিধিবদ্ধ হতে পারবে না।

অহিংসা ভিত্তিক

গান্ধীজী তাঁর স্বাবলম্বী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার মূলনীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করলেন। তিনি বললেন, "...অহিংসা থেকে এই পরিকল্পনার উদ্গম। সম্পূর্ণরূপে মাদক দ্রব্য বর্জন করার জন্য জাতি যে সংকল্প করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেও আপনাদের আমি নিবেদন করতে চাই যে যদি রাজস্বের কোন ঘাটতি না হয় এবং আমাদের রাজকোষ যদি ভরাও থাকে আমাদের ছেলেদের শহুরে করে তোলার ইচ্ছা না থাকলে এই শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। দেশের ছেলে-মেয়েদের আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও জাতির সত্যকার চারিত্র্যধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি করে তুলতে হবে। স্বাবলম্বী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা ছাড়া জাতির এ উত্তরাধিকার তারা পাবে না। ইউরোপ আমাদের উদাহরণস্থল নয়। ইউরোপ হিংসায় বিশ্বাসী বলে তদনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করে। রাশিয়ার সাফল্যকে আমি আদৌ ছোট করে দেখাতে চাই না কিন্তু সেখানকার সমস্ত কাঠামোও হিংসা ও জবরদস্তির উপর খাড়া রয়েছে। ভারত যদি হিংসা পরিহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে থাকে তাহলে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অনুশীলন হিসাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি তাকে গ্রহণ করতেই হবে। বলা হয়ে থাকে যে ইংলণ্ড শিক্ষাখাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। আমেরিকাও একই পথের পথিক। আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে ঐ সব দেশের ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ শোষণলব্ধ। শোষণকলাকে ঐ সব দেশ একেবারে বিজ্ঞানে পর্যবসিত করেছে এবং তাই তাঁরা নিজেদের দেশের ছেলেমেয়েদের ঐ রকম ব্যয়বহুল শিক্ষা দিতে পারেন। আমরা কাউকে শোষণের কথা চিন্তা করতে পারি না এবং করবও না। তাই অহিংসাভিত্তিক এই শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

ঘ

বিকেলে গান্ধীজী কয়েকটি সমালোচনার উত্তর দিয়ে সম্মেলনের কাজের সূত্রপাত করলেন। তকলীই একমাত্র জিনিস নয়, তবে তকলীই একমাত্র জিনিস যাকে সর্বত্র কাজে লাগানো যায়। এছাড়া কাগজ তৈরী, তালখেজুরের গুড় তৈরী, ইত্যাদি শিল্পকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। মন্ত্রীদের কাজ হবে

কোন্ বিদ্যালয়ে কোন্ শিল্প সব চেয়ে ভাল চলবে তার আবিষ্কার করা। যন্ত্র-প্রেমীদের তিনি সতর্ক করে দিতে চান যে যন্ত্রের উপর খুব বেশী জোর দিলে মানুষেরই যন্ত্রে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে। যাঁরা যন্ত্রযুগের আওতায় বাস করতে চান তাঁদের কাছে তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনার মূল্য নেই। তিনি তাঁদের আরও জানিয়ে দিতে চান যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রামবাসীদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। যে দেশে ত্রিশ কোটি জীবিত যন্ত্র রয়েছে সেখানে নূতন জড় যন্ত্র আনার কথা চিন্তা করা নিরর্থক। ডঃ জাকির হোসেন-এর একথা ঠিক নয় যে আদর্শ-গত পটভূমিকা যাই হোক না কেন শিক্ষার দৃষ্টিতে এ পরিকল্পনা যথার্থ। প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনৈকা মহিলা কয়েক দিন পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তিনি মন্তব্য করেন যে প্রজেক্ট পদ্ধতির সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পনার দুস্তর পার্থক্য। গান্ধীজী কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না হলে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলবেন না। আমাদের নিজেদের লোকেরা যদি যথাযথভাবে কাজ করেন তাহলে এই সব বিদ্যালয় থেকে দাস-এর সৃষ্টি হবে না, আদর্শ কারিগর বেরিয়ে আসবে আমাদের বিদ্যালয়গুলি থেকে। শিশুরা যে কোন রকমের শ্রমই করুক না কেন তার মূল্য নিশ্চয়ই ঘণ্টায় দুই পয়সা হবে।

তবে সকলকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চান যে নিছক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে কেউ যেন কোন কিছু গ্রহণ না করেন। তিনি প্রায় মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত এবং তাই জনসাধারণের গলার মধ্যে কোন কিছু জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা তিনি স্বপ্নতেও চিন্তা করতে পারেন না। বেশ ভাল করে সব দিক সম্বন্ধে খুঁটিয়ে চিন্তা করে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে কিছু দিন পরই একে বর্জন করতে না হয়। অধ্যাপক শাহ-এর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সহমত যে কর্মহীনদের জন্য কর্মের সংস্থান করতে না পারলে রাষ্ট্রের মূল্য এক কড়া কড়িও নয়। কিন্তু বেকারদের খয়রাতি সাহায্য দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি তাই সকলকে কাজ দেবেন এবং টাকা দিতে না পারলেও কাজের বিনিময়ে খাবার দেবেন। খেয়েদেয়ে ফুর্তি করার জন্য ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের ভাত রোজগার করার জন্য আমাদের জন্ম।

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

অহিংস ভিত্তি

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত বনিয়াদী শিক্ষা পর্ষৎ-এর এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী নঈ তালিমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, "...আমি বলছি মাত্র এই কারণে আপনারা কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করবেন না। যা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কেবল তা-ই বিশ্বাস করুন।—তবে আমি এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় যে মাত্র দুটি বিদ্যালয়ও যদি আমরা সঠিক পন্থায় পরিচালিত করতে পারি তাহলে আমি আনন্দে নৃত্য করব।"

সঠিক পন্থা-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এই সব প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়কে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। আমাদের সব রকমের সমস্যা—যার মধ্যে প্রমুখ হল সাম্প্রদায়িক বিরোধ, তার সমাধান যেন আবিষ্কৃত হয় এই বিদ্যালয়ে। এর জন্য আমাদের অহিংসার উপর জোর দিতে হবে। হিটলার ও মুসোলিনীর দেশের বিদ্যালয়ে হিংসাকে মূল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের আদর্শ হবে কংগ্রেস কথিত অহিংসা। সুতরাং অহিংস পদ্ধতিতে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমাদের গণিত বিজ্ঞান ইতিহাস—সবেরই একটা অহিংস আবেদন থাকবে এবং এর পাঠও অহিংসার রঙে রঞ্জিত হবে। জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে মাদাম হালিদা এদিব হানুম যখন তুরস্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, আমি তখন মন্তব্য করেছিলাম যে সাধারণতঃ ইতিহাস রাজারাজড়ার কুলপঞ্জি ও তাঁদের যুদ্ধসমূহের বিবরণ হলেও ভবিষ্যৎ ইতিহাস হবে মানুষের ইতিবৃত্ত। আর এই ইতিবৃত্ত অহিংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না এবং নয়ও। অতএব আমরা শহরের শিল্পের উপর জোর দিতে পারি না, আমাদের নজর দিতে হবে গ্রামীণ শিল্পের উপর। অর্থাৎ দেশের এক ভগ্নাংশকে নয়, সমগ্র দেশের সাত লক্ষ গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের গ্রামীণ হস্তশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আর আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন যে এই সব হস্তশিল্পের মাধ্যমে যদি আমরা উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারি তাহলে আমরা দেশে এক বিপ্লব আনয়ন করব। আমাদের পাঠ্যপুস্তক-সমূহকেও অনুরূপ লক্ষ্য সাধনের উপযুক্ত করে রচনা করতে হবে।

হরিজন, ৭-৫-১৯৩৮

পশ্চিম থেকে আমদানি করা নয়

[ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত বনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত করেন তার প্রতিবেদন "বেসিক ন্যাশনাল এডুকেশন" বা বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।]

এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণের এক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে দেখে মনে হয় যে ডঃ জাকির হোসেন এবং তাঁর কমিটি যাকে বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা আখ্যা দিয়েছেন তা দেশে-বিদেশে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি অধিকতর সঠিক নাম দেওয়া যায় যদিও সেটি বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা নামটির মত অত আকর্ষণীয় হবে না। এ নাম হল গ্রামের হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জাতীয় শিক্ষা। "গ্রামীণ"-এর ভিতর তথাকথিত উচ্চতর অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা পড়ে না। আর বর্তমানে "জাতীয়" বলতে সত্য ও অহিংসা বোঝায়। "গ্রামের হস্তশিল্পের মাধ্যমে" বলতে এই কথা বোঝায় যে এই পরিকল্পনার জনকেরা চান যে শিক্ষকেরা এমন ভাবে গ্রামের শিশুদের নিজ নিজ গ্রামে শিক্ষা দেবেন যাতে কোন নির্বাচিত গ্রাম্য হস্তশিল্পের মারফৎ বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধ এবং হস্তক্ষেপের পরিবেশমুক্ত হয়ে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহের সম্যক্ বিকাশ সাধন করতে পারে। এই ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে পরিকল্পনাটি গ্রামের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এ পরিকল্পনা পশ্চিম থেকে আমদানি করা নয়। পাঠক এই কথা মনে রাখলে এই যে পরিকল্পনাটি রচনা করার জন্য দেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন, তাকে ভাল করে বুঝতে পারবেন।

সেগাঁও ২৫-৫-১৯৩৮

নঈ তালিমের কাছে আশা

নঈ তালিমের নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বোঝা দরকার। পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতির ভালটুকু অবশ্যই নঈ তালিমে রাখা হবে; কিন্তু এছাড়া এতে অনেক নূতন জিনিস থাকবে। নঈ তালিম যথার্থই নূতন হলে এর ফল হবে নিম্নরূপ: আমাদের হতাশার মনোবৃত্তি চলে গিয়ে আশার সঞ্চার হবে, আমাদের দৈন্য ও বুভুক্ষার বদলে আসবে নিজেদের ব্যয়ভার-নির্বাহের উপযুক্ত সচ্ছলতা, বেকারত্বের

পরিবর্তে শিল্প ও কর্মের কলগুঞ্জন আর অনৈক্যের স্থলে ঐক্য। আমাদের ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে শিখবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিখবে এমন একটি হাতের কাজ যার মাধ্যমে তারা উত্তরোত্তর জ্ঞানার্জন করবে।

উতমানগাই, ১৪-১০-১৯৩৮

সংশয় নিরশন

প্রতিনিধিরা গান্ধীজীকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা কি কালের কষ্টিপাথরে টিকবে, না এ কেবল একটা সাময়িক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনে করেন যে শীঘ্র হোক অথবা ভবিষ্যতে হস্তশিল্প ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তর যন্ত্রীকরণের শরণ নিতে হবে। বনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত এবং ন্যায়বিচার সত্য ও অহিংসার আধারে দণ্ডায়মান কোন সমাজ কি যন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার প্রচণ্ড চাপ বরদাস্ত করতে সক্ষম?

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "প্রশ্নটি বাস্তব নয়। আমাদের অবিলম্বে করণীয় কাজের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। আজ থেকে কয়েক পুরুষ পর কি হবে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হল বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোকের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্তিতে সক্ষম কিনা। ভারতবর্ষ এমনভাবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত হবে যে দেশে গ্রাম বলতে কোন কিছু থাকবে না—এমন অবস্থা আদৌ কোনদিন আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ চিরকালই গ্রাম দ্বারা গঠিত হবে।

"দেশকে যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেও কংগ্রেস দেশের সম্মুখে আজ যে আদর্শ পেশ করেছে তা যন্ত্রীকরণের নয়। বোম্বাই-এ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে এ আদর্শ হল গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন। কৃষকদের সম্মুখে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্য যতই বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করুন না কেন তার দ্বারা জনজাগৃতি ঘটানো সম্ভব নয়। এর দ্বারা তাদের আয় এক পয়সাও বাড়বে না। কিন্তু অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এবং গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গ্রামবাসীদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দেবে।...বনিয়াদী শিক্ষা ঐসব প্রতিষ্ঠানেরই এক অঙ্গ। শিক্ষামন্ত্রীদের পরিবর্তন হলেও এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে যাবে। সুতরাং বনিয়াদী শিক্ষাপ্রেমীরা

কংগ্রেসের রাজনীতি নিয়ে যেন দুশ্চিন্তা না করেন। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা নিজের যোগ্যতার বলে বাঁচবে আর তার অভাব হলে মরবে।"

মূল আদর্শ

সভায় উপনীত হবার পূর্বে জনৈক বন্ধু গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শ কি এই যে তকলীর সঙ্গে যে সব বিষয়ের সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর নয়, সে সব বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে শিক্ষকরা একটি কথাও বলবেন না? সাধারণ সভায় এই প্রশ্নটির উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন:

"এ আমার প্রতি মিথ্যা নিন্দারোপ! আমি সত্যসত্যই একথা বলেছি-যে সব রকমের শিক্ষাই কোন না কোন মূল হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। সাত বা দশ বছরের কোন ছেলেকে যখন কোন শিল্পের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে তখন প্রথম দিকে যেসব বিষয়কে সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না, তার শিক্ষা মুলতবী রাখাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যহ এরকম করলে দেখতে পাবেন যে এমন অনেক বিষয়কে হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করার উপায় পাওয়া যাচ্ছে যা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। প্রথমে বাদ দেওয়ার এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে আপনার নিজের ও ছাত্রদের পরিশ্রম বাঁচাতে পারবেন। আমাদের কাজের নির্দেশদানকারী কোন বই বা পদ্ধতি আজ আমাদের সামনে তৈরি নেই। এইজন্য আমাদের ধীরে-সুস্থে এগোতে হবে। প্রধান কথা হল এই যে শিক্ষক তাঁর মনের সজীবতা বজায় রাখবেন। আপনারা যদি এমন কোন বিষয় পান যাকে শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে পারছেন না তবে তার জন্য বিচলিত হয়ে হতাশা বোধ করবেন না। সাময়িক ভাবে সে বিষয় ছেড়ে দিয়ে সেই সব বিষয় নিয়ে অগ্রসর হোন যার সঙ্গে হাতের কাজের সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। এমন হতে পারে যে অন্য কোন শিক্ষক সেই সব বিষয়ের সমন্বয় সাধনের সঠিক পন্থা উদ্ভাবন করবেন। আর অনেকের অভিজ্ঞতার সার সংগৃহীত হলে আপনাদের কাজের সহায়ক বই রচিত হবে। তার ফলে আপনাদের পরবর্তী শিক্ষকদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।

"আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে কতদিন এই বাদ দিয়ে চলার নীতি দ্বারা চালিত হতে হবে? আমার জবাব হল—সমগ্র জীবনের জন্য। শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাবেন যে এমন অনেক বিষয় গ্রহণ করেছেন যা প্রথমে বর্জিত

ছিল এবং প্রত্যুত্ত গ্রহণ করার মত সব বিষয়ই গৃহীত হয়েছে আর অবস্থাগতিকে শেষ অবধি যা বর্জন করেছেন তা অত্যন্ত হাল্কা বিষয় ও বর্জন করারই উপযুক্ত। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাই এই। আমি যেসব কাজ করেছি তার অনেক-গুলিই করতে পারতাম না যদি না সমপরিমাণ কাজ আমি বর্জন করতাম।

"আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিপ্লব সংসাধন করতে হবে। মস্তিষ্ককে হাতের সাহায্যে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমি কবি হলে পাঁচ আঙুলের সম্ভাবনার সম্বন্ধে কবিতা রচনা করতাম। আপনারা কেন একথা মনে করবেন যে মনই সব কিছু এবং হাত-পা কিছুই নয়। শিক্ষার গতানুগতিক পথে যাঁরা চলেন এবং হাতকে যাঁরা গড়ে তোলেন না, তাঁদের জীবনে "সঙ্গীতের" অপ্রতুলতা ঘটে। তাঁদের সব বৃত্তি বিকশিত হয় না। কেবল জ্ঞান ছাত্রের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না এবং তাই তার মনকেও পূর্ণমাত্রায় টেনে রাখতে পারে না। কেবল কথার চাপে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ছাত্রের মনও সে-ধরনের পড়ায় বসে না। হাত চোখ কানের যা করা দেখা এবং শোনা উচিত নয়, তা-ই করে দেখে ও শোনে। আর তাদের যা করা দেখা ও শোনা উচিত, তা করে না দেখে না এবং শোনে না। তাদের সঠিক জিনিসটি বেছে নিতে শেখানো হয় না এবং তাই সময় সময় শিক্ষা সর্বনাশ ডেকে আনে। যে শিক্ষা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় না অথবা যা ভালকে গ্রহণ করতে ও মন্দকে বর্জন করতে শেখায় না তা শিক্ষা নামের অযোগ্য।"

হাতের সাহায্যে মনের শিক্ষা

হাতের মাধ্যমে কি করে মনের প্রশিক্ষণ হতে পারে সে সম্বন্ধে সকলকে বুঝিয়ে দেবার জন্ত শ্রীমতী আশা দেবা গান্ধীজীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন।

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "পুরাতন মত অনুসারে বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একটি হাতের কাজ যোগ করা হত। অর্থাৎ হাতের কাজকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত ভাবে গ্রহণ করা হত। আমার একে এক মারাত্মক ভ্রম বলে মনে হয়। শিক্ষককে সেই হাতের কাজটি ভাল ভাবে জানতে হবে এবং নিজের জ্ঞানকে সেই কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে হবে যাতে তিনি ছাত্র কর্তৃক নির্বাচিত সেই হাতের কাজের মাধ্যমে তাকে সর্বপ্রকারের জ্ঞান দিতে পারেন।

"সুতা কাটার উদাহরণ নিন। অঙ্ক না জানলে রোজ তকলীতে আমি কত

গজ সুতা কেটেছি তার হিসাব দিতে পারব না অথবা তাতে কত তার হবে কিংবা সেই সুতার নম্বর কত তাও বলতে পারব না। এ কাজ করার জন্ত প্রথমতঃ আমাকে সংখ্যাগুলি শিখতে হবে এবং তারপর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও শিখে নিতে হবে। জটিল অঙ্ক করার জন্ত আমাকে প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করা শিখতে হবে ও এইভাবে বীজগণিত এসে পড়বে। তবে রোমান হরফ-এর বদলে হিন্দুস্থানী বর্ণমালা ব্যবহার করার উপর আমি জোর দেব।

"এর পর জ্যামিতির কথা ধরুন। বৃত্ত সম্বন্ধে শেখাতে হলে তকলীর চাকতির চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? এইভাবে এমন কি ইউক্লিডের নাম একবারও উচ্চারণ না করেই আমি বৃত্ত সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারি।

"তারপর আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে কাতাই-এর মাধ্যমে কি করে আপনি ছেলেমেয়েদের ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেবেন? কিছুদিন পূর্বে আমি "কাপাস—মানবজাতির কাহিনী" নামক একটি বই পড়েছিলাম। বইটি পড়ে আমি চমৎকৃত হলাম। পড়তে এটি একটি উপন্যাসের মত। প্রাচীন কালের ইতিহাস বিবৃত করে বইটি শুরু হয়েছে। কোথায় কিভাবে সর্বপ্রথম কাপাসের চাষ হয়, এর বিকাশের ধারা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কাপাসের বাণিজ্য ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের এইভাবে পড়াতে পড়াতে বিভিন্ন দেশের প্রসঙ্গ এলে সেই সব দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধেও ছাত্রদের কিছুটা জ্ঞান দেওয়া যায়। বিভিন্ন যুগে কার কার রাজত্বকালে কোন্ কোন্ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? কোন্ কোন্ দেশ কাপাস আমদানি করে আর কেনই বা কোন কোন দেশকে কাপড় আমদানি করতে হয়? সব দেশ নিজের প্রয়োজনীয় কাপাস উৎপাদন করে নিতে পারে না কেন? এর থেকে অর্থশাস্ত্র ও প্রাথমিক কৃষিবিজ্ঞান এসে যাবে। কাপাসের বিভিন্ন জাতি, কোন্ ধরনের মাটিতে কোন্ কাপাস জন্মায় ও কিভাবে তার চাষ করতে হয় এবং কোথায় কোন্‌টি পাওয়া যায় ইত্যাদির জ্ঞান ছাত্রদের আমি দেব। এইভাবে তকলীতে সুতা কাটা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পূর্ণ ইতিহাসে চলে যাওয়া যায়। কেন তারা এ দেশে এল, কিভাবে তারা আমাদের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসসাধন করল, যে আর্থিক উদ্দেশ্য চালিত হয়ে গোড়ার দিকে তারা এখানে এসেছিল তার পরিপুষ্টির জন্ত পরে তারা কেমন করে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং কিভাবে এর কারণ মোগল ও মারাঠা রাজত্বের পতন হয়ে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের পত্তন হল এবং তারপর কিভাবে আমাদের যুগের জনজাগৃতি এল—

এ সবই তকলীতে সূতা কাটাকে কেন্দ্র করে পড়ানো যায়। সুতরাং নঈ তালিমের শিক্ষাবিষয়ক সম্ভাবনা অফুরন্ত। আর নিজের মন ও স্মৃতিশক্তির উপর অহেতুক চাপ না দিয়ে অতীব শীঘ্র শিশু এসব শিখবে।

"বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝাই। জীববিৎকে যেমন ভাল জীববিৎ হতে হলে জীববিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানও শিখতে হয়, বনিয়াদী শিক্ষাও (একে যদি বিজ্ঞান বলে মনে করা হয়) তেমনি আমাদের জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় নিয়ে যায়। আবার তকলীর উদাহরণ নেওয়া যাক। সূতা কাটার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে (শিক্ষককে অবশ্য সূতা কাটায় দক্ষ হতে হবে) জিনিসটির মূল নীতির উপর নজর দিলে তিনি তকলীর বিভিন্ন দিকের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। তকলী কেন লোহার শলাকা ও তামার চাকতির সহযোগে তৈরী হয়—এ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগবে। প্রথম যুগে তকলীর চাকতি যেমন তেমন করে তৈরী হত। আরও প্রাচীনকালে তকলী তৈরী হত কাঠের শলা এবং শ্লেট বা মাটির চাকতি দিয়ে। তকলীর বিকাশ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হয়েছে এবং পিতলের চাকতি ও লোহার বালা ব্যবহার করার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। তাঁকে সেই কারণ আবিষ্কার করতে হবে। তারপর শিক্ষককে মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে চাকতির ব্যাস অতটাই কেন—কেনই বা ওর বেশী বা কম নয়। আপনাদের ছাত্ররা যখন সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা করতে পারবে এবং এর গণিত সম্বন্ধে পারঙ্গম হবে তখন তারা সুদক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানীতে পরিণত হবে। তকলী তখন তার কামধেনু হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে যে পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আপনাদের উদ্যম ও বিশ্বাসের দ্বারাই কেবল এ সীমিত। আপনারা তিন সপ্তাহ যাবৎ এখানে আছেন। আপনারা যদি এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে থাকেন এবং এর সাফল্যের জন্য যদি "মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতনের" প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে থাকেন তাহলেই এতদিন এখানে থাকা সার্থক হয়েছে।

"সূতা কাটা আমি নিজে জানি বলেই বার বার এর উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যদি সূত্রধর হতাম তাহলে কাঠের কাজের মাধ্যমে আমার ছেলেকে এসব বিষয় শেখাতাম অথবা পিজবোর্ডের কারিগর হলে সেই শিল্পের মাধ্যমে।"

গান্ধীজী বলে চললেন, "মৌলিকতা-বিশিষ্ট শিক্ষাবিদই আমাদের কাম্য, সত্যকার প্রেরণার আগুন যাঁদের অন্তরে জলছে। ছাত্রদের তাঁরা কি শেখাবেন

সে সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত তাঁরা চিন্তা করবেন। মোটা মোটা কেতাবে শিক্ষক এ পাবেন না। শিক্ষককে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার গুণকে কাজে লাগাতে হবে এবং কোন হাতের কাজের মাধ্যমে মুখে মুখে ছাত্রদের শেখাতে হবে। এর অর্থ হল শিক্ষাপদ্ধতিতে বিপ্লব সাধন, শিক্ষকের দৃষ্টিকোণে বিপ্লব সংসাধন। এযাবৎ আপনারা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রতিবেদনের দ্বারা চালিত হয়েছেন। আপনারা পরিদর্শকদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে চেয়েছেন যাতে আপনাদের বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসাহায্যের বরাদ্দ বাড়ানো যায় অথবা নিজেদের বেতন বৃদ্ধি হয়। নূতন ধরনের শিক্ষক কিন্তু এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তিনি বলবেন, ছাত্রকে যদি আমি মানুষ হিসাবে উন্নততর করে গড়ে তুলে থাকি তাহলে তার প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে মনে করব। আর এই প্রক্রিয়ায় আমার সমগ্র শক্তি আমি নিয়োগ করেছি। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

হরিজন, ১৮-২-১৯৩৯

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের প্রথমে পৃথক ভাবে হাতের কাজটি শিখিয়ে তারপর সেই হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার যথাযথ পদ্ধতি শেখানো কি ভাল নয়? বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যে তাঁরা যেন নিজেদের সাত বছরের শিশু বলে মনে করেন এবং কোন হাতের কাজের মাধ্যমে সব বিষয়ে নূতন করে শেখেন। এই পন্থা অনুসরণ করলে তো নূতন পদ্ধতি শিখে যোগ্য শিক্ষক হতে তাঁদের বহু বছর সময় লেগে যাবে।

উত্তর: না, বহু বছর সময় লাগবে না। ধরে নেওয়া যাক যে শিক্ষক আমার কাছে আসার সময় কাজ চলার মত গণিত ইতিহাস ও অপরাপর বিষয় জানেন। আমি তাঁকে কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরী করতে অথবা সুতা কাটতে শেখানো শুরু করলাম। এই কাজ তিনি যখন করছেন তখন আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম যে সেই বিশেষ হাতের কাজের মাধ্যমে তিনি কিভাবে গণিত ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান পেতে পারতেন। এইভাবে নিজের জ্ঞানকে হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করার প্রক্রিয়া তিনি শিখলেন। এর জন্য খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। অপর একটি উদাহরণ নিন। ধরুন আমার সাত বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে আমি কোন বনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাওয়া আরম্ভ

করলাম। দুজনেই আমরা সুতা কাটা শিখছি এবং আমি আমার পূর্বতন জ্ঞানকে সুতা কাটার সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে শিখলাম। ছেলেটির কাছে সব কিছুই নূতন। আর সত্তর বছর বয়স্ক পিতার কাছে সব কিছুই পুনরাবৃত্তি হলেও তিনি নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন জ্ঞান পাবেন। তাই এই নূতন পদ্ধতি শিখতে তাঁর কয়েক সপ্তাহের বেশী সময় লাগার কথা নয়। সুতরাং শিক্ষক যদি আট বছরের বালকের মত গ্রহণশীলতা ও আগ্রহের পরিচয় দিতে না পারেন তাহলে তিনি যান্ত্রিক কাটুনী ছাড়া আর কিছু হতে পারবেন না এবং তাহলে তিনি নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবেন না।

প্রশ্ন: প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ কোন ছেলে ইচ্ছা করলে কলেজে যেতে পারে। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সমাপ্তকারী কোন ছেলেও কি তা পারবে?

উত্তর: প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ও বনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনকারী ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত জন অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ তার বৃত্তিসমূহের সম্যক্ বিকাশ হয়েছে। প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কলেজে গিয়ে প্রায়ই যেমন অসহায় বোধ করে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রের বেলায় তেমন হবে না।

প্রশ্ন: বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য ন্যূনপক্ষে সাত বছর বয়স হওয়া চাই স্থির হয়েছে। এই সাত বছর কি পঞ্জিকা মতে না মানসিক বয়স অনুসারে?

উত্তর: সাত বছর হল গড় ন্যূনতম বয়স। তবে কোন কোন ছাত্র এর চেয়ে বেশী বয়সের এবং কোন কোন ছাত্র কম বয়সেরও হতে পারে। শারীরিক এবং মানসিক—উভয় বয়সের কথাই বিবেচনা করতে হবে। সাত বছর বয়সের কোন শিশুর হয়ত হাতের কাজ করার উপযুক্ত যথেষ্ট দৈহিক বিকাশ হয়েছে। অপর শিশুটি হয়ত সাত বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তা পারে না। সুতরাং কোন বাঁধাধরা নিয়ম করা চলে না। এতদসংশ্লিষ্ট সব রকম বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে।

গান্ধীজী বলে চললেন, "প্রশ্নগুলির ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে অনেকের মনেই নানারকম সন্দেহ আছে। কাজ করার সঠিক পন্থা নয় এ। আপনাদের মনে প্রবল বিশ্বাস থাকা চাই। আমার মত আপনাদের মনেও যদি এই বিশ্বাস থাকে যে একমাত্র বনিয়াদী শিক্ষাই দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে জীবনের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে তাহলে আপনাদের কাজ সমৃদ্ধ

হবে। এ বিশ্বাস না থেকে থাকলে বুঝতে হবে যে আপনাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন গলদ আছে। তাঁরা আপনাদের আর কিছু দিতে পারুন বা না-ই পারুন এই বিশ্বাস যেন আপনাদের অন্তরে অঙ্কিত করতে সমর্থ হন।"

প্রশ্ন: ধরুন কোন গ্রামে তিনটি বিদ্যালয় আছে এবং সেগুলিতে বিভিন্ন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই তিনটি শিল্পের কোনটির মাধ্যমে যদি অপর দুটির চেয়ে অধিকতর জ্ঞান দানের-অবকাশ থাকে তাহলে শিশু এর মধ্যে কোন্‌টিতে যাবে?

উত্তর: এরকম ঘটা উচিত নয়। কারণ আমাদের অধিকাংশ গ্রামই এত ছোট যে সেখানে একাধিক বিদ্যালয় হতে পারে না। তবে বড় গ্রামে একাধিক বিদ্যালয় থাকতে পারে। তবে এরকম ক্ষেত্রে সব বিদ্যালয়ে একই হস্তশিল্প শেখানো হবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম আমি করতে চাই না। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বড় পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। বিভিন্ন শিল্পের কতটা জনপ্রিয় হবার ক্ষমতা আছে এবং কোন্‌টি ছাত্রের গুণাবলীর কতটা বিকাশ সাধন করতে পারে তা খতিয়ে দেখতে হবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে যে-কোন হাতের কাজই বাছা হোক না কেন, তা যেন শিশুদের গুণাবলী সম্পূর্ণ-ভাবে ও সমপরিমাণে বিকশিত করতে সক্ষম হয়। এই শিল্প হবে গ্রামীণ শিল্প এবং নিত্যকার জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

প্রশ্ন: শিশুর ভবিষ্যৎ জীবিকা যখন অন্য কিছু হবে তখন কেন সে কোন হস্তশিল্প শেখার জন্য সাত বছর সময়ের অপব্যয় করবে? অর্থাৎ মহাজনের ছেলেকে ভবিষ্যতে যখন মহাজনীই করতে হবে তখন কেন সে সাত বছর ধরে সুতা কাটা শিখবে?

উত্তর: যদি দেখা যায় যে এক মাস সুতা কাটা শেখানোর পর ছাত্রদের সে বিষয় নীরস মনে হচ্ছে তাহলে যে শিক্ষক সুতা কাটা শেখাচ্ছেন তাঁকে আমি বরখাস্ত করব। যেমন একই বাদ্যযন্ত্র থেকে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি হতে পারে তেমনি প্রত্যেকটি পাঠে অভিনবত্ব থাকবে। বার বার ছাত্রকে হাতের কাজ বদল করতে হলে তার অবস্থা হয় গৃহবিহীন শাখা থেকে শাখান্তরে ঝম্প-প্রদান-কারী বানরের মত।...বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সুতা কাটা শেখাতে হলে শিক্ষককে সুতা কাটা ছাড়া আরও বহু বিষয় শিখতে হয়। শীঘ্রই ছাত্রকে নিজের তকলী ও পয়েতা তৈরী করে নেওয়া শেখাতে হবে। সুতরাং আমার প্রথমের বক্তব্যের

পুনরুক্তি করে বলব যে শিক্ষক যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিচালিত হয়ে হস্তশিল্পকে গ্রহণ করেন তাহলে নিজের ছাত্রদের সঙ্গে তিনি নানা মাধ্যমে কথা বলবেন এবং সেগুলির সব কয়টিই ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপোষক হবে।

হরিজন, ৪-৩-১৯৩৯

বাধ্যতামূলক সূতা কাটা

"প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং জনসাধারণকে আপনি যদি এই মর্মে বাণী বা নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সুতা কাটা ও কাপড বোনা বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে আমার কোন সন্দেহ নেই যে অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের হাতে তৈরী কাপড় পরবে। এটা হবে প্রথম পদক্ষেপ। আপনার আদর্শে আমি বিশ্বাস হারাই নি। আমি এই আশা পোষণ করি যে প্রতিটি কুটিরে নিজ প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন হবে এবং আপনার গ্রামোদ্যোগ ও নয়ী তালিমের পথ গ্রহণ করে প্রতিটি গ্রাম কেবল বস্ত্রেই স্বাবলম্বী হবে না, জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য জিনিসেও স্বাবলম্বী হবে।..."

জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রী উপরোক্ত মর্মে লিখেছেন। আমার যদি কোন স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা থাকত তাহলে অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি সুতা কাটাকে বাধ্যতামূলক করতাম। সুতা কাটার উপর যে মন্ত্রীর বিশ্বাস আছে তিনি অন্ততঃ এরকম করবেন। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়। তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় হস্তকলাকে কেন বাধ্যতামূলক করা হবে না? তবে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন কিছুকে বাধ্যতামূলক করা যায় না। সুতরাং গণতন্ত্রে বাধ্যতামূলক কেবল কথার কথা। গণতন্ত্রের আওতায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অলসতা দূর করে, কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য করে না। এই রকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা শিক্ষার অঙ্গ। তবে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আমি একটি অপেক্ষাকৃত মৃদু ব্যবস্থাপত্র দেব। সেরা কাটুনীকে যেন পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা থাকে। এর আকর্ষণে সবাই না হলেও অধিকাংশ ছাত্রই সুতা কাটার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আস্থা না থাকলে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি বনিয়াদী

শিক্ষাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সূতা কাটা ও তার আনুষঙ্গিক সব কিছু কেবল পাঠ্যক্রমের অঙ্গ নয়, এসব শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত। আর বনিয়াদী শিক্ষা যদি দৃঢ়মূল হয় তাহলে আমাদের এই দরিদ্র দেশে খদ্দর নিঃসন্দেহে সর্বব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত সস্তা হবে।

হরিজন, ১৪-১০-১৯৩৯

শারীরিক শ্রম ও বুদ্ধির বিকাশ

গান্ধীজী বললেন, "আপনাদের মতে একজন এই অভিযোগ করেছেন যে (বনিয়াদী শিক্ষায়) শারীরিক শ্রমের উপর বড় বেশী জোর দেওয়া হয়। আমি শারীরিক শ্রমের শিক্ষাগত মূল্যের উপর খুবই বিশ্বাসী। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনকে শক্তিশালী করে তাকে চিরস্থায়ী করা। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় লালিত পালিত তাঁরা তাই স্বভাবতই একে পছন্দ করেন এবং দৈহিক শ্রম তাঁদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। সরকারী স্কুল-কলেজে কেউ ছাত্রদের রাস্তা বা পায়খানা পরিষ্কার করতে শেখানোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাফাই হল আপনাদের প্রশিক্ষণের বনিয়াদ। সাফাই এক সুন্দর চারুকলা এবং সযত্নে এ শেখা উচিত। যে-কোন রকমের জ্ঞান উপার্জনের প্রথম সোপান হল নিয়মিত ভাবে প্রশ্ন করা ও সুস্থ কৌতূহল-বৃত্তি জাগরূক রাখা। কৌতূহল-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শিক্ষকের প্রতি যথোচিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভাব থাকবে। এ যেন ঔদ্ধত্যে পরিণত না হয়। ঔদ্ধত্য মনের গ্রহণশীলতার শত্রু। বিনয় ও শেখার ইচ্ছা ছাড়া কোন জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না।

"বুদ্ধিপ্রয়োগে প্রয়োজনীয় শরীর-শ্রম করা বুদ্ধির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম পন্থা। অন্য উপায়েও অবশ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু সে সব পন্থায় বুদ্ধির সুসম বিকাশ হবে না, হবে বিসম বিকৃত পরিণতি। এর ফলে মানুষ সহজেই শয়তান বা শঠ-এ পরিণত হতে পারে। সুসম বুদ্ধির অর্থ হল শরীর মন ও আত্মার সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ। এই জন্য আমাদের এখানকার প্রশিক্ষণে দৈহিক শ্রমকে আমরা প্রধান স্থান দিয়ে থাকি। সামাজিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় শ্রমের মাধ্যমে যে বুদ্ধির বিকাশ হবে তা হবে সেবার উপাদান এবং সহজে তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা যাবে না অথবা তা উন্মার্গগামী হবে না।..."

হরিজন, ৮-৯-১৯৪৬

বনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব

দেশে আমাদের চতুর্দিকে যে পরিবেশ তাকে কেন্দ্র করে এবং তার চাহিদা মেটাতে বনিয়াদী শিক্ষার জন্ম। সুতরাং এর লক্ষ্য হল পরিবেশের চাহিদা মেটানো। এই পরিবেশ দেশের সাত লক্ষ গ্রামে তার কোটি কোটি অধিবাসীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এদের ভুলে গেলে ভারতবর্ষকেও ভুলে যেতে হয়। ভারতবর্ষকে তার শহরগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ ছড়িয়ে রয়েছে তার অসংখ্য গ্রামে।

বনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব নিম্নরূপ:

১. সব রকমের শিক্ষাকে শিক্ষা নামের যোগ্য হতে হলে স্বাবলম্বন ভিত্তিক হতে হবে। অর্থাৎ শেষ অবধি এর জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ছাড়া পৌনপৌনিক ব্যয় উপার্জন করতে হবে। অবশ্য পুঁজি শেষ পর্যন্ত অস্পৃষ্ট থেকে যাবে অর্থাৎ খরচ হবে না।

২. এতে এমন কি শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত হস্তকুশলতাকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ দিনের কিছুটা সময় ছাত্ররা নিজ হাতে দক্ষতা সহকারে কোন শিল্পে কাজ করবে।

৩. প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সব রকমের শিক্ষা দিতে হবে।

৪. এতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কোন অবকাশ নেই। অবশ্য মূল বিশ্বজনীন নীতিশাস্ত্রের সম্যক্ চর্চা হবে।

৫. শিশু অথবা বয়স্ক পুরুষ বা নারী যারাই এই শিক্ষার আওতায় আসুক না কেন তাদের মাধ্যমে এই শিক্ষা তাদের ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।

৬. এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ ছাত্র যেহেতু নিজেদের সমগ্র ভারতবর্ষের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করবে সেইজন্য তারা একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা শিখবে। এই আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হতে পারে কেবল হিন্দুস্থানী যা নাগরী বা উর্দু লিপিতে লেখা যায়। ছাত্রদের তাই উভয় লিপিই শিখতে হবে।

হরিজন, ২-১১-১৯৪৭

॥ ছয় ॥

প্রাথমিক শিক্ষা

আজকের প্রাথমিক শিক্ষা

চতুর্দিকেই আজ নজরে পড়ে যে দুর্বল ভিত্তির উপর বিশাল সৌধের কাঠামো তোলা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষকদের বাছাই করা হয় নিছক ভদ্রতার খাতিরেই তাঁরা শিক্ষক নামের অধিকারী। আসলে তাঁদের শিক্ষক নামে অভিহিত করা শিক্ষক শব্দটির অপপ্রয়োগ। শৈশব মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় যে জ্ঞান লাভ করা যায় মানুষ তা কখনও ভোলে না। কিন্তু (আমাদের দেশে) শিশুরা শৈশবে বিশেষ কিছুই শেখার সুযোগ পায় না এবং তাদের যে-কোন তথাকথিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। আমার বিশ্বাস এই যে আমাদের দেশে উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে যে বিরাট খরচ হয় আমাদের মত দরিদ্র দেশ তার বোঝা বহন করতে অসমর্থ। এর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পীঠভূমি স্থানসমূহে সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যদি **প্রাথমিক শিক্ষা** দেবার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে স্বল্পতর সময়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দৃষ্টিগোচর হত। এই পরিবর্তন সংসাধনের উদ্দেশ্যে বর্তমানের শিক্ষককুলের বেতন দ্বিগুণ করে দিলেও আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। এজাতীয় স্বল্প পরিবর্তনে বৃহৎ জয়লাভ করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার চরিত্রধর্মেই রূপান্তর ঘটাতে হবে।···

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দোষ দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় এবং তাহলেও সময় সময় তাঁরা আশাতীত সুফলের পরিচয় দেন। আমাদের মহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই বিস্ময়ের মূলে ক্রিয়াশীল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যথোচিত প্রোৎসাহন পেলে তাঁরা এমন সুন্দর ফল দেখাবেন যার কথা আমরা এখন চিন্তাও করতে পারি না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে **সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের দ্বারা এই সব ত্রুটি দূর হবার নয়।** শাসকরা কখনও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করতে পারেন না। জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এ

জাতীয় পথিকৃৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ব্রিটিশ সংবিধানে জনসাধারণের এজাতীয় প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায়তা দানের ব্যবস্থা আছে। আমরা যদি মনে করি যে কেবল সরকারই এই সব কাজ করবেন তাহলে বহু দিনেও আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। ইংলণ্ডের মত আমাদের দেশেও প্রথমে আমাদের এ ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং সরকারকে কোন কিছু করতে বলার পূর্বে নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সরকারের সামনে রাখতে হবে।···পথিকৃৎ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে দেশে এরকম কয়েকটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা প্রয়োজন।

এ কাজ করার পথে একটি বড় বাধা আছে এবং সেটি হল ডিগ্রীর মোহ। জীবিকার জন্য আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার উপর নির্ভর করি। এর ফলে জনসাধারণের অপ্রমেয় ক্ষতি হয়। আমরা ভুলে যাই যে যাঁরা সরকারী চাকুরি করতে চান কেবল তাঁদের ডিগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন সরকারী চাকুরি খুঁজবেন তাঁদের দ্বারা জনসাধারণের জীবনসৌধ গড়ে উঠবে না। প্রায় নিরক্ষর লোক যখন নিজের বুদ্ধি ও চাতুর্যের বলে লক্ষপতি হতে পারে তখন শিক্ষিতরা কেন ধনোপার্জন করতে পারবেন না তার কারণ নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কেবল তাঁদের মনের ভয়কে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে তাঁরা নিঃসন্দেহে অন্ততঃ নিরক্ষরদের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।

বিচারসৃষ্টি, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ

শিশুদের শিক্ষা

বহু বৎসর যাবৎ আমার মনে হচ্ছে যে পড়তে জানা এবং লিখিত বাক্যের উপর আমরা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের ক্রমবর্ধমান স্থান।

আমরা এই মোহের শিকার হয়ে পড়েছি যে শিশু পড়তে না শেখা পর্যন্ত তাকে কোন জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় কোন ভ্রমাত্মক ধারণা আছে কিনা বলতে পারব না। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে এই মিথ্যা বিশ্বাসের পরবশ হয়ে আমরা শিশুর বিকাশের গতিরোধ করি। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে শিশু লিখতে পড়তে শেখার পূর্বেই তার মানসিক বিকাশ হতে পারে এবং হয়েও থাকে। লেখা ও পড়া বরং কতকাংশে তার বিকাশকে ব্যাহত করে। বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা যে-কোন শিক্ষক এই উক্তির

সত্যতা নির্ধারণ করতে পারেন। অক্ষরজ্ঞান অথবা বিধিবদ্ধ শিক্ষা ছাড়াই শিশুকে মুখে মুখে শিক্ষা দিন, দেখবেন তাড়াতাড়ি সে শেখে। মুখে মুখে আলোচনা করার সময় শিক্ষক ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য শেখাতে পারেন। এক বছরের মধ্যেই কোন শিশু রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পগুলি শিখে নিতে পারে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে চার পাঁচ বছর পড়ার পর তারা এসব শিখে থাকে। "মা আমাকে খাবার জল দাও"—এই জাতীয় একটি সাধারণ বাক্য পড়তে ও লিখতে শেখার জন্য শিশুর পুরো একটি বছর লাগা কি অনাবশ্যক ব্যাপার! শিশুকে প্রথমেই পড়া ও লেখা শিখতে বাধ্য করে আমরা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করি, অন্য উপায়ে সহজে সে যেসব বিষয় শিখতে পারত সে সম্বন্ধে তাকে অজ্ঞ রাখি, তার স্মরণশক্তির উপর চাপ দিই, তাড়াহুড়া করে তার হাতের লেখা বিশ্রী করে দিই এবং শৈশব থেকে তাকে পাঠ্যপুস্তকের দাস করে শেষ অবধি দরিদ্র ভারতবর্ষের উপর অনাবশ্যক বই কেনার মারাত্মক বোঝা চাপিয়ে দিই।

শিক্ষকদের যদি আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গী বোঝাতে পারতাম তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পাঠ্যপুস্তকসমূহকে আমি কেবল শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য রাখতাম, ছাত্রদের জন্য নয়। অবশ্য পাঠ্যপুস্তককে তখন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখতে হত। অক্ষর ও বাক্য লিখতে শেখার পূর্বে শিশুদের আঁকতে শেখানো উচিত যাতে তারা নিখুঁতভাবে মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন চিত্র ও ছবি অঙ্কন করতে পারে। এর জন্য অক্ষর চিনতে শিশুর যদি এমন কি তিন বছরও সময় লাগে তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। এই সময়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব ও ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। তাকে গীতা থেকে নির্বাচিত শ্লোক শেখানো যেতে পারে যাতে তার স্মরণশক্তির অনুশীলন ও পরিপুষ্টি হয় এবং তার ভিতর ছন্দ ও শ্রুতির জ্ঞান সৃষ্টি হয়। তাকে সঠিক উচ্চারণ আচার ব্যবহারবিধি ও নিখুঁতভাবে কাজ করার কলা শেখানো যেতে পারে। এইভাবে তার ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন হবে আমাদের লক্ষ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পকলার অনুশীলনের মত তার হাতের লেখার উন্নতিসাধনে তাকে প্রোৎসাহিত করতে হবে। আজকে অধিকাংশ ছাত্রের হাতের লেখা এত বিশ্রী যে তা পড়তে ও পড়ে তার পাঠোদ্ধার করতে মানুষের বিরক্তি ও অনিচ্ছা হয়। একথা আমি বলছি অভিজ্ঞতা থেকে। কারণ আমার নিজের হাতের লেখা এত খারাপ যে আমি এর জন্য লজ্জাবোধ করি ও কারও কাছে লিখতে ইচ্ছা করে না। নিজের হাতের

আঁকাবাঁকা অক্ষর দেখে আমার দুঃখ হয়। ভালভাবে সিদ্ধ না হওয়া খাবার যেমন কেউ খেয়ে হজম করতে পারেন না সেইভাবে কাঁচা হাতের লেখাও বরদাস্ত করা যায় না। যার হাতের লেখা খারাপ তাকে সভ্য বলা চলে না। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে এই জাতীয় লোকের হাতের লেখা পড়তে অস্বীকার করা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারলে আমরা অনেক অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তনের ফলে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ অধিকতর মাত্রায় হবে বলে আমরা শিশুদের জীবনকে সমৃদ্ধতর ও দীর্ঘতর কবতে পারব।

নবজীবন, ২৬-১০-১৯২৪

প্রাথমিক শিক্ষা

বহু চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অন্ততঃ এক বছর বই ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে এবং এক বছর পরও বই-এর ব্যবহার হবে যথাসম্ভব কম।

শুরু থেকেই যদি বই-এর ব্যবহার করা হয় এবং শিশুদের যদি অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয় তাহলে তাদের বিভিন্ন যোগ্যতা বিকশিত হতে পারে না ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়। অথচ এই সময়ে শিশুর যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত বিকাশ হওয়া উচিত। জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশু শিখতে আরম্ভ করে। অবশ্য এ শিক্ষা সে পায় তার চোখ কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে। আর কথা বলতে অর্থাৎ শব্দের ধ্বনি অনুকরণ করতে শেখা মাত্রই সে দ্রুতগতিতে ভাষার প্রয়োগ আরম্ভ করে। শিশু স্বভাবতই তার পিতামাতার ভাষাই শিক্ষা করে। পিতামাতা যদি সুরুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী হন শিশুও নিজের ভিতর সেই সব বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। সে শুদ্ধভাবে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে ও পিতামাতার সৎ বৃত্তি ও আচরণের অনুকরণ করে। এই হল তার যথার্থ শিক্ষা। আর আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যদি ধ্বংস না হয়ে যায় তাহলে নিজের গৃহেই শিশু সেরা ধরনের শিক্ষা পেতে থাকবে।

কিন্তু আজ আমরা যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছি তাতে এ সম্ভব নয় এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে

শিশুকে যদি বিদ্যালয়ে যেতেই হয় তাহলে দেখতে হবে যে বিদ্যালয় যেন তার ঘরের মত হয় এবং শিক্ষকরা যেন পিতামাতার মত হন। বিদ্যালয়ে যেন সংস্কৃতিসম্পন্ন গৃহ-পরিবেশের ধরনে শিক্ষা দেওয়া হয়। এর অর্থ হল এই যে প্রথম দিকে মুখে মুখে সব শিক্ষা দিতে হবে। এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু এক বছরে অন্য ভাবে অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষিত শিশুর চেয়ে দশ গুণ বেশী শিখবে।

গল্প শেখার মত করেই প্রথম বছরে শিশুরা খুব সহজে মুখে মুখে প্রারম্ভিক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি শিখবে। বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা তারা মুখস্থ করতে পারে। আর কোন প্রচেষ্টা বিনাই একরকম স্বতঃই তারা গুনতে শিখবে। আর তাদের উপর অক্ষরজ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না বলে তাদেব মনের বিকাশ অবরুদ্ধ হবে না ও তাদের দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহারও হবে না।

বিভিন্ন অক্ষর নকল করার জন্য তারা তাদের হাতকে কাজে লাগাবে না। কারণ এর ফলে তাদের হাতের লেখা চিরতরে খারাপ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে তারা জ্যামিতির চিত্রসমূহ ও সহজ সরল ছবি আঁকবে। হাতের পক্ষে এ সুন্দর প্রাথমিক অনুশীলন হবে কারণ এর দ্বারা সমন্বয় ও কুশলতা—উভয় বৃত্তিরই অভিবৃদ্ধি হবে।

গুজরাত ও ভারতের কোটি কোটি শিশুকে যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চাই তাহলে এই তার একমাত্র পন্থা।

আজকে দেশের যা অবস্থা তাতে সব শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়া অসম্ভব। আমি স্বীকার করছি যে যদি মনে হয় যে প্রাথমিক পর্যায়েও শিশুদের হাতে বই দেওয়া উচিত বলে মনে হয় তাহলে যা-ই খরচ পড়ুক না কেন বই দেবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এটা কেবল অপ্রয়োজনীয় নয় ক্ষতিকারকও বটে তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে বই বাদ দেবার জন্য আমার এই যুক্তি খাটে। আমার এ পরিকল্পনাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বদা অবাঞ্ছিত প্রতীয়মান হয়। আদর্শ সভ্যতায় নৈতিকতা ও তথাকথিত বাস্তব নীতি দুই পরস্পরবিরোধী জিনিস হয় না।

সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে এখানে যে শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হল আজকের শিক্ষক সম্প্রদায় তাকে রূপায়িত করতে পারবেন না। শিশুদের তাঁরা হয়ত বর্ণ পরিচয় করাতে ও সাধারণ গণিত শেখাতে পারবেন। কিন্তু

আমার এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম বছরেই ছাত্রদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাঁরা স্বয়ং সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁরা নিজেরা শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারেন না বলে শিশুদের কি করে শুদ্ধ করে কথা বলা শেখাবেন ?

নবজীবন, ১৩-৫-১৯২৮

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ আমাদের ইউরোপের অভিজ্ঞতার কথা জানতে হবে। তবে এই ধারণাপরবশ হয়ে আমরা বলব না যে ইউরোপীয় সব কিছুই ভাল অথবা ইউরোপের পরিবেশে ইউরোপীয়দের জন্য যা মঙ্গলজনক এখানে ভারতবর্ষেও তা আমাদের পক্ষে শুভ হবে। পূর্বোক্ত যুক্তি যথার্থ স্বীকার করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে সরকারী বিদ্যালয়সমূহে যা চলছে তার বিস্তারিত মূল্যায়ন করা উচিত। সরকারী শিক্ষা স্বরাজের পরিপন্থী এবং আমাদের সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং সরকারী বিদ্যালয়ে যা করা হয় তার বিপরীত জিনিসটি করলেই বোধ হয় আমরা সঠিক সমাধানে উপনীত হব। এর কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরেজী। এর থেকেই আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে জাতীয় শিক্ষায় কদাচ এরকম হওয়া উচিত নয়।

ওখানে বড় বড় ব্যয়বহুল ঘরবাড়ী আছে। আমাদের জানা দরকার যে এটা অবাঞ্ছিত। আমাদের বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী দরিদ্রদের উপযুক্ত সাদাসিধে হবে।

ওখানে কেতাবী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। দেশীয় হস্তশিল্পের উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে কেবল ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করা হয়। বলা বাহুল্য এটা ঠিক নয়।

ওখানে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই। ধর্মশিক্ষা বলতে আমি বিশেষ কোন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের কথা বলছি না, সকল ধর্মের ভিতর যে সর্বসামান্য মূল নীতি বিদ্যমান তার প্রতি ইঙ্গিত করছি। প্রচলিত শিক্ষা সাধারণতঃ ছাত্রদের যেটুকু মঙ্গলবিধান করতে পারত আমরা জানি যে এর ফলে তাও নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শেখানো হয় তা যদি পূর্ণ মাত্রায় মিথ্যা নাও হয় তা হল ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত। জার্মান ফরাসী বা

আমেরিকান ঐতিহাসিকরা ঐ একই বিষয়কে ভিন্ন ভাবে লিখতেন ও তার ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ এমন কি পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের মত সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে সরকার এক ধরনে লিখছেন এবং জাতীয়তাবাদীরা লিখছেন ভিন্ন ধরনে।

সরকারী বিদ্যালয়ে যেভাবে অর্থশাস্ত্র শেখানো হয় তা সরকারী নীতির সমর্থক। অথচ আমরা এসব দেখি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে চরিত্র সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা না করেই শিক্ষক নিয়োগ করা হয় আমাদের বিদ্যালয়ে সেখানে শিক্ষকদের সুউচ্চ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ কাজ সম্বন্ধে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে এবং তাঁদের মাইনেও সব চেয়ে কম। পক্ষান্তরে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অবশ্য মাইনে তাঁরাও কম পাবেন। তবে তার কারণ তাঁদের অসহায় অবস্থা নয়, স্বার্থত্যাগ বৃত্তি।

আমাদের ছাত্ররা দেশেব গ্রামীণ সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ করা ও এর পুনরুজ্জীবন করার জন্য কাজ করবে। গ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা জ্ঞান অর্জন করবে, গ্রামবাসীদের মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পাবে তা দূর করার জন্য তারা প্রয়াস করবে এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের শহরের চাকচিক্যে সম্মোহিত না হয়ে ভাল কৃষক ও ভাল গ্রামবাসী হবার শিক্ষা দেবে। এইভাবে যতদিম না আমরা শহরের প্রচলিত শিক্ষার রূপ ও চারিত্র্যধর্মে মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করতে পারি, আমরা এই বিদ্যাপীঠের (গুজরাত বিদ্যাপীঠ) অন্যতম আদর্শের পরিপূর্তি করতে সক্ষম হব না।

নবজীবন, ২০-৫-১৯২৮

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

পাছে লোকে কিছু বলে অথবা ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাবে কিংবা প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষে হেয় হবে—এই সব কারণে আমরা আজ প্রচলিত ব্যবস্থার কোনরকম পরিবর্তন করতে ইতস্তত করি। কিন্তু সাহস করে আমরা যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংসাধন করি তাহলে এই সব বিদ্যালয় থেকে গ্রামের সেবা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ একদল কর্মী বেরোবে যারা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে শহরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

এই সব বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা প্রথম শ্রেণীর ধুনুরী কাটুনী ও তাঁতী হবে। কাপাস চাষে তারা হবে বিশেষজ্ঞ। গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় সূত্রধরের কাজ তারা জানবে। অর্থাৎ তারা ভাল চরখা তৈরি করতে পারবে এবং গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরি করতে না পারলেও অন্ততঃ মেরামত করতে পারবে। এছাড়া গ্রামজীবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সীবন-বিদ্যা তারা জানবে। তাদের হাতের লেখা ভাল হবে এবং সরল অথচ শুদ্ধ গদ্য তারা লিখতে শিখবে। এছাড়া তারা সাধারণ হিসাব-কিতাবও জানবে। রামায়ণ মহাভারতের মত পুরাণ-গ্রন্থ সম্বন্ধে তাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকবে ও এই সব পুরাণকে বর্তমানের পট-ভূমিকায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তাদের জন্মাবে। গ্রামের খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সম্বন্ধে তারা জানবে। সাধারণ রোগনির্ণয় ক্ষমতা ও টোটকা চিকিৎসা দ্বারা তার নিরাময় পদ্ধতিও তাদের জানা চাই। গ্রামের কূপ পুষ্করিণী ও আবর্জনাস্তূপ পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া তাদের শিখতে হবে। তালিকা আরও দীর্ঘ করতে পারতাম কিন্তু তা না করে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা গ্রামবাসীদের সর্বাধিক প্রকারে সেবা করতে পারে। ছাত্রদের এইভাবে প্রশিক্ষিত করতে যে ব্যয় হবে তাকে শিক্ষাব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। একমাত্র এই জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলেই আমরা গ্রামে প্রবেশ করে গ্রাম্যজীবনের সংস্কার সাধন করার যোগ্যতা অর্জন করব।

আমি জানি যে আপনাদের কারও কারও মনে এই আশঙ্কা আছে যে আমরা যদি এই সব পরিবর্তনের প্রবর্তন করি এবং পূর্বোক্ত প্রকারে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করি তাহলে আমাদের বিদ্যালয়গুলি শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু এ আশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণতও হয় তবু সত্যের খাতিরে আমি এর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হব।...

পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে আজকাল খুবই বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যহ কিছু না কিছু পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরই কিছুটা ভাষাজ্ঞান আছে অথবা আছে বলে মনে হয় অথবা যিনিই কোন বিষয়ে কিছুটা অধ্যয়ন বা চিন্তা করেছেন বলে বিবেচনা করেন তিনিই নিজ বিচারধারা লিখিতভাবে ব্যক্ত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তারপর সেই লিখিত বিষয় ছাপান এবং ভাবেন যে এর দ্বারা তিনি জাতির সেবা করছেন। এর ফলে ছাত্রদের মন ও অভিভাবকদের অর্থসঙ্গতির উপর খুব চাপ পড়ছে। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

তাদের মন উদ্ভট ও অসংবদ্ধ তথ্যের গুদামঘরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, মৌলিক চিন্তাধারার কোন স্থান থাকে না সেখানে। আর সে সব তথ্যও সুসংবদ্ধ ভাবে নিজের জায়গায় সাজানো-গোছানো থাকে না, সেগুলি থাকে কুঁড়ে লোকের ঘরের জিনিসের মত এলোমেলো ভাবে। ছাত্ররা না এর কোন সম্যক্ ব্যবহার করতে পারেন আর না জনসাধারণের এর ফলে কোন উপকার হয়।

সুতরাং ক্ষমতা থাকলে আমি আজকে জনসাধারণের হাতে যে বহুসংখ্যক পুস্তক দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করতাম, এমন কি যেসব ছাত্র লিখতে পড়তে জানে তারাও অধিকাংশ বিষয় শিক্ষকদের মুখ থেকে শেখে। আমি তাই ছাত্রদের কয়েকটি বাছাই করা বই পড়তে দেব। তবে তারা যা পড়বে তা নিয়ে চিন্তা করবে এবং তার মধ্যে যা কাজের মনে হবে তদনুযায়ী আচরণ করবে। এরকম করলে তাদের জীবন সুন্দর ও পবিত্র হবে এবং তারা সর্বদা শক্তি ও উদ্যম অনুভব করবে। এর ফলে তারা শিক্ষার খাঁটি লক্ষণ—চিন্তা করতে ও সত্যাসত্যের বিচার করতে শিখবে। এই শিক্ষাই আমাদের দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের উপযুক্ত ও তাদের পক্ষে লাভজনক। এর ফলে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ উভয়েরই কল্যাণ হবে।

নবজীবন, ২৭-৫-১৯২৮

একটি আদর্শ শিশু বিদ্যালয়

শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সাধারণতঃ সব চেয়ে সহজ কাজ হওয়া উচিত কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা একে কঠিন ব্যাপার করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে আমাদের নজরে পড়ুক বা না-ই পড়ুক অথবা ভালমন্দ যা-ই হোক, শিশুরা সর্বদাই কিছু না কিছু শিখছে। কথাটা অনেক পাঠকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু শিশু বলতে কাদের বোঝায়, শিক্ষা কাকে বলে এবং শিশুদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতম ব্যক্তি কে—এই সব প্রশ্ন যদি গভীরভাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে পূর্বোক্ত বক্তব্যকে অদ্ভুত তো মনেই হবে না, তাকে তখন হয়ত একান্ত যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হবে।

শিশু বলতে আমরা দশ বছরের কমবয়স্ক ছেলেমেয়ে বুঝি। আর শিক্ষা বলতে কেবল অক্ষরজ্ঞান অর্থাৎ লিখতে পড়তে জানা বোঝায় না। অক্ষরজ্ঞান

শিক্ষার একটি মাধ্যম মাত্র। আসল কথা হল এই যে, মন সহ মানুষের যাবতীয় অনুভূতি-ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের প্রক্রিয়া জানার নাম হল শিক্ষা। অর্থাৎ শিশু নাসিকা চক্ষু প্রমুখ তার জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিখবে। যে ছেলেটি একথা জানে যে তার হাতকে চুরি করা, মাছি অথবা ছোট ভাইবোন ও বন্ধুদের মারার কাজে ব্যবহার করা অনুচিত, সে তার নিজস্ব পন্থায় শিক্ষার পথে বেশ কিছুটা অগ্রগতি করেছে বলতে হবে। যে ছেলেটি তার দাঁত জিভ কান চোখ নখ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তার সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য। খাওয়া-দাওয়ার সময় যে দুষ্টুমি করে খাদ্য বা পানীয় নষ্ট করে না, পাঁচজনের সঙ্গে অথবা একা খেতে বসলে যে নিয়ম মোতাবেক খাওয়া-দাওয়া সারে, পুষ্টিকর ও অপুষ্টিকর খাদ্যের পার্থক্য যে জানে এবং প্রথমোক্ত ধরনের খাদ্য যে নিজের জন্য বেছে নেয়, যে প্রয়োজনের বেশী খায় না এবং যখন যা দেখে তা-ই চায় না অথবা তা না পেলে গণ্ডগোল করে না সে নিজের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি করেছে বলা চলে। যার উচ্চারণ ভাল, যে নিজের এলাকার ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে বলতে পারে (ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ তার না জানলেও চলবে), মাতৃভূমি বলতে কি বুঝায় তা যে জানে সে শিক্ষার পথে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে বলতে হবে। অনুরূপ ভাবে যে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে শিখেছে, শিখেছে ভাল ও মন্দের পার্থক্য এবং যে অবিসংবাদী রূপে যা সত্য ও ভাল তা-ই বেছে নেয় তাকে আর এ বিষয়ে শেখাতে যাওয়া নিরর্থক। সুতরাং পাঠকেরা ব্যাপারটা বুঝে নেবেন। আমি কেবল একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই : উপরে আমি যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি শেখার জন্য লিখতে পড়তে জানা অপরিহার্য নয়। শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে বর্ণ পরিচয় করানোর অর্থ হল তাদের কোমল মনের উপর অহেতুক চাপ দেওয়া এবং তাদের চোখ ও হাতের অপব্যবহার। সঠিক ভাবে শিক্ষিত শিশু প্রায় এক রকম বিনা প্রয়াসেই লিখতে পড়তে শেখে—আর এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে এটা শেখে যথাসময়ে এবং সানন্দে। কিন্তু আজ যে বয়সে তাদের বর্ণ পরিচয় করানো হয় সেটা তাদের কাছে বিরাট বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যে মহামূল্যবান সময় এর জন্য অপচয় করা হয় তার অধিকাংশ অন্যভাবে ভাল কাজে লাগানো যেত। এর ফলে শেষ অবধি সুগঠিত অক্ষর লেখা বা সঠিক উচ্চারণে পড়ার বদলে শিশুরা আঁকাবাঁকা হরফে বিশ্রী

হাতের লেখা লিখতে শেখে। পড়ার ব্যাপারে এই হয় যে তারা যা পড়তে শেখে তার অধিকাংশ না শিখলেই ভাল হত আর এইটুকুও পড়ে উচ্চারণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়া ভাবে। একে শিক্ষা বলার অর্থ শিক্ষা নামক মহান শব্দটির অপব্যবহার। লিখতে পড়তে শেখার পূর্বে শিশুকে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হবে। এটা করা হলে আমাদের দেশে শিশুদের নানারকম পাঠ্য-পুস্তকের খাতে যে বহুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় হয় তার এবং আরও বহুবিধ কুপ্রথার হাত থেকে মুক্তি পাবে। শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক যদি একান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাহলে সেগুলি এই বয়সের বালকদের জন্য না লিখে শিক্ষকদের সহায়ক পুস্তকরূপে রচনা করতে হবে।

আমি যে শিক্ষার কথা বললাম শিশুরা এ শিক্ষা পেতে পারে কেবল তাদের বাড়ীতে এবং তাও শুধু মায়ের কাছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে সব শিশুরাই মায়ের কাছ থেকে কোন না কোন রকমের শিক্ষা পায়। আজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাড়ী এক রকম তছনছ হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ মাতাপিতাই এই শিক্ষাদান কার্যের অনুপযুক্ত। এই অবস্থায় তাই শিশুদের এমন পরিবেশে রাখতে হবে যেখানে তারা বাড়ীর মত পরিবেশ পাবে। সবার মধ্যে মা-ই যেহেতু শিশুকে শিক্ষা দেবার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য সেই কারণে এ দায়িত্ব মহিলাদের উপর দিতে হবে। ভালবাসা ও ধৈর্যগুণের ব্যাপারে সাধারণতঃ পুরুষ নারীর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে যুগপৎ নারীদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না করে শিশুদের শিক্ষার সমস্যার সমাধান মিলবে না। আর একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে আমাদের শিশুদের সুযোগ্যতা সহকারে যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য যতদিন না আমরা খাঁটি মাতা-শিক্ষয়িত্রী পাচ্ছি ততদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করলেও শিশুরা অশিক্ষিত থেকে যাবে।

এবার আমি সংক্ষেপে শিশুদের শিক্ষার রূপরেখা সম্বন্ধে বলব। ধরুন কোন মাতা-শিক্ষয়িত্রীর হাতে পাঁচটি শিশুর দায়িত্ব দেওয়া হল। ছাত্ররা আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই পায় নি। স্পষ্টভাবে তারা কথাও বলতে পারে না। ঠিকভাবে চলা বা বসার ধরনও তারা জানে না। তাদের নাক চোখ কান এবং নখ ময়লা। বসতে বললে তারা পা ছড়িয়ে বসে আর কথা বলার সময় বিড়বিড় করে। দিক সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানগম্যি নেই। তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ নোংরা এবং পকেটে রাজ্যের টুকরো টুকরো জিনিসপত্র

রয়েছে যা ক্ষণে ক্ষণে বার করে তারা মুখে পুরছে। তাদের মাথার টুপির কিনারা কালচে ও চিটচিটে হয়ে গেছে এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এই রকম ছাত্রদের মানুষ করতে হলে পূর্বোক্ত শিক্ষয়িত্রীটিকে মাতৃহৃদয়-সম্পন্না হতে হবে। সর্বপ্রথমে তিনি এদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাঠ দেবেন। তিনি এই সব ছাত্রদের তাঁর হৃদয়ের ভালবাসায় নিষিক্ত করে দেবেন এবং মায়ের মত—কৌশল্যা যেভাবে রামকে রাখতেন সেইভাবে তাদের হাসিখুশী রাখবেন। এই ভাবে তিনি তাদের এমন ভাবে নিজের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে নেবেন যার ফলে এমন একটা অবস্থা হবে যখন তিনি তাদের দিয়ে হাসিমুখে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নিতে পারবেন। যতক্ষণ না তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে, যতক্ষণ না তাদের দাঁত কান হাত পা পরিষ্কার হচ্ছে, যতদিন না তারা নিজেদের কাপড়চোপড় সামলাতে শিখছে ও তাদের উচ্চারণের উন্নতি হচ্ছে ততদিন তাঁর মনে শান্তি আসবে না। এসব করার জন্য তিনি তাদের রামনাম শেখাবেন। ঈশ্বরের অসংখ্য নাম তাই তাঁকে কোন্ নামে ডাকা হচ্ছে—এটা কোন বড় প্রশ্ন নয়। ধর্মেব পর হল অর্থ বা ঐহিক জ্ঞান। সুতরাং আমাদের মাতা-শিক্ষয়িত্রী এবার তাদেব গণিত শেখাবেন। মুখে মুখে যতটা সম্ভব তাদের নামতা ও যোগ-বিয়োগ শেখাবেন। ছেলেরা যেখানে থাকে তার কথা তাদের জানতে হবে। সুতরাং তিনি তাদের স্থানীয় নদী-নালা পাহাড়-পর্বত এবং উল্লেখযোগ্য ঘর-বাড়ী সম্বন্ধে বলবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন। শিশুদের জন্য তিনি নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন। এ পদ্ধতিতে ইতিহাস ও ভূগোলকে পৃথক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা চলবে না। গল্পচ্ছলে উভয় বিষয় শেখানো হবে। অবশ্য কেবল এইটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। হিন্দু মাতা তাঁর সন্তানদের কাছে ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করবেন যাতে তারা সংস্কৃত উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। ঈশ্বরের স্তবমূলক সংস্কৃত স্তোত্র তিনি তাদের শেখাবেন। স্বদেশপ্রেমী মাতা এর উপরন্তু তাদের হিন্দীও শেখাবেন। শিশুদের তিনি হিন্দী বই-এর নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনাবেন ও এইভাবে তাদের দ্বিভাষী করে গড়ে তুলবেন। এখনও পর্যন্ত তাদের অক্ষর পরিচয় তিনি শুরু করবেন না, তবে তাদের হাতে ছবি আঁকার তুলি দেবেন। তাদের দিয়ে তিনি জ্যামিতিক চিত্র নকল করাবেন এবং সরলরেখা ও বৃত্ত আঁকাবেন। যে শিশু ফুল জলপাত্র বা ত্রিভুজ ইত্যাদি আঁকতে পারে না তাকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলা যায় না। এছাড়া তিনি তাদের ভাল সঙ্গীতের সঙ্গে

পরিচিত করাবেন। তারা জাতীয় সঙ্গীত বা মন্ত্র ইত্যাদি সমস্বরে গাইতে না শেখা পর্যন্ত তিনি তাদের ছাড়বেন না। তিনি তাদের ঠিক তালে তালে গাইতে শেখাবেন। সম্ভব হলে তাদের হাতে একতারা বা ঝাঁজ দেওয়া হবে। তাদের শরীর গড়ে তোলার জন্যে তিনি তাদের দিয়ে দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি দৈহিক কসরৎ করাবেন। এছাড়া ছেলেদের সেবার আনন্দ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্বোক্ত শিক্ষয়িত্রী গাছ থেকে কাপাস তোলা থেকে শুরু করে সুতা কাটার যাবতীয় প্রক্রিয়া তাদের শেখাবেন। আর এই ছেলেগুলি রোজ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা স্বেচ্ছায় সুতা কাটবে।

বর্তমানে দেশে যেসব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে তার অধিকাংশই এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিরর্থক। মাতা-শিক্ষয়িত্রী তাই উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক খুঁজে বার করবেন অথবা স্বয়ং নূতন পাঠ্যপুস্তক লিখবেন। শিশুদের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে এই কার্যসাধনে সাহায্য করবে। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস ও ভূগোল আছে। তাই স্বভাবতই প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস ও ভূগোল বই থাকবে। গণিত অনুশীলনের উদাহরণগুলিও নূতন হবে। ছাত্রদের যে পাঠগুলি মাতা-শিক্ষয়িত্রী প্রত্যহ শেখাতে চান সেগুলি তিনি স্বয়ং প্রথমে শিখবেন। শেখার সময় তিনি ঐ প্রণালীতে নূতন নূতন অঙ্ক তৈরি করে শিক্ষণীয় আরও নূতন নূতন কথার সঙ্গে নিজের নোটবই-এ লিখে রাখবেন। এইভাবে ক্লাসে তাঁর পাঠন কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মনে হবে না, এ হবে প্রাণবন্ত ও সৃজনাত্মক ব্যাপার।

শিশুদের পাঠপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমে ইতরবিশেষ করা হবে। সুতরাং প্রত্যেক তিন মাসের ব্যবধানে পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে। একই ক্লাসের ছেলেরা বিভিন্ন বাড়ী থেকে আসে—প্রত্যেকের পটভূমিকা এবং স্বভাব পৃথক পৃথক। সুতরাং সকলের জন্য একই রকম পাঠ্যক্রম করা চলতে পারে না। সময়ে সময়ে হয়ত তাদের অতীতের শেখা বিষয় ভুলে যেতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ছয় সাত বছরের কোন শিশু যদি অপরিচ্ছন্ন ভাবে হরফ নকল করতে অথবা বোঝার চেষ্টা না করে পড়তে শিখে থাকে মাতা-শিক্ষয়িত্রী তাহলে দেখবেন যে সে যেন তা ভুলে যায়। তাঁকে এই ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে যে একমাত্র পড়ার মাধ্যমেই শিশু জ্ঞান পেতে পারে। এ কথা বোঝা খুবই সহজ যে জীবনে কখনও কিছু পড়ে নি এমন লোকও জ্ঞানী হয়।

এ প্রবন্ধে আমি শিক্ষক শব্দটি ব্যবহার করি নি, এর পরিবর্তে আগাগোড়া আমি মাতা-শিক্ষয়িত্রী শব্দটি ব্যবহার করেছি। এর কারণ হল এই যে শিক্ষা-দানকারীকে বাস্তবপক্ষে তাঁর ছাত্রের মা হতে হবে। যিনি মায়ের ভূমিকা নিতে পারবেন না তিনি শিক্ষণ-কার্য করতে পারবেন না। শিশু যেন একথা অনুভবই না করে যে তাকে শেখানো হচ্ছে। শিক্ষাদানকারা কেবল ছাত্রের উপর নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনমত তাকে সাহায্য করবেন। যে শিশুটি দৈনিক ছয় ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকে সম্ভবতঃ তার অনেকটা সময়েরই অপব্যয় হয়। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত শিশুটি যথার্থ শিক্ষার পরিভাষায় সর্বদাই কিছু না কিছু শিখছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভবতঃ আমরা ভাল শিক্ষয়িত্রী পাব না। অগত্যা পুরুষদের এ কাজে লাগাতে হবে। সে অবস্থায় পুরুষ শিক্ষকদের মায়ের স্থান নিতে হবে। অবশ্য শেষ অবধি মায়েদেরই এ দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপ্রেমী যে-কোন মাতাই নিজেকে এ কাজের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন। এবং নিজেকে প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিশুদেরও গড়ে তুলতে পারেন।

নবজীবন, ২-৬-১৯২৯

মন্তেসরী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

[মাদাম মন্তেসরী গান্ধীজীকে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজকর্ম দেখানো ও তারপর বিদ্যালয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে এক সম্বর্ধনা-ভাষণ দেন। তার উত্তরে গান্ধীজী যা বলেন তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল।—সম্পাদক]

মাদাম, আপনার অভিভাষণ আমাকে অভিভূত করেছে। যথোচিত বিনয় সহকারে আমি একথা স্বীকার করছি যে যতটা ক্ষীণভাবেই হোক না কেন আমার সত্তার অণু-পরমাণুতে আমি প্রেমশক্তির প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করছি—আপনার এ বক্তব্য অতীব সত্য। আমার স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমি অধীর এবং আমার কাছে তিনি সত্য স্বরূপ। আমার জীবনের প্রথম দিকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে এই সত্যকে যদি আমার উপলব্ধি করতে হয় তাহলে এমন কি আমার জীবনের বিনিময়েও আমাকে প্রেমশক্তির অনুশীলন করতে হবে। আর ঈশ্বরেচ্ছায় আমি কয়েকটি সন্তানের জনক বলে আমি

বুঝতে পারলাম যে ছোট ছোট শিশুর মাধ্যমেই এই প্রেমনীতি সব চেয়ে ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, শেখা যায়। আমাদের মত অজ্ঞ ও দুর্ভাগা পিতামাতার সান্নিধ্য পেতে না হলে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হয়েই গড়ে উঠত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কোন শিশু দুষ্ট হয়ে জন্মায় না। শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা যদি যথাযথ আচরণ করেন, তাদের জন্মের পূর্বে ও পরে তাঁদের আচরণ যদি আদর্শস্থানীয় হয় তাহলে শিশু সহজ প্রবৃত্তিবশেই সত্য ও প্রেমনীতির অনুগামী হবে। আমার জীবনের গোড়ার দিকে যখন আমি এই শিক্ষা পেলাম তখন থেকেই ধীর হলেও নিশ্চিত গতিতে আমার জীবনে একটা পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস আরম্ভ করলাম।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম আমি আপনার কার্য-কলাপের পরিচয় পাই। আমরিলি নামক একটি জায়গায় দেখি যে মন্তেসরী পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট বিদ্যালয় চলছে। অবশ্য বিদ্যালয়টি দেখার পূর্বেই আপনার নাম আমার কানে এসেছিল।

এর পর আমি আরও অনেক মন্তেসরী বিদ্যালয় দেখেছি এবং যতই এজাতীয় বিদ্যালয় দেখেছি ততই মনে হয়েছে যে এব বনিয়াদ ভাল ও চমৎকার। শিশুদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমে—যে প্রাকৃতিক বিধান মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত, পশুপ্রবৃত্তির নিয়ামক নয়। যেভাবে শিশুদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তা দেখে আমার সহজ প্রবৃত্তি বশে আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন কোন মন্তেসরী বিদ্যালয়ে হেলায়ফেলায় শিক্ষা দিলেও এই শিক্ষা-পদ্ধতির মূল নীতি প্রাকৃতিক বিধানরূপী পূর্বোক্ত মৌলিক বিধিব্যবস্থার অনুযায়ী। এর পর আপনার একাধিক ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়। এঁদের মধ্যে একজন আবার ইতালীতে তীর্থযাত্রা করেছিলেন ও আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সেই থেকে এখানকার শিশুদের এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে ছিল আর তাই আজ এখানকার শিশুদের দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। এই সব ছোট ছোট শিশুদের সম্বন্ধে কিছুটা জানার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। এখানে যা দেখলাম বার্মিংহামের একটি বিদ্যালয়েও ইতঃপূর্বে তার কিছুটা স্বাদ পেয়েছি, যদিচ এখানকার সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে এখানকার মত সেখানেও লক্ষ্য করেছি যে মানব-প্রকৃতি আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করছে। এখানেও তাই দেখছি এবং এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আমি খুব খুশী হয়েছি যে

ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের এখানে মৌনতার গুণ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হচ্ছে ও শিক্ষকের অস্ফুট ইঙ্গিতে তারা কী সুন্দর একেবারে নীরবে একের পর এক এগিয়ে এল। শিশুদের এই সব তালে তালে শরীর সঞ্চালন দেখেও আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এ দেখার সময় অর্ধাশনে দিনযাপনকারী ভারতবর্ষের গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিশুর কথা মনে পড়ল। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকেই আমি নিজে প্রশ্ন করলাম, "আপনার পদ্ধতিতে এখানকার শিশুদের যে পাঠ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আমার পক্ষে ভারতবর্ষের গ্রামের শিশুদের কি এই রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে?" ভারতবর্ষের দরিদ্রতম শিশুদের মধ্যে আমরা একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতটা সফল হবে তা আমি জানি না। ভারতবর্ষের পর্ণকুটিরসমূহের নিবাসী শিশুদের প্রাণবন্ত সত্যকার শিক্ষা দেবার সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে, অথচ এর সঙ্গতি আমাদের নেই।

শিক্ষকদের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে কিন্তু শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে শিক্ষক—বিশেষ করে যে ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন তাঁদের সংখ্যা অতীব অল্প। আমাদের এমন শিক্ষক প্রয়োজন যাঁরা ছাত্রদের ভাল ভাবে বুঝে তাদের ভিতরকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ফুটিয়ে তুলবেন, ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে এক রকম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ছাত্রকে তার নিজের গুণের উপর খাড়া করবেন। আর আমার যে শত শত (হাজার হাজার বলতে যাচ্ছিলাম) ছাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে তাদের মানসম্মান-জ্ঞান আপনার আমার চেয়ে সূক্ষ্ম। একটু নত ও নম্র হলে আমরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাব তথাকথিত অজ্ঞ শিশুদের কাছ থেকে, বয়স্ক পণ্ডিতদের কাছ থেকে নয়। শিশুর মুখ থেকে জ্ঞানের প্রকাশ হয়—এর থেকে বড ও মহান সত্য যীশুখ্রীষ্ট আর বলেন নি। আমি যীশুর ঐ কথা বিশ্বাস করি এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে নম্রভাবে নিষ্কলুষ চিত্তে যদি শিশুদের কাছে যাওয়া যায় তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান পেতে পারি।

…ইদানীং আমার মনে যে বিষয় নিয়ে আলোডন চলছে অর্থাৎ আমি যে শিশুদের কথা আপনাকে বললাম, তাদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশের দুরূহ সমস্যা সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।…শিশুদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক ভালবাসার কারণ আপনি যেমন আপনার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ

শিশুদের শিক্ষা দেবার ও তাদের সদগুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা করছেন, তেমনি আমিও আশা করি যে শুধু সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-ই নয়, দরিদ্রের ঘরের শিশুও ঐ জাতীয় শিক্ষা পাবে। আপনি যথার্থই বলেছেন যে, আমরা যদি এই বিশ্বে সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ করা যদি আমাদের অভীষ্ট হয়, তাহলে শিশুদের নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করতে হবে। শিশুরা যদি তাদের স্বাভাবিক সারল্যের ভিতর বেড়ে ওঠে, তাহলে আমাদের এত সব বাদ-বিসম্বাদের সম্মুখীন হতে হবে না বা নিষ্ফল দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করারও প্রয়োজন পড়বে না। প্রেম হতে উচ্চতর প্রেমে এবং শান্তি হতে অধিকতর শান্তিতে উত্তরণ করতে পারব এবং শেষ অবধি পৃথিবীর কোণে কোণে সেই শান্তি ও প্রেম পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করবে যার জন্য সচেতন ভাবে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্ব ব্যাকুলভাবে প্রযত্ন করেছে।

ইয়ং-ইণ্ডিয়া, ১৯-১১-১৯৩১

শিশুদের শিক্ষারম্ভ

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় অভিমত হল এই যে বর্ণ পরিচয় ও লিখতে পড়তে শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার সূত্রপাত হওয়ার প্রথা তাদের বৌদ্ধিক বিকাশকে ব্যাহত করে। শিশুরা ইতিহাস ভূগোল মানসাঙ্ক এবং কোন হস্তকলা (ধরুন সূতা কাটা) সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক জ্ঞান না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বর্ণ পরিচয় করাব না। এইগুলির মাধ্যমে আমি তাদের বুদ্ধির বিকাশ করার ব্যবস্থা করব। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তকলি বা চরখার মাধ্যমে কি করে বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো সম্ভব ? নিছক যান্ত্রিকভাবে শেখানো না হলে এর দ্বারা চমৎকার ভাবে বুদ্ধির বিকাশ করানো যায়। শিশুকে যখন সূতা কাটার প্রতিটি প্রক্রিয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়, তকলি বা চরখার কার্যকৌশল যখন তাকে ব্যাখ্যা করা যায়, কাপাসের ইতিহাস ও মানবসভ্যতার সঙ্গে এর সম্বন্ধের কথা যখন তাকে বলা হয় এবং যখন তাকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কাপাসের ক্ষেত দেখানো হয়, কত তার সূতা সে কাটল তা গুণতে যখন তাকে শেখানো যায় এবং, সূতার সমানতা ও শক্তি পরিমাপের পদ্ধতি যখন তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন তার আগ্রহকে জাগরূক রাখা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চোখ ও মনের অনুশীলন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিক্ষার জন্য আমি ছয় মাস সময়

দেব। তারপর শিশুর বর্ণ পরিচয়ের সময় হবে এবং ভাল মত অক্ষরজ্ঞান হলে সে সহজ অঙ্কন শেখার যোগ্য হয়ে উঠবে। যখন সে জ্যামিতিক চিত্র এবং পশুপক্ষীর ছবি ইত্যাদি আঁকতে পারবে তখন সে বর্ণমালার চিত্রগুলি মোটামুটি লেখার ক্ষমতা অর্জন করবে। ছেলেবেলায় যখন আমার অক্ষরজ্ঞান হয় তখনকার কথা আমার মনে আছে। ব্যাপারটা কি রকম বিরক্তিকর ছিল তার কথা আমার স্মরণ আছে। আমার বুদ্ধি কেন কাজ করছিল না তা বোঝার জন্য কেউ ভ্রূক্ষেপ করেন নি। লেখাকে আমি এক সুকুমার চারুকলা মনে করি। ছোট্ট শিশুদের উপর অক্ষরজ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এবং অক্ষরজ্ঞানকে শিক্ষার প্রথম সোপান বিবেচনা করে আমরা এই সুকুমার চারুকলাকে নষ্ট করে ফেলি। এইভাবে লিখন-কলার উপর আমরা অত্যাচার করি এবং সময় হবার পূর্বেই শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিতে গিয়ে আমরা শিশুর বিকাশকে ব্যাহত করি।

হরিজন, ৬-৬-১৯৩৭

॥ সাত ॥

উচ্চশিক্ষা

রাষ্ট্রের ব্যয়ে কলেজী শিক্ষা চলবে না

আমি কলেজী শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করব ও জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে একে সম্বন্ধিত করব। মেকানিক্যাল ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপাধি দান ব্যবস্থা থাকবে। এসব বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এবং এই সব শিল্পের জন্য যে সব স্নাতক প্রয়োজন, শিল্পগুলি স্বয়ং তার ব্যয়নির্বাহ করবে। এইভাবে টাটাদের রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণাধীনে ইঞ্জিনীয়ারদের শিক্ষা দেবার জন্য কলেজ চালাতে হবে। মিল-মালিকসঙ্ঘও এইভাবে তাদের প্রয়োজনীয় স্নাতকদের শিক্ষিত করার জন্য নিজ ব্যয়ে কলেজ চালাবে।

এইভাবে যদি অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায়ের নাম করতে হয়, তবে বলব বাণিজ্যের জন্য পৃথক কলেজ থাকবে। এর পর বাকি থাকে কলা, চিকিৎসা ও কৃষির কথা। আজ একাধিক কলার কলেজ স্বাশ্রয়ী। সুতরাং রাষ্ট্রের তরফ থেকে কলার কলেজ চালানো হবে না। চিকিৎসা-বিদ্যার কলেজ অনুমোদিত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। চিকিৎসা-বিদ্যা শেখার কলেজ বিত্তবান

সম্প্রদায়ের ভিতর বেশ জনপ্রিয়। সুতরাং তাঁরা নিজেদের চাঁদায় এজাতীয় কলেজ চালাবেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। কৃষি-কলেজকে নিজ নামের যোগ্য হতে হলে স্বাবলম্বী হতেই হবে। একাধিক কৃষিবিদ্যার স্নাতক সম্বন্ধে আমার বড়ই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে। তাঁদের জ্ঞান একেবারে ভাসা-ভাসা। তাঁদের ভিতর বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব দেখেছি। কিন্তু তাঁরা যদি কোন স্বাবলম্বী কৃষি-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ থাকতেন ও দেশের প্রয়োজন বুঝে কাজ করতেন, তাহলে ডিগ্রী নেবার পরও নিয়োগকর্তার অর্থের অপচয় করে তাঁদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত না।

হরিজন, ৩১-৭-১৯৩৭

উচ্চশিক্ষা

জাতির প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শ্রমশিল্প, যন্ত্রবিজ্ঞান, রম্যরচনা বা চারুকলা ইত্যাদি যাবতীয় উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দিতে হবে।

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত অর্থের দ্বারা সেগুলি স্বাবলম্বী হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা ও নির্ধারণ করবে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চলবে না। যে-কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে উদারভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সরবরাহ করা হবে। তবে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ পরিচালন করা ছাড়া রাষ্ট্রকে বিশ্ববিদ্যালয় বাবদ আর কিছু খরচ করতে হবে না।

অবশ্য পূর্বোক্ত প্রস্তাবের অর্থ এ নয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সেমিনার চালানো যাবে না।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে

১। আমি বিশ্বের উচ্চতম শিক্ষারও বিরোধী নই।

২। রাষ্ট্রের কাছে এর কোন নিশ্চিত প্রয়োজন থাকলে তবে রাষ্ট্র এর জন্য অর্থব্যয় করবে।

৩। আমি সর্বসাধারণ-প্রদত্ত রাজস্ব থেকে যাবতীয় উচ্চশিক্ষার ব্যয়নির্বাহ প্রথার বিরোধী।

৪। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের কলেজগুলিতে তথাকথিত কলাশিক্ষার নামে যে অজস্র অর্থব্যয় করা হয়ে থাকে, তা একেবারেই বাজে খরচ এবং এর ফলে শিক্ষিত সমাজ বেকার হয়ে পড়েছে। আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, যেসব ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষার যাঁতাকলের ভিতর পেষাই হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

৫। ভারতবর্ষে এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে এর পরিণামে জাতির ভীষণ বৌদ্ধিক ও নৈতিক হানি হয়েছে। আমরা এই কালেরই মানুষ বলে এই ক্ষতির সর্বনাশা গভীরতা পরিমাপ করতে পারব না। এ ছাড়া আমরা স্বয়ং এ শিক্ষা পেয়েছি বলে ক্ষতির হিসাবনিকাশ করার সময় আমাদের এক অসম্ভবপ্রায় কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এই শিক্ষার শিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আবার এর পরিণামের বিচারক হতে হবে। অতএব আমাদের পক্ষে এই সর্বনাশের ভয়াবহতা পরিমাপ করা এক রকম অসম্ভব।...

অতএব আমার দাবি হচ্ছে এই যে, আমি উচ্চশিক্ষার বৈরী নই। তবে আমাদের দেশে যেভাবে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, অবশ্যই আমি তার শত্রু। আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাতে আজকের তুলনায় বহুগুণ অধিক ও উঁচুদরের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান-মন্দির ও গবেষণাগার থাকবে। মৎ পরিকল্পিত স্থিতিতে দেশে দলে দলে রসায়নশাস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বাহিনী থাকবে। নিজেদের অধিকার ও অভাব সম্বন্ধে ক্রমসচেতন জনগণের বহুমুখী এবং নিত্য-বর্ধনশীল প্রয়োজন পূর্তি করা দেশের সেবক এই সব বিশেষজ্ঞের কাজ হবে। এই সব বিশেষজ্ঞ বিদেশী ভাষায় কথা বলবেন না। তাঁরা জনগণের ভাষায় বাক্যালাপ করবেন। তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করবেন তা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হবে। তখন স্রেফ অনুকরণের পরিবর্তে মৌলিক কাজ হবে এবং এর ব্যয়ভার সবার উপর সমান ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পড়বে।

হরিজন, ৯-৭-১৯৩৮

ছাত্রদেব বিলাতে পাঠানো

বন্ধুটি বললেন, "সেকালের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ইংলণ্ডে শিক্ষা পেয়েছিলেন। আপনিও এর এক উদাহরণ। আপনি কি চান যে স্বাধীনতা পাবার পর ভারত তার ছাত্রদের পূর্বের মত বিলাতে শিক্ষা নিতে পাঠাক?"

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "না, এখনই নয়। বছর চল্লিশেক পরে অবশ্য ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতে যাবার পরামর্শ দিতে আমার আপত্তি নেই। বন্ধুটি মন্তব্য করলেন, "তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে আগামী দুই পুরুষ পাশ্চাত্য-দেশের সম্পর্কে আসার উপকার থেকে বঞ্চিত হবে।"

গান্ধীজী বললেন, "দুই পুরুষ কেন? এমন কি কোন ব্যক্তির জীবনেও চল্লিশ বা ষাট বছর খুব একটা বড় কথা নয়। আজকে দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই যেমন এদেশে ষাট বছর বয়সে বুড়িয়ে যান ঠিকমত চলতে জানলে তা হবার কথা নয়। আমি আবার বলছি যে বুদ্ধি পরিণত হবার পরই ছাত্রদের বিদেশে যাওয়া উচিত। কারণ নিজেদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্বন্ধে জানার পরই কেবল তারা ইংলণ্ড বা আমেরিকার কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ গুণাবলী যথাযথভাবে উপলব্ধি ও গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আমার মত সতের বছরের যে ছেলে বিলাতে যাচ্ছে তার কথা কল্পনা করুন। সে তো নিছক ডুবে মরবে।"

হরিজন, ২৩-৬-১৯৪৬

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

বিভিন্ন প্রদেশে যেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে। গুজরাত গুজরাতী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় চায়, মহারাষ্ট্র মারাঠীর, কর্ণাটক কন্নড় ভাষার, ওড়িষা ওড়িয়া ভাষার এবং আসামের লোক অসমীয়া ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় চায়। আমিও বিশ্বাস করি যে এই সব সমৃদ্ধ প্রাদেশিক ভাষা-ভাষীদের যদি পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে হয়, তবে এজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই আশঙ্কাও উঠেছে যে উপরি-উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমরা যেন অহেতুক ব্যগ্রতা প্রকাশ করছি। প্রথমে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির রাজনৈতিক পুনর্গঠন প্রয়োজন। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গুলি পৃথক পৃথক ভাবে শাসিত হলে স্বভাবতই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাতী মারাঠী ও কন্নড়—এই

তিনটি ভাষা চলেছে। ফলে তিনটিরই বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে। মাদ্রাজে তামিল তেলেগু মালায়লম্ ও কন্নড়—এই চার ভাষা। এখানে ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। একথা ঠিক যে অন্ধ্র দেশে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আমার মতে বিদেশীর প্রভাবমুক্ত এক পৃথক শাসনবিভাগীয় একক্ রূপী অন্ধ্রে এর যে মর্যাদা হত এখন তা নেই। ভারত মাত্র দুই মাস পূর্বে সেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কে একথা বলতে পারে যে সেখানে তামিলের যথাযোগ্য স্থান হয়েছে?

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উপযুক্ত পৃষ্ঠভূমি প্রস্তুত থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সরবরাহকারী যথেষ্টসংখ্যক স্কুল ও কলেজ থাকা প্রয়োজন এবং সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। শুধু তাহলেই যথার্থ পরিবেশ সৃষ্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থাকে সবার শীর্ষে। মজবুত ভিত্তিভূমিই মহতী শীর্ষ ধরে রাখতে পারে।

আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি পেলেও পশ্চিমের প্রচ্ছন্ন অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হই নি বলে মনে হয়। যেসব রাজনীতিবিদ্ মনে করেন যে শুধু পশ্চিম থেকেই জ্ঞান আসতে পারে, তাঁদেরকে আমার বলার কিছু নেই। আর আমি একথা মানতে রাজী নই যে পাশ্চাত্য দেশ থেকে কল্যাণকর কিছু আসতে পারে না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে এখনও আমরা এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম নই। অবশ্য আমার বিশ্বাস যে কারও মনে এরকম ধারণা নেই যে আমরা বিদেশের শাসনবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি বলে শুধু সেই কারণেই বিদেশী ভাষা ও চিন্তাধারার গোপন ও সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করতে যাবার পূর্বে একটু দাঁড়িয়ে আমাদের শ্বাসযন্ত্রকে নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রাণবায়ুতে ভরে নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধিও কি আমাদের এই নির্দেশ দেয় না? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কখনই বিশাল সৌধমালা বা স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার প্রয়োজন হয় না। জাগ্রত ও বুদ্ধিযুক্ত জনমতের সমর্থন এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিরাট এক শিক্ষক-বাহিনী চাই। এর প্রতিষ্ঠাতৃবর্গকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থব্যয় করা উচিত নয়। জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য তারাই করবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় দেশের শোভা বর্ধন

করবে। শাসন-ব্যবস্থা যে দেশে অপরের কবলিত, সেখানে জনসাধারণের কাছে সব কিছু উপর থেকে আসে বলে তারা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর শাসন-ব্যবস্থা যেখানে গণসমর্থনের সুপ্রশস্ত ভিত্তিভূমি আধারিত, সেখানে সব কিছু নীচে থেকে জন্ম নিয়ে উর্ধ্বাভিমুখে অভিযান করে এবং সেই জন্য তা স্থায়ী হয়। এরূপ ব্যবস্থা সুদৃশ্য ও জনগণের শক্তিবর্ধক হয়। উর্বর ভূমিতে বপিত বীজ থেকে যেমন প্রচুর শস্য পাওয়া যায়, তেমনি পূর্ব-বর্ণিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থ দশগুণ ফল প্রসব করে। বিদেশী শাসনকালে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একেবারে বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়েছে। হয়ত তাদের কাছে অন্যরকম পরিণাম আশা করাই অন্যায়। অতএব ভারতবর্ষ নবলব্ধ স্বাধীনতা ভালভাবে পরিপাক না করা পর্যন্ত সতর্কভাবে পদক্ষেপ করার সর্ববিধ কারণ বিদ্যমান।

এর পর হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের কথা ধরুন। এই গরল এত ভীষণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে যে, এ যে আমাদের কোন্ সর্বনাশের ঘূর্ণিপাকে নিয়ে যাবে, অগ্রিম তা বলা অসম্ভব। সেই অচিন্তনীয় অবস্থার কথা কল্পনা করুন, যখন ভারতীয় ইউনিয়নে আর একটি মুসলমানেরও সম্মান ও নিরাপত্তা সহকারে থাকার উপায় নেই এবং পাকিস্তানেও হিন্দু ও শিখেদের ঐ একই অবস্থা হয়েছে। সে সময় আমাদের শিক্ষা এক বিষাক্ত আবরণে আচ্ছাদিত হবে। পক্ষান্তরে উভয় ডোমিনিয়নেই যদি হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে, তাহলে স্বভাবতই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অতীব প্রীতিপ্রদ রূপ পরিগ্রহ করবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বহুদিন সখ্যতা সহকারে একত্র বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মনোহর সমন্বয় ঘটেছে, হয় আমরা তাকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে স্থায়ী করার চেষ্টা করব, আর নচেৎ আমরা আকুল আগ্রহে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করব, হিন্দুস্থানে যখন একটিমাত্র ধর্ম ছিল ও অবশেষে আমরা সেই অন্য-নিরপেক্ষ সংস্কৃতির যুগে ফিরে যাব। খুব সম্ভব আদৌ আমরা ইতিহাসে ঐরকম কোন যুগের নজীর পাব না। তবে যদি এরকম যুগের নজীর পাওয়াও যায় এবং আমরা পিছু হটে যদি সেই যুগে ফিরে যাই, তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে অন্ধকার যুগে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলব এবং এরূপ করার জন্য আমরা সমগ্র বিশ্বের অভিশাপ কুড়াব। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি মুসলমান যুগ বিস্মৃত হবার বৃথা চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের ভুলে যেতে হবে যে দিল্লীতে

পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় জুম্মা মসজিদ ছিল, আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বা আগ্রাতে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজ ছিল, অথবা মোগল আমলে দিল্লী ও আগ্রায় বিরাট বিরাট দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। আমাদের তাহলে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসকে নূতন করে লিখতে হবে। আমরা কোন্ পথ বেছে নেব সে সম্বন্ধে মতানৈক্য অপরিহার্য এবং আজ নিশ্চয় দেশের বায়ুমণ্ডল এমন নয় যে আমরা এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমাদের দুই মাস বয়স্ক স্বাধীনতা রূপপরিগ্রহ করার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত এব আকৃতি কেমন হবে, তা আমরা জানি না। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ রূপ আমাদের সম্মুখে ভাস্বর না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাতে সম্ভবত অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে তাদের ভিতর স্বাধীনতার প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার করাই এখনকার মত যথেষ্ট। এইভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা নবীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সময় এলে কাজে লাগবে।

হরিজন, ২-১১-১৯৪৭

॥ আট ॥

বয়স্কদের শিক্ষা

সামাজিক শিক্ষা

সামাজিক শিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার সমস্যা শিশুদেব শিক্ষা-সমস্যার চেয়েও দুরূহ। শিশুশিক্ষার ফলিত রূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু উদাহরণ দেশে আছে। কিন্তু দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সেটুকু সহায়ক দৃষ্টান্তও নেই। এ ব্যাপারে বিদেশ থেকে আমরা সামান্য মাত্রই শিখতে পারি। সেসব দেশের থেকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ভিন্নতর।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির কারণ আমাদের দেশে সামাজিক শিক্ষার প্রগতি তেমন সবলভাবে হয় নি। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত থাকায় দেশে প্রায়ই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হয়ে থাকে। আর হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টান ইত্যাদি সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাও চলতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিন্দুর কাছে যে যুক্তি পেশ করা যায় মুসলমানের কাছে তা করা চলে না। অথচ তবুও উভয়কে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের অপকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

সমাজ সংস্কার বহু ব্যাপক এবং দুরূহ কার্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, প্রত্যেকের ভিতর বহু উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বজনিত সমস্যা আছে। একথা কেউ যেন মনে না করেন যে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা নেই। হিন্দুরা সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই এই পাপ সংক্রমিত করেছেন।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাফাই ও রাজনীতি—একমাত্র এই তিনটি বিষয় সবাইকে সমানভাবে শেখানো যেতে পারে। আমি ধরে নিয়েছি যে রাজনীতির ভিতর অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানও অন্তর্নিহিত।

আশ্চর্য মনে হলেও আমাদের ভারতবর্ষে রাজনীতি ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের গভীর সম্বদ্ধ বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন ধর্মের সবাই রাজনীতির প্রতি সমান দৃষ্টিতে দেখেন না। তাছাড়া রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবেচনা করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জনগণের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অসুস্থতার পর আরোগ্যকামী সবাইকে বীফ-টি খাবার পরামর্শ দিতে পারেন না। আর মুসলমানদের তাঁরা জলপান করার ব্যাপারে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে পারবেন না।

এই অবস্থায় কোথা থেকে সামাজিক শিক্ষার সূত্রপাত করতে হবে এবং এর পরিধি ও গণ্ডিই বা কতটা হবে? সামাজিক শিক্ষার অর্থ হল সমগ্র জনসাধারণের শিক্ষা। এর অর্থ কেবল একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলে কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের অক্ষর পরিচয় করানো নয়।

তাহলে সামাজিক শিক্ষায় আত্মনিয়োগকারী শিক্ষক কি করবেন?

এখনকার মত আমি কেবল তাঁর সামনে খোলা দুটি উপায়ের কথাই চিন্তা করতে পারি: প্রথমটি হল তিনি কোন গ্রামের বাসিন্দা হবেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের সেবা করবেন। তিনি তাঁদের যে-পরিমাণ সেবা করবেন সেই পরিমাণ তাঁদের শিক্ষাদান কার্য হবে। দ্বিতীয় পন্থা হল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করার উপযুক্ত সহজ পুস্তক লিখে স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করতে হবে এবং তারপর জনসাধারণের মধ্যে এই সব পুস্তকের বহুল প্রচারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। এই কাজে উৎসাহী ব্যক্তিরা

নিরক্ষর জনসাধারণদের একসঙ্গে বসিয়ে এই সব বই পড়ে শোনাবেন এবং ক্রমশঃ এ একটা স্থায়ী প্রথায় পরিণত হবে।

গণশিক্ষার এই ধারণা যদি যথার্থ হয় তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তার সঠিক ধারণা এখনও জনসাধারণের হয় নি। এক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ ভাবে হলেও কংগ্রেস কিছু কাজ করেছে। অবশ্য চরিত্রগঠনেচ্ছুক শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে কংগ্রেস এ কাজ করে নি। রাজনৈতিক কর্মী প্রধানতঃ রাজনৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ স্বরাজের দাবিতে সোচ্চার হবার শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহশীল। তিনি মনে করেন যে স্বরাজ অর্জিত হলে জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই রূপায়িত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে শিক্ষক মনে করেন যে একমাত্র চরিত্রবলে বলীয়ান্ হলেই স্বরাজ অর্জন সম্ভব। বর্তমানে অবশ্য আমরা কেবল শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করছি। চরিত্রবল না থাকলেও রাজনৈতিক কর্মী নিজ লক্ষ্য-সাধনে সফলকাম হতে পারেন, কিন্তু চরিত্রবল ছাড়া গণশিক্ষকের চলবে না। এ ব্যাপারে কোন ন্যূনতা থাকলে তিনি নোন্‌তা স্বাদবিহীন নুনের মত হবেন।

বিনয়, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

বয়স্কদের শিক্ষা

আমার মতে দেশবাসীর নিরক্ষরতার জন্য নয়, বরং অজ্ঞতার জন্য আমাদের লজ্জিত ও দুঃখিত হবার সঙ্গত কারণ আছে। অতএব বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি সযত্নে নির্বাচিত শিক্ষকদল এবং সমপরিমাণ যত্নের সহিত নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা দ্বারা গ্রামস্থ বয়স্কদের মন গড়ে তুলে অজ্ঞতা দূরীকরণের এক ব্যাপক কার্যক্রম আরম্ভ করতে চাই। এর অর্থ এ নয় যে আমি তাদের অক্ষরজ্ঞান দিতে অনিচ্ছুক। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এর মূল্য আমি খুবই স্বীকার করি এবং তাই অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পরিকল্পনা বর্জন করা বা একে ছোট করে দেখার প্রশ্ন ওঠে না। অক্ষরপরিচয়-পর্ব সহজ করার জন্য অধ্যাপক লুবাক্-এর অসীম প্রচেষ্টা ও ঐ আদর্শাভিমুখে অধ্যাপক ভাগবতের মহান্ এবং বাস্তব অবদান আমি প্রশংসা করি। আমি তো সেগাঁওবাসী নরনারী এবং এমন কি শিশুর উপর তাঁর কলাপ্রয়োগ করার জন্য অধ্যাপক ভাগবতকে সুবিধা পেলেই সেগাঁও-এ আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

হরিজন, ৬-৬-১৯৩৭

বয়স্ক-শিক্ষার লক্ষ্য

প্রশ্ন : আমাদের বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনার লক্ষ্য অক্ষরজ্ঞানের প্রসার, না "প্রয়োজনীয় জ্ঞান" দানের প্রচেষ্টা হবে ?

উত্তর : যাঁরা বয়স্ক এবং কোন না কোন পেশায় নিযুক্ত, তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে লিখতে পড়তে জানা। ব্যাপক নিরক্ষরতা ভারতের পাপ ও লজ্জার বিষয় এবং তাই এর নিরাকরণ অবশ্য কর্তব্য। তবে সাক্ষরতার আন্দোলন বর্ণ পরিচয়ে শুরু ও শেষ হবে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কার্য চলবে।

হরিজন, ১৮-২-১৯৩৯

বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান

তিরু ভেন্নাইনাল্লুরের গান্ধী মিশন সোসাইটি তাঁদের বয়স্ক শিক্ষণ-কার্যের ষাণ্মাসিক কার্য-বিবরণ আমাকে পাঠিয়েছেন। মোট ১৯৭ জন প্রাপ্তবয়স্ককে শিক্ষিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের সামনের জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে, "কিভাবে প্রাপ্তবয়স্করা এইভাবে অর্জিত জ্ঞানকে স্থায়ী করতে পারে।" কার্য-বিবরণে বলা হয়েছে : "প্রথম দফায় যেসব লোকেরা শিক্ষা নিতে আসতেন, তাঁদের প্রায় অর্ধেকেই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে পুনরায় পুরাতন পাঠ পড়াতে বলেছেন। বস্তুতঃ আবার তাঁরা নিরক্ষরের পর্যায়ে ফিরে গেছেন। এই জাতীয় বিস্মৃতির পালা বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কর্মীরা মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন।" কর্মীদের মাথা ঘামিয়ে মরার প্রয়োজন নেই। যে যৎসামান্য সময়ের জন্য ওদের পড়ানো হয়, তারপর অধীত পাঠ ওদের পক্ষে ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। গ্রাম-বাসীদের দৈনন্দিন জীবনেব প্রয়োজনের সঙ্গে পঠিতব্য বিষয়ের অনুবন্ধ করার পরই মাত্র এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির হাত এড়ানো যেতে পারে। শুধু মোটামুটি লিখতে পড়তে ও হিসাব করতে জানা আজ তো গ্রামীণ জীবনের স্থায়ী অঙ্গ নয়-ই ভবিষ্যতেও কোন দিন এ মর্যাদা পাবে না। গ্রামবাসীদের জ্ঞানদানের পদ্ধতি তাঁদের নিত্যকার জীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। এটা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। তাঁদের ভিতর এর জন্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা দরকার। আজ তাঁদের যা দেওয়া হয়, তার জন্য তাঁদের মনে চাহিদাও নেই এবং তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। গ্রামবাসীদের গ্রাম্য গণিত,

গ্রাম্য ভূগোল, গ্রাম্য ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিন। যেটুকু সাহিত্য-জ্ঞান তাদের নিত্য প্রয়োজন, অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখতে পড়তে জানা ইত্যাদি—তা-ই তাদের শেখাবার ব্যবস্থা করুন। এই ধরনের জ্ঞান তাঁরা সযত্নে রক্ষা করবেন ও শিক্ষার পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। যেসব পুস্তক তাঁদের নিত্যকার জীবনে গ্রহণীয় কিছু দিতে পারে না, তাঁদের তার প্রয়োজন নেই।

হরিজন, ২২-৬-১৯৪০

॥ নয় ॥

নারীদের শিক্ষা

নারীদের শিক্ষা

নারীদের শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষার মতই ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষা-পরিকল্পনা নির্বাচনের পূর্বে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় নি।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বালক ও বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশই একরকম হবে। এটা বাদ দিলে উভয়ের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে পৃথক। প্রকৃতি যেভাবে পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে গড়েছে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ভিতর সেই রকম পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। একথা সত্য যে উভয়েই সমান। কিন্তু তাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্যে পার্থক্য বিদ্যমান। গৃহের অভ্যন্তরে নারীই সর্বেসর্বা। আর পুরুষ বাইরের প্রভু। পুরুষ জীবিকা উপার্জন করে, নারী তার থেকে সঞ্চয় ও ব্যয় করে থাকে। নারী শিশুদের মানুষ করে, তাকে মা হতে হয়। শিশুদের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব নারীর। নারী শিশুদের শিক্ষয়িত্রী এবং সেই কারণে সমগ্র জাতিরও মাতা। এই অর্থে পুরুষ সমগ্র জাতির পিতা নয়। একটা বয়সের পর পিতা আর সন্তানকে প্রভাবিত করতে পারে না কিন্তু মায়ের বেলা তা ঘটে না। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলেও মায়ের কাছে শিশুর মতই আচরণ করে। অথচ বাবার কাছে এমন করতে পারে না।

এই ব্যবস্থাকে যদি স্বাভাবিক ও উচিত বিবেচনা করা হয় তাহলে নারীদের জীবিকা অর্জন করতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের

তার বিভাগের কেরানী টাইপিস্ট বা কম্পোজিটারের কাজ করতে হয় আমার মতে তা সুব্যবস্থিত রীতি নয়। এরকম সমাজব্যবস্থা নৈতিক ও আর্থিক দেউলিয়া বৃত্তির দ্যোতক এবং এ অবস্থা এই কথা প্রমাণ করে যে সেই সমাজের অধিবাসীরা নিজেদের পুঁজি ভেঙ্গে খাওয়া আরম্ভ করেছেন।

এই জন্য নারীদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে বা অবদমিত করে রাখা যেমন অন্যায় তেমনি তাদের দিয়ে পুরুষের কাজ করানোও অনুচিত। কারণ এসব সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বলতার লক্ষণ ও নারীদের প্রতি অত্যাচারের সমতুল্য।

সুতরাং একটা বয়সের পর মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা করা উচিত যা পুরুষদের থেকে পৃথক। গৃহস্থালী পরিচালনা, প্রসূতি-বিজ্ঞান ও শিশুপালন সম্বন্ধে নারীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

…দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এমন বহুসংখ্যক মেয়ে আছেন যাঁদের শৈশবেই বিবাহ হয়ে যায়।· ·আর একবার তাঁদের বিবাহ হয়ে গেলে তাঁরা যেন সামাজিক জীবন থেকে একদম অদৃশ্য হয়ে যান। এ সম্বন্ধে "ভগ্নী পুস্তকমালার" ভূমিকায় আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি এবং এখানে তা আবার উদ্ধৃত করছি:

"কেবল বালিকাদের শিক্ষা দিয়ে আমরা নারীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে পারব না। বাল্যবিবাহের দৈত্যের কবলে পড়ে হাজার হাজার মেয়ে বারো বছর বয়সের পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে যায়। এক ধাক্কায় তারা মেয়ে থেকে গৃহিণীতে পরিণত হয়ে যায়। এই কুপ্রথা যতদিন চলবে ততদিন একটিমাত্র বিকল্প ব্যবস্থাই হতে পারে এবং তা হল পুরুষদের নারীর শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটা এই জাতীয় পুরুষ শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। আজকের মত নারীদের আমাদের ক্রীতদাসী ও সম্ভোগের পাত্রী করে রাখা চলবে না। এর পরিবর্তে তাদের আমাদের যথার্থ জীবন-সঙ্গিনী, জীবনযুদ্ধের সহকর্মী ও সুখ-দুঃখের সাথীর ভূমিকা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা বাড়ীর মেয়েদের পশু বলে মনে করেন।…এই মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে মেয়েদের হীন মনে করার প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। অপর দিকে আবার কামনায় অন্ধ অনেক পুরুষ নারীদের মাথায় তুলে রাখেন এবং দেবমূর্তিকে যেমন আমরা অলঙ্কার পরাই তেমনিভাবে

নারীদের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। এই কুপ্রথা থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে। মহাদেবের কাছে পার্বতী যা, রামের কাছে সীতার যে স্থান এবং নলের কাছে দময়ন্তী যা—আমাদের নারীরা আমাদের কাছে সেই রকম না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। এরকম হলে নারীরা আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, সমানাধিকারের ভিত্তিতে কোন বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করবেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করে তাকে শক্তিশালী করবেন, সংবেদনাজাত তাঁদের চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির বলে আমাদের অসুবিধার কথা উপলব্ধি করবেন, এই সব অসুবিধা দূরীকরণের সংগ্রামে আমাদের ভাগীদার হবেন এবং প্রয়োজনকালে আমাদের স্নিগ্ধ শান্তির পরশ দেবেন। কেবল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করলে এ আদর্শ সংসাধিত হবে না। বাল্যবিবাহের ফাঁস যতদিন আমাদের গলায় থাকবে ততদিন পুরুষকেই নারীর শিক্ষক হতে হবে। আর পুরুষরা এই যে শিক্ষা নারীদের দেবেন তা কেবল সাহিত্যমূলক হবে না—এর পরিধি সমাজসংস্কার ও রাজনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। অক্ষর ও ভাষাজ্ঞান হবে পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ শেখাবার সোপান স্বরূপ। এমন কি ভাষাজ্ঞান ছাড়াই ঐ সব বিষয় শেখানো যেতে পারে। নিজ স্ত্রীকে যে পুরুষ এইভাবে শিক্ষা দিতে যান স্ত্রীর প্রতি, তাঁর নিজ মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং ছাত্র হবেন এবং স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম পালন করবেন। কোন অবস্থাতেই তিনি বারো থেকে পনের বছরের মেয়ের উপর সন্তানধারণের বোঝা চাপাবেন না। ব্যাপারটি কল্পনা করতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই শত পালন করলে আমরা বর্তমানের মত আর জড়তার চাপে পিষ্ট হব না।"

বিচার সৃষ্টি, ১৯১৭

নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা

পুরুষদের মত নারীদের জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে নারীদের পুরুষদের ধরনের শিক্ষা দিতে হবে।...পুরুষ ও নারী উভয়ে সমশ্রেণীর; তবে দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিক থেকে পরস্পরের হুবহু অনুরূপ নয়। পুরুষ ও নারী এক অনবদ্য যুগল ও একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে সাহায্য করে বলে একজন বিনা অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই ঘটনা থেকে স্বতঃসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, এদের কারও সামাজিক

মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য। নারী-শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এই জলন্ত সত্য সদাসর্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকা প্রয়োজন। বিবাহিত দম্পতির ভিতব পুরুষের উপর বাইরের কার্যকলাপের সর্বাধিক দায়িত্ব। সুতরাং স্বভাবতই এক্ষেত্রে তার অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে গৃহস্থালীর ভিতর নাবীব একচ্ছত্র আধিপত্য। অতএব গৃহস্থালীর ব্যাপারে ও শিশুপালন এবং তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নারীর অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানকে অবশ্য পরস্পর সম্পর্ক-রহিত ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত করার কথা বলা হচ্ছে না। এ কথাও বলা হচ্ছে না যে জ্ঞানরাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ কারও কাছে অনধিগম্য থাকবে। তবে পূর্বোক্ত মৌলিক নীতি অনুসরণে পুরুষ এবং নারীর জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাক্রম নির্ধারিত না হলে নর বা নারীর জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

মেয়েদের ইংরাজী শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার মতে সাধারণতঃ পুরুষ বা নারী কারও ইংরাজী শেখার দরকার নেই। তবে জীবিকা অর্জনের জন্য অথবা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য পুরুষদের হয়ত ইংরাজী শিখতে হতে পারে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য নারী চাকরি বা ব্যবসা করুক—এ নীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। যে সামান্য কয়জন নারীর ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজন বা যাঁদের এ ইচ্ছা আছে, তাঁরা পুরুষদের বিদ্যালয়ে যোগদান করে সহজেই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন। মেয়েদের বিদ্যালয়েও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করার একমাত্র অর্থ হচ্ছে আমাদের অসহায় অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। সময় সময় এই কথা কানে আসে যে ইংরাজী সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ নরনারী নির্বিশেষে সকলের কাছে সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। আমার বিনম্র নিবেদন এই যে, এজাতীয় মনোভাব গঠিত হবার পিছনে কিছুটা ভ্রান্তি ক্রিয়াশীল। কেউ-ই চায় না যে এই সম্পদের দ্বার পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত রেখে তার উপর নারীদের জন্য প্রবেশ নিষেধের বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হোক। সাহিত্যিক রুচি থাকলে পৃথিবীতে কারও এমন শক্তি নেই যে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। তবে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবার কালে সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রয়োজন পূর্তি করা যায় না।

বোম্বাই ভগ্নী সমাজের সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৮

নারী-শিক্ষার নানা দিক

[আহমেদাবাদের গুজরাত সাহিত্যসভা নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুসংখ্যক নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিল। এখানে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের কয়েকটি দেওয়া হল।]

প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি মেয়ে আরও চার-পাঁচ বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এই কয় বৎসর তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে না ইংরেজীর মাধ্যমে—এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমার মনে হয় এ অবস্থায় তাদের ইংরেজী শেখার অর্থ তাদের মেরে ফেলা। দেশের লক্ষ লক্ষ নারী কখনও ইংরেজীর মাধ্যমে চিন্তা করতে বা সেই চিন্তা ব্যক্ত করতে পারবেন না। আর এরকম সম্ভবপর হলেও তা অবাঞ্ছিত।

"যেসব মহিলাদের জন্য আমরা এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করছি তাঁদের যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা নিজেদের ঘর-গৃহস্থালীকে সোনার মত উজ্জ্বল ও সুন্দর করে তুলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাহলে তাঁদের শিক্ষালাভে বঞ্চিত ভগ্নীদেরও এর দ্বারা প্রভাবিত করতে পারবেন এবং তাঁদের মূল্যবান সেবা দিতে পারবেন।"

সংস্কৃত সম্বন্ধে গান্ধীজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন: "আমার মতে মেয়েদের সংস্কৃত শেখানো উচিত এবং সম্ভব হলে এটা তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তবে এই চার-পাঁচ বছর সময়কে সব চেয়ে বেশী কাজে লাগাতে হবে বলে এসময় সংস্কৃত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।"

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

"নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। আমার মনে হয় যে ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে হিন্দুধর্মের মূল নীতি এত প্রচ্ছন্ন যে কিভাবে এ ধর্ম শেখানো যেতে পারে হঠাৎ তা বলা যায় না। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে গীতা রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতকে হিন্দুরা সবাই শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে দেখেন এবং এই সব ধর্মগ্রন্থের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যদি মেয়েদের এগুলি পড়ানো হয় তাহলে যথেষ্ট কাজ হবে বলে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করার চেয়ে শিক্ষক বাছাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

"আখা ভগত-এর বাণী ছিল যে পৃথিবীতে নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে যেমন ভাবেই থাক না কেন সর্বদা নিজের সম্মুখে ঈশ্বরপ্রাপ্তির লক্ষ্য

জাগরূক রাখ। এই আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তবে ধর্মীয় শিক্ষার পরিপূর্তি হবে।”

আত্মোদ্ধার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫

নারীদের ভিতর নিরক্ষরতা

পুরুষদের মত নারীদের ভিতর নিরক্ষরতার কারণ আলস্য ও জাড্য নয়। যে হীন অবস্থার বোঝা নারীকে স্মরণাতীত কাল থেকে অন্যায়ভাবে নিষ্পিষ্ট করে মারছে, নারীর বর্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ তাই। পুরুষ নারীকে তার কর্ম-সহচরী ও অর্ধাঙ্গীর মর্যাদা দেবার পরিবর্তে তাকে গৃহস্থালীর নীরস কৃত্য সম্পাদন-যন্ত্র ও সম্ভোগ-পাত্রে পরিণত করেছে। ফলে সমাজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে। নারীকে অতি সঙ্গত কারণেই জাতির মাতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমরা যে মহা অবিচার করেছি, তাঁদের ও আমাদের উভয়ের খাতিরে তার নিরাকরণ করতে হবে।

হরিজন, ১৮-২-১৯৩৯

॥ দশ ॥

হরিজনদের শিক্ষা

হরিজন-ছাত্রাবাস

একটি হরিজন-ছাত্রাবাসের পরিচালক লিখেছেন :

“.. বর্তমানে পনেরটি ছাত্র এখানে আছে এবং তাদের জন্য একজন পাচক নিয়োগ করা হয়েছে। ছাত্রাবাসের আর সব কাজকর্ম এখানকার ছেলেদের করতে হয়। কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আলোচনার সময় রান্নার বাসনপত্র পরিষ্কার করার ভার দুটি ছেলের উপর দেবার কথা ভাবছিলাম। এতে আমার জনৈক সহকর্মী বললেন যে এমনিতেই হরিজন ছাত্রদের মনোভাব নীচু, এর উপর তাদের বাসন মাজতে দিলে তা আরও শোচনীয় হবে। বন্ধুটিকে আমি ‘সাতারা হোম’ ও মাদ্রাজের ‘রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম’-এর উদাহরণ দিলাম। ‘সাতারা হোম’-এ এমন কি রান্নার কাজও ছাত্ররা করে এবং ‘রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস্ হোম’-এর

১২০ জন অধিবাসীর জন্য দুজন পাচক ছাড়া অপর কোন ভৃত্য নেই। তবে আমার বন্ধুটি আমার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হন নি। তিনি এইজন্য এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন যে এখনকার মত আর একজন লোক রাখার সঙ্গতি আমাদের নেই। ছাত্রদের দিয়ে প্রত্যেক দিন সকালে রান্নার বাসনপত্র মাজানো কি আপনি অনুচিত মনে করেন?"

এ এক পুরাতন কাহিনী। আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রতিটি ছাত্রাবাসে ময়লা পরিষ্কার করা সহ যাবতীয় শ্রমমূলক কাজ ছাত্রাবাসের অধিবাসীদের দিয়েই করানো উচিত। এর কারণ ছাত্রাবাসের অধিবাসীদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে না। প্রত্যুত এর ফলে অধ্যয়নের সঙ্গে বাস্তবতা যুক্ত হবে, ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে এবং তাদের অর্থের সাশ্রয় হবে। সুতরাং যেসব ছাত্রাবাস পরিচালক সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে অথবা আলস্যের কারণ ছাত্রদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন না তাঁরা ছাত্রদের নিজ নিজ ছাত্রাবাসের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শ্রমমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন ছাত্রদের সুস্পষ্ট অপকার করবেন। এজাতীয় শ্রমকে ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। তবে ছাত্রদের দিয়ে এজাতীয় শ্রমমূলক কাজ করানোর একটি শর্ত আছে। ছাত্রাবাসের পরিচালকেরা নিজেরা এসব শ্রমমূলক কাজে ভাগ নিয়ে স্বয়ং আদর্শ পেশ করবেন। তাহলে আর নীচু মনোভাব আরও শোচনীয় হবার বিপদ থাকবে না।

হরিজন, ৩০-৯-১৯৩৩

হরিজন শিশুদের শিক্ষা

প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের হরিজন ছাত্রছাত্রীদের আমরা ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধা দিতে বাধ্য হলেও আমাদের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলিতে ক্রীতদাসের মত ঐসব বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতির অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের বুঝতে হবে যে অনেক কষ্ট করলে তবে পড়ুয়া হরিজন শিশু পাওয়া যায়। তারা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসবে—একথা আশা করা যায় না। আর আমাদের অতীতের শোচনীয় উপেক্ষার কারণ তারা আজ এতটা রুক্ষ, তাই প্রথমাবস্থায় তাদের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখাশুনা করতে হবে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি করার পর তাদের শরীরকে ভাল করে দেখে নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। হয়ত তাদের কাপড়চোপড় কেচে দিয়ে জায়গায় জায়গায় সেলাই করে দিতে হবে। সুতরাং কিছু দিনের জন্য তাদের প্রথম পাঠ হবে ফলিত-স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাফাই-বিজ্ঞান এবং সেলাই-ফোঁড়াই। সমগ্র প্রথম বছরে সম্ভবতঃ কোন বই-এর প্রয়োজন হবে না। তারা যে সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত তাই নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে এবং এই সময় তাদের উচ্চারণ সংশোধন করে তাদের ব্যাকরণ ও নূতন নূতন শব্দ শিক্ষা দিতে হবে। রোজ তারা যেসব নূতন নূতন শব্দ শিখছে সেগুলি আমি লিখে রাখব এবং সেগুলি আমি তাদের মনে গেঁথে না যাওয়া পর্যন্ত থেকে থেকে সেগুলি ব্যবহার করব। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তৃতা না দিয়ে কথাবার্তার প্রক্রিয়ার শরণ নেবেন। এই কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ছাত্রদের ক্রমশঃ ইতিহাস ভূগোল ও অঙ্ক শেখাবেন। ইতিহাসের সূত্রপাত হবে আমাদের বর্তমান কাল থেকে। তারপর আমরা আমাদের কাছাকাছি সময়ের ও নিকটস্থ ব্যক্তিদের ইতিহাস শেখাব। আর বিদ্যালয়ের নিকটস্থ এলাকা থেকে ভূগোল শেখানোর পালা শুরু হবে। ছাত্রের বাড়িতে যেসব হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন ঘটে তার থেকে অঙ্ক শেখানোর সূত্রপাত হবে। এই পদ্ধতিতে আমি নিজে হাতেকলমে কাজ করেছি বলে আমি জানি যে এই পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বেশী পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং এর জন্য ছাত্রের উপর কোন বেশী চাপ পড়ে না। অক্ষরজ্ঞানকে একেবারে পৃথক বিষয় বলে বিবেচনা করা উচিত। অক্ষরগুলিকে ছবির মত মনে করা দরকার, যা ছাত্ররা প্রথমে চিনতে ও তার নাম বলতে শিখবে। আর লেখাটা, চিত্রাঙ্কণ শেখার অঙ্গ স্বরূপ হবে। অক্ষর নিয়ে হিজিবিজি না কেটে ছাত্ররা যেন তাদের সামনে রাখা কোন জিনিস ভাল ভাবে আঁকতে শেখে। সুতরাং শিশুরা নিজের আঙুল ও কলমের উপর পূর্ণমাত্রায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যেন তাদের দিয়ে অক্ষর লেখানো না হয়, এলোমেলো ভাবে একটি বই পড়ে সারা বছরে যতটুকু শিখতে পারে কেবল ততটুকুই শিশুকে শেখানোর অর্থ হল তার মানসিক বিকাশকে শোচনীয় ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা। আমরা একথা উপলব্ধি করি না যে কোন শিশুকে যদি তার গৃহ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আটক করে রাখা যায় তাহলে কয়েক বছরের জন্য সে নিছক মূর্খে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের ভিতরে নয়, ঘরের পরিবেশে সে

অজ্ঞাতসারে তথ্য ও ভাষা শিক্ষা করে। এই জন্য আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন বাড়ি ও সংস্কৃতির সম্পর্কবিহীন বাড়ির—যাকে আসলে বাড়িই বলা চলে না—ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই।

হরিজন, ১০-১১-১৯৩৩

হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা

…অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা অপরের থেকে পৃথক।

আমি তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এক্ষেত্রে বই-এর প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের কাছেই বেশী। আর প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করতে হলে তাঁর কাছে উপলব্ধ মাল-মশলার সাহায্যে দৈনিক পাঠ্যবিষয়ের নোট তৈরি করতে হবে। আর এও তিনি করবেন তাঁকে যে ক্লাসে পড়াতে হবে তার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে।

যথার্থ শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে উদ্ভাসিত করে তুলবে। এলোমেলো ভাবে বাছা ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে এ আদর্শের রূপায়ণ করা যাবে না। এরকম করলে তাদের উপর মারাত্মক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে যা ছাত্রদের যাবতীয় স্বকীয়তাকে নষ্ট করে তাদের নিছক জড়যন্ত্রে পর্যবসিত করবে। স্বয়ং আমরা এই কুপ্রথার শিকার না হলে অনেক দিন আগেই বুঝতে পারতাম যে আজকালকার পাইকারী হারে শিক্ষা দেবার প্রথা বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত দেশের ক্ষেত্রে কী সর্বনাশ সাধন করছে।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তক রচনা করার অল্পাধিক চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার মতে তার দ্বারা দেশের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্তি হয় নি।

আমি এখানে যা কিছু বলেছি তা আমার মৌলিক চিন্তার ফল—এমন দাবি আমি করছি না। হরিজন-বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকদের সুবিধার জন্য এখানে এসব কথার পুনরুক্তি করা হল। কারণ তাঁদের সম্মুখে গুরুভার কর্তব্য রয়েছে। নিজেদের কর্তৃত্বাধীন ছেলেদের যেন তেন প্রকারেণ বেছে নেওয়া পাঠ্যপুস্তক থেকে কতকটা অংশ যেমন তেমন করে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করালেই তাঁদের কাজ হয়ে গেল—এমন কথা ভেবে যেন তাঁরা আত্মতুষ্টি লাভ না করেন। তাঁদের উপর এক মহান্ দায়িত্ব বর্তিয়েছে যা তাঁদের সাহস বুদ্ধি ও সততা সহকারে পালন করতে হবে।

এ কর্তব্য কঠিন। তবে হরিজন-বিত্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দ নিজেদের সমগ্র হৃদয় দিয়ে এ কাজ করলে এ কাজ তত কঠিন বলে মনে হবে না। তাঁরা যদি তাঁদের ছাত্রদের পিতা হতে পারেন তাহলে তাদের কি প্রয়োজন তা নিজে থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন এবং তারপর তার ব্যবস্থা করার প্রয়াস করবেন। আর এ দেওয়ার ক্ষমতা যদি তাঁর না থাকে তাহলে তিনি নিজেকে এর যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। ছেলেমেয়েদের কি চাই তাই বুঝে তদনুযায়ী শিক্ষা দেবার নীতি গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে হরিজন বা যে কোন শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষকের কোন রকম অস্বাভাবিক বুদ্ধিচাতুর্য বা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নেই।

আর এ কথা যদি খেয়াল রাখা যায় যে যাবতীয় শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ছাত্রদের চরিত্রগঠন তাহলে চরিত্রবান শিক্ষকদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

হরিজন, ১-১২-১৯৩৩

হরিজনদের জন্য প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

[দিল্লীর নিকটস্থ শ্রদ্ধানন্দ বস্তির হরিজনেরা গান্ধীজীকে একটি অভিনন্দন পত্র দেন। তাতে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, "আমাদের জন্য পৃথক বিত্যালয় ও কূপ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কি? এর দ্বারা কি আমাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থাকে স্থায়ী করা হবে না?" নিম্নে গান্ধীজীর উত্তর দেওয়া হল।]

আপনাদের জন্য যে সব কূপ ও বিত্যালয় খোলা হচ্ছে তা আপনাদের আর সবার কাছ থেকে পৃথক করবে না। কথা হচ্ছে এই যে আপনারা খাওয়ার ও অন্যান্য কাজের জন্য বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পান না। এ অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার চাই। ...বিত্যালয় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য যদিও ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের বিত্যালয় সমূহের দ্বারও হরিজনদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে যত দিন না দেশের সবগুলি বিত্যালয়ের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে তত দিন হয় হরিজনদের জন্য পৃথক বিত্যালয় খোলা আর নচেৎ তাদের নিরক্ষর রাখার সমস্যা থেকেই যাবে। এই কারণে তাদের জন্য বিশেষ বিত্যালয় খোলা হচ্ছে। তবে এখানে অন্যান্য জাতির ছাত্রদেরও নেওয়া হবে। কিন্তু হরিজনদের এখানে ভর্তি হবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

হরিজনবন্ধু, ২৪-১২-১৯৩৩

হরিজনদের শিক্ষা

হরিজনদের শিক্ষার ব্যাপার সর্বাপেক্ষা দুরূহ। যতই স্থূল বা অসংস্কৃত হোক না কেন, বর্ণ-হিন্দুদের ঘরের শিশু পরিবারের প্রভাবে কিছু না কিছু সংস্কারের উত্তরাধিকারী হয়। হরিজন শিশু সমাজ থেকে একেবারে তফাৎ থাকার জন্য কোন রকম সংস্কৃতির ধার ধারে না। শীঘ্র বা বিলম্বে হোক, যখনই প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিজন শিশুদের প্রবেশাধিকার হবে (আমার মতে এ অবসর সত্বর আসবে, এতে বিলম্ব হবে না) তখনও তাদের জন্য প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন পড়বে। নচেৎ হরিজন শিশুদের চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ভারতের সর্বত্র হরিজন সেবক-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে যে অসংখ্য হরিজন বিদ্যালয় চলছে, সেখানে এই প্রারম্ভিক শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করতে হবে। হরিজন শিশুদের সদাচার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখানো ও সুশীল করে তোলা এই শিক্ষার কর্তব্য হবে। হরিজন শিশু যেমন তেমন ভাবে বসে, তার বেশভূষার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চোখ, মুখ, দাঁত, কান, নখ, চুল এবং নাকে প্রায়ই ময়লা থাকে। অনেকে তো স্নান করা কাকে বলে তা-ই জানে না। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রম কোচরবে থাকাকালীন তামিলনাদের ট্রানকুইবার থেকে একটি হরিজন বালককে সেখানে নিয়ে গিয়ে যা করেছিলাম, তা স্মরণ হচ্ছে। প্রথমে তার মস্তক মুণ্ডন করা হল। তারপর তাকে ভাল করে স্নান করানো হল ও পরিধানের জন্য একটি সাধারণ ধুতি, মেরজাই ও টুপি দেওয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার এবং ভদ্রঘরের শিশুদের মধ্যে কোন বাহ্য পার্থক্য রইল না। তার মাথা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল। তার নখগুলি ছিল ময়লার ভাণ্ডার বিশেষ। সেগুলিকে কেটে সাফ করা হয়েছিল। তার পদযুগল ধূলি-সমাকীর্ণ ছিল। সেগুলিকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা হয়েছিল। যে সব হরিজন শিশু বিদ্যালয়ে আসে, প্রয়োজন বুঝলে তাদের নিয়ে প্রত্যহ এইভাবে দলাই-মলাই করতে হবে। প্রথম তিন মাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানোর দ্বারা তাদের পাঠ-পর্বের সূচনা হবে। সুষ্ঠুভাবে আহার করার পদ্ধতিও তাদের শেখাতে হবে। কিন্তু এই বাক্যটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার পাদ-পরিক্রমাকালে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে, তার কথা মনে আসছে। যাত্রাপথে কোথাও কোথাও যখন সকলে একসঙ্গে বসে খাবার অবকাশ এসেছে, তখন দেখেছি যে বালক ও বয়স্ক হরিজনেরা অন্যান্যদের চেয়ে

পরিষ্কারভাবে খেয়েছে। অন্যে গায়ে-হাতে ভাত মাখামাখি করেছে, উচ্ছিষ্ট এদিকে ওদিকে ছড়িয়েছে এবং খাওয়ার জায়গাকে একেবারে নরককুণ্ডে পরিণত করে খেয়ে উঠেছে। হরিজনরা পাতে বা তার চারপাশে কিছু ফেলে রাখে নি। তাদের পাত একেবারে পরিষ্কার ছিল। খাবার সময় প্রতিটি গ্রাস মুখে দেবার পর তারা আঙুল চেটেপুটে পরিষ্কার করে খেয়েছে। অবশ্য এ কথা আমি জানি যে আমি যাদের কথা বর্ণনা করলাম, প্রত্যেকটি হরিজন শিশু তাদের মত পরিষ্কার করে খায় না।

প্রত্যেকটি হরিজন বিদ্যালয়ে এই প্রারম্ভিক শিক্ষা দিতে হলে প্রথমতঃ শিক্ষকদের মাতৃভাষায় এতৎ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নির্দেশনামা পুস্তিকাকারে ছেপে তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তারপর বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মহাশয়ের কাজ হবে ঐ সব বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষক ও ছাত্ররা এতদনুযায়ী কাজ করছে কিনা দেখা এবং এই দিকে কতটা প্রগতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করা।

এই কার্যক্রম সফল করার জন্য সতর্কভাবে নূতন শিক্ষক নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং এখন যে সব শিক্ষক আছেন, তাঁদেরও এতৎ সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে সঙ্ঘের উপর যে সহস্র সহস্র হরিজন ছাত্রের দায়িত্বভার ন্যস্ত, তা সম্যকভাবে পালন করার জন্য এ কার্যে এই ভাবে সতর্ক মনোযোগ দেবার সার্থকতা আছে।

হরিজন, ১৮-৫-১৯৩৫

॥ এগারো ॥

ধর্মীয় শিক্ষা

ধর্মীয় শিক্ষা

ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন অতীব জটিল। তবু তাকে বাদ দিলে চলবে না। ভারত কদাপি নিরীশ্বরবাদী হবে না। উৎকট নাস্তিক্যবাদ এদেশের মাটিতে মাথা তুলতে পারবে না। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সমস্যা নিঃসন্দেহে কঠিন কার্য। এর কথা চিন্তা মাত্র আমার শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। আমাদের ধর্মগুরুরা সাধারণতঃ ধর্মধ্বজী ও আত্মপরায়ণ। তবু তাঁদের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সমাজের চাবিকাঠি হচ্ছে মোল্লা, দস্তুর এবং ব্রাহ্মণদের হাতে। তবু তাঁদের মনে সৎবুদ্ধির

উদয় না হলে ইংরাজী শিক্ষার কারণ প্রাপ্ত আমাদের প্রাণশক্তি ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে নিয়োগ করতে হবে। এ কাজ খুব কঠিন নয়। মহাসমুদ্রের ক্ষীণ প্রান্তদেশই মাত্র দূষিত হয়েছে এবং মাত্র যাঁরা ঐ প্রান্তদেশের অধিবাসী, শুধু তাঁদেরই শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। আমাদেব মত যাঁরা এই শ্রেণীভুক্ত, তাঁরা স্বয়ং এ শুদ্ধিক্রিয়া করে নিতে পারেন, কারণ আমার এ মন্তব্য দেশের কোটি কোটি জনগণের জন্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গরিমা পুনঃ সংস্থাপনার্থ আমাদের প্রাচীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হিন্দ স্বরাজ, ১৯০৮

ধর্মীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে

কয়েক দিন আগে জনৈক মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতবর্ষ যদি সত্যসত্যই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি হয়, তবে অধিকাংশ ছাত্রেরই নিজ ধর্ম এবং এমন কি ভাগবদ্‌গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই কেন? বন্ধুটি স্বয়ং শিক্ষাব্রতী এবং নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানালেন যে নূতন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের নিজ ধর্ম বা ভাগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে জানা আছে কিনা? দেখা গেছে যে ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

কিছুসংখ্যক ছাত্রের নিজ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে ভারত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি নয় বা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ছাত্রদের অজ্ঞতার অর্থ যাদের মধ্যে তারা বাস করে, সেই ভারতবাসীর ভিতর যাবতীয় ধর্মীয় ভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার অভাবসূচক নয় ইত্যাদি যেসব সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে করা সম্ভব, এক্ষেত্রে আমি তার আলোচনা করব না। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সবকারী শিক্ষায়তনে যে সব ছাত্র আসেন তাঁদেব মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিহীন। আমার মিশনারী বন্ধুটি মহীশূরের ছাত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দেখে আমার দুঃখ হল যে মহীশূর রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্ররা কোন রকম ধর্ম শিক্ষা পায় না। আমি খবর রাখি যে এক দল ব্যক্তি মনে করেন যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। এ কথাও আমি জানি যে, ভারতের মত যে দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রচলিত ধর্মমত এবং তাদের শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সেখানে ধর্ম-

শিক্ষার ব্যবস্থা করা কত কঠিন। কিন্তু ভারতকে যদি আধ্যাত্মিক দেউলিয়া বৃত্তি ঘোষণা না করতে হয়, তবে যুব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অন্ততঃ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে। একথা সত্য যে ধর্মপুস্তকের জ্ঞান আর ধর্ম—এ দুই এক জিনিস নয়। কিন্তু আমরা যদি ধর্মশিক্ষা না-ই দিতে পারি তবে যেন অন্ততঃ আমাদের ছেলেমেয়েদের তার চেয়ে আর একটু নীচের জিনিস—ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারি। তবে বিদ্যালয়ে এজাতীয় শিক্ষা দেওয়া হোক বা না হোক, বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম সম্বন্ধে নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করা। বিতর্ক সভা বা আজকাল যে সূতা কাটার বর্গ চলেছে, তাঁরা তার অনুকরণে এরকম বর্গ নিজেদের জন্য চালাবেন।

শিমোগা কলেজিয়েট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শতাধিক হিন্দু ছাত্রের মধ্যে খুব বেশী হলে আটজন মাত্র ভাগবদ্গীতা পড়েছেন। যে কয়জন গীতা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ গীতার অর্থ বুঝেছেন কিনা এ প্রশ্ন করা হলে কেউ হাতই তুললেন না। পবিত্র কোরান পড়েছেন কিনা জানতে চাওয়ায় পাঁচ-ছয়জন মুসলমান ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই হাত তুলেছিলেন। তবে একজন মাত্র বলেছিলেন যে তিনি এর অর্থ বোঝেন। আমার মতে গীতার অর্থ বোঝা খুবই সহজ। এতে অবশ্য এমন কতকগুলি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার সমাধান নিঃসংশয়ে কঠিন। তবে আমার মতে গীতার সাধারণ ভাবধারা গ্রহণ করতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সম্প্রদায় একে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। গীতা যাবতীয় গোঁড়ামির স্পর্শমুক্ত। এতে সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভিতর পূর্ণাঙ্গ যুক্তিসঙ্গত নৈতিক বিধান পাওয়া যায়। বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়েরই এ সন্তোষবিধান করে। সেইজন্য একে দার্শনিক ও ভক্তিমূলক দুই বলা চলে। এর আবেদন সার্বিক। এর ভাষা অতীব সরল। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যে ভারতের প্রত্যেকটি কথ্য ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং অনুবাদ কার্য যেন জটিলতার দোষমুক্ত হয়। অনুবাদ যেন এমন হয় যে সাধারণ মানুষকে গীতা পড়ানো সহজসাধ্য হয়। তবে অনুবাদকে মূলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য এ প্রস্তাব নয়। কারণ আমি আমার অভিমতের পুনরুক্তি করতে চাই যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আগামী বহুদিন পর্যন্ত এমন অনেকে থাকবেন, যাঁরা সংস্কৃত জানবেন না।

শুধু সংস্কৃত না জানার অপরাধে তাঁদের ভাগবদ্‌গীতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখা আত্মহত্যার সামিল হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৮-১৯২৭

ধর্মীয় শিক্ষাব দুটি দিক

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষকদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁদের অধীনস্থ ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার অধিকার আছে ?

শিক্ষকরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তার নীতি অনুযায়ী তাঁদের চলা উচিত। সুতরাং তাঁরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার অধিকার দাবি করতে পারেন না। অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সেই প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে হবে। শিক্ষকের অবশ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির করার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তিনি যা শেখাচ্ছেন তা যেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একথা সত্য যে দুই-চারটি নির্ধারিত পুস্তক পাঠ করে অপরাপর বিষয় পড়ানো গেলেও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম সম্ভবপর নয়। সত্যি কথা বলতে কি বই-এর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়াও যায় না। অন্যান্য বিষয়ে প্রধানতঃ বুদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও ধর্মীয় শিক্ষা এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার জিনিস। অতএব শিক্ষক স্বয়ং গভীর-ভাবে ধর্মভাবাপন্ন না হলে ধর্ম-শিক্ষার দায়িত্ব নেবেন না। আর এক্ষেত্রে কিছুটা বাছ-বিচার করারও প্রয়োজন আছে। উদাহরণ স্বরূপ যে বিদ্যালয়ে অহিংসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম স্বরূপ স্বীকার করা হয়েছে সেখানে হিংসাবৃত্তির প্ররোচক কোন কিছু শেখানো উচিত নয়। অনুরূপ ভাবে যে বিদ্যালয় সকল ধর্ম সম্বন্ধে প্রেম ঔদার্য ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছে সেখানে অপর কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন রকম অপপ্রচারের কোন স্থান নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোন বিদ্যালয় যদি ধর্মীয় শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাহলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সে শিক্ষার স্বরূপও ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ব্যাপার শিক্ষকের অভিরুচির উপর ছেড়ে দিলে চলবে না কারণ তাতে গোলযোগের সূত্রপাত হবে।

প্রশ্ন : প্রত্যেকটি ছাত্রের তিনটি থেকে চারটি ভাষা জানা যদি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে আপনি কি মনে করেন না যে ছাত্রদের প্রচলিত

সব কয়টি ধর্মমতের মূল তত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে জানাও সমান প্রয়োজন ?

অধর্ম নয়, ধর্ম বলতে যথার্থই যা বুঝায় সেই অর্থে সকল ধর্মমতের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব সৃষ্টি করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের সকল ধর্মমতের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান দিতে হবে। তবে আমি একথা মনে করি না যে এর জন্য বিভিন্ন ধর্মের সংস্কার অথবা তার অন্তর্ভুক্ত আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মত দেশে চোখ-কান খোলা রাখলে যে কেউ এসব সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পারবেন। আমরা যদি সব ধর্মের ভাল দিক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হই (আর এই রকমই হওয়া উচিত) তাহলে বিভিন্ন ধর্মের সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা জানতে চাইব না। এর কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের নিজ নিজ ধর্মের সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানাই যথেষ্ট আর তারপর ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসবের সংস্কার সাধনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেই কাজ হবে। আর এতেই অনেক সময় লাগবে।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮ থেকে ১-৭-১৮২৮

ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন

আমার কাছে ধর্মের অর্থ হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। তাই বা কেন, ধর্ম মানে বোধ হয় শুধু সত্য। কারণ সত্যের ভিতর অহিংসা নিহিত ও অহিংসা হচ্ছে সত্য আবিষ্কারের অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং যা কিছু এই সদ্‌গুণাবলী আচরণে প্রবুদ্ধ করে, তা-ই ধর্মীয় শিক্ষা দেবার মাধ্যম এবং আমার মতে এই কার্য সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে শিক্ষকদের নিজ জীবনে এই সব সদাচার মূর্ত করার জন্য কঠোর প্রযত্ন করা। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ বা অধ্যয়ন-মন্দির—যেখানেই ছাত্ররা শিক্ষকদের সাহচর্যে আসবে, সেখানেই তাঁরা তাহলে এই সব সুচারু বনিয়াদী সদ্‌গুণাবলী সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারবেন।

ধর্মের বিশ্বজনীন মূল সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এইখানেই ইতি করা যাক। ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমে নিজ ধর্ম-পরিধির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার পন্থাও থাকবে। এজন্য ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে, তাদের ভিতর যেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও উদার সহিষ্ণুতার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত বোঝার ও তার গুণগ্রাহী হবার অভ্যাস জন্মে। সুষ্ঠুভাবে এ

কর্তব্য করতে পারলে এর ফলে তাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূল দৃঢ় হবার সহায়তা হবে এবং এর পরিণামে তারা নিজ ধর্মমতকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে। তবে মহান্ ধর্মমতসমূহ সম্বন্ধে অধ্যয়নকালে একটি নীতির কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। কথা হচ্ছে এই যে, এই সব ধর্মমত সম্বন্ধে জানতে হবে সেই ধর্মের কোন সুপরিচিত পণ্ডিতের রচনা থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেউ যদি ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করতে চান, তবে গীতার কোন কটু সমালোচকের অনুবাদের শরণ নিলে চলবে না, ভগবদ্গীতা-প্রেমীর অনুবাদের সাহায্য নিতে হবে। এইভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হলে কোন ভক্ত খ্রীষ্টান লিখিত ভাষ্য পাঠ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলে সর্বধর্মের ভিত্তিমূলে নিহিত ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে এবং মতবাদ ও শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের ধূলিজালের অন্তরালে যে বিশ্বজনীন ও শাশ্বত সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারও আভাস পাব।

ক্ষণেকের জন্যও যেন কারও মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক না হয় যে শ্রদ্ধাশীল চিত্তে অপরাপর ধর্মমত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলে নিজ ধর্মবিশ্বাস শিথিলমূল বা দুর্বল হতে পারে। হিন্দু-দর্শন মনে করে যে, প্রত্যেক ধর্মের ভিতরই সত্যের অংশ আছে এবং তাই প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, নিজ ধর্মের প্রতি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধা বিদ্যমান। অপর ধর্মমত অধ্যয়ন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার ফলে তাতে কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হবার কারণ নেই। এর অর্থ শুধু এই যে, নিজ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিধি অপর ধর্মের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা।

এই ক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই ভিত্তিভূমির উপর অধিষ্ঠিত। নিজ সংস্কৃতি রক্ষার অর্থ অপরের সংস্কৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য নয়, বরং এর জন্য অপরের সংস্কৃতির সদ্গুণাবলী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। দেশে পারস্পরিক বিদ্বেষ অসূয়া এবং অবিশ্বাসের যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বর্তমান ভয় ও আশঙ্কার মূল্য সেখানে। সর্বদা আমরা এই পরিবেশে রয়েছি যে এই বুঝি কেউ আমাদের নিজের বা আমাদের প্রিয়জনদের বিশ্বাসের উপর গুপ্ত আক্রমণ করবে। অবশ্য অন্যান্য ধর্মমত ও তার অনুগামীদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব ও সহনশীলতার অনুশীলন করলে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কেটে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১২-১৯২৮

বনিয়াদী শিক্ষা ও ধর্ম

জনৈক মুসলমান পত্রলেখক লিখেছেন :

"বিগত কয়েক মাস যাবৎ উর্দু সংবাদপত্রসমূহে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। সচরাচর যেমন ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও তেমনি কেউ এতৎ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি যত্নসহকারে পড়েন নি অথবা বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। (বনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে) সমালোচকের দুটি বক্তব্য :

(ক) ধর্মশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

(খ) সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাভাব গড়ে তুলতে হবে।"

ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক অর্থে ধর্মীয় শিক্ষাকে ইচ্ছা করেই বর্জন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কোন কিছু না থাকলে সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই দুরূহ। এ শিক্ষা ঘরে সব চেয়ে ভাল ভাবে দেওয়া সম্ভব। ঘরে বা অপর কোথাও এ শিক্ষা নেবার মত যথেষ্ট সময় রাষ্ট্র সকল শিশুকে দেবে। এ কথাও কল্পনা করা যায় যে কোন সম্প্রদায় যদি ব্যয়ভার বহনে রাজী হন তবে রাষ্ট্র তার বিদ্যালয়-সমূহে সেই ধর্মমত সম্বন্ধে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেবার সুযোগ করে দেবে।

সকল ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধা সৃষ্টিকারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিমত খুবই দৃঢ়। সেই সুখকর স্থিতিতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। শিশুদের যদি এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাদের ধর্মমতই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সেইটিই একমাত্র সত্য ধর্ম তাহলে বিভিন্ন ধর্মমতের শিশুদের মধ্যে বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা হবে মারাত্মক। এই জাতীয় বিভেদকারীর মনোভাবের দ্বারা জাতি যদি আচ্ছন্ন হয় তাহলে তার পরিণামে হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও এর প্রত্যেকটিকে পরস্পরকে নিন্দা করার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে আর নচেৎ ধর্মের নাম নেওয়াই একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। এজাতীয় নীতির কুফল কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয়। নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সকল ধর্মমতেই উপস্থিত। এগুলি অবশ্যই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত বিদ্যালয়ের পক্ষে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-ই যথেষ্ট।

হরিজন, ১৬-৭-১৯৩৮

রাষ্ট্র ও ধর্মীয় শিক্ষা

আমি একথা বিশ্বাস করি না যে রাষ্ট্র ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে অথবা এর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। আমার মতে ধর্মীয় শিক্ষা একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য হওয়া উচিত। তবে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমি বিশ্বাস করি যে সকল ধর্মমতের মূল নীতিশাস্ত্রই এক। এই মৌলিক নীতিশাস্ত্রের শিক্ষণব্যবস্থা করা অবশ্যই রাষ্ট্রের কর্তব্য। ধর্ম বলতে আমি এখানে মূল নীতিশাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করছি না, সাম্প্রদায়িক ধর্মের নামে যা চলছে তার কথাই এখানে বলছি। রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ধর্মসঙ্ঘের হাতে আমরা যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছি। যে সমাজ বা গোষ্ঠী আংশিক-ভাবে অথবা পূর্ণতঃ নিজেদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় তাদের ধর্ম নামক কোন কিছু থাকতে পারে না কিংবা নেই-ই।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

সবকাবেব দায়িত্ব

সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন—আমি এতে রাজী নই। ভুল ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন এরকম কিছু লোক যদি থাকেন আপনারা তাতে বাধা দিতে পারেন না। সে কাজ করতে গেলে তার ফল খারাপ হবে। যাঁরা ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চান নিজেদের উদ্যোগে তা দিতে পারেন। শর্ত কেবল এইটুকু যে সে শিক্ষা দেশের আইন ও নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হবে না। সরকার কেবল সকল দলের অনুমোদিত প্রতিটি ধর্মের মূল তত্ত্ব আধারিত নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর প্রত্যুত আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ।

হরিজন, ৯-১১-১৯৪৭

॥ বারো ॥

শিক্ষা ও শরীরচর্চা

শরীরচর্চা প্রসঙ্গে

নানারকম খেলাধুলাকে শরীরচর্চার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কেউ এসবের সত্যকার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না এবং আমাদের দেশী খেলাধুলা এর থেকে বাদ পড়েছে। টেনিস ফুটবল ও ক্রিকেট

খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এ খেলা তিনটি যে চিত্তাকর্ষক এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে পাশ্চাত্য ধরনের খেলাধুলার জন্ম আমরা যদি পাগল না হতাম তাহলে আমরা গেন্দ-বাল্লা, গুলি-ডাণ্ডা, খো-খো, সাত-তালি, কাবাডি ইত্যাদি বিনা খরচেব অথচ সমপরিমাণ চিত্তাকর্ষক দেশী খেলা বর্জন করতাম না। সেকালের আখড়া প্রমুখ যেসব জায়গায় কুস্তি ও অন্যান্য ভারতীয় পদ্ধতির শরীরচর্চার অনুশীলন হত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেগুলি প্রায় উঠে গেছে। আমার মতে এক্ষেত্রে আমরা যে একমাত্র পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারি তা হল ড্রিল বা কুচকাওয়াজ। জনৈক বন্ধু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আমরা —বিশেষ করে যখন আমরা একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি থাকি—চলতে জানি না। আমাদের তালে তালে চলতে হবে। আমরা শতখানেক বা হাজারখানেক কোথাও একত্র হলে শান্ত অথচ নিয়মিত পদক্ষেপে চলতে পারি না। পায়ে পা মিলিয়ে দুজন বা চারজনের সারি বেঁধে চলতে গেলে গণ্ডগোল বাধে। একথা ঠিক নয় যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেই কেবল এরকম ভাবে চলা কাজে লাগে। বহু ধরনের সেবামূলক কাজেও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। উদাহরণ স্বরূপ আগুন নেভানোর সময়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারকালে, অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তিদের ডুলি ইত্যাদিতে বইবার সময় কুচকাওয়াজের পূর্ব অভিজ্ঞতা খুবই সাহায্যে আসে। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় খেলাধূলা ব্যায়াম ও পাশ্চাত্য ধরনের কুচকাওয়াজ প্রবর্তন করা উচিত।

বিচারবস্তি, ১৯১৭

শরীরচর্চার স্বরূপ

আমার মতে প্রাণায়াম আসন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের ছাত্রদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা উচিত।…প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরচর্চা করার পর যারা আধুনিক যুগের কসরৎ ইত্যাদি শিখতে চায় তাদের সে সুযোগও দেওয়া কর্তব্য। তবে লাঠিখেলা বা অসিযুদ্ধ ইত্যাদি না শিখলেও চলবে। · শরীরকে চটপটে করে তুলতে অথবা এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে তোলার জন্ম লাঠির খুব একটা প্রয়োজীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং লাঠি খেলা ও ছোরা চালানো ইত্যাদিকে শরীরচর্চার অঙ্গ বলা চলে না। তবে আত্মরক্ষা ও অনুরূপ উদ্দেশ্যে এদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

* * *

শরীরচর্চা ও খেলাধূলাকে এখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে শুনে সুখী হয়েছি। যা কিছু ভাল তাকে যেন আমরা বাধ্যতামূলক করি।···ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা আমাদের ক্রীতদাসে পর্যবসিত করে। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক বাধ্যবাধকতা আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

১৯২৪-২৫

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

এলাহাবাদের জনৈক স্নাতক লিখছেন :

> "আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক নিবন্ধভুক্ত স্নাতক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে নির্বাচনপ্রার্থী কোন্ প্রার্থীকে ভোট দেবার অধিকার আমার আছে।
>
> বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে আমার অভিমতের জন্য আপত্তি উঠেছে। আপনি কি এ সম্বন্ধে ইয়ং ইণ্ডিয়া মারফৎ আপনার অভিমত জানাবেন ?··"

ধর্মে আমি শান্তিবাদী হবার জন্য পত্রলেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যা কিছু বলেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তার সমর্থন করছি। · অবশ্য অহিংসায় ষোল আনা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ অবস্থায় অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সার্থকতা আমি বুঝি। তবে সরকার যতক্ষণ না জনসাধারণের প্রয়োজনের ব্যাপারে নিতান্ত দায়িত্বহীন থাকছে ততক্ষণ তার আওতায় দেশের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারি না। আর সর্বাবস্থাতেই এমন কি জাতীয় সরকারের আওতাতেও আমি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং যাঁরা সামরিক শিক্ষা নিতে চান না তাঁদের সর্বসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের অধিকার হরণ করা চলবে না। তবে শরীরচর্চা এক ভিন্ন ব্যাপার। অন্যান্য বিষয়ের মত একেও যে কোন আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ করা যায় এবং করা উচিতও।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-১৯২৫

সামরিক শিক্ষা

যে বিষয়টি আমাকে বেদনা দিয়েছে তা হল সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। আমার মতে এ বিষয়ে সর্বভারতীয় স্তরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়ে। নচেৎ পৃথিবীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হবার পরিবর্তে আমরা অভিশাপ হয়ে উঠব। নেতা কাউকে বানানো যায় না, লোকে নেতা হয়েই জন্মায়। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই রাষ্ট্রের কি এ ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে ওঠা সমীচীন? সুতরাং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি এজাতীয় বহু ব্যাপক সুপারিশ* করায় ভাগ নিয়েছেন দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্রে বলা হয় যে শরীরকে কর্মঠ ও সবল রেখে তার সদুপযোগ করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। আমি সমগ্র দেশে ভ্রমণ করেছি ও এই ভ্রমণকালে যে অন্যতম শোচনীয় দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে তা হল যুবকদের জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। যতদিন আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থাকবে এবং যতদিন আমাদের সমাজের এক বিশিষ্ট অংশ হবে এই বাল্যবিবাহের সৃষ্টি ততদিন ভাল-মত শরীরচর্চা করা অসম্ভব ব্যাপার হয়েই থাকবে। ক্ষয়রোগগ্রস্তদের কে ব্যায়াম করতে বলবে? আমরা যদি তাই চাই যে ভারতের যুবক-যুবতীরা শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হোক এবং দেশ তেজস্বিতা ও বলবীর্যের পথে আগুয়ান হোক তাহলে এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। মনু বলেছেন যে ছাত্রদের

---

*শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশ

নূতন দিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী

"শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি জাতীয় সামরিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিব এই সুপারিশ সমর্থন করেছে যে রাজ্য ও প্রদেশসমূহ জাতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাবাব উপযুক্ত আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, ছেলেরা যেখানে চরিত্র গঠন ও নেতৃত্বশক্তির বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা পাবে।

"সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে জাতীয় যুদ্ধোত্তর শিক্ষায় যে নূতন ধরনের বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর উপযুক্ত নেতৃত্বশক্তি চরিত্র বুদ্ধি সাহস ও শারীরিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেবে।

"সমিতি প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সামরিক কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত পূর্বোক্ত ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আকর্ষণ করছে।"—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। এ শর্ত পালন না করলে সব রকমের শরীরচর্চাই ব্যর্থ হবে।

আর একটি দিকের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা জানেন যে পরোক্ষভাবেও হিংসার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন ব্যাপারের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি না। অপরে যে যাই বলুন না কেন আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে অহিংসাই একমাত্র পথ এবং আমার কাছে এ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী ধর্ম। তাই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে আমার মত একজন প্রকাশ্য অহিংসাপ্রেমী কি করে এজাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি? এর কারণ অতীব প্রাঞ্জল। অহিংসার অর্থ হল হিংসা প্রয়োগেব শক্তি বর্জন করা। সুতরাং এই হিংসা প্রয়োগের শক্তি যার নেই সে অহিংস আচরণেরও অযোগ্য। অহিংসা এক মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু অহিংসাপ্রেমীর দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা চাই এবং সচেতন ভাবে ও স্বেচ্ছায় তিনি এই শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে হিংস শক্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীরচর্চা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অহিংসার যোগ্য হবার জন্য আমাদের যুবকদের ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কল্পার কথা আমরা যেন না ভাবি। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কাউকে অহিংস করা যায় না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অপরাধ হল আমাদের বাধ্যতামূলক ভাবে নিবস্ত্র করে রাখা। অবশ্য সম্ভবপর হলেও আমাদের অহিংস করার জন্য এরকম করা হয় নি, আমাদের নিরস্ত্র রাখা হয়েছে নির্বীর্য করার জন্য। আমি চাই যে ভারতবর্ষ বলশালী এবং প্রয়োজন বোধে সে বল প্রয়োগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও যেন বলপ্রয়োগের পন্থা পরিহার করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-১২-১৯২৬

॥ তের ॥

ভাষা ও লিপিসমস্যা

কোন্ ভাষা শিখব?

প্রতিটি সুসংস্কৃত ভারতবাসীর নিজ মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দু হলে সংস্কৃত, মুসলমান হলে আরবী এবং পার্শী হলে ফার্সী ভাষা এবং সকলের পক্ষেই হিন্দী জানা উচিত। কিছু কিছু হিন্দুর আরবী ফার্সী জানা প্রয়োজন এবং কিছু কিছু মুসলমান ও

পার্শীর সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের কিছুসংখ্যক অধিবাসীর তামিল ভাষা জানা উচিত। ভারতের সর্ব-জনমান্য ভাষা হবে হিন্দী এবং নাগরী বা ফার্সী যে কোনও লিপিতে এ ভাষা লেখা চলবে। হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনার জন্য উভয় লিপির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

হিন্দ স্বরাজ, ১৯০৮

মাতৃভাষা

আমি আশা করি যে ছাত্ররা যাতে নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে, এই বিশ্ববিদ্যালয় (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের ভাষা হচ্ছে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি এবং তোমরা যদি বল যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে আমাদের ভাষা দুর্বল, তবে আমার মতে যত তাডাতাডি ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদেব অস্তিত্ব মুছে যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি মনে কবেন যে ভারতে রাষ্ট্রভাষার স্থান ইংরেজী পাবে ? (না, না, ধ্বনি)। তবে কেন জাতির চলার পথে এই বাধা সৃষ্টি করা ? একবার ভেবে দেখুন যে ইংরেজ ছেলেদের তুলনায় আমাদের ছেলেদের কি রকম প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। পুণার জনকয়েক অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা দৃঢতার সঙ্গে এই কথা জানালেন যে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হয় বলে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুবককে জীবনের ছয়টি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করতে হয়। প্রতিটি স্কুল ও কলেজে যে সংখ্যক ছাত্র পড়ে, তাকে ছয় দিয়ে গুণ দিলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, জাতির কত সহস্র বৎসর সময়ের অপচয় হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, আমাদের ভিতর প্রেরণা-শক্তি নেই। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার জন্য এমন মূল্যবান সময় নষ্ট করলে আর প্রেরণা-শক্তি আসবে কোথা থেকে ? সুতরাং এ প্রচেষ্টায় আমরা ব্যর্থতা বরণ করে নিই। গতকাল এবং আজকের বক্তাদের মধ্যে শ্রীহিগিনবুথামের মত আর কারও পক্ষে কি তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় জয় করা সম্ভব হয়েছে ? শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মনে দাগ কাটতে সমর্থ না হবার অপরাধ পূর্বোক্ত বক্তাদের নয়। তাঁদের বক্তৃতায় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনের খোরাক ছিল; কিন্তু তাঁদের বক্তব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নি। আমি অনেককে এ কথা বলতে শুনেছি

যে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তো জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করছেন। এর বিপরীত ঘটাটাই আশ্চর্যের বিষয়। দেশের একমাত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরেজীর মাধ্যমে পরিচালিত। তাই নিঃসন্দেহেই এর কিছু না কিছু ফল দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু আমরা যদি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেতাম, তাহলে এর পরিণাম কি হত? আজ তাহলে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হতাম এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজগৃহে পরবাসীর মত হতেন না, জাতির প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তাঁদেব যোগাযোগ থাকত। দেশের দীনতম ব্যক্তিটির মাঝে তাঁরা কাজ করতে সমর্থ হতেন এবং এই অর্ধশতাব্দীতে তাঁরা যা অর্জন করতেন, তাকে সমগ্র জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্য আখ্যা দেওয়া যেত (হর্ষধ্বনি)। আজ শিক্ষিতবর্গের অর্ধাঙ্গীরা পর্যন্ত তাঁদের মহানতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন। অধ্যাপক (জগদীশচন্দ্র) বসু এবং অধ্যাপক রায়ের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) গৌরবময় গবেষণার উদাহরণ নিন। এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে তাঁদের গবেষণা সর্বসাধারণের সম্পত্তি নয়?

স্পিচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ৪-২-১৯১৬

মাতৃভাষা সম্বন্ধে

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তনের প্রশ্নটির গুরুত্ব জাতীয় পর্যায়ের। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার অর্থ হল জাতিগতভাবে আত্মহত্যা। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীকে বজায় রাখার ঔচিত্যের প্রবক্তারা এই কথা বলে থাকেন যে বর্তমান ভারতে স্বদেশসেবা এবং জনসেবার ক্ষেত্রে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। এরকম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। কারণ এদেশে ইংরেজীর মাধ্যমে ছাড়া অপর কোন রকম শিক্ষা পাবার সুযোগ নেই। আসল কথা হচ্ছে এই যে এই শিক্ষার পিছনে আমরা যত সময় দিই সে তুলনায় ফল পাই না। জনসাধারণের উপর শিক্ষার কোন প্রভাবই পড়ে নি।

…মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদীরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন অনুভব করে তাঁরা তাঁদের কথ্য ভাষা ইদ্দিসকে পূর্ণাঙ্গ ভাষায় উন্নীত করেছেন এবং এই ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরাজী অনুবাদ করায় কৃতকার্য হয়েছেন। এই সব ইহুদীরা বহু বিদেশী ভাষা ভালভাবে শিখলেও তাতে তাঁদের অন্তরের তৃষ্ণা

মেটে নি। আর তাঁদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহুদা সমাজ নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পূর্বে তাদের সবাই-এর উপর বাধ্যতামূলক ভাবে কোন বিদেশী ভাষা শেখার বোঝাও চাপিয়ে দেন নি। সুতরাং এক সময় যাকে কেবল একটি কথ্য ভাষা মনে করা হত এবং ইহুদী শিশুরা যে ভাষা তাদের মায়েদের কাছ থেকে শিখত, সেই ভাষায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাজির অনুবাদ করে তাঁরা তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সত্যসত্যই এ এক চমৎকার কৃতিত্ব।

…এক পুরুষ কালের ভিতর ইহুদী পণ্ডিতরা যদি তাঁদের জনসাধারণ গৌরব বোধ করতে পারে এমন একটি ভাষা তাঁদের দিয়ে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের প্রাদশিক ভাষাগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ সমৃদ্ধ করে তোলা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কারণ এগুলি সবই বিকশিত ভাষা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও আমরা একই শিক্ষা পাই। সেদেশে ডাচ ভাষার একটি বিকৃত রূপ তাল ভাষা ও ইংরেজীর মধ্যে বিবাদ ছিল। বুয়র মাতাপিতারা মোটেই চাইতেন না যে তাঁদের যেসব সন্তানের সঙ্গে ছেলেবেলায় তাঁরা তাল ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা পাবার জন্য তারা অসুবিধায় পড ক। সেদেশে ইংরেজীর পক্ষ খুবই মজবুত ছিল। এর সপক্ষে যোগ্য প্রবক্তার দল ছিলেন। তবুও বুয়রদের দেশপ্রেমের কাছে ইংরেজীকে নতি-স্বীকার করতে হল। এ প্রসঙ্গে খেয়াল করতে হবে যে বুয়ররা এমন কি শুদ্ধ ডাচ ভাষাকেও বাতিল করে দিল। যেসব শিক্ষক ইতিপূর্বে ইউরোপে প্রচলিত শুদ্ধ ডাচ ভাষা শেখাতেন তাঁরা সহজতর তাল ভাষা শেখাতে বাধ্য হলেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যে তাল ভাষা দক্ষিণ আফ্রিকার সরল অথচ সাহসী গ্রামবাসী বুয়রদের পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা ছিল বর্তমানে সেই তাল ভাষায় সুন্দর সাহিত্য গড়ে উঠছে। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উপর থেকে আমাদের আস্থা যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে নিজেদের উপরই আমাদের ভরসা নেই এবং এটা অবক্ষয়ের নিশ্চিত নিদর্শন। আমাদের মায়েরা যেসব ভাষায় কথা বলেন তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব না থাকলে যতই ঔদার্য ও শুভেচ্ছা সহকারে যে রকমেরই স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের দেওয়া হোক না কেন তার দ্বারা আমরা কদাচ স্বয়ংশাসিত জাতিতে পরিণত হতে পারব না।

স্পিচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, ১৯১৬

হিন্দী : ভারতের জাতীয় ভাষা

শিক্ষার মাধ্যমের প্রতি যেমন আমরা মনোযোগ দিয়েছি, তেমনি জাতীয় ভাষার সমস্যার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া কর্তব্য। ইংরেজীকে যদি জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হয়, তাহলে একে অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে পরিগণিত করা উচিত। ইংরেজী কি জাতীয় ভাষা হতে পারে? অনেক বিদ্বান স্বদেশ-প্রেমিক বলে থাকেন যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থই অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। তাঁদের মতে ইংরেজী ইতোমধ্যেই সে স্থান অলঙ্কৃত করে রয়েছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এক সাম্প্রতিক উক্তিতে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, ইংরেজী যেন সেই মর্যাদা পায়। উৎসাহের আধিক্যে তিনি অবশ্য স্বদেশ-প্রেমিক পণ্ডিতদের মত অত দূর যেতে পারেন নি। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর বিশ্বাস করেন যে, ক্রমে ক্রমে ইংরেজী অধিকাধিক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, পারিবারিক পরিধির ভিতর অনুপ্রবেশ করবে এবং অবশেষে জাতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হবে। বড়লাট বাহাদুরের যুক্তিকে বাহ্যতঃ বিবেচনা করলে সমর্থন জানাবার ইচ্ছা হবে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের দশা দেখে মনে হয় যে, ইংরেজীর ব্যবহার বন্ধ করলে বুঝি আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। তথাপি গভীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ইংরেজী কখনই ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়। জাতীয় ভাষার লক্ষণ কি?

(১) রাজকর্মচারীদের পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ হবে।

(২) ভারতের সর্বত্র এই ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয়, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানো সম্ভব হবে।

(৩) এই ভাষা অধিকতম সংখ্যক ভারতবাসীর কথ্য ভাষা হবে।

(৪) সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ হবে।

(৫) জাতীয় ভাষা নির্ধারণকালে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী অবস্থার উপর জোর দেওয়া চলবে না।

ইংরেজী ভাষা পূর্বোক্ত কোন শর্তই পূর্ণ করে না। প্রথম শর্তটির অবশ্য সর্বশেষ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল। তথাপি ইচ্ছা করে আমি একে প্রথম স্থান দিয়েছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মাত্র এই শর্তটি দেখেই মনে হয় যে ইংরেজীর বুঝি রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি করার কারণ আছে। কিন্তু একটু গভীর-ভাবে বিবেচনা করলেই দেখতে পাব যে, রাজকর্মচারীদের পক্ষেও এই মুহূর্তে

ইংরজী শেখা সহজ নয়। আমাদের কল্পিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ইংরেজীনবীশ রাজকর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে মহামান্য বড়লাট ইত্যাদি মুষ্টিমেয় জনকয়েক মাত্র ইংরেজ থাকবেন। আজকেও অধিকাংশ রাজকর্মচারী ভারতীয় এবং তাদের সংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যেকেই এ কথা স্বীকার করবেন যে তাঁদের পক্ষে কোন ভারতীয় ভাষার তুলনায় ইংরেজী শেখা নিঃসন্দেহেই বহু কঠিন কাজ। দ্বিতীয় শর্তটি বিচাব করলে দেখতে পাব যে দেশের জনসাধারণ ইংরেজী বলতে না পারলে সেই ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা এক আকাশকুসুম স্বরূপ। আর জনসাধারণের ভিতর সেই পরিমাণ ইংরেজী ভাষার প্রসারের কল্পনা এক অসম্ভব ব্যাপার।

ইংরেজী তৃতীয় শর্তটি পূরণে অক্ষম। ভারতবর্ষের অধিকতম সংখ্যক অধিবাসী এ ভাষায় কথা বলে না।

চতুর্থ শর্তটিও ইংরেজী দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না; কারণ, সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ নয়।

সর্বশেষ শর্তের কথা বিবেচনা করলে দেখতে পাব যে, ইংরেজীর বর্তমান মর্যাদা একেবারে সাময়িক। স্থায়ী অবস্থা হচ্ছে এই যে, জাতীয় জীবনে ইংরেজীর প্রয়োজন অত্যন্ত সামান্য হবে। রাজকীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধিত বিষয়) অবশ্যই এর সার্থকতা থাকবে। তবে রাজকীয় ভাষা বা কূটনৈতিক ভাষা হওয়া এক ভিন্ন কথা। শুধু এর জন্য কিয়ৎ পরিমাণ লোকের এ ভাষার জ্ঞান থাকলেই চলবে। আমরা ইংরেজীবিদ্বেষী নই। আমরা শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, এই ভাষাকে তার সীমার বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয় এবং ইংরেজী রাজকীয় ভাষা হবে বলে আমাদের মালব্যজী, শাস্ত্রী এবং বন্দ্যোপাধ্যায়দের আমরা এ ভাষা শিখতে বাধ্য করব। তারপর আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হব যে তাঁরা বিশ্বের কোণে কোণে ভারতের মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করবেন। তথাপি ইংরেজী ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে না। একে সেই ভাষার মর্যাদা দেওয়া মেকী বিশ্বভাষা প্রবর্তনের চেষ্টার মত। আমার মতে এমন কি ইংরেজী আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারবে ভাবাটাই হচ্ছে অমানুষিক ব্যাপার। এ মেকী বিশ্বভাষা প্রবর্তন-প্রচেষ্টার মত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাহলে কোন্ ভাষা প্রথমোক্ত পাঁচটি শর্ত পূর্ণ

করে? এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দীর ভিতরই এর গুণ আছে।

দেবনাগরী বা উর্দু লিপিতে উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বারা লিখিত ও কথিত ভাষাকেই আমি হিন্দী আখ্যা দিয়ে থাকি। এই সংজ্ঞায় কেউ কেউ আপত্তি করেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, হিন্দী ও উর্দু পৃথক পৃথক ভাষা। এ যুক্তির ভেতর সারবত্তা নেই। উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা একই ভাষায় কথোপকথন করে থাকেন। শিক্ষিত সমাজ একটু বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দীকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করে ফেলেছেন। এইজন্য মুসলমানরা এখন এ ভাষা বুঝতে পারেন না। আবার লক্ষ্ণৌএর দিকের মুসলমানরা নিজেদের কথাবার্তাকে একেবারে পার্শীয়ান-ঘেঁষা করে ফেলেছেন বলে সে ভাষা হিন্দুদের বোধগম্য নয়। এ ব্যাপার একই ভাষার দ্বিবিধ বাহুল্যের নিদর্শন। জনসাধারণের বার্তালাপের ভাষায় এই বাহুল্যের ঠাঁই নেই। উত্তর ভারতে আমি থেকেছি, অবাধে আমি হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি এবং আমার হিন্দী-জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নি। উত্তরের ভাষাকে ইচ্ছামত হিন্দী বা উর্দু যে নামই দিন না কেন, জিনিস একই। উর্দু লিপিতে লিখলে উর্দু হয় এবং সেই একই কথা দেবনাগরীতে লিখলে তা হয় হিন্দী।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থাকে, তবে তা লিপির। এখনকার মত মুসলমান শিশুরা অবশ্যই উর্দু লিপিতে শিখবে এবং অধিকাংশ হিন্দু ছেলেও এ ভাষা দেবনাগরী লিপিতে শিখবে। হিন্দুদের বেলায় "অধিকাংশ" কথাটি এই জন্য প্রয়োগ করলাম যে সহস্র সহস্র হিন্দু উর্দু লিপিই ব্যবহার করে এবং তাদের ভিতর অনেকে নাগরী লিপির কথা জানেই না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানরা যখন আর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখবে না এবং তাদের ভিতর থেকে যখন সন্দেহের কারণসমূহ অপসারিত হবে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাণশক্তি-সম্পন্ন লিপিই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে ও অবশেষে জাতীয় লিপিরূপে পরিগণিত হবে। ইতোমধ্যে যে সব হিন্দু-মুসলমান উর্দু লিপিতেও দরখাস্ত লিখতে ইচ্ছুক, তাদের সেরূপ করার অবাধ অধিকার থাকবে এবং জাতীয় সরকারও তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

পূর্বোক্ত পঞ্চ শর্ত পূরণে সক্ষম অপর কোন ভাষা হিন্দীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। হিন্দীর পরেই বাংলার স্থান। কিন্তু বাঙালীরা স্বয়ং বাঙলার

বাইরে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। হিন্দীভাষী কোন ব্যক্তি যে কোন জায়গায় গিয়ে হিন্দী ব্যবহার করলে কেউ বিস্মিত হয় না। হিন্দুধর্ম প্রচারক এবং মুসলমান মৌলবীরা ভারতের সর্বত্র তাঁদের ধর্মীয় উপদেশাবলী হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় দিয়ে থাকেন এবং এমন কি অক্ষরজ্ঞানহীন জনসাধারণও তাঁদের কথা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, কোন নিরক্ষর গুজরাতীও উত্তর ভারতে গেলে হিন্দীতে এক-আধটি কথা বলার চেষ্টা করেন; কিন্তু উত্তর ভারতের কোন দরোয়ানও নিজ গুজরাতী মালিকের সঙ্গে গুজরাতীতে কথা বলেন না। পক্ষান্তরে মালিককেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কাজ চালাতে হয়। দ্রাবিড় দেশেও আমি হিন্দীতে কথা বলতে শুনেছি। ইংরেজী জানা থাকলে মাদ্রাজে কাজ চলে যায় বলা সত্য ভাষণ নয়। সেখানেও আমি হিন্দী প্রয়োগ করে ফল পেয়েছি। রেলওয়ে ট্রেনে মাদ্রাজী যাত্রীদের আমি হিন্দী ব্যবহার করতে শুনেছি। একটা আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা উর্দুতে কথাবার্তা বলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশেই তাঁদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায় যে, হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হওয়া যেন ভারতের বিধিলিপি। অতীত কাল থেকেই আমরা হিন্দীকে এই মর্যাদা দিয়ে আসছি। উর্দু সৃষ্টি হওয়ার কারণও এই। মুসলমান বাদশাহগণ ফার্সী বা আরবীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে পারেন নি। তাঁরা রাষ্ট্রভাষার জন্য হিন্দী ব্যাকরণ স্বীকার করে নিয়ে উর্দু লিপি ও ফার্সী শব্দসম্ভার দ্বারা তার রূপায়ণ করেন। কারণ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। ইংরেজদের কাছে এসব অবিদিত নয়। সিপাহীদের সম্বন্ধে যাঁদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁদের জন্য হিন্দী বা উর্দুতে সামরিক নির্দেশনামাসমূহ রচনা করতে হয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র হিন্দীই জাতীয় ভাষা হতে পারে। মাদ্রাজের শিক্ষিতবর্গের কাছে এ অবশ্য কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য, গুজরাত, সিন্ধু বা বাঙলার অধিবাসীদের কাছে এ ব্যাপার অতীব সহজ। কয়েক মাসের ভিতরই তাঁরা হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হতে পারবেন এবং তখন জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁরা এই ভাষায় বার্তালাপ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। তামিলদের অবশ্য এতটা সুবিধা হবে না। দ্রাবিড় ভাষাসমূহ গঠন-রীতি ও ব্যাকরণের দিক থেকে তার সংস্কৃতজ ভগ্নীদের থেকে পৃথক। উভয় গোষ্ঠীর ভিতর সংস্কৃতজ শব্দের অস্তিত্বের কারণ যা কিছু ঐক্য

আছে। তবে এ অসুবিধা শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সীমাবদ্ধ। তাঁদের স্বদেশপ্রেমিকতা-বৃত্তির কাছে আবেদন করার অধিকার আমাদের আছে এবং আমরা আশা করতে পারি যে, তাঁরা হিন্দী শেখার জন্য যথোচিত প্রয়াস করবেন; কারণ, ভবিষ্যতে সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করার পর অন্যান্য প্রদেশের মত মাদ্রাজেও হিন্দী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে প্রবর্তিত হবে এবং তখন অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে মাদ্রাজের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে। ইংরেজী দ্রাবিড় জনসাধারণের ভিতর দৃঢ়মূল হতে পারে নি, কিন্তু হিন্দী অচিরাৎ এ কার্য সাধন করবে।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ২০-১০-১৯১৭

ইংরেজীর স্থান

সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় কূটনীতিজ্ঞদের ভাষা হচ্ছে ইংরেজী; এ ভাষায় বহু সাহিত্য-সম্পদ বিদ্যমান ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়-সূত্র এই ভাষা। সুতরাং আমাদের ভিতর কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে এই ভাষা জানতে হবে। এঁরা জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিভাগ পরিচালনা করবেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রত্নাবলী তাঁরা স্বদেশীয়দের জন্য আহরণ করবেন। ভবিষ্যতে এই হবে ইংরেজীর যথা-যোগ্য উপযোগ। আজ কিন্তু ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষাকে হৃদি-সিংহাসন-চ্যুত করে অন্তরের প্রিয়তম স্থান জোর করে দখল করেছে। ইংরেজীর এ মর্যাদা অস্বাভাবিক এবং ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের এক বিসম সম্বন্ধ এর মূলে ক্রিয়াশীল। ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বিনাই ভারতীয় চিত্তের চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভবপর হওয়া উচিত। দেশের ছেলেমেয়েরা আজ মনে করে যে ইংরেজী না জানলে সুসংস্কৃত সমাজে প্রবেশলাভ অসম্ভব। এইভাবে এই মনোভাব আজ ভারতের পুরুষসমাজ এবং বিশেষতঃ নারীকুলের প্রতি ভীষণ হিংসাচরণ করছে। এ মনোবৃত্তি অতীব অপমানজনক ও অসহ্য। স্বরাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংরেজীর প্রতি এই মূঢ় আকর্ষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-১৯২১

ইংরেজীর সীমাবদ্ধতা

আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে যে যথার্থ শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল, আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই তা উপেক্ষা করেছি। বাঙলা, গুজরাত বা দাক্ষিণাত্যের যুবকদের পক্ষে মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রমুখ ভারতের যে বিশাল অংশ হিন্দুস্থানী ছাড়া অন্য কোন ভাষাতেই কথা বলে না, সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এইজন্য আপনাদের অবসর সময়েও আমি হিন্দুস্থানী শিখতে বলছি। মুহূর্তের জন্যও মনে এ চিন্তার ঠাঁই দেবেন না যে ইংরেজীকে জনসাধারণের পারস্পরিক মনোভাব আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা হিসাবে রূপ দিতে পাববেন। বাইশ কোটি ভারতবাসী হিন্দুস্থানী জানেন। তারা অন্য কোন ভাষা জানেন না এবং আপনারা যদি তাঁদের হৃদয়-রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে চান, তাহলে একমাত্র হিন্দী ভাষার পথই আপনাদের সম্মুখে উন্মুক্ত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-২-১৯২১

হিন্দী ভাষার বৈভব

আপনারা হিন্দী ভাষার দৈন্যের কথা বলছেন। আধুনিক হিন্দীর দীনতা আপনাদের সমালোচনার লক্ষ্য। কিন্তু আপনারা যদি অভিনিবেশ সহকারে তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" অধ্যয়ন করেন, তাহলে আপনারা সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে বিশ্বের আধুনিক ভাষাসমূহের কোন গ্রন্থই "রামচরিত মানসের" সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়। ঐ একখানি গ্রন্থ আমাকে যে বিশ্বাস ও আশার জীবন-বারি পান করিয়েছে, অন্য কোন পুস্তকের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমার চমৎকারিত্ব এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা—যে কোন দিক থেকেই এই গ্রন্থখানি সর্ববিধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-২-১৯২১

বিদেশী মাধ্যম

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার মাধ্যম মস্তিষ্কে অবসাদ সৃষ্টি করেছে, আমাদের শিশুদের স্নায়ুর উপর অহেতুক বোঝা চাপিয়েছে এবং এর ফলে শিশুরা স্রেফ মুখস্থকারী ও নকলনবীশে পর্যবসিত হয়েছে। পরিণাম স্বরূপ তাদের ভিতর আর

মৌলিক কৃতিত্ব ও চিন্তার ক্ষমতা নেই এবং অধীত বিষয় নিজ পরিবার বা জনগণের ভিতর সম্প্রসারণের সাধ্যও তাদের নেই। বিদেশী মাধ্যম আমাদের শিশুদের একরকম নিজভূমে পরবাসী করে দিয়েছে। এই হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সর্বাধিক বিয়োগান্তক অধ্যায়। বিদেশী মাধ্যম বিভিন্ন দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেয় নি। আমার হাতে স্বৈরতন্ত্রী গণনায়কের ক্ষমতা থাকলে আজই আমি দেশের ছেলেমেয়েদের বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাবার প্রথা রদ করতাম এবং পদচ্যুত করার হুমকি দিয়ে প্রতিটি শিক্ষক ও অধ্যাপককে অবিলম্বে এ পরিবর্তন কার্যকরী করতে বাধ্য করতাম। পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম না। পরিবর্তন হলে এসব আপনি-ই হবে। অবিলম্বে এ অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-১৯২১

সাধারণ লিপি

একজাতি রূপে আমাদের দাবি সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের ভিতর কতিপয় বিষয়ে সমতা থাকা প্রয়োজন। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নানা শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একই সংস্কৃতির স্রোতধারা প্রবাহিত। আমরা একই প্রকার অযোগ্যতায় ভুগি। আমি স্বয়ং এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, বেশভূষার ক্ষেত্রে একই ধরনের সাজসরঞ্জাম শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনও বটে। এ ছাড়া আমাদের একটি সাধারণ ভাষা প্রয়োজন। এই সাধারণ ভাষা আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের কণ্ঠরোধ করবে না, তাদের পরিপূরক হবে। অধিকাংশ লোকই একথা স্বীকার করেন যে, হিন্দুস্থানী এই সাধারণ ভাষা হবে। হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দী ও উর্দুর সমন্বয়। এ ভাষা একেবারে সংস্কৃত-ঘেঁষা বা চূড়ান্ত আরবী-ফার্সী গন্ধী হবে না। এ পথের সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বহুবিধ লিপি। এই সব ভাষার জন্য একটি সাধারণ লিপি নির্ধারিত হলে দেশে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলন করার স্বপ্ন সফল হবার পথে একটি বিরাট বাধা দূরীভূত হয়েছে বলা যাবে।

বহুসংখ্যক লিপি একাধিক কারণে বাধা স্বরূপ পরিগণিত হয়। জ্ঞানার্জনের পথে এ এক বিরাট বিঘ্ন; আর্যভাষা-গোষ্ঠীর ভিতর এতটা সাদৃশ্য আছে যে, বিভিন্ন লিপিশিক্ষার জন্য এত সময়ের অপচয় না হলে অত্যন্ত অল্পায়াসে আমরা প্রত্যেকে কতিপয় ভাষায় দক্ষ হতে পারতাম। উদাহরণ স্বরূপ অল্পবিস্তর

সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হলে বিনা বাধায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতুলনীয় রচনার রসাস্বাদন করতে পারত। কিন্তু অবাঙালীদের কাছে বাঙলা হরফ যেন "প্রবেশ নিষেধ"-এর বিজ্ঞপ্তি। এইভাবে বাঙালীরা দেবনাগরী লিপি জানলে অবিলম্বে তুলসীদাস প্রমুখ হিন্দুস্থানী লেখকদের রচনাবলীর অপূর্ব সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক রস উপভোগ করতে পারতেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমি একটি সমিতির কাগজপত্র পাই। সম্ভবতঃ এই সমিতির সদর কেন্দ্র ছিল কলকাতায় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় লিপির প্রচার ও প্রসার করা। সেই সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে বিশেষ কিছু জানি না; তবে এর আদর্শ সুমহান্। এই ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী অগ্রণী হলেও অনেক কাজ করা যায়। এ আদর্শ পরিপূর্তির পথে বাধা-বিপত্তি আছে। সমগ্র ভারতের পক্ষে একটি সাধারণ লিপি গৃহীত হওয়া সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তবে আমরা শুধু প্রাদেশিকতা বর্জন করতে পারলে সংস্কৃত ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার পক্ষে (এর ভিতর দাক্ষিণাত্যের এই শ্রেণীর ভাষাও পড়ে) একটি সাধারণ লিপি গ্রহণ করা অতীব বাস্তব আদর্শ। উদাহরণ স্বরূপ বলব যে একজন গুজরাতীর পক্ষে গুজরাতী লিপি আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না। বৃহত্তর সর্বভারতীয় স্বদেশপ্রেমের পোষক হলে তবেই প্রদেশকেন্দ্রিক স্বদেশপ্রেম ভাল। এবং এই সর্বভারতীয় স্বাদেশিকতা বোধও যতটুকু সমগ্র বিশ্বরূপী আরও ব্যাপক লক্ষ্য পরিপূরণের সহায়ক হয়, ততটুকু ভাল। কিন্তু যে প্রাদেশিক স্বাদেশিকতা বলে যে, "ভারতবর্ষ কিছুই নয়, গুজরাত-ই সব", তা দুষ্টতা। গুজরাতে লিপির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা আপস হয়েছে এবং আমি স্বয়ং গুজরাতী বলে আমি গুজরাতের উদাহরণ নিয়েছি। গুজরাতে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁরা দেবনাগরী লিপি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এই জন্য স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি গুজরাতী বালক-বালিকা গুজরাতী এবং দেবনাগরী লিপি জানে। প্রাথমিক শিক্ষানীতি-নির্ধারকেরা শুধু দেবনাগরী লিপি জারী করলে আরও ভাল করতেন। সে অবস্থায় অবশ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিতদের গুজরাতী লিপি শিখতে হত; কিন্তু দুটির বদলে একটি লিপি শেখার জন্য গুজরাতী ছেলেদের কর্মশক্তি অপর কোন প্রয়োজনীয় কার্যে লাগত। মহারাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিকল্পনা-রচয়িতারা এতদপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তাঁরা শুধু দেবনাগরী লিপি বজায় রাখেন। এর পরিণাম স্বরূপ শুধু যতটুকু পড়ার সঙ্গে

সম্পর্ক, যে কোন মারাঠী তুকারামের রচনার মতই সহজে তুলসীদাসের রচনাবলী পাঠ করে। তাই গুজরাতী এবং হিন্দুস্থানীরাও সমপরিমাণ সাবলীলতার সঙ্গে তুকারামের লেখনী-নিঃসৃত গ্রন্থরাজি পাঠ করেন। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের শিক্ষা-নির্ধারণ সমিতি একেবারে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে এবং এর ফল আমরা সকলেই জানি ও এর জন্য অনেক অনুতাপ করি। যেন ইচ্ছা করেই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ভাষাকে অনধিগম্য করা হয়েছে। আমার মনে হয় দেবনাগরীকে সর্বসাধারণের লিপিতে পরিণত করার যুক্তি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চলে এই লিপি চলে—এই তথ্য এ সমস্যা সমাধানের নিরীখ হওয়া উচিত।

এই সব চিন্তা মনে ওঠার একটা কারণ ঘটেছে। আমার কটক সফরের সময় আমাকে একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিহারের হিন্দীভাষী জনসাধারণ ও ওড়িষার ওড়িয়াভাষী জনসাধারণের মাঝামাঝি অবস্থায় একদল আদিবাসী আছেন। তাঁদের শিশুদের শিক্ষার জন্য কি করা উচিত? তাঁদের ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে, না হিন্দীর মাধ্যমে? অথবা তাঁদের নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সে ভাষার লিপি দেবনাগরী হবে অথবা নূতন কোন লিপি আবিষ্কার করা হবে? উৎকলের বন্ধুরা প্রথমে এদের ওড়িয়াদের ভিতর বিলীন করার কথা ভেবেছিলেন। বিহারীরাও এই ভাবে চাইবেন যে তারা বিহারী সমাজে লীন হোক। এবং ঐ উপজাতায় প্রবীণ বয়স্কদের মত জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বোধ হয় স্বভাবতই বলবেন যে তাঁদের ভাষা ওড়িয়া ও হিন্দীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তাই এই ভাষাকে এবার লিখিত রূপ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁরা যদি নিতান্ত কোন লিপি গ্রহণ না করেন (এ যুগে অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে এভাবে নূতন লিপি প্রবর্তিত হয়েছে বলে আমি জানি), তাহলে তাঁদের লটারি করে স্থির করতে হবে যে তাঁরা ওড়িয়া লিপি বজায় রাখবেন, না দেবনাগরী। সর্বভারতীয় পটভূমিকায় চিন্তা করে মিত্রবর্গকে আমি পরামর্শ দিই যে, ওড়িয়াভাষী জনসাধারণের ভিতর ওড়িয়া ভাষাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা সমীচীন বটে, কিন্তু এই উপজাতীয় শিশুদের হিন্দী শেখানো উচিত এবং স্বভাবতই এদের দেবনাগরী লিপি শিক্ষা দিতে হবে। যে বর্জনধর্মী ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি কথ্য ভাষার প্রতিটি রূপকে স্থায়ী করতে ও তার সাহিত্যিক রূপ দিতে চায়, তা জাতীয়তা এবং বিশ্বমানবতা-বিরোধী। আমার বিনম্র অভিমত এই যে, প্রতিটি অবিকশিত ও লেখ্য রূপবিহীন ভাষার

স্বতন্ত্র রূপ বিসর্জন দিয়ে তাদের হিন্দুস্থানীর মহাসাগরে বিলীন করে দেওয়া উচিত। একে আত্মহত্যা আখ্যা দেওয়া অন্যায়, এ হচ্ছে মহত্তর লক্ষ্যাভিমুখী আত্মোৎসর্গ। সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতবর্ষের জন্য একটি সাধারণ ভাষা কাম্য হলে আমাদের ভেদ-বিভেদের পন্থা পরিহার করতে হবে এবং ভাষা ও লিপির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। আমাদের একটি সাধারণ ভাষা গড়ে তুলতেই হবে। স্বভাবতঃ এর সূত্রপাত করতে হবে লিপি দিয়ে এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়াকে সম্ভবতঃ ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমার কথা চললে আমি প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষার অতিরিক্ত দেবনাগরী ও উর্দু লিপি শিক্ষা করা প্রতিটি প্রদেশে বাধ্যতামূলক করতাম এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মুখ্য গ্রন্থসমূহ আমি দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রণ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে তার ভাবানুবাদ দিতাম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-১৯২৫

সংস্কৃত ও অপরাপর ভাষার স্থান

তখন আমি যতটুকু সংস্কৃত শিখেছিলাম, তা না শিখলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত। বস্তুতঃ সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে না পারার জন্য আজ আমি অত্যন্ত অনুশোচনা করি; কারণ পরে আমি উপলব্ধি করেছি যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃতে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আজ আমার অভিমত এই যে, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার পাঠ্য-ক্রমে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী ও ইংরেজীর স্থান থাকা প্রয়োজন। এইরূপ দীর্ঘ তালিকা দেখে ভীত হবার কারণ নেই। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যদি অধিকতর সুসমঞ্জস্য হত এবং ছেলেদের যদি একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে না হত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহলে এই সব ভাষা শেখা বিরক্তিকর প্রতীত হত না। পক্ষান্তরে এ অতীব আনন্দের ব্যাপার হত। কোন একটি ভাষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা করলে অন্যান্য ভাষা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

আত্মকথা, ১৯২৬,

ইংরাজী বনাম হিন্দী

আমি জানি যে ইংরেজী ও হিন্দীর ভিতর এই বাদ-বিসম্বাদ এক রকম চিরস্থায়ী ব্যাপার। ছাত্রদের ভিতর বক্তৃতা দেবার সময় ইংরেজীতে বলার জন্য তাদের দাবি শুনে শুনে হতচকিত হয়েছি। আপনারা জানেন এবং জানা উচিতও যে আমি ইংরেজী ভাষার গুণগ্রাহী, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতের ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত ও তাদের সেবাই ছাত্রসমাজের ব্রত হওয়া উচিত বলে তারা যদি ইংরেজীর বদলে হিন্দী শেখার উপর বেশী জোর দেয়, তবে তারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। আমি একথা বলছি না যে আপনারা ইংরেজী শিক্ষা করবেন না; ইংরেজী আপনারা অবশ্যই শিখবেন। তবে আমাব যতদূর দৃষ্টি যায়, এ ভাষা দেশের কোটি কোটি পর্ণকুটিরের ভাষা হবে বলে মনে হয় না। হাজার বা লাখের ভিতর এর গণ্ডি সীমিত হবে, এ ভাষা কখনই কোটির কোঠা ছুঁতে পারবে না।

হরিজন, ১৭-১১-১৯৩৬

আমার নিজের অভিজ্ঞতা

নিজ অভিজ্ঞতার একটি অধ্যায় আপনাদের কাছে বিবৃত করব। বারো বৎসর পর্যন্ত আমি আমার মাতৃভাষা গুজরাতীর মাধ্যমেই যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। সে সময় আমি কিছুটা গণিত ইতিহাস ও ভূগোল জানতাম। তারপর আমি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। এখানেও প্রথম তিন বৎসর আমার মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ছিল। তবে শিক্ষকেরা সর্বদা ছাত্রদের মগজে ইংরেজী অনুপ্রবিষ্ট করাবার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং আমাদের অর্ধেকেরও বেশী সময় ইংরেজী শিখতে ও তার উদ্দণ্ড স্বভাব বানান ও উচ্চারণ-ভঙ্গী আয়ত্ত করার জন্য দিতে হত। কোন ভাষার উচ্চারণ যে তার বানান-পদ্ধতি মেনে চলে না—এটা বহু বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। ইংরেজীর বানান মুখস্থ করা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবে আমি যে কথা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে আপাততঃ এর সম্পর্কে নেই। যাই হোক, প্রথম তিন বৎসর অপেক্ষাকৃত কম ঝঞ্ঝাটে চালিয়ে দেওয়া গেল।

চতুর্থ বৎসর থেকে শাস্তির পালা শুরু হল। জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতিষবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সব কিছুই ইংরেজীর

মাধ্যমে শিখতে হত। ইংরেজীর অত্যাচার এত ভীষণ ছিল যে এমন কি সংস্কৃত ও পার্শীয়ানও মাতৃভাষার মাধ্যমে নয়, ইংরেজীর মাধ্যমে শিখতে হত। ক্লাসে কোন ছাত্র নিজ বোধগম্য ভাষা গুজরাতীতে কথা বললে তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হত। কোন ছাত্র বিকৃত উচ্চারণে অর্থ না বুঝে ভুল ইংরেজী বললেও শিক্ষকের তাতে আপত্তি ছিল না। আর শিক্ষক মহাশয় দুশ্চিন্তা করবেনই বা কেন? তাঁর নিজের ইংরেজীও তো আর ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁর ছাত্রদেরই মত তাঁর কাছে ইংরেজী ভাষা বিদেশী। ফলং বিভ্রাটম্। সম্যক্‌ভাবে অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে এবং এমন কি অনেক সময় কিছুমাত্র না বুঝেই আমাদের মত ছেলেদের দলকে অনেক কিছু মুখস্থ করতে হত। শিক্ষক মহাশয় যখন তাঁর জ্যামিতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বোঝাবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস করতেন, ত্রাসে তখন আমার শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হত। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ উপপাদ্য পর্যন্ত না পৌছানো পর্যন্ত আমি জ্যামিতির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া পাঠকের কাছে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মাতৃভাষার প্রতি আমার এবম্বিধ গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমি জ্যামিতি, বীজগণিত ইত্যাদির যথাযথ গুজরাতী পরিভাষা জানি না। তবে এখন আমি বুঝতে পারি যে ইংরেজীর মাধ্যমে যতটুকু গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষবিজ্ঞান চার বৎসরে শিখেছিলাম, গুজরাতীর মাধ্যমে অতীব সহজে তা এক বৎসরে শিখতে পারতাম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেলে অপেক্ষাকৃত সহজে আরও প্রাঞ্জলভাবে আমি বিষয়গুলি বুঝতে পারতাম, আমার গুজরাতী শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হত। নিজগৃহে আমি এই জ্ঞানের উপযোগ করতে পারতাম। আমার পরিবার-পরিজন ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ হওয়ায় এই ইংরেজী মাধ্যম তাদের ও আমার মাঝে এক দুর্ভেদ্য ব্যবধান সৃষ্টি করল। বিদ্যালয়ে আমি কি করতাম, সে সম্বন্ধে আমার পিতা অজ্ঞ ছিলেন। ইচ্ছা থাকলেও আমি যা শিখেছিলাম, সে সম্বন্ধে পিতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। কারণ তাঁর যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। দ্রুতগতিতে আমি নিজগৃহে বহিরাগতের মত হয়ে পড়ছিলাম। আমি অবশ্যই একজন মাতব্বর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলাম। এমন কি আমার পোশাক ও ধরন-ধারণে অভাবনীয় পরিবর্তন হতে লাগল। আমার যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা কোন অসাধারণ অভিজ্ঞতা নয়। অধিকাংশেরই এই অভিজ্ঞতা।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম তিন বৎসর আমার সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশেষ কিছু সমৃদ্ধ হয় নি। ঐ সময়টুকু ছাত্রদের ইংরেজীর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার প্রস্তুতিকাল। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতির বিজয়াভিযানের পীঠভূমি। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনশত ছাত্র কর্তৃক আহরিত জ্ঞান অবরুদ্ধ সম্পদের মত হয়ে দাঁড়াল। এ জিনিস যেন জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেবার মত নয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথা বলব। আমাদের কতিপয় ইংরেজী গদ্য ও কবিতা-গ্রন্থ পড়তে হয়। বইগুলি যে চমৎকার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে বা তাদের সেবা করতে ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞান আমার সহায়ক হয় নি। ইংরেজী গদ্য ও পদ্যের যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছিলাম, তা না করলে যে আমি অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতাম—একথা আমি স্বীকার করতে অক্ষম। এর পরিবর্তে এই বহুমূল্য সাত বৎসরকাল যদি আমি গুজরাতী ভাষায় পারঙ্গম হবার প্রচেষ্টা করতাম এবং গণিত, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয় যদি গুজরাতীর মাধ্যমে শিখতাম, তাহলে সহজেই আমি এইভাবে অর্জিত জ্ঞান আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে বণ্টন করে নিতে পারতাম। আমি তাহলে গুজরাতী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারতাম এবং কে জানে স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আমার অনুরাগ ও আমার প্রয়োগশীল স্বভাবের কারণ আমি হয়ত জনগণের সেবায় মহত্তর অবদান রেখে যেতে পারতাম।

আমি ইংরেজী ভাষা ও তার মহান্ সাহিত্য-সম্পদের নিন্দা করছি বলে যেন মনে না করা হয়। 'হরিজন' পত্রিকাই আমার ইংরেজী প্রেমের যথেষ্ট প্রমাণ। তবে ভারতবাসীদের কাছে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মহত্ত্ব ইংলণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতই উপযোগী। ভারতবর্ষের জলবায়ু, নৈসর্গিক দৃশ্য এবং সাহিত্য—এই তিনটিই যদি ইংলণ্ডের তুলনায় নিকৃষ্ট হয় তবুও এর দ্বারাই ভারতের বিকাশ হবে। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলব। অপরের কাছ থেকে ধার করলে নিজেদের সম্পদ ক্ষীণ হবে। আমরা কোনমতেই বিদেশী আহার্য গ্রহণ করে পুষ্ট হতে পারি না। আমি চাই যে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ তার ভাষায় বিধৃত থাকুক এবং এর জন্য প্রয়োজনবোধে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সম্পদ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হোক। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সৃষ্টির রসাস্বাদন করার জন্য আমার বাঙলা ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। সুন্দর 'অনুবাদের

সহায়তায় আমি এর আনন্দ পাই। টলস্টয়ের ছোট গল্প পাঠের আনন্দ পাবার জন্য গুজরাতী ছেলেমেয়েদের রুশ ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। ভাল অনুবাদ দ্বারা তারা টলস্টয়ের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবে। ইংরেজ গর্ব করে থাকে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি মূলগ্রন্থ প্রকাশেব এক সপ্তাহের ভিতর সহজ ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে জাতির হাতে পৌঁছে যায়। তাহলে শেক্সপিয়র ও মিল্টনের ভাবধারা ও রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমি ইংরেজী শিখব কেন ?

জাতীয় প্রতিভার সাশ্রয় করার দৃষ্টি থেকে এমন এক দল ছাত্রকে বিশেষ ভাবে তৈরী করা প্রয়োজন, যারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাবলী অধ্যয়ন করনান্তর নিজ মাতৃভাষায় তার অনুবাদ করবে। আমাদের প্রভুরা আমাদের জন্য ভুল পথ নির্বাচন করেন এবং অভ্যাসের ফলে এখন ভ্রান্তিকেই সত্য মনে হচ্ছে।

লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উপর আমাদের এই ভ্রান্ত অভারতীয়করণের শিক্ষা ক্রমাগত বর্ধিতহারে যে ভীষণ অন্যায় ও অবিচার করছে, তার প্রমাণ আমি পাচ্ছি। আমার পরম আদরণীয় বহু গ্র্যাজুয়েট সঙ্গী ও সহকর্মী নিজেদের অন্তরতম লোকের ভাবপ্রবাহকে ভাষায় ব্যক্ত করার কালে ছট্‌ফট করেন। তাঁরা নিজগৃহে পরবাসী। নিজ মাতৃভাষার শব্দ-সম্পদ তাঁদের এত সীমিত যে ইংরেজী শব্দ এবং এমন কি সময় সময় ইংরেজী বাক্যের শরণ না নিলে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন না। ইংরেজী গ্রন্থ ছাড়া তাঁরা টিকে থাকতে পারেন না। নিজেদের মধ্যে তাঁরা ইংরেজীতেই পত্রালাপ করেন। এই পাপ কত গভীরে মূল অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছে দেখাবার জন্য আমি আমার সঙ্গীদের উদাহরণ দিলাম। কারণ আমরা নিজেদের এইভাবে পরিবর্তিত করার জন্য সজ্ঞানে প্রযত্ন করেছি।

অনেকে এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে কলেজের ছাত্রদের ভিতর থেকে একজনও জগদীশ বসু সৃষ্টি হলে কলেজের কারণ যে বৌদ্ধিক অপচয় হয়, তার জন্য দুঃখ করার কারণ থাকবে না। এই অপচয় যদি অপরিহার্য হত, তাহলে আমি মুক্তহৃদয়ে এ যুক্তি মেনে নিতাম। আমার মনে হয় আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, এ দুর্বিপাক এড়ানো যেত এবং এখনও এড়ানো যায়। তা ছাড়া একজন বসু সৃষ্টি হলেই এ যুক্তি সমর্থনযোগ্য হয় না। কঠোর বাধা-বিপত্তিজনক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয় এবং তৎসত্ত্বেও তিনি মাথা তুলে ওঠেন।

তা ছাড়া তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেন তা দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে একপ্রকার অনধিগম্য। আমরা বোধ হয় এই কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি যে ইংরেজী না জানলে আর কেউ জগদীশ বসুর মত হবার আশা করতে পারেন না। এর চেয়ে বিকট কুসংস্কারের কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। কোন জাপানী নিজেকে আমাদের মত অসহায় বোধ করেন না।

অবিলম্বে যে কোন্ মূল্যে শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তন সাধন করে প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। প্রত্যহ যে মারাত্মক অপচয়ের স্তূপ জমে উঠছে, তার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে আমি সামাজিক অরাজকতাকে আবাহন জানাব।

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মর্যাদা ও বাজার-দর বৃদ্ধির জন্য আমার মতে প্রত্যেকটি প্রদেশের আদালতের কার্যকলাপ সেই প্রদেশবাসীর ভাষায় পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রাদেশিক ভাষাই সেই প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে ব্যবহৃত ভাষা হবে এবং কোন প্রদেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকলে প্রতিটি ভাষা পরিষদে স্বীকৃতি পাবে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের আমি বলব যে, কথাবার্তায় প্রয়োগ করতে থাকলে মাসখানেকের ভিতরই তাঁরা নিজ প্রদেশের ভাষা সম্যকভাবে বুঝতে পারবেন। জনৈক তামিল সামান্য চেষ্টা করলেই তামিল ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত তেলেগু, মালায়ালম্ এবং কন্নড় ভাষার সাধারণ ব্যাকরণ ও কয়েক শত শব্দ শিখে নিতে পারেন। কেন্দ্রে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুখ্য স্থান পাবে।

আমার মতে এ প্রশ্ন পণ্ডিতদের দিয়ে সমাধান করাবার মত নয়। কোন এক স্থানের বালক-বালিকারা কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাবে—তা তাঁরা স্থির করে উঠতে পারবেন না। ছাত্ররা যে দেশেব অধিবাসী, সেই দেশের প্রয়োজনানুসারে পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হবে। পণ্ডিতরা শুধু দেশের আকাঙ্ক্ষাকে সাধ্যমত সুচারুরূপে রূপদান করতে পারেন। এ দেশ সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন করলে শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নের সমাধান সুসঙ্গত ভাবে হয়ে যাবেই। পণ্ডিতরা তখন তদনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবেন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন। আজ যেমন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির রচয়িতারা বিদেশী শাসকের প্রয়োজন-পূর্তি করেন, তেমন স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ফল মাতৃভূমির ডাকে সাড়া দেবে। আমার মনে গভীর শঙ্কা বিদ্যমান যে যতদিন পর্যন্ত আমাদের মত শিক্ষিত সমাজ এই সমস্যাকে নিয়ে খেলা করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ধ্যানের মুক্ত ও সবল ভারত সাকার হবে না। শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি—এর প্রতিটি

ক্ষেত্রে বন্ধন ভেঙ্গে অমিত প্রচেষ্টা দ্বারা আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। প্রচেষ্টাই এই সংগ্রামের তিন-চতুর্থাংশ কার্যক্রম।

হরিজন, ৯-৭-১৯৩৮

দ্রুত ব্যবস্থা প্রয়োজন

ক্রমে ক্রমে নয়, অবিলম্বে যদি শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তন সাধন করা যায়, তাহলে অত্যল্পকালের মধ্যেই আমরা দেখব যে প্রয়োজন-পূর্তির জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সৃষ্টি হয়ে গেছে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতির পরিচয় পেতে গিয়ে জাতির সময় ও কর্মশক্তির যে মর্মন্তুদ অপচয় আমরা এযাবৎ করেছি, আমরা যদি কাজের কাজ চাই, তবে এক বৎসরকালের মধ্যেই দেখব যে কিছুতেই আমরা এজাতীয় অন্যায়ের ভাগীদার হতাম না। আদালতগুলির উপর প্রাদেশিক সরকারসমূহের যদি কর্তৃত্ব বা প্রভাব থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে অবিলম্বে আদালতগুলিতে এবং সরকারী দপ্তরসমূহে প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করা। উদ্দিষ্ট সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা অনুভব করি, তবে অচিরাৎ আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হতে পারে।

হরিজন, ৩০-৭-১৯৩৮

সংস্কৃতের প্রতি উপেক্ষা

...আমি এ বিষয়ে সহমত যে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন শোচনীয় ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। আমি এমন এক যুগের মানুষ যে কালে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হত। আমি একথা মনে করি না যে এসব ভাষা অধ্যয়ন করার অর্থ সময় ও উদ্যমের অপচয়। আমার মতে প্রাচীন ভাষা পড়লে আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যয়নে সহায়তা মেলে। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বেলায় একথা অপর যে-কোন প্রাচীন ভাষার তুলনায় সত্য। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরই তাই সংস্কৃত পড়া উচিত কারণ এর ফলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ অধ্যয়নের পথ সুগম হয়। এই ভাষাতে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ চিন্তা করতেন এবং লিখতেন। নিজ ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হলে যে কোন হিন্দু ছেলে বা মেয়েকে কিছুটা সংস্কৃত জানতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ হয় না। কোন অনুবাদই গায়ত্রীর মূল সুরের পরশ দিতে

পারে না। কারণ আমার মতে মূল গায়ত্রী মন্ত্রের একটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা আছে। আর আমি যা বলতে চাইছি তার সপক্ষে গায়ত্রী কেবল একটি উদাহরণ।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪০

হিন্দুস্থানী ও মাতৃভাষা

গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে, কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন যে রাষ্ট্র-ভাষার প্রসারের ফলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ক্ষতি হবে। এ আশঙ্কার মূল অজ্ঞতার ভিতর। প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি স্বরূপ। এবং এরই আধারে জাতীয় ভাষার সৌধ রচিত হবে। এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। এরা কেউ কারও ঘাতক নয়।

হরিজন, ১৮-৮-১৯৪৬

ইংরেজীব সঠিক স্থান

ইংরেজী ভাষা তার ন্যায্যস্থানে থাকলে আমি এ ভাষার পূজারী; কিন্তু যে স্থান এর প্রাপ্য নয়, সেখানে বলপূর্বক অধিষ্ঠিত হলে আমি ঘোরতর ইংরেজী বিরোধী। ইংরেজী আজ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ভাষা। সুতরাং ইংরেজীকে আমি দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইংরেজীর স্থান হবে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ছাত্রের উপর এ ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না, অল্পসংখ্যক বাছাই করা ছাত্র এ ভাষা অধ্যয়ন করবে। আজ আমাদের যখন এমনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করার সঙ্গতি নেই, তখন ইংরেজী শেখার ব্যয়নির্বাহ করার প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? রাশিয়া ইংরেজী ছাড়াই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রগতি করেছে। ইংরেজী ছাড়া আমাদের চলবে না বলে ভাবা মানসিক দাসত্বের পরিচায়ক। কিছুতেই আমি এই জাতীয় পরাজিত মনোবৃত্তির সঙ্গে সহমত হতে পারি না।

হরিজন, ২৫-৮-১৯৪৬

রোমান লিপি

উর্দু এবং নাগরী লিপির পরিবর্তে রোমান লিপি প্রবর্তন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এ প্রস্তাব যতই চিত্তাকর্ষক মনে হোক না কেন, আমার মতে এই পুনঃ-

সংস্থাপন কার্য এক মারাত্মক ভ্রম বলে প্রমাণিত হবে এবং আমাদের অবস্থা ভাল হবার পরিবর্তে মন্দ হবে।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

॥ চৌদ্দ ॥

শিক্ষকদের প্রতি

শিক্ষকের লক্ষণ

...শিক্ষক হবেন চুম্বকের মত। ছেলেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি এমন হবেন যাতে ছেলেরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে না চায়। অল্প সময়ের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া ছেলেদের অসহ্য মনে হবে। ছেলেদের মা-বাবা এরকম শিক্ষককে উপেক্ষা করতে পারবেন না। শিক্ষক যদি ধনী হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁকে চোর মনে করা হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি নিজের খরচ চালাতে অক্ষম হন এবং তাঁকে যদি বাধ্য হয়ে উপবাসী থাকতে হয় তাহলে তাঁকে বোকা বলতে হবে।

নবজীবন, ২৭-৭-১৯২৪

শিক্ষার উপকরণ

দেশের সাত লক্ষ গ্রামে কি ভাবে সরকার উপযুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে? এই সাত লক্ষ গ্রামের ভিতর তিন লক্ষ গ্রামে কোন বিদ্যালয়ই নেই। অবস্থা যখন এমন শোচনীয় তখন সরকারী বিদ্যালয় খুলে লাভ কি? বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর ছাড়াও আমাদের কাজ চলবে, শুধু চাই চরিত্রবান শিক্ষক। প্রাচীন-কালের গুরুরা এইরকম শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ভিক্ষার দ্বারা সংসার প্রতিপালন করে শিক্ষাদান কার্য করতেন। ভিক্ষায় যেটুকু গোধূমচূর্ণ পেতেন তাতেই তাঁরা চালিয়ে নিতেন। অবশ্য পেলে তাঁরা ঘৃতও নিয়ে আসতেন। যেখানে শিক্ষক ভাল জুটত না সেখানকার শিক্ষাও সন্তোষজনক হত না। আর শিক্ষক ভাল হলে শিক্ষার মানও হত উচ্চ। সেই জাতের শিক্ষক আজ অদৃশ্য। কেবল ভাল ঘরবাড়ী হলে শিক্ষার মান উন্নত হয় না।

নবজীবন, ৩-৮-১৯২৪

শিক্ষকের মর্যাদা

…শিক্ষকরা স্বয়ং অথবা জনসাধারণ—কেউই শিক্ষকদের মূল্য বোঝেন না। বেতনের ভিত্তিতে লোকে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করে থাকে। আর তাঁদের বেতন কেরানীদের চেয়েও কম বলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষকদের মর্যাদা কেরানীর চেয়েও কম। ·

অতএব শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় কি? সাত লক্ষ গ্রামের সাত লক্ষ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা কি সম্ভব? বাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে যদি এটা সম্ভবপর না হয় তাহলে অপর একটি বিকল্প প্রস্তাব হল সীমিত সংখ্যক গ্রামে ভাল বেতন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা এবং বাদবাকী গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখা। প্রত্যুত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে এই-ই আমরা করেছি। আর আমার বিশ্বাস যে এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এ পদ্ধতি ভ্রান্ত। সুতরাং আমাদের এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে যাতে সব গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এর জন্য যা করণীয় তা হল এই যে বেতনের ভিত্তিতে শিক্ষকদের মর্যাদার পরিমাপ করলে চলবে না। আর শিক্ষকরাও শিক্ষাকে তাঁদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন—পরিশ্রমের বিনিময়ে কি পাচ্ছেন সেটা তাঁদের কাছে গৌণ হবে। শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকদের কর্তব্য বা ধর্ম হবে, যা তাঁর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। যে শিক্ষক এই যজ্ঞ সম্পাদন ব্যতিরেকে অন্ন গ্রহণ করেন তিনি তস্কর রূপে পরিগণিত হবেন। এরকম করলে দেশে শিক্ষকের অভাব হবে না এবং তাঁদের মর্যাদাও লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাবে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সংসাধন করতে পারলে প্রতিটি শিক্ষক আজই এই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

নবজীবন, ১০-৮-১৯২৪

শিক্ষকদের ভূমিকা

আমি গুরুভক্তিতে বিশ্বাসী। তবে প্রত্যেক শিক্ষকের গুরু হবার ক্ষমতা নেই। এই অর্থে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এর জন্ম। যাই হোক, ব্যাপারটা কৃত্রিম নয় অথবা কোন বাহ্য চাপ দ্বারা এটা সৃষ্টি করা যায় না। ভারতবর্ষে এখনও এরকম শিক্ষক আছেন। (এখানে নিশ্চয় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই যে আমি আধ্যাত্মিক

শিক্ষকদের কথা বলছি না যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মোক্ষের পথে চালনা করেন) এজাতীয় শিক্ষকরা তোষামোদের ধার ধারেন না। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রদের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন এবং নিজের ছাত্রদেরও তাঁরা স্বভাবতই ভালবাসেন। এই অবস্থায় শিক্ষক সর্বদাই জ্ঞানদানে প্রস্তুত এবং ছাত্রও অনুরূপ ভাবে গ্রহণ করার জন্য তৈরী। সাধারণ বিষয় আমরা যে কোন লোকের কাছ থেকে শিখতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ কোন ছুতার মিস্ত্রি, যার সঙ্গে আমার কোন রকম সাযুজ্য নেই এবং যার হয়ত বহুবিধ দোষ-ত্রুটি আছে, তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। কোন দোকানদারের কাছ থেকে আমি যেমন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনি, ঐ ছুতার মিস্ত্রিটির কাছ থেকেও আমি তেমনি আমার দরকারী জ্ঞানটুকু কিনে নিই। অবশ্য এখানেও এক ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন। যে ছুতার মিস্ত্রির কাছ থেকে আমি সূত্রধর-বিদ্যা শিখতে চাই, এই বিদ্যায় তার জ্ঞান সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস থাকা দরকার। এই বিশ্বাস আমার না থাকলে আমি যে কিছুই শিখতে পারব না একথা স্পষ্ট। কিন্তু শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা এক ভিন্ন জিনিস। শিক্ষার লক্ষ্য যেখানে চরিত্রগঠন সেখানে এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অপরিহার্য। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব না থাকলে চরিত্রগঠন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

পাঠ্যপুস্তক যতই ভাল হোক না কেন আমার মতে তবুও ভাল শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে। কেবল দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলির সারমর্ম বলে দিয়ে অথবা দুরূহ বাক্যসমূহের অর্থ করে দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। প্রয়োজন বুঝলেই তিনি পাঠ্যপুস্তক একদিকে রেখে দিয়ে ভাল চিত্রকরের মত পড়ানোর বিষয়কে ছাত্রের কাছে জীবন্ত করে তুলবেন। ভাল পাঠ্যপুস্তক বড় বেশী হলে ভাল ফটোগ্রাফের মত। কিন্তু একেবারে উচ্চকোটির না হওয়া সত্ত্বেও যেমন চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবি সেরা ফটোগ্রাফের চেয়েও ভাল, তেমনি ভাল শিক্ষক সেরা পাঠ্যপুস্তকসমূহের চেয়েও মূল্যবান। ভাল শিক্ষক ছাত্রকে বিষয়ের মর্মমূলে নিয়ে যান, অধিতব্য বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করতে এবং ছাত্রকে স্বয়ং বুদ্ধিপূর্বক তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কখনও আমরা এই বহুল প্রচারিত ধারণা স্বীকার করে নেব না যে যিনি দীর্ঘ অনুচ্ছেদসমূহের সারমর্ম বলতে পারেন অথবা দুরূহ বাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনিই শিক্ষক। আমাদের প্রচেষ্টা হবে এমন সব ভাল শিক্ষক তৈরী করা যাঁদের লক্ষ্য কেবল

নিজ নিজ বিষয়ের একটু একটু তথ্য ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা নয়, তাঁদের লক্ষ্য হবে সেবার মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শ। বিরল সংখ্যাতে হলেও এরকম শিক্ষক যে একেবারে নেই—সেকথা বলা চলে না।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮

শাস্তিদান প্রসঙ্গে

বিনয় মন্দিরের (জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়) জনৈক শিক্ষক প্রশ্ন করেছেন :

১. বিদ্যালয়ের বিশেষ করে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চূড়ান্ত শাস্তি দেবার কি কোন যৌক্তিকতা আছে ?

২. কোন কোন শিক্ষক বলেন : "পড়াশুনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছেলেদের শাস্তি না দিতে পারি। কিন্তু ছেলেরা বদমায়েশী অথবা নৈতিক অপরাধ করলে তাদের শাস্তি দেওয়ায় কোন দোষ নেই।" এ অভিমত কি যথার্থ ?

৩. কোন কোন বন্ধু বলেন যে কখনও কখনও তাঁরা ছেলেদের ভালর জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে শাস্তি দেবার পর তাঁরা এর জন্য দুঃখ বোধ করেন। সুতরাং তাঁদের মতে এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের কোন দোষ হয় না। যেসব শিক্ষক ছাত্রদের সাজা দেবার পর এই জাতীয় কৈফিয়ত দেন তাঁদের কি আমরা ক্ষমা করতে পারি ?

৪. প্রহার ছাড়া আর কোন্ ধরনের শাস্তি জাতীয় বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ?

৫. কোন্ ধরনের শাস্তি দিলে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক অহিংসার শপথ ভঙ্গ করছেন বলা হবে ?

আমার অভিমত হল এই যে ছাত্রদের যে কোন ধরনের শাস্তি দেওয়াই অন্যায়। শিক্ষকদের মনে ছাত্রদের সম্বন্ধে যে ভালবাসার ভাব ও গর্ববোধ থাকা উচিত শাস্তিদানের ফলে তা হ্রাস পায়। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রাচীন কালে যে শাস্তিদান প্রথা ছিল, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে তা দ্রুত অদৃশ্য হচ্ছে। আমি জানি যে সময় সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন সবচেয়ে ভাল শিক্ষকও দুষ্কৃতিকারী ছাত্রকে শাস্তি না দিয়ে পারেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এজাতীয় ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং যাই হোক না কেন, ব্যাপারটিকে সমর্থন করা যায় না।

কোন শিক্ষক যদি শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে যে নিজ বৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর ঐ পরিমাণ ত্রুটি আছে। স্পেন্‌সার-এর মত শিক্ষাবিদ্‌ সর্বদা নিজ অভিমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকতে না পারলেও সকল প্রকারের শাস্তিদান প্রথাকে অন্যায় বলে মনে করতেন।

উপরিউক্ত উত্তর দেবার পর আমার মনে হয় যে অপর প্রশ্নগুলির পর্যালোচনা নিরর্থক।

সাধারণতঃ অহিংসা ও শাস্তিদান প্রথা একসঙ্গে চলতে পারে না। তবে আমি এমন সব পরিস্থিতির কথা কল্পনা করতে পারি শাস্তিদান যখন শাস্তিদান হয় না। তবে সে সব উদাহরণ শিক্ষকদের কাজে লাগবে না। উদাহরণ স্বরূপ কোন পিতা যদি তাঁর পুত্রের অসদাচরণের জন্য খুব দুঃখিত হন এবং সেই দুঃখ বরদাস্ত করতে না পেরে ছেলেকে প্রহার করেন তাহলে তাঁর সেই প্রহারকে অক্লেশে ভালবাসার শাস্তি বলা যেতে পারে। ছেলেটিও পিতার এরূপ আচরণকে হিংসা বলে মনে করবে না। সময় সময় বিকারগ্রস্ত রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে রোগীকে আয়ত্তে রাখার জন্য চপেটাঘাত করতে হয়। একেও হিংসা বলা যায় না, এ হল অহিংসা। তবে শিক্ষকদের কাছে এসব উদাহরণের অর্থ নেই। তাঁরা ছাত্রদের শৃঙ্খলাধীনে আনার কলা আয়ত্ত করবেন এবং শাস্তি না দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে শিখবেন। এমন অনেক শিক্ষকের উদাহরণ আছে যাঁরা জীবনে কখনও শাস্তি দেন নি। প্রহার ছাড়া শাস্তিদানের অপরাপর পদ্ধতি হল : ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রাখা, তাদের উঠবস করানো, তাদের গালিগালাজ করা ইত্যাদি। আমার মতে শিক্ষক এর কোন শাস্তিই ছাত্রের উপর প্রয়োগ করবেন না।

ছাত্রদের উন্নতিবিধানের জন্য প্রথমে তাদের শাস্তি দেওয়া ও তারপর দুঃখিত হওয়াকে যথার্থ অনুতাপ বলা চলে না। তাছাড়া শিক্ষকেরা যদি এই প্রথা অবলম্বন করেন এবং এতদানুযায়ী আচরণ করেন তাহলে শেষ অবধি সমাজের সর্বসাধারণের কাছে এটা আচরণবিধির মর্যাদা পাবে। শাস্তিদান প্রথার কারণ আমরা এই অলীক বিশ্বাসের পরবশ হয়েছি যে হিংসাপ্রয়োগে কারও উন্নতি-বিধান করা যায়। আমার মতে যে শিক্ষক স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ছাত্রদের শাস্তি দেন তিনি তাঁর অহিংস আচরণের শপথ ভঙ্গ করেন।

নবজীবন, ২১-১০-১৯২৮

॥ পনের ॥

ছাত্রসমাজ

ছাত্রদেব ধর্ম

ছাত্রদের ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে আজ আমাকে বলতে হবে। ধর্ম যতটা সহজ ততটাই আবার কঠিন। হিন্দুমতে ছাত্র হচ্ছে ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রাবস্থা ব্রহ্মচর্যা-শ্রম। কৌমার্য-ব্রত পালন করা ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ। এর মূল অর্থ হচ্ছে ছাত্রাবস্থা বা ছাত্রের জীবন। তার মানে হল ইন্দ্রিয়-সংযম। সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সমগ্র অধ্যয়নকালে জ্ঞানার্জন করার নামই ব্রহ্মচর্য। জীবনে এইভাগে প্রতিগ্রহের পরিমাণ বেশী, দান অল্প। এ সময় আমরা মূলতঃ গ্রহীতা। পিতামাতা, অধ্যাপকবর্গ এবং এই বিশ্বের কাছ থেকে যা পাই গ্রহণ করি। কিন্তু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এখনই যদি প্রতিদানের দায়িত্ব না থাকে, (আর তা নেইও) তাহলে স্বভাবতই ভবিষ্যতে সময় এলে এ ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। এই কারণেই হিন্দুরা ধর্মীয় কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করেন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন সমঅর্থসূচক। ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচারী হতে হলে সন্ন্যাসী হতেই হবে। সন্ন্যাসীর কাছে এটা অভিরুচির প্রশ্ন। হিন্দুধর্মের চতুর্বিধ আশ্রমের আজ আর সে পবিত্র মর্যাদা নেই। থাকলে, এর শুধু আজ নামটুকুই আছে। অঙ্কুরেই ছাত্র-ব্রহ্মচারীর জীবনকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। সেই প্রাচীন আশ্রম-প্রথার আজ অবশ্য এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীদের সামনে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরা যেতে পারে। তথাপি সে যুগে যে মূল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আশ্রমব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এ যুগে ছাত্রদের কর্তব্য জানার উপায় কি ? আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। ছাত্রদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার নেতৃত্ব নেন পিতামাতা। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সামনে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের পথ খুলে দেওয়া। এইভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যভিচার চলছে এবং বৃথাই আমরা ছাত্রজীবনের শান্তি, সারল্য ও মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। যে সময় আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের কোন কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কথা নয়, সে সময় চিন্তা-ভাবনার ভারে তাদের ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। অধ্যয়নকাল তাদের কাছে শুধু গ্রহণ ও অধীত বিষয় নিজের করে নেবার সময়। তারা এ

সময় শুধু গ্রহণীয় আর বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখবে। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রকে এই ভাবে পার্থক্য করতে শেখানো। নির্বিচারে আমরা যদি সব গ্রহণ করে চলি তাহলে আমরা যন্ত্রের চেয়ে উঁচুদরের কিছু হব না। আমরা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান জীব। সেই জন্য এই সময়ে সত্য ও অসত্য, মিষ্ট ও রূঢ় ভাষা, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিস ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখব। কিন্তু ছাত্রদের চলার পথ আজকে শুধু ভালমন্দ বিচার করার চেয়ে অনেক কঠিন দায়িত্বে পূর্ণ। আজকের ছাত্রদের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ঋষি-গুরুর আশ্রমের পূত পরিবেশের পরিবর্তে আজ তারা শতধাবিচ্ছিন্ন গৃহ ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিসঞ্জাত কৃত্রিম পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঋষিরা বই ছাড়াই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঋষিরা ছাত্রদের কয়েকটি মন্ত্র দিতেন এবং ছাত্ররা সেগুলিকে বহু মূল্যবান জ্ঞানে অন্তরে ধারণ করে বাস্তব জীবনে তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করতো। আজকের ছাত্রদের এত বিপুল সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে থাকতে হয় যে সেগুলি তার শ্বাসরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের কালে ছাত্রমহলে "রেনল্ডসের" লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল; কিন্তু আমি ভাল ছেলের ধার ঘেঁষেও না যাওয়ায় স্কুলপাঠ্য বইএর বাইরে তাকাই নি। তবে ইংলণ্ডে গিয়ে দেখলাম যে ভদ্রসমাজে এসব উপন্যাস অস্পৃশ্য এবং ওসব না পড়ে আমার কোন লোকসান হয় নি। এইরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে যা ছাত্ররা অক্লেশে বাতিল করতে পারে। এই জাতীয় একটি ব্যাপার হচ্ছে নিজ ভবিষ্যৎ গড়ার অশোভন ব্যগ্রতা। এ সম্বন্ধে ভাববে গৃহস্থ। ব্রহ্মচারী ছাত্রের ধর্ম এ নয়। তাকে নিজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, সামনে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তার ব্যাপকতা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে অবহিত হতে হবে। আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্র পড়েন। এ অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করতে বলা আমার উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তবে স্বল্পকালীন গুরুত্বের সব কিছু আপনারা না পড়েন সে কথা আমি আপনাদের বলব এবং আমার মনে হয় সংবাদপত্রে স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু থাকে না। চরিত্র গঠনের উপাদান এতে কিছুই পাওয়া যায় না। তবুও সংবাদপত্রের জন্য দেশবাসীর উন্মত্ততার বিষয়ে আমি জানি। এ এক করুণ আতঙ্কজনক অবস্থা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-১৯২৫

ছাত্রসমাজ ও বিজ্ঞান

আমেরিকায় পাঠরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জনৈক ছাত্র লিখেছেন :—

"ভারতের দারিদ্র্য অপনোদনের জন্য ভারতের সম্পদাবলী নিয়োগের কথা যাঁরা ভাবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন। এদেশে এই ছয় বৎসর হল এসেছি। উদ্ভিদ্-রসায়ন নিয়ে আমি চর্চা করছি। ভারতের শিল্পোন্নতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এইরকম গভীরভাবে বিশ্বাস না করলে আমি হয়তো সরকারী চাকরি নিতাম, আর নয় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করতাম।··· কাগজের মণ্ড বা কাগজ উৎপাদনের মত শিল্পে আমার যোগদান করা কি আপনি সমর্থন করেন? ভারতের জন্য একটি সুবিবেচনাপ্রসূত মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার কি অভিমত? আপনি কি বৈজ্ঞানিক প্রগতি চান? বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলতে আমি অবশ্য ফ্রান্সের ডাঃ পাস্তুর, টেরিয়োণ্টোর ডাঃ বেন্টিং-এর গবেষণার মত মানব-কল্যাণকর আবিষ্কার বুঝি।"

সব জায়গার ছাত্রদের কাছ থেকে আমার কাছে এত প্রশ্ন আসে এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার অভিমত সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা আছে যে এই প্রশ্নটির প্রকাশ্য উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন বোধ করছি। ছাত্রটি যে ধরনের শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবছেন তাতে আমার কোন রকম আপত্তি নেই। তবে এর জন্যই একে আমি মানবতাপূর্ণ বলব না। আমার কাছে ভারতের পক্ষে মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হচ্ছে হাতে সুতা কাটার গৌরবজনক পুনরভ্যুত্থান। কারণ শুধু এর দ্বারাই যে দারিদ্র্য এদেশের কোটি কোটি পর্ণকুটিরের অধিবাসীর জীবনকে কীটদষ্ট ফুলের মত নষ্ট করছে, অবিলম্বে তা দূর হতে পারে। দেশের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর সব এর পরে করা যেতে পারে। সুতরাং নিজের চরখাকে ভারতের কুটিরসমূহের পক্ষে উৎপাদনের অধিকতর কার্যকুশল যন্ত্রে পরিণত করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি যুবক স্বীয় প্রতিভা নিয়োগ করুন এই আমি চাই। আমি বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে নই। পক্ষান্তরে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আমার প্রশস্তিবাচন যদি কোথাও সীমিত হয়ে থাকে তবে তার কারণ হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথা আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। তথাকথিত বিজ্ঞান

ও মানবতার নামে নিরীহ জীবহত্যা করাকে আমি ক্ষমার অযোগ্য মনে করি এবং এর প্রতি বিরাগ পোষণ করি। নিরপরাধের রক্তরঞ্জিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আমি অহেতুক বিবেচনা করি। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ছাড়া যদি রক্ত-সঞ্চালন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন সম্ভব না হয়, তবে এমন জ্ঞান ছাড়াই মানুষের চলবে। আমার মনে হয় সেদিন দূরে নয়, যেদিন ইউরোপের সৎ বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞানার্জনের বর্তমান উপায়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। মানবতার ভবিষ্যৎ মূল্যমান শুধু মানব সম্প্রদায়ের কথাই ভাববে না, ভবিষ্যতে সকল জীবের কথাই বিবেচনা করা হবে। আজ যেমন আমরা ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবেই একথা উপলব্ধি করছি যে আমাদের এক-পঞ্চমাংশকে নরকসদৃশ অবস্থায় ফেলে রেখে হিন্দুত্বের বিকাশ অসম্ভব, অথবা প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকার জাতি-সমূহকে শোষণ ও হতমান করে যেমন পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সমৃদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তেমনি সময়কালে আমরা বুঝতে পারব যে সৃষ্টির নিম্নস্তরের জীবের চেয়ে আমরা উচ্চ পর্যায়েরব বলে তাদেব হত্যা করাতে আমাদের মহত্ত্ব নেই। বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেব মঙ্গলবিধানই আমাদের উচ্চতার নিদর্শন। কারণ এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে আমারই মত তাদেরও আত্মা বিদ্যমান।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১২-১৯২৫

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-মন্দিরেব অভিভাষণ

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি (গান্ধীজী) বললেন, "কোথায় যে এসেছি একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমার মত যে গ্রামবাসী এসব দেখে ভীতিজড়িত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে পড়ে, তার এখানে স্থান নেই। বেশী কিছু বলার অবস্থা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে এখানকার এই সব বিরাট বিরাট গবেষণাগার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে লক্ষ লক্ষ জনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে। কারণ টাটার ত্রিশ লক্ষ টাকা বাইরে থেকে আসে নি, আর মহীশূর রাজের দানের উৎসও বেগার-প্রথা ছাড়া আর কি? যেসব অট্টালিকা ও যন্ত্রপাতি কোনকালেই গ্রামবাসীদের উপকারে আসবে না, হয়ত ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাজে লাগবে, তার জন্য কিভাবে আমরা তাদের অর্থের সদ্ব্যয় করছি একথা যদি আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝাতে যাই, তাহলে তারা তা বুঝতেই পারবে না।

এসব কথায় তারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করবে না। আমরা কিন্তু তাদের আস্থা অর্জনের কোন চেষ্টাই করি না এবং এসব সুবিধা পাওয়া স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করি। আমরা ভুলে যাই যে 'প্রতিনিধিত্বের অধিকার না দিলে কর দেব না'—এই নীতি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতি প্রয়োগ করেন এবং তাদের টাকাপয়সার হিসাব-কিতাব তাদের কাছে দাখিল করার দায়িত্ব যদি বোধ করেন তবে দেখতে পাবেন যে এই সব গবেষক নিয়োগের অন্য আর একটি দিক আছে। তখন আপনারা নিজ হৃদয়ে এদের জন্য সংকীর্ণ স্থান নয়, অনেকখানি জায়গা আছে দেখতে পাবেন। হৃদয়ের এই বিস্তীর্ণ স্থানটুকুব যদি আপনারা উচিতমত হেফাজত করেন, তাহলে যেসব লক্ষ লক্ষ জনগণের মেহনতেব উপর আপনাদের শিক্ষা নির্ভরশীল, তাদের মঙ্গলের জন্য আপনারা আপনাদের জ্ঞান নিয়োগ করবেন। আপনারা আমাকে যে টাকার থলি দিয়েছেন তা আমি দরিদ্রনারায়ণের কাজে নিয়োগ করব। সত্যকার দরিদ্রনারায়ণকে আমি চোখে দেখি নি, শুধু তার কল্পনা করে নিয়েছি। সুদূর যোগাযোগবিহীন গ্রামের নিভৃত পল্লীর অধিবাসী যেসব কাটুনী এই অর্থ পাবেন, তাঁরাও সত্যকার দরিদ্রনারায়ণ নন। আপনাদের অধ্যাপকদের কাছে শুনেছি যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণ সন্ধান করতে একাধিক বৎসরের গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সব গ্রামবাসীর সন্ধান করবে কে? আপনাদের গবেষণাগারে কোন কোন গবেষণা-কার্য যেমন চব্বিশ ঘণ্টাই চলে, তেমনি আপনাদের হৃদয়ের সুবিস্তীর্ণ অংশ যেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির হিতকামনায় সদাই উষ্ণ থাকে।

"পথেঘাটে বিচরণশীল সাধারণ মানুষের তুলনায় আপনাদের কাছে আমি অনেক বেশী আশা করি। যেটুকু আপনাবা করেছেন, তাতে তৃপ্তি বোধ করে একথা বলবেন না, 'আমরা যা পেরেছি, করেছি। এবার টেনিস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলা যাক।' আমি বলব যে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে আর টেনিসের ময়দানে আপনাদের নামে প্রতি দিন যে বিরাট ঋণের অঙ্ক চাপছে তার কথা স্মরণ করুন। তবে ভিক্ষার চাল আবার কাড়া-আকাড়া কি? আপনারা আমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে প্রার্থনা আমি জানালাম তার কথা ভেবে দেখবেন এবং তাকে কার্যান্বিত করার চেষ্টা করবেন। দরিদ্র রমণীরা আপনাদের জন্য যে বস্ত্র উৎপাদন করেন তা পরতে শঙ্কিত হবেন না এবং খাদি পরিধান করার জন্য আপনাদের নিয়োগকর্তা যদি সিধা দরজা দেখিয়ে

দেন তাতে ভয় পাবেন না। আমি চাই যে আপনারা মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজ বিশ্বাসের বলে অকম্পিত পদে দাঁড়ান। মূক জনগণের জন্য আপনাদের মনে যে উদ্যম আছে তা যেন অর্থের সন্ধানে নিষ্প্রভ না হয়। আমি বলছি যে জড়জগতে সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের গবেষণা বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ (আভ্যন্তরীণ গবেষণা ছাড়া সব গবেষণাই তো নিষ্ফল) গবেষণার ফলে আপনারা এমন বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার করতে পারেন যা লক্ষ লক্ষ জনগণের হৃদয়ের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করবে। আপনাদের সকল আবিষ্কারের লক্ষ্য যদি দরিদ্রদের মঙ্গলসাধন না হয়, তাহলে রাজাগোপালাচারী ঠাট্টা করে যেকথা বলেছেন তাই সত্য হবে—আপনাদের এসব কর্মশালা শয়তানের কারখানার চেয়ে ভাল হবে না।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-১৯২৭

ব্যক্তিগত শুচিতার সপক্ষে

একটু পূর্বেই ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রদের আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করে বলব যে, সত্য ও শুচিতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে আপনাদের শিক্ষা একেবারে মূল্যহীন। আপনারা ছেলের দল যদি ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি না দেন এবং আপনাদের চিন্তায়, বচনে ও কর্মে যদি শুচিতার পরশ না লাগে, তাহলে পাণ্ডিত্যের আকর হলেও আপনারা শেষ হয়ে গেছেন বলতে হবে।

একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। শুচিতার প্রথম সোপান হচ্ছে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। তবে একথাও ঠিক যে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহারে মনের কথা বেরিয়ে আসেই। যে ছেলেটি নিজের মুখ পবিত্র রাখতে চায় তার কু-কথা উচ্চারণ করা চলবে না। কথাটা অবশ্য অতীব প্রাঞ্জল। এতদ্ব্যতিরেকে এমন কোন জিনিস সে মুখে দেবে না, যা কিনা তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনকে ধূম্রাচ্ছন্ন করতে পারে এবং যা তার বন্ধুদের ক্ষতি করবে।

আমি জানি যে অনেক ছেলে ধূমপান করেন। ধূমপানের এই বদভ্যাসের কথা বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সর্বত্র ছেলেদের অবনতি হচ্ছে। তবে সিংহলের আপনারা বোধ হয় এদিক দিয়ে ব্রহ্মদেশের ছেলেদেরই মত খারাপ। আর আপনারা জানেন যে পার্শীদের অগ্নি-উপাসক বলা হয়।

ভগবানকে তাঁরা অগ্নির দেবাদিদেব সূর্যরূপী মহান্ পাবকের মাধ্যমে দেখলে কি হবে, তাঁরা আপনাদের চেয়ে বড় অগ্নিপূজক নন।

(উপস্থিত পার্শী ছাত্রদের লক্ষ্য করে) আপনারা অনেকে আদৌ ধূমপান করেন না এবং আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ছেলে থাকলে আপনাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা হবে যাতে তাঁরা ধূম্রজালে মুখমণ্ডল কলঙ্কিত না করেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ধূমপান করেন, তবে অতঃপর এ বদভ্যাস পরিহার করবেন। ধূমপানে শ্বাসপ্রশ্বাস কলুষিত হয়। অভ্যাসটি বিরক্তিকরও বটে। রেলের কামরায় উপবেশকালীন ধূমপায়ী এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না যে গাড়ীতে অন্য যেসব ধূমপানে অনভ্যস্ত মহিলা বা পুরুষ রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে তাঁর মুখনিসৃত দুর্গন্ধ বিরক্তির কারণ হয়।

দূর থেকে সিগারেট জিনিসটিকে ছোট্ট মনে হতে পারে। কিন্তু এর ধোঁয়া যখন মুখের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসে, তখন সে হয়ে ওঠে বিষ। ধূমপায়ীদের খেয়াল থাকে না যে তাঁরা কোথায় থুথু ফেলছেন। অতঃপর গান্ধীজী টলস্টয় লিখিত একটি গল্পের উল্লেখ করলেন, যাতে দেখানো হয়েছে যে তাম্রকূট সেবনের প্রতিক্রিয়া মদ্যপানের চেয়েও মারাত্মক এবং তারপর বললেন :

ধূমপানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয় এবং অভ্যাসটিও খারাপ। আপনারা যদি কোন ভাল চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন তবে শুনবেন যে বহুক্ষেত্রে এই ধোঁয়া হচ্ছে কর্কট রোগের কারণ বা অন্ততঃ এ রোগের মূলে আছে তামাকের ধোঁয়া।

যখন এর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না, তখন ধূমপান করাই বা কেন? এ তো খাদ্য নয়। সিগারেট ধরার সময় পরের শোনা কথায় যেটুকু আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল, তাছাড়া তো আর কোন আনন্দ নেই এতে।

আপনারা যুবকের দল যদি ভাল হন, আপনারা যদি আপনাদের শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবদের অনুগত হন, তাহলে ধূমপানের অভ্যাস বর্জন করুন এবং এর দ্বারা যেটুকু অর্থ বাঁচাবেন তা আমাকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সহায়তার্থ পাঠিয়ে দিন।

সিংহলে গান্ধীজী, ১৮-১১-১৯২৮

ছাত্রীদের কর্তব্য

আজকের দিনটিকে আপনারা নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে পালন করবেন এবং খাদি-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ-মানসে এদিন চেষ্টা করবেন—আপনাদের এই সংকল্প আমার হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে অনুরণন সৃষ্টি করেছে। আমি জানি আপনারা লঘুভাবে এ শপথ গ্রহণ করেন নি, ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা এ সংকল্প পূর্ণ করবেন। যে দৈন্যপীড়িত জনগণের প্রতিভূরূপে আমি সফর করে বেড়াচ্ছি, তাঁরা যদি তাঁদের ভগ্নীদের এই সংকল্পের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন, তবে আমি জানি যে এতে তাঁদের বুক ফুলে উঠত। আপনারা কিন্তু আমার কাছে একথা শুনে দুঃখিত হবেন যে, যাঁদের জন্য আপনারা এবং আপনাদের মত আরও অনেকে সিংহলে আমাকে এই টাকার তোড়া দিলেন, আমি বোঝাতে চেষ্টা করলেও তাঁরা এর বিন্দুবিসর্গ বুঝবেন না। তাঁদের শোচনীয় জীবন সম্বন্ধে আমি যত বর্ণনাই করি না কেন, আপনারা হয়ত কিছুতেই সে অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এ থেকে স্বতঃই এই প্রশ্নটি জাগে—এই সব এবং এই জাতীয় লোকদের জন্য আপনাদের কি করা উচিত? আর একটু অনাড়ম্বর হওয়া বা জীবনের আর একটু কৃচ্ছ্রতা আনয়ন করা ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাতে প্রশ্নটির মূল স্পর্শ করা হবে না। এ সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আমি চরখার কথায় উপনীত হয়েছি। আপনাদের আজ যে কথা বলছি সেই কথাই নিজের মনে মনে আমি বললাম—এই বুভুক্ষু জনসাধারণের সঙ্গে কোন জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে আপনাদের, তাদের এবং সমগ্র জগতের পক্ষে একটা আশাস্থল দেখা যাবে।

আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং থাকা উচিত। এখানে একটি মনোরম দেব-দেউলও আছে। আপনাদের কর্মসূচীতে দেখছি যে আপনাদের দিনের কাজ শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এ সবই ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সে প্রার্থনা যদি কোন নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তব কর্মে প্রকট না হয়, তবে এর শুধু এক প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা আছে। প্রার্থনার এই ধারা অনুসরণ করার জন্যই আমি বলি যে চরখা ধরুন, আধঘণ্টা সুতা কাটুন এবং যেসব জনগণের কথা আমি আপনাদের বলছি তাদের কথা ভাবুন। এর পর মনে ঈশ্বর স্মরণ করে বলুন, "আমি এই জনগণের জন্য সুতা কাটছি।" হৃদয় মন দিয়ে আপনারা যদি এ কাজ করেন, আপনাদের মনে যদি এই ভাবনা থাকে যে, সেই খাঁটি উপাসনা-কার্যের আপনারা আদর্শ দীন এবং

সম্পন্ন পাত্র, আপনাদের পরিচ্ছদ পরিধানের কারণ যদি সাজগোজ করা না হয়ে দেহাচ্ছাদন হয়, তাহলে খাদি পরতে এবং নিজেদের সঙ্গে জনগণের সেই যোগসূত্র স্থাপন করতে আপনাদের মনে কোনরকম ইতস্ততঃ ভাব আসার কথা নয়।

আপনাদের পত্রিকায় দেখলাম ঈষৎ গর্ব সহকারে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রীর কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। অমুক অমুক বিবাহ করেছে—এই মর্মে চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তিও দেখলাম। পঁচিশ বা এমন কি বাইশ বছরের মেয়েদের বিবাহ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু এই সব বিজ্ঞপ্তিতে আমার এমন একটি নামও চোখে পড়ল না যিনি জনসেবার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সুতরাং বাঙ্গালোরের মহারাজ কলেজের মেয়েদের আমি যা বলেছিলাম তার পুনরুক্তি করে বলব যে এই সব প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ছাড়লেই আপনারা যদি স্রেফ পুতুলটি হয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হন, তাহলে বলতে হবে যে শিক্ষাবিদ্‌রা যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন এবং দানবীরেরা দানের যে ধারা বইয়ে দিচ্ছেন, তার বিনিময়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদান মিলছে না।

স্কুল-কলেজ থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র অধিকাংশ মেয়ে প্রকাশ্য জনসেবামূলক জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীর দল, আপনাদের এমন করলে চলবে না। আপনাদের সামনে কুমারী এমারীর উদাহরণ রয়েছে এবং এছাড়া আমার মনে হয় এখনকার কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক অবিবাহিতা মহিলাও রয়েছেন।

প্রত্যেক মেয়ে, প্রতিটি ভারতীয় মেয়েকে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা নয়। এমন অনেক মেয়ে আমি দেখাতে পারি যাঁরা একজন মাত্র লোকের সেবা না করে নিজেদের সকলের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন। হিন্দু মেয়েদের সীতা বা পার্বতীর নবীন এমন কি অধিকতর গৌরবমণ্ডিত সংস্করণ সৃষ্টি করার দিন এসে গেছে।

আপনারা নিজেদের শৈব বলেন। পার্বতী যে কি করেছিলেন, তা আপনারা জানেন? স্বামীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নি বা নিজেকে তিনি বিক্রয়োপযোগী পণ্যে পরিণত হতে দেন নি। আজ কিন্তু তিনি সপ্তসতীর অন্যতমারূপে পরিগণিত হয়ে হিন্দুকুল-চূড়ামণি রূপে শোভিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জোরে নয়, এ গৌরব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অশ্রুতপূর্ব তপস্যার বলে।

আমার মনে হয় এখানে সেই ঘৃণ্য পণপ্রথা বিদ্যমান এবং এর জন্য তরুণীদের

উপযুক্ত জীবনসঙ্গী পাওয়া অতীব দুষ্কর হয়ে পড়ে। আপনাদের মধ্যে অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে এই জাতীয় প্রলোভনের প্রতিরোধ করা। এই কু-প্রথার প্রতিরোধ করতে গেলে আপনাদের মধ্যে অনেককে আজীবন এবং অনেককে বেশ কয়েক বৎসর কুমারী থেকে যেতে হবে। তারপর যখন আপনাদের বিবাহকাল সমাগত হবে এবং আপনারা যখন মনে করবেন যে এবার একজন জীবনসঙ্গী প্রয়োজন, তখন আপনারা এমন কাউকে খুঁজবেন না, যাঁর ধন যশ বা দেহসৌষ্ঠব আছে। পার্বতীর মতই আপনারা এমন লোকের সন্ধান করবেন, যাঁর মধ্যে সৎচরিত্র গঠনের উপযোগী গুণাবলী বিদ্যমান। নারদ যে পার্বতীর কাছে মহাদেবের কিরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা আপনারা জানেন—"গায়ে ছাইমাখা ভিখারী, রূপের কোন বালাই নেই, তায় আবার ব্রহ্মচারী।" পার্বতী এর জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, তিনিই আমার পতি।" আপনাদের ভিতর কেউ কেউ তপস্যা করতে মনস্থ না করলে একাধিক শিবের সৃষ্টি হবে না। অবশ্য পার্বতীর মত আপনাদের সহস্র বৎসর তপস্যা করতে হবে না। আমাদের মত ক্ষীণজীবী মানবের পক্ষে অতটা সম্ভবপর হবে না। তবে আপনাদের একটা জীবন আপনারা এই তপস্যা চালিয়ে যেতে পারেন।

পূর্বোক্ত শর্তগুলি স্বীকার করলে আপনারা পুতুলের দেশে নিরুদ্দেশ হতে অস্বীকার করবেন। আপনারা তখন পার্বতী দময়ন্তী সীতা এবং সাবিত্রীর মত সতী হতে চাইবেন। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতে তখনই আপনাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসার অধিকার জন্মাবে।

ভগবান যেন আপনাদের এই আশায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন এবং আপনাদের মধ্যে প্রেরণা জাগলে তিনি যেন সে আশার পরিপূর্তির জন্য আপনাদের সহায়তা করেন।

সিংহলে গান্ধীজী, ২৯-১১-১৯২৭

স্বাবলম্বনই আত্মমর্যাদা

এই পত্রিকা মারফৎ অনেকবার এই রকম প্রস্তাব করা হয়েছে যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে, বা অন্ততঃ শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক প্রতিটি বালক-বালিকার কাছে সহজলভ্য করতে হলে আমাদের স্কুল-কলেজগুলিকে পূর্ণতঃ না হলেও অন্তত প্রায় তারই সমান স্বাবলম্বী করা উচিত। চাঁদা তুলে, সরকারী সাহায্য নিয়ে, ছাত্রদের বেতনে স্বাবলম্বী হলে চলবে না। ছাত্রদের স্বীয় উৎপাদন-মূলক কর্মের

দ্বারা স্বাবলম্বী হতে হবে। এ শুধু সম্ভব হবে শিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে। এসব কারণে কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা দেবার প্রয়োজন দৈনিক অধিকতর মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে, তা ছাড়াও শিক্ষাকে প্রত্যক্ষরূপে স্বাবলম্বী করার জন্য এদেশে শিল্পশিক্ষা দেবার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের ছাত্ররা যখন শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখবে এবং যখন শ্রমমূলক বৃত্তি না জানা অগৌরবজনক বলে বিবেচিত হবার প্রথা প্রবর্তিত হবে, তখনই এ সম্ভবপর হবে। আমেরিকা পৃথিবীর সব চেয়ে ধনাঢ্য দেশ এবং সেইজন্য সেখানে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন বোধ হয় সব চেয়ে কম। কিন্তু এই আমেরিকাতেও শিক্ষার পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় ছাত্রদের শ্রমে নির্বাহ-করা অতীব স্বাভাবিক ঘটনা। আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্র 'হিন্দুস্থানী স্টুডেণ্ট' বলছেন :

"আমেরিকার শতকরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে বা স্কুল-কলেজ খোলা থাকাকালীন কিছুটা সময়ে অর্থোপার্জন করেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে 'স্বাবলম্বী ছাত্রদের সম্মান করা হয়'। শিক্ষায়তন খোলা থাকার সময় নিজ অধ্যয়ন-নিষ্ঠার কোনরকম গুরুতর ক্ষতি না করেও যে কোন ছাত্র সপ্তাহে ১২ থেকে ২৫ ঘণ্টা বাইরের কাজ করতে পারেন। কলেজের ১২ থেকে ১৬টি পিরিয়ডের জন্য সপ্তাহে মোট ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ছাত্রদের নিম্নলিখিত বিষয়ে কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা চাই : সূত্রধরের কাজ, জরিপ করা, নক্শা তৈরী, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মোটর চালানো, ফটো তোলা, কলকব্জা-মেরামত, রন্ধন-বিদ্যা, কৃষিকর্ম, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আহার্য পরিবেশকের কাজ করা ইত্যাদি সাধারণ কাজ তো কলেজ খোলা থাকার সময়ে অনেকেই করেন। এতে ছাত্রদের নিজ ভোজন-ব্যয় নির্বাহে সুবিধা হয়। কোন আংশিক স্বাবলম্বী ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে কাজ করে ১৫০ থেকে ২০০ ডলার বাঁচাতে সমর্থ হন। কানসাস, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, পিটস্‌বার্গ ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়, এণ্টিওক কলেজ ইত্যাদি ইনডাস্‌ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কো-অপারেটিভ শিক্ষণ-ক্রমের ব্যবস্থা করেছেন এবং এর ফলে ছাত্ররা কোন কারখানায় কাজ করে এক বছরের শিক্ষণবেতন উপার্জন করতে পারেন। এতে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাও বাড়ে।

"মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় সিভিল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই জাতীয় কো-অপারেটিভ শিক্ষণক্রম প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করছেন। কো-অপারেটিভ শিক্ষণক্রম গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক হতে এক বছর বেশী লাগে।"

আমেরিকা যদি সে দেশের স্কুল-কলেজগুলিকে এমন ধাঁচে গড়ে তোলে যাতে ছাত্ররা শিক্ষণ-ব্যয় উপার্জন করতে পারে, তাহলে আমাদের স্কুল-কলেজে এটা আরও কত প্রয়োজনীয়। দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়তে দেবার ব্যবস্থা করে তাঁদের ভিখারী করে দেবার বদলে তাঁদের কাজ যোগাড় করে দেওয়া কি শ্রেয় নয়? জীবিকা বা শিক্ষণ-ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের হাতপায়ে খাটা অভদ্রতা—এই ভুল ধারণা ভারতীয় যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দেবার জন্য তাঁদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। নৈতিক এবং ভৌতিক—দ্বিবিধ অপকারই এতে হচ্ছে, বোধ হয় নৈতিক হানির পরিমাণই বেশী। যে কোন বিবেকবান ছেলের কাছে বিনা বেতনে পড়া সারা জীবন বোঝার মত মনে হয় এবং হওয়া উচিত। কেউ চায় না যে উত্তরকালে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হোক যে শিক্ষা পাবার জন্য তাঁকে দয়ার দানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন কি কেউ আছেন যিনি নিজ দেহ মন ও আত্মার শিক্ষার জন্য সূত্রধর বা ঐ জাতীয় কোন কাজ করার সৌভাগ্যের কথা ভবিষ্যৎ জীবনে সগৌরবে স্মরণ করবেন না?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৮-১৯২৮

উৎসব পালন

জনৈক পত্রলেখক আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে দেওয়ালী উৎসবোপলক্ষে যাঁরা বাজি, খারাপ মিষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর আলোকসজ্জার পিছনে বহু অর্থের অপচয় করার কথা ভাবছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। এ অনুরোধে আমি সোৎসাহে সাড়া দেব। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি এই দিনটিতে জনসাধারণকে দিয়ে নিজ গৃহ এবং অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করতাম এবং বালক-বালিকাদের জন্য নির্দোষ ও শিক্ষামূলক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতাম। আমি জানি যে বাজি পোড়ানোতে ছেলেপিলেরা আনন্দ পায়। তবে এর কারণ হচ্ছে এই যে তাদের পূর্বজ আমরা তাদের ভিতর বাজি পোড়ানোর অভ্যাস প্রবর্তন করেছি। বাজি সম্বন্ধে অজ্ঞ আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা বাজি চায় বা এতে আনন্দ পায় বলে আমি শুনি নি। এর বদলে

তাদের মধ্যে নাচের প্রথা আছে। নানারকমের লাফঝাঁপ করে খেলা করা ও বনভোজনের চেয়ে ছেলেমেয়েদের পক্ষে আর কি শ্রেয়তর ও স্বাস্থ্যকর হতে পারে? তবে এসব চড়ুইভাতিতে তারা এমন সব মিষ্টান্ন খাবে না যার উপকার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তারা খাবে শুকনা বা টাটকা ফলমূল। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বালক-বালিকাদের ঘর পরিষ্কার ও চুনকাম করা শেখানো যেতে পারে। শুরুতে যদি অন্ততঃ এ কাজ ছুটির দিনেও আরম্ভ হয়, তবুও এর ফলে তারা শ্রমের মর্যাদা কতকটা বুঝতে শিখবে। কিন্তু যে কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, এইভাবে বাজি এবং অন্যান্য খাতে যে টাকাটা বাঁচবে, তার পুরোটা না হলেও অন্ততঃ একাংশ খাদি-কার্য সম্প্রসারণের জন্য দান করা উচিত। আর খাদির ব্যাপারে যদি একেবারে দিব্যি দেওয়া থাকে, তাহলে এ অর্থ এমন কোন সৎকাজে দান করা যেতে পারে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিটি উপকৃত হতে পারে। উৎসবের দিনে দেশের দীনতম ব্যক্তিটিও সঙ্গে আছে—এই অনুভূতি হৃদয়ে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে হতে পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-১০-১৯২৮

যুবকদের জন্য

অনেক জায়গায় আজকাল বয়োবৃদ্ধদের সব কথা নিয়ে বিদ্রূপ করা যুবকদের কাছে একটা ফ্যাশানের মধ্যে গণ্য হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই না যে, এ বিশ্বাসের সপক্ষে একেবারে কোন কারণ নেই। তবে প্রবীণরা যাই বলুন, তাকে স্রেফ বৃদ্ধদের কথা বলেই লঘু করার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিতে চাই। সময় সময় শিশুর মুখে যেমন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বৃদ্ধদের কাছেও প্রজ্ঞার নিদর্শন মেলে। সেরা উপায় হচ্ছে, যাঁর কাছে যা কিছু শোনা যাক না কেন, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে তার বিচার করা। গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিষয়ের আমি পুনরালোচনা করতে চাই। প্রতিনিয়ত কানের কাছে এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, দেহের ক্ষুধার খোরাক জোগানো আইনসঙ্গত ঋণ পরিশোধ করার মতই পবিত্র দায়িত্ব এবং এ না করার শাস্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাপহ্নব। এ দেহের ক্ষুধার সঙ্গে বংশবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত নেই এবং গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের সমর্থকরা বলেন যে উভয়পক্ষের সম্মতি না থাকলে গর্ভসঞ্চাররূপী

দুর্ঘটনার প্রতিরোধ করতে হবে। আমার নম্র নিবেদন এই যে, যেখানেই প্রচার করা হোক না কেন, এ এক ভীষণ নীতি। বিশেষ করে ভারতের মত যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষরা সৃজন-ক্রিয়ার দুরুপযোগের ফলে প্রায় পুরুষত্বহীনের কোঠায় এসে পৌঁছেছেন, সেখানে এ আরও ভয়ঙ্কর। রীরংসা বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন যদি কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়, তাহলে কিছুদিন আগে আমি যেসব অস্বাভাবিক পাপের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেসব এবং লালসা-তৃপ্তির অন্তবিধ উপায়সমূহকেও কাম্য বলে স্বীকার করতে হয়। পাঠকদের জেনে রাখা উচিত যে এমন কি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিরাও তথাকথিত কামবিকারের সমর্থক। কথাটায় হয়তো অনেকে চমকে উঠবেন। তবে কোন না কোন রকমে একবার এসব যদি মর্যাদার ছাপ পায়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমলৈঙ্গিক রতিবাসনা তৃপ্তির রেওয়াজ চালু হবে। আমার কাছে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা আর বিচিত্র উপায়ে রমনেচ্ছায় নিবৃত্তিসাধন সমান জিনিস এবং এর ফল যে কি হয়, তা অনেকেরই জানা নাই। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের ভিতর এই গোপন পাপ কী বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তা আমি জানি। বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ও সমাজজীবনকে কলুষতামুক্ত করার কাজে ব্রতী সংস্কারকদের কাজ এখনকার মত প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। একথা আজ গোপন নয় যে, স্কুল-কলেজের ছাত্রী এমন সব অনেক বয়স্থা মেয়ে আছে, যাঁরা গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করেন ও এমন কি অনেকের কাছে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম থাকে। শুধু বিবাহিতাদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব। যখন স্বাভাবিক পরিণতি সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে শুধু পাশববৃত্তির তৃপ্তিসাধন করাই বিবাহের লক্ষ্য ও পরমার্থ জ্ঞান করা হয়, তখন বিবাহ তার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে।

আমার এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, যেসব ভদ্রমহোদয় ও মহিলা ধর্মীয় উন্মাদনায় আবিষ্ট হয়ে এর সপক্ষে প্রচার করছেন, তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণার অনুবর্তী যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণে অনিচ্ছুক রমণীদের তাঁরা বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছেন। অথচ তাঁদের এই কাজের ফলে দেশের যুবক-যুবতীদের মারাত্মক হানি হচ্ছে। যাঁরা সত্যসত্যই সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক, তাঁরা সহজে তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। আমাদের দেশের দরিদ্র রমণীদের পাশ্চাত্য

ললনাদের মত শিক্ষা-দীক্ষা নেই। এ প্রচার নিশ্চয় মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের জন্য হচ্ছে না। কারণ আর যাই হোক, দরিদ্র নারীদের মত তাঁদের এতে এতটা প্রয়োজন নেই।

তবে এই প্রচারে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এর ফলে প্রাচীন আদর্শ বাতিল করে তার জায়গায় এমন এক আদর্শ কায়েম করার ব্যবস্থা হচ্ছে, যা কার্যান্বিত হলে জাতির মানসিক ও দৈহিক অবলুপ্তি ঘটবে। পুরুষের দেহস্থিত সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের অপচয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্ররাজি যে সব আতঙ্ককর কথা বলছে, তা মোটেই অজ্ঞতা-প্রসূত কুসংস্কার নয়। যে গৃহস্থ তার সেরা বীজ উষর ভূমিতে বপন করে বা যে কৃষক তার উৎকৃষ্ট ক্ষেতে এমন ভাবে ভাল বীজ নিয়ে থাকে যে তা যেন অঙ্কুরিত না হয়, তাদের আর কি বলা যেতে পারে? ভগবান মানুষকে অতুলনীয় জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট বীজের অধিকারী করেছেন এবং নারীকে দিয়েছেন এমন ক্ষেত্র, সমগ্র ভূমণ্ডলে যার জুড়ি নেই। মানুষ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদের অপচয় করবে—এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত মূর্খতা। অতীব মূল্যবান হীরা-জহরতের চেয়েও সতর্কভাবে এর হেফাজত করা প্রয়োজন। এইভাবে যে নারী তার প্রাণদায়িনী ক্ষেত্রে জেনেশুনে নষ্ট হতে দেবার জন্য বীজ গ্রহণ করে, সেও অপরিসীম মূঢ়তার দোষে দোষী। এদের উভয়েই নিজ সম্পদের দুরুপযোগের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তাদের যা দেওয়া হয়েছিল, তা তারা হারাবে। রতিকামনা মহৎ ও সুন্দর এতে সন্দেহ নেই। এতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। কিন্তু শুধু সৃষ্টিতেই এর সার্থকতা। এছাড়া অন্য কোনভাবে এর প্রয়োগ ঈশ্বর ও মানবতার বিরুদ্ধে পাপস্বরূপ। কোন না কোন প্রকারের গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে সেকালে এর ব্যবহার পাপজনক বলে মনে করা হত। আমাদের যুগের কেরামতি হচ্ছে পাপকে পুণ্য বলে চালানো। গর্ভ-নিরোধক সাজ-সরঞ্জামের প্রচারকেরা ভারতের যুবকদের সব চেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন এই যে, আমি যাকে ভ্রান্ত আদর্শ মনে করি, তাঁরা তাঁদের মাথায় তা-ই ঢোকাচ্ছেন। যেসব যুবক-যুবতীর হাতে ভারতের ভাগ্য নির্ভরিত, তাঁরা যেন এই মেকী ভগবান সম্বন্ধে সতর্ক হন এবং ভগবান তাঁদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা যেন তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেন ও ইচ্ছা হলে যেজন্য এর সৃষ্টি সে কাজে ব্যবহার করেন।

হরিজন, ২৮-৩-১৯৩৬

যৌনশিক্ষা

গুজরাতের মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আজকাল যৌন গূঢ়ৈষা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হচ্ছে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে যাঁরা এর কবলিত হন, তাঁরাই আবার মনে করেন যে এ যেন একটা গৌরবের বিষয়। ক্রীতদাস যখন তার লৌহবলয় সম্বন্ধে গর্বানুভব করে ও মূল্যবান অলঙ্কারের মত তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে সেই ক্রীতদাসের প্রভুর পূর্ণ বিজয় লাভ হয়েছে। কিন্তু রতিদেবতার আপাতদৃষ্টিতে নয়নমোহনকারী এই সাফল্য অবশেষে যে ক্ষণস্থায়ী ও অবাঞ্ছিত মনে হবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। নির্বিষ বৃশ্চিকের মত শেষ পর্যন্ত এ শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ইত্যবসরে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। এর পরাভবের নিশ্চয়তা যেন আমাদের অলীক নিরাপত্তার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কোন পুরুষ বা রমণীর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ হচ্ছে কামনা-বাসনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। বাসনাজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের উপর রাজত্ব করার আশা পোষণ করতে পারে না। আর আত্মশাসন বিনা স্বরাজ বা রামরাজত্বের ভরসা নেই। আত্মশাসন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে শাসন করতে যাওয়া আত্ম-প্রতারণার নামান্তর মাত্র। এ যেন সুন্দর রঙ-করা মাটির আম। বাইরে থেকে দেখতে মনোহর; কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। যে কর্মী নিজ কামনা-বাসনা সংযত করতে শেখেন নি, তিনি হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, গোরক্ষা বা গ্রামোন্নয়ন আদি কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার সেবা করতে পারেন না। এই জাতীয় মহান কার্য শুধু বৌদ্ধিক সম্পদ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আত্মার শক্তি আসে ঈশ্বর-কৃপায় এবং যিনি বাসনার দাস তিনি কখনও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে পারেন না।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে যৌন-বিজ্ঞানের স্থান কি হবে বা আদৌ এর কোন স্থান থাকবে কিনা? যৌনবিজ্ঞান দুই প্রকারের। এক রকম যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি শেখায় ও অপরটি যৌন উত্তেজনা বাড়ায় ও এর খোরাক সংগ্রহে প্রবৃত্ত করে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য যতটা প্রয়োজন, দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক বলে একান্ত বর্জনীয়। কামকে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু আখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ঠিকই করেছে। ক্রোধ বা বিদ্বেষকে সকলে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। গীতার মতে কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। গীতায় অবশ্য কাম কথাটি ব্যাপকার্থে

প্রযুক্ত হয়েছে। তবে যে সংকুচিত অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হল, গীতার উপদেশ সে অর্থেও সমান কার্যকরী।

অবশ্য তবুও মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি থেকে যায়। কথা হচ্ছে এই যে, সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন-যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কাম্য কিনা? আমার মনে হয় তাঁদের এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান দান করা উচিত। বর্তমানে তাঁদের যে কোন উপায়ে এতদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও ফলে তাঁরা পথভ্রান্ত হয়ে নানারকম কুক্রিয়ার কবলে পড়েন। যৌন কামনা সম্বন্ধে জোর করে চোখ বুজে আমরা যথোচিতভাবে এর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে পারব না। সুতরাং আমি তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজ প্রজনন যন্ত্রের তাৎপর্য ও যথাযথ উপযোগিতা শিক্ষা দেবার ঐকান্তিক সমর্থক এবং আমার উপর যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার পড়েছিল তাঁদের আমি আমার স্বকীয় পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে ধরনের যৌন শিক্ষা চাই, তার লক্ষ্য হবে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া। এ শিক্ষা স্বতঃই ছাত্রদের মানুষ ও পশুর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে, তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করবে যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়—এই উভয়বিধ বৃত্তির আধার হবার একমাত্র সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মানুষেরই। তাঁদের জানিতে হবে যে, মনুষ্য কথাটির শব্দ-রূপার্থের যথাযথ পরিচয় তাঁদের মাঝে আছে, অর্থাৎ তাঁরা প্রবৃত্তিতাড়িত হলেও বিচারশীল জীব বটেন। অতএব অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে বিচার-ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেবার সমতুল। মানুষের ভিতর বিচারশক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হয় ও প্রবৃত্তি যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু পশুর ভিতর আত্মা চিরকালই সুপ্তিমগ্ন। হৃদয়কে সজাগ করার অর্থ নিদ্রামগ্ন আত্মাকে জাগরিত করা, যুক্তিবোধের ঘুম ভাঙানো এবং সু ও কুর ভিতর পার্থক্য করার স্ফুরণ ঘটানো।

সত্যকার এই যৌন বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবেন কে? নিঃসন্দেহে যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তিনি-ই। জ্যোতিষশাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন হয়, যাঁরা এসব বিষয় ভাল ভাবে জানেন ও এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। এইভাবে যৌনবিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন-বিজ্ঞান শেখবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন, যাঁরা এ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন ও আত্মজয় করেছেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে সুমহান ভাবোদ্যোতক বাক্যও নিষ্প্রাণ ও জড়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং

জনমানসে প্রবেশ করা ও হৃদয় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এর থাকে না। অথচ আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার অভিজ্ঞতার ফলে উৎসারিত বাক্যাবলী সর্বদা ফলপ্রসূ হয়।

আজকাল আমাদের সমগ্র পরিবেশ—পঠন-পাঠন চিন্তা সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুকেই একধার থেকে কামোদ্দীপক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর হাত এড়ানো অতি কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃসন্দেহে এ লেগে পড়ে থাকার মত কাজ। আত্মসংযমকে মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য বিবেচনাকারী জনকয়েক মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাগুরুও যদি থাকেন এবং তাঁরা যদি সত্যকার জলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও তাঁরা যদি সদাজাগ্রত ও নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রযত্নের ফলে গুজরাতের সন্তান-সন্ততিদের চলার পথ আলোকোদ্ভাসিত হবে, অজস্রজন কামুকতার পঙ্কে নিপতিত হবার হাত থেকে ত্রাণ পাবেন এবং যাঁরা ইতিপূর্বে এর কবলিত হয়েছেন, তাঁদেরও পরিত্রাণের পথ পাওয়া যাবে।

হরিজন, ২১-১১-১৯৩৬

ছাত্রসমাজ ও ধর্মঘট

ছাত্রদের বাক্‌-স্বাধীনতা ও অবাধ বিচরণের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন করলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্র-ধর্মঘট এবং ছাত্রদের দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন আমি সমর্থন করতে অক্ষম। ছাত্রদের মতামত প্রকাশের সর্ববিধ স্বাধীনতা থাকা চাই। তাঁরা ইচ্ছামত যে-কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে পারেন। কিন্তু আমার মতে পাঠ্যাবস্থায় তাঁদের ইচ্ছামত যা-কিছু করার স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত নয়। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। তবে জাতীয় আন্দোলনকালে কঠোর ভাবে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশ্য তখনকার অবস্থায় 'ধর্মঘট' শব্দটি প্রয়োগ করা চলতে পারে কি না, তা একটি বিবেচ্য বিষয়। যাই হোক, তখন আর তাঁদের ধর্মঘট করতে হয় না। তখন সর্বব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে পড়াশুনা মুলতবী রাখতে হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে, আসলে তা ব্যতিক্রম-পদবাচ্য নয়।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

ছাত্রদের পক্ষে লজ্জার বিষয়

প্রায় দুমাস যাবৎ আমার দপ্তরে পাঞ্জাবের একটি কলেজের ছাত্রীর একটি অত্যন্ত করুণ পত্র পড়ে আছে। সময়াভাবের জন্য মেয়েটির পত্রের জবাব দিতে পারি নি বলাটা খানিকটা বাজে অজুহাতের মত শোনাবে। আসল কথা এই যে তাঁর প্রশ্নের জবাব জানলেও পাকেপ্রকারে জবাব দেবার হাঙ্গামা আমি এড়াতে চাইছিলাম। ইতিমধ্যে আর একজন অতীব অভিজ্ঞতাসম্পন্না ভগ্নীর একটি চিঠি পেলাম এবং তখন মনে হল যে কলেজের ঐ ছাত্রীটি যে অতীব প্রত্যক্ষ অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, আর তার সম্বন্ধে আলোচনা না করলে চলে না। পত্রের ছত্রে ছত্রে মেয়েটির গভীর ভাবাবেগের ছাপ পড়েছে। তাই সম্পূর্ণ পত্রটি উদ্ধৃত করা সম্ভব না হলেও তার প্রতি আমি যথাসম্ভব ন্যায়বিচার করব :

"ইচ্ছা না থাকলেও মেয়েদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তাদের একলা বাইরে বেরোতে হয়। শহরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা বা এক শহর থেকে অন্য শহরে সময় সময় তাদের যাবার দরকার পড়ে। এই কারণে তাদের যখন একলা পাওয়া যায় তখন কু-স্বভাব ব্যক্তিরা তাদের উত্যক্ত করে। পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা অসৌজন্যমূলক এবং এমন কি অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে। আর তাদের মনে ভয়ডর না থাকলে তারা আরও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অহিংসার কর্তব্য কি তা আমি জানতে ইচ্ছুক। অবশ্য এরকম অবস্থায় হিংসার প্রয়োগ তো হাতের মধ্যেই রয়েছে। মেয়েটি যদি যথেষ্ট সাহসী হয় তবে সে সেই বদলোকটিকে শায়েস্তা করার জন্য হাতের কাছে যা পাবে তা-ই কাজে লাগাবে। মেয়েটি অন্ততঃ চেঁচামেচি জুড়ে দিতে পারে এবং তার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ে বদমায়েশটির পিঠে ভালমত চাবুকের দাগ পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আমি একথা জানি যে এর ফলে দুর্গতিকে শুধু মুলতবী রাখা হয়, এ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। মানুষ দুর্ব্যবহার করলেও একটা আশা থাকে যে যুক্তি প্রেমভাব এবং বিনয়ের পরিচয় দিলে তার মন পাল্টানো যেতে পারে। কিন্তু সাইকেলে করে যেতে যেতে কেউ যখন পুরুষ-অভিভাবক-হীনা মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করে তখন কি করা সম্ভব? তার সঙ্গে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হবার অবকাশ নেই। তার সঙ্গে হয়ত আর কোন দিন দেখাই হবে না। তাকে এর পরে চেনাও যাবে

না, বা তার হালহদিসও জানা নেই। এ অবস্থায় দুর্ভাগা মেয়েদের উপায় কি? উদাহরণ স্বরূপ আমার গতকালকার (২৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতার কথা বলব। রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময় একটি বিশেষ কাজে আমার একটি বান্ধবীর সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম। সে সময় কোন পুরুষ-সাথী পাবার উপায় ছিল না এবং কাজটাও মুলতবী রাখার মত নয়। রাস্তায় একটি শিখ-যুবক সাইকেলে চড়ে পার হয়ে গেল এবং আমরা তার কথা শ্রবণযোগ্য দূরত্বের মধ্যে থাকাকালীন সব সময়ে সে একটি কথা বলেই চলল। বুঝলাম সে কথা আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। রাস্তায় বিশেষ জনমানব ছিল না। দুই-এক পা যেতে না যেতেই সেই সাইকেল-আরোহী ফিরে এল। বেশ খানিকটা দূর থেকেই তাকে আমরা চিনতে পেরেছিলাম। সে আমাদের দিকেই আসতে লাগল। আমাদের সামনে নেমে পড়া না পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া—কি যে তার মতলব ছিল ভগবানই জানেন। আমার মনে হল বিপদ আসন্ন। শরীরের শক্তিতেও আমাদের ভরসা ছিল না। নিজে আমি গড়পড়তা মেয়েদের চেয়ে দুর্বল। তবে আমার হাতে একখানা ভারী বই ছিল। কি জানি কি করে হঠাৎ আমার মনে সাহস এল। ভারি বইখানা সাইকেলের দিকে ছুঁড়ে মেরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ফের ওসব বলবে!' অতি কষ্টে সে সাইকেলের ভারসাম্য বজায় রেখে জোরে পা চালিয়ে পালিয়ে গেল। আমি যদি ঐভাবে সাইকেলের দিকে বইখানি ছুঁড়ে না মারতাম তাহলে সারা পথ সে হয়ত ঐসব কুৎসিত কথা বলে আমাদের বিরক্ত করত। এটা অবশ্য অতি সাধারণ ও অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপনি যদি লাহোরে এসে আমাদের মত হতভাগ্য মেয়েদের কাহিনী শোনার অবকাশ পেতেন তাহলে বড় ভাল হত। আপনি নিশ্চয় এর সম্যক্ সমাধান খুঁজে পাবেন। প্রথমতঃ আমাকে এই কথা বলুন যে ঐরকম অবস্থায় কিভাবে মেয়েরা অহিংসা-নীতি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করতে পারে? দ্বিতীয়তঃ এইসব হীনচেতা যুবকদের মহিলাদেরকে অসম্মান করার রোগ থেকে মুক্ত করার উপায় কি? আপনি নিশ্চয় একথা বলবেন না যে যতদিন না মেয়েদের প্রতি সৌজন্য-মূলক আচরণ করতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন মানবসমাজের অভ্যুদয় হচ্ছে,

ততদিন ধৈর্য ধরে আমাদের এ অপমান সয়ে যেতে হবে। সরকার হয় এ সামাজিক দুরাচার বন্ধ করতে অনিচ্ছুক আর নয় তার সে শক্তি নেই। বড় বড় নেতাদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন সাহসিকা কোন অসৌজন্যকারী যুবককে উচিত শিক্ষা দিয়েছে শুনলে বলেন, 'ঠিক করেছে। এই ভাবে সব মেয়েদের চলা উচিত।' সময় সময় কোন কোন নেতা ছাত্রদের এই সব বদভ্যাসের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য কেউ নিরন্তর প্রযত্নশীল নন। আপনি একথা জেনে দুঃখিত ও বিস্মিত হবেন যে দেওয়ালী ও অন্যান্য পর্বের সময় সংবাদপত্রে এই মর্মে সব বিজ্ঞপ্তি বেরোয় যে মেয়েরা যেন এমন কি দীপান্বিতার আলোকসজ্জা পর্যন্ত দেখতে না বেরোয়। শুধু এই একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীর এই অংশে আমরা কী রকম হীন অবস্থায় নেমে গেছি। ঐসব বিজ্ঞপ্তির লেখক ও পাঠক কারও মনে এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য এতটুকু লজ্জাবোধ নেই।"

আর একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে আমি এই চিঠিটি পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি নিজ কলেজ-জীবনের কথা উল্লেখ করে পত্রলেখিকার বক্তব্য সমর্থন করলেন এবং জানালেন যে এই মেয়েটি যা লিখেছেন অধিকাংশ মেয়ের অভিজ্ঞতাই এই ধরনের।

আর একজন যে অভিজ্ঞতাসম্পন্না মহিলার কথা উল্লেখ করেছিলাম, তিনি তাঁর লক্ষ্ণৌ-এর বান্ধবীর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে পিছনের সারিতে উপবিষ্ট ছেলেরা নানারকম অভব্য উক্তি করে তাঁদের বিরক্ত করে। সেখানকার ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে যেসব ঠাট্টা-তামাশা করতে যায়, তার কথা পত্রলেখিকা উল্লেখ করলেও এখানে আমি আর তার পুনরালোচনা করছি না।

শুধু যদি তৎকালীন ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের কথা আলোচনা করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, যে মেয়েটি নিজেকে দুর্বল মনে করেন তাঁর কাজ অর্থাৎ সাইকেলের আরোহীর প্রতি বই ছুঁড়ে মারাই ঠিক। প্রতিকারের এ পন্থা বহুদিনের। এবং একাধিকবার আমি বলেছি যে হিংস্র আচরণ করতে ইচ্ছুক হলে শারীরিক দুর্বলতা—এমন কি অধিকতর বলশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার আয়ুধ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যের বাধা নয়। আর আজকাল দৈহিক

হিংসা প্রয়োগ করার এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে একটুখানি বুদ্ধি থাকলে ছোট্ট একটি মেয়েও হত্যা এবং ধ্বংসসাধন করতে পারে। পত্রলেখিকা বর্ণিত অবস্থায় এ পন্থায় মেয়েদের আত্মরক্ষা করার উপায় শিক্ষা দেবার রেওয়াজও আজকাল দেখা যাচ্ছে। তবে পত্রলেখিকা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলে একথা বুঝতে পেরেছেন যে ঐক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বাঁধানো বইটিকে আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে সাফল্য সহকারে প্রয়োগে সমর্থ হলেও ক্রমবর্ধমান এই পাপের স্থায়ী সমাধান এ নয়। কেউ কোন অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করলে বিচলিত হবার কারণ নেই। তবে এসব ঘটনা উপেক্ষা করাও চলে না। এসব কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুষ্কৃতিকারীদের খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের নাম প্রকাশ করা দরকার। পাপকে সর্বজনসমক্ষে ব্যক্ত করার ব্যাপারে কোন রকম ভুয়া বিনয় সামনে এসে পথরোধ না করে। প্রকাশ্যে যারা বদমায়েশী করে বেড়ায়, তাদের সাজা দিতে হলে জনমতের মত কার্যকরী আর কিছু নেই। পত্রলেখিকার কথা ঠিক যে জনসাধারণের মনে এ সম্বন্ধে প্রচণ্ড ঔদাসীন্য বিদ্যমান। তবে এজন্য শুধু জনসাধারণকে দোষ দিলেই চলবে না। তাঁদের কাছে দুর্ব্যবহারের প্রত্যক্ষ উদাহরণ পেশ করা চাই। চুরির ঘটনা প্রকাশ না হলে এবং তার তদন্ত না হলে যেমন চুরির ব্যাপারে কিছু করা যায় না, তেমনি দুর্ব্যবহারের উদাহরণ চেপে গেলে তার আর কিনারা হয় না। সাধারণতঃ পাপ ও অপরাধের পরিপুষ্টির জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন ঘটে। আলোর ছটা পড়লেই এসব নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তবে আমার মনে হয় যে একজন আধুনিকা অন্ততঃপক্ষে আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েট হতে চান। দুঃসাহসিক বৃত্তি তাঁদের খুব পছন্দ। পত্রলেখিকা বোধ হয় সাধারণ মেয়ের ব্যতিক্রম। আধুনিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বৃষ্টিবাদলা অথবা রবিকরোত্তাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয়, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। গালে মুখে রংচং মেখে তাঁরা প্রকৃতির উপরও এক কাঠি উঠতে চান এবং নিজেদের চেহারাকে অনন্যসাধারণ করে তোলেন। অহিংসা এসব মেয়ের জন্য নয়। একাধিকবার আমি একথা বলেছি যে নিজেদের মধ্যে অহিংস-শক্তির বিকাশের একটা সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক নিয়ম আছে। এর জন্য কঠোর প্রযত্ন করতে হয়। পত্রলেখিকা এবং তাঁর মত মেয়েরা যদি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবনে বিপ্লব সাধন করেন, তাহলে অনতিবিলম্বে তাঁরা দেখতে পাবেন, যেসব যুবক তাঁদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন ও

তাঁদের সামনে সাধ্যমত সৌজন্যমণ্ডিত আচরণ করছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁরা যদি দেখেন যে তাঁদের সতীত্ব সংকটাপন্ন (আর এর সম্ভাবনা আছেই), তাহলে মানুষের ভিতরকার সেই পশুটার কাছে আত্মসমর্পণ করার বদলে তাঁরা বরং মরার সাহস অর্জন করবেন। অনেকে আমাকে বলে থাকেন যে মুখে কাপড় গুঁজে বা অন্যভাবে যেসব মেয়েকে বেঁধে রেখে তাঁদের আত্মরক্ষা করার শক্তিটুকু পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে তাঁদের মরা আমি যতটা সহজ ভাবছি তা নয়। সবিনয়ে আমি এই কথা নিবেদন করব যে যাঁর প্রতিরোধ করার ইচ্ছা আছে তিনি তাঁর দেহকে বন্ধনকারী সর্ববিধ বাঁধনকে ছিন্নভিন্ন করতে পারেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁকে মরণ বরণ করার ক্ষমতা দেবে।

কিন্তু এরকম সাহসিকতা প্রকাশ করা সম্ভব শুধু তাঁদেরই, যাঁরা এর অনুকূল শিক্ষা নিয়েছেন। অহিংসায় যাঁদের জীবন্ত বিশ্বাস নেই তাঁরা আত্মরক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়া শিখবেন এবং এইভাবে অভব্য যুবকদের অসৌজন্যমূলক আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করবেন।

বড় কথা হচ্ছে এই যে যুবকেরা কেন এভাবে সাধারণ ভদ্র আচরণ-জ্ঞান বিরহিত হবে, যার জন্য সচ্চরিত্রা মেয়েদের নিরন্তর তাঁদের দ্বারা উত্যক্ত হবার ভয়ে কাল কাটাতে হবে? অধিকাংশ যুবক ভব্যতার যাবতীয় জ্ঞানগম্যি হারিয়েছেন—এ কথা শুনলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। তাঁদের কিন্তু সমগ্র-ভাবে নিজ সম্প্রদায়ের সুযশ বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে এবং নিজ সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ বেচাল হলে নিজেদেরকেই তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাঁদের একথা বুঝতে হবে যে প্রত্যেক নারীর সম্মান তাঁর নিজ মাতা ও ভগ্নীর সম্ভ্রমের সমতুল্য মহার্ঘ। সদাচার না শিখলে তাঁদের সকল শিক্ষা মূল্যহীন।

ছাত্রদের ভিতর যাতে ভদ্রতাবোধের বিকাশ হয়, তা দেখা এবং ক্লাসের পাঠ্য-তালিকার ভিতর সদাচার শিক্ষা দেবার প্রথা সমাবিষ্ট করার সমপরিমাণ দায়িত্ব কি অধ্যাপকবর্গ ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপরও বর্তায় না?

হরিজন, ৩১-১২-১৯৩৮

ছাত্রসমাজ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতি

দেশের জন্য আমি লড়াই করছি। এই দেশ বলতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে ছাত্রসমাজকেও বোঝায়। তবে ছাত্রদের উপর আমার একটা বিশেষ অধিকার আছে এবং তাঁদেরও আমার কাছে একটা বিশেষ দাবি আছে। তার কারণ,

আমি এখনও নিজেকে ছাত্র মনে করি। আর তাছাড়া আমি ভারতে ফেরার পর থেকেই ছাত্রদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাঁদের অনেকে সত্যাগ্রহের কাজ করেছেন।

সুতরাং সাময়িক আবেগের তাড়নায় আজ সমস্ত ছাত্রসমাজও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবুও আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য হবে এই আশঙ্কায় আমি উপদেশ দেওয়া বন্ধ করব না।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়া উচিত নয়। তাঁরা যেমন সব ধরনের বই পড়েন, তেমনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য তাঁরা শুনবেন। তাঁদের লক্ষ্য হবে "নীরং পরিত্যজ্য গ্রহেৎ ক্ষীরম্।" রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি এই হবে তাঁদের যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিকোণ।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছাত্রসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এই সব ব্যাপারে আটকা পড়ামাত্র তাঁদের ছাত্রত্ব আর থাকে না এবং তাই সংকট-মুহূর্তে তাঁরা আর জাতির সেবা করতে সক্ষম হন না।

২৬-১-১৯৪১

ছাত্রদের প্রতি

১। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবেন না, তাঁরা হচ্ছেন বিদ্যার্থী এবং তথ্যান্বেষক—রাজনীতিবিদ্ নন।

২। রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করা তাঁদের উচিত হবে না। নেতা অবশ্য তাঁদের থাকবে, তবে নেতার প্রতি তাঁরা অনুরাগ দেখাবেন তাঁর সৎগুণাবলীর অনুকরণ করে। তাঁদের নেতাকে জেলে দিলে বা নেতা মারা গেলে কিংবা এমন কি তাঁর ফাঁসি হলেও তাঁরা ধর্মঘট করবেন না। দুঃখ যদি তাঁদের অসহ্য মনে হয় এবং সমস্ত ছাত্রের বুকেই যদি তা সমানভাবে বাজে, তবে সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ কর্ণপাত না করলে যথোচিত শিষ্টাচার সহকারে ছাত্ররা বিদ্যানিকেতন ছেড়ে চলে যেতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করে তাঁদের পুনরায় ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তাঁরা ফিরে আসবেন না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কখনই তাঁরা বলপ্রয়োগ করবেন না। এ বিশ্বাস তাঁদের থাকা চাই যে, সংহতিসম্পন্ন হলে এবং নিজেদের আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হলে তাঁদের বিজয় অনিবার্য।

৩। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁরা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুতা কাটবেন। তাদের সাজ-সরঞ্জাম সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজানোগোছানো থাকবে। সম্ভব হলে তাঁরা নিজেরাই সে সব তৈরি করবেন। স্বভাবতই তাঁদের সুতা খুব উঁচুদরের হবে। সুতা কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিকগুলি সম্বন্ধে যে সব বই আছে, তাঁরা সেগুলি পড়বেন।

৪। তাঁরা পুরোপুরি খাদি ব্যবহার করবেন এবং কলে তৈরী বা বিদেশী জিনিসের বদলে গ্রাম্যপণ্য ব্যবহার করবেন।

৫। অপরের উপর তাঁরা "বন্দেমাতরম্" বা "জাতীয়-পতাকা" জোর করে চাপাবেন না। জাতীয় পতাকার ছবিযুক্ত প্রতীক তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করতে পারেন, তবে অপরকে অনুরূপ প্রতীক ব্যবহারের জন্য চাপ দেবেন না।

৬। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বাণী তাঁরা নিজেরা বহন করবেন এবং তাঁদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বা ছুঁৎমার্গের ভাব থাকবে না। প্রিয়জনের মত নিজেরা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করবেন।

৭। আহত প্রতিবেশীর প্রাথমিক পরিচর্যা অবশ্যই তাঁরা করবেন এবং নিকটস্থ গ্রামে তাঁরা সাফাই এবং আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করবেন ও গ্রামের শিশু ও বয়স্কদের তাঁরা শিক্ষা দেবেন।

৮। রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী তাঁরা সবাই শিখবেন এবং এর বর্তমান যুগ্মরূপ অর্থাৎ দু ধরনের কথন ও লিখনপদ্ধতিও তাঁরা জানবেন। এর ফলে হিন্দি বা উর্দু—যাই বলা হোক না কেন এবং নাগরী ও উর্দু যে কোন লিপিই লেখা হোক না কেন, তাঁরা কোন অসুবিধাই ভোগ করবেন না।

৯। নতুন কিছু যা তাঁরা শিখবেন, তা তাঁরা মাতৃভাষায় অনুবাদ করবেন এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাপ্তাহিক পরিক্রমার সময় সেই নতুন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন।

১০। কোন কিছুই তাঁরা গোপন করবেন না, তাঁদের যাবতীয় আচরণ খোলাখুলি হবে। তাঁরা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবনযাপন করবেন, সমস্ত ভয় বিসর্জন দেবেন ও সহপাঠী দুর্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। জীবন পণ করেও অহিংস পন্থায় দাঙ্গা দমনের জন্য তাঁরা তাঁদের বিদ্যানিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন ও প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবেন।

১১। সহপাঠিনী ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা যথোচিত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করবেন।

ছাত্রদের যে কার্যক্রম আমি ছকে দিয়েছি, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁদের সময় করে নিতে হবে। আমি জানি যে কুঁড়েমি করে তাঁরা বহু সময় নষ্ট করেন। প্রকৃত মিতাচারের ফলে তাঁরা সময় বাঁচাতে পারেন। তবে কোন ছাত্রের উপর আমি অসঙ্গত চাপ দিতে চাই না। যে দেশ-প্রেমিক ছাত্রকে একনাগাড়ে আমি তাই একটি বছর নষ্ট করতে বলব না। তাঁর সমস্ত বিদ্যাভ্যাসকালের মধ্যে তাঁকে এই এক বছর দিতে বলব। তাঁরা দেখবেন যে এভাবে এক বছর দেওয়ায় সময় নষ্ট হয় নি। এ প্রচেষ্টায় তাঁরা মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক—সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হবেন এবং পঠদ্দশায় তাঁরা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবেন।

১৩-১১-১৯৪৫

॥ ষোল ॥

আদর্শ ছাত্রাবাস

আদর্শ ছাত্রাবাস

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত আমি ছাত্রাবাস পরিচালনা করছি। সুতরাং আমি এই দাবি করতে পারি যে কিভাবে ছাত্রাবাস পরিচালনা করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছুটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। এখানে "ছাত্রাবাস" শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করলে ভাল হয়। প্রতিটি ব্যক্তি যিনি কিছু না কিছু শিখছেন তিনিই ছাত্র এবং যেখানে যেখানে এরকম একাধিক ছাত্র থাকেন সেই সব জায়গাকেই ছাত্রাবাস বিবেচনা করা যায়।

এই সব ছাত্রাবাস সাফল্য সহকারে পরিচালনার প্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত হল এই যে এখানকার সুপারইনটেনডেণ্ট বা ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা সচ্চরিত্র ব্যক্তি হবেন।

ছাত্রাবাসকে কদাপি কেবল ছাত্রদের বাসাবাড়ীতে পর্যবসিত হতে দেওয়া উচিত নয়, যেখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার জন্য ছাত্ররা একত্র থাকেন।

ছাত্রদের পরস্পরের ভিতর পরিবার-ভাবনামূলক বন্ধন গড়ে উঠবে এবং ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এ ব্যাপারে পিতার ভূমিকা নেবেন। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ ছাত্রদের

সব ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন, তাঁদের সামাজিক জীবনের ভাগীদার হবেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে আহার করবেন।

আদর্শ ছাত্রাবাস ছাত্রদের কাছে নিজ নিজ বিদ্যায়তনের চেয়েও গুরুত্ব লাভ করবে। প্রত্যুত ছাত্রাবাসই যথার্থ বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ররা কেবল মৌখিক জ্ঞান পান কিন্তু ছাত্রাবাসে তাঁরা সব রকমের জ্ঞান অর্জন করবেন। আদর্শ ছাত্রাবাস বিদ্যানিকেতন থেকে পৃথক কোন প্রতিষ্ঠান হবে না। সুতরাং উভয় প্রতিষ্ঠান একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন হবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্র থাকবেন। এইভাবে ছাত্রাবাসগুলিকে যথার্থ বাড়ীর মত করে তুলতে হবে এবং সেখানে ছাত্রদের বিকাশের এমন আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা আসল বাড়ীতেও পাওয়া যায় না। অতএব ছাত্রাবাসগুলিকে গুরুকুলে রূপান্তরিত করতে হবে।

আমাদের ছাত্রাবাসসমূহে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। এর কারণ হল এই যে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের ভিতর এই মনোভাব গড়ে ওঠে না যে তাঁরা একই পরিবারের অংশ। আর ছাত্রাবাস পরিচালকরাও ছাত্রদের জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করেন না।

তাছাড়া এই সব ছাত্রাবাসকে শহরের এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং গ্রাম বা শহরের নাগরিক জীবনে যেসব সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়, সেগুলিকে এই সব ছাত্রাবাসে প্রথমে প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ এখানে স্বাস্থ্য ও সাফাই-নীতিসঙ্গত জীবন যাপন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং স্বাস্থ্য ও সাফাই-এর বিধি-বিধান কঠোরতা সহকারে পালন করতে হবে। ভাড়াটে বাড়ীতে আদর্শ ছাত্রাবাস পরিচালনা করা যায় না। ছাত্রাবাসে ভাল স্নান ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। কামরাগুলিতে চমৎকার আলো-হাওয়া খেলবে এবং ছাত্রাবাসের সংলগ্ন একটি বাগান থাকা চাই।

আদর্শ ছাত্রাবাস সর্ববিষয়ে স্বদেশী হবে। ছাত্রাবাসের গৃহনির্মাণ, তার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম—সর্বত্র এই স্বদেশীয়ানার ছাপ থাকবে। গ্রামীণ শিল্প হস্তকলা এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রভাব পড়বে ছাত্রাবাসের জীবনে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে এর ঘরবাড়ী তৈরি হবে। সুতরাং সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্য দেশসমূহে যেরকম ছাত্রাবাস তৈরি হয়, তা আমাদের আদর্শ হতে পারে না। সেই সব দেশের আবহাওয়ার সঙ্গেও আমাদের দেশের পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং ছাত্রাবাসের ঘরবাড়ী হবে আমাদের দেশের অবস্থার অনুকূল।

আদর্শ ছাত্রাবাসে এমন কিছু থাকবে না যার ফলে আলস্য বা বিলাস প্রোৎসাহন পায় অথবা স্বেচ্ছাচারের পথ প্রশস্ত হয়। এইজন্য সেখানে যে আহার্য সরবরাহ করা হবে তা জ্ঞানান্বেষীর জীবনচর্যার উপযুক্ত সাদাসিধে হবে। ছাত্রাবাসে নিয়মিত প্রার্থনা হবে, কাজকর্মের এবং বিশ্রাম ও নিদ্রার বাঁধাধরা নিয়ম থাকবে।

আদর্শ ছাত্রাবাস হবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মত—ব্রহ্মচারীর মত জীবনযাপনকারী ছাত্রদের বসতি। ছাত্র শব্দটি একালের। প্রাচীনকালে এর পরিবর্তে ব্রহ্মচারী শব্দটি ব্যবহৃত হত এবং ছাত্রজীবনের আদর্শ যথাযথভাবে ব্যক্ত করার পক্ষে সেই শব্দটি অধিকতর ভাববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন—ইন্দ্রিয় সংযম, দেহ-মনের পবিত্রতা ও চূড়ান্ত সত্যের উপলব্ধির প্রয়াস অধ্যয়নকালে একান্ত অপরিহার্য। বর্তমানের এই বিপর্যয়কর দিনে আমি চাইব যে বিবাহিত ছাত্রেরাও যদি ছাত্রাবাসে থাকেন তাহলে অধ্যয়নকাল শেষ না হওয়া অবধি তাঁরা যেন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এর অর্থ হল এই যে এই সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর সংসর্গ থেকেও দূরে থাকবেন।

পাঠকেরা স্মরণ রাখবেন যে আমি আদর্শ ছাত্রাবাসের বিধিপ্রকরণ বর্ণনা করেছি। একথা বুঝতে পারা যায় যে, সব ছাত্রাবাসই হয়ত এ আদর্শে উপনীত হতে পারবে না। তবে পূর্ববর্ণিত আদর্শকে যদি মানদণ্ডস্বরূপ স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেক ছাত্রাবাসের কর্তব্য হল সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করা ও পূর্বোক্ত আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের অগ্রগতির পরিমাপ করা।

নবজীবন, ৩-৩-১৯২৯

আদর্শ ছাত্রাবাস প্রসঙ্গে

ছাত্রাবাসে থাকা সম্বন্ধে আমার ধারণা হল এই যে, এ হল নিজের পরিবারে থাকার মত। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এবং ছাত্ররা একই পরিবারের সদস্যদের মত মিলেমিশে থাকবেন এবং এখানে অধ্যক্ষ পিতামাতার স্থান নেবেন। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের স্ত্রী সেখানে থাকলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ছাত্রদের এই পরিবারের বাবা-মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। আমাদের দেশের ছাত্রাবাস-গুলির অবস্থা এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ যদি ব্রহ্মচর্য পালন না করেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী ছাত্রদের মায়ের স্থান নিতে পারবেন না।

সম্ভবতঃ তিনি তাহলে চাইবেনই না যে তাঁর স্বামী ছাত্রাবাসের দায়িত্ব নিন আর যদি বা স্বামীকে সে কাজ করতে দেন তবে তা কেবল ভাল মাইনের জন্য। সেক্ষেত্রে স্বামী যদি ছাত্রাবাসের ভাঁড়ারঘর থেকে কিছুটা ঘি চুরি করেন তাহলে স্ত্রীর তাতে পরোক্ষ সমর্থন থাকবে এবং তিনি ঘি পাবার জন্য খুশীও হবেন। এই উদাহরণ দিয়ে আমি অবশ্য এই কথা বলতে চাই না যে, সব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরাই এমনি। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে আমাদের বর্তমান অবস্থা শ্লাঘনীয় নয়।

আমি যাকে আদর্শ ছাত্রাবাস বিবেচনা করি, তার সংখ্যা আজও খুবই কম। প্রত্যুত গুজরাতের বাইরে ভারতবর্ষে এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ছাত্রাবাস গুজরাতের এক বিশেষ অবদান। এর বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। গুজরাত ধনী ব্যবসায়ী ও বণিকদের দেশ। ব্যবসার দ্বারা যাঁরা অর্থোপার্জন করেন, তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়ের বালকদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করতে ভালবাসেন। ছাত্রালয় নামক মহৎ শব্দটি অবশ্য পরে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে। গোড়ার দিকে এগুলিকে কেবল ছাত্রদের বাসাবাড়ী বলা হত। কারণ তখন শহরে আশেপাশের গ্রাম থেকে যেসব ছাত্র আসেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তীকালে যখন অধিকতর জ্ঞানী ছাত্রাবাসাধ্যক্ষদের নিয়োগ করা হতে লাগল তখন তাঁরা এখানকার ব্যবস্থাপনায় আদর্শবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানো আরম্ভ করলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিদ্যালয়ের চেয়ে ছাত্রাবাসকে অধিক গুরুত্ব দিই। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অনেকটা যা বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না, তা পাওয়া যায় ছাত্রাবাসে। বিদ্যালয়ে কিছুটা প্রশিক্ষণ ঘটে থাকে, তবে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। ছেলেরা বিদ্যালয়ে যা শোনে ও যার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয় তার খানিকটা অচেতন ভাবে হলেও তাদের মনে লেগে থাকে। আমি অবশ্য কেবল খারাপ দিকটাই দেখাচ্ছি। বিদ্যালয়ের পক্ষে এককভাবে ছাত্রাবাসের মত ছেলেদের মনকে শক্তিশালী ও বিকশিত করা সম্ভবপর নয়। আমার কল্পনা হল এই যে শেষ অবধি ছাত্রাবাসের মধ্যে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস উভয়েরই কর্মের সমন্বয় ঘটুক।

শেঠজীদের বদান্যতার দ্বারা স্থাপিত ছাত্রাবাসগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শেঠজীরা ছাত্রাবাস স্থাপনা করলেও তার প্রত্যক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতেন না। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষও মনে করতেন যে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা যদি খেতে পায় ও বিদ্যালয়ে যায় তাহলে তাঁর দায়িত্ব শেষ হল।...ছাত্রা-

বাসাধ্যক্ষকে কেবল হিসাবনবিশ হলে চলবে না, ছাত্ররা বিদ্যালয়ে কি করছে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। ছাত্রাবাসের বাসিন্দাকে তিনি নিজের পুত্র বা ছাত্র মনে করে তাঁর পড়াশুনার উন্নতি ও অধিকতর কল্যাণের জন্য তিনি প্রয়াস পাবেন। বহুক্ষেত্রে আজ কিন্তু ছাত্ররা কোন্ ধরনের খাবার খেল সে সম্বন্ধে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ খবরও রাখেন না।

আমাদের ছাত্রাবাসসমূহে আজকে যে দুঃখদ বিপত্তিকর পরিস্থিতি বিরাজিত এবং প্রায়শঃ যাকে গোপন করার প্রচেষ্টা করা হয়, বিশেষ করে আমি তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা সত্যকার অবস্থা ব্যক্ত করতে অনিচ্ছুক। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা এই সব ঘটনা গোপন করেন। ছাত্রদের দুষ্কর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়বে এই ভয়ে তাঁরা এমন কি ছাত্রদের অভিভাবকদেরও সে সব ঘটনার কথা জানান না। তবে চিরকাল এইভাবে সত্যকে গোপন রাখা যায় না। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এই ধারণা-পরবশ হয়ে চলেন যে এসব ঘটনার কথা বুঝি কেউ জানেন না; কিন্তু দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েই। সবাইকে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁরা যেন সাবধান হন এবং যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালন করেন। যেসব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ নিজেদের ছাত্রাবাসকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন না, তাঁরা যেন ইস্তফা দেন। ছাত্রাবাসের বাসিন্দা ছেলেরা যদি চরিত্রশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাঁদের চিন্তা যদি বিশৃঙ্খল হয় ও বুদ্ধিবৃদ্ধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার জন্য তাঁরা যদি বখাটে-স্বভাবের হয়ে পড়েন তাহলে তার দায়িত্ব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের। এটা তাঁর অযোগ্যতার পরিচায়ক।

…ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ কাজ করার জন্য উচ্চ হারে বেতন দাবি করেন। তাঁরা বলেন যে তাঁদের বিধবা বোনকে দেখতে হয়, তাঁদের পুত্র বা কন্যার বিবাহের ব্যয়-নির্বাহ করতে হয়। এমতাবস্থায় এরকম লোক যোগ্য হলেও তাঁদের বাদ দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে দেশে এমন আরও অনেকে আছেন যাঁরা সমাজসেবা হিসাবে এ কাজে নেমেছেন—এ কাজকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অপর কিছু করতে চান না, এমন অনেকে আছেন যাঁরা কেবল মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানের বিনিময়ে এ কাজ করতে প্রস্তুত।

পূর্বে আমি যা বলেছি তার থেকে বোঝা যাবে যে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে প্রাজ্ঞ

নিখুঁত হতে হবে। যিনি ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে এবং তাঁদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম তিনিই কেবল সফল ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ হতে পারেন। প্রথমে এ জাতীয় ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ যোগাড় না করে ছাত্রাবাস খোলা বিপজ্জনক ব্যাপার।

ছাত্রাবাসাধ্যক্ষদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। এবার ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলব। গর্বে অন্ধ হয়ে ছাত্ররা যদি মনে করেন যে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা তাঁদের সুখ-সুবিধা দেখাশুনা করার চাকর, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ছাত্ররা যদি মনে করেন যে তাঁদের কিছুই করার নেই, ছাত্রাবাসের সব কাজকর্ম সেখানকার ভৃত্যেরা করবেন তাহলে তাও হবে আর এক ভ্রান্তি। ছাত্ররা স্মরণ রাখবেন যে ছাত্রাবাস আরাম-আয়াসে দিন কাটাবার জায়গা নয়। ছাত্রাবাসে তাঁরা যা কিছু পাচ্ছেন তার দাম দিচ্ছেন—এই ধারণা তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তাতে ছাত্রাবাসের সব খরচ চলে না। এই সব ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা শেঠেরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ালেই বুঝি ছাত্রদের উন্নতি ঘটবে এবং তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখলে পুণ্যলাভ হবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণ ছাত্রদের জন্য তাঁরা বহুবিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এর ফলে পুণ্য হবার পরিবর্তে পাপ হয়। ভাল হবার বদলে ছেলেরা আরও খারাপ হয় এবং তাদের পরনির্ভরশীল স্বভাব গড়ে ওঠে। যে কোন বুদ্ধিমান ছাত্র সহজেই এটা হিসাব করতে পারেন যে তিনি ছাত্রাবাসের যে কামরায় থাকেন তার ভাড়া কত এবং ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ ও সেখানকার পাচক ভৃত্য ইত্যাদির বেতনই বা কত। এই হিসাবটুকু করলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে ছাত্রাবাসের খরচ হিসাবে ছাত্ররা যা দেন তাতে ছাত্রাবাসের সব রকম ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। তাঁরা কেবল খাইখরচ দেন। অনেক ছাত্রাবাসে আবার আহার্য, বস্ত্র ও পুস্তক ইত্যাদি বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করা হয়। যেসব শেঠেরা এই সব বাবদ অর্থব্যয় করেন তাঁরা যদি সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রদের কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি নিতেন যে শিক্ষালাভের পর তাঁরা দেশের সেবা করবেন তাহলে না হয় একটা কথা ছিল। বদান্য হবার কারণ তাঁরা এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেন না। কিন্তু ছেলেদের একথা বোঝা উচিত যে তাঁরা যা পাচ্ছেন তার প্রতিদান না দিলে চুরির ধনে জীবন নির্বাহ করা হয়। আমার ছেলেবেলায় আমি আখা ভগতের একটি কবিতা পড়েছিলাম যার একটি ছত্র নিম্নরূপ: "চুরির ধনে জীবন যাপন করার অর্থ পারা খাওয়ার মত।"

নবজীবন, ১৩-২-১৯৩০

শিক্ষক ও ছাত্রী

কোন শিক্ষকের যদি নিজ ছাত্রীর সঙ্গে গোপন সম্বন্ধ থাকে এবং পরে আর যখন সে সম্বন্ধকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয় না তখন তাকে বৈধ করার জন্য যদি শিক্ষকটি তাঁর ছাত্রীকে বিবাহ করেন তাহলেও একথা বলা যায় না যে এর দ্বারা সেই সম্বন্ধকে শুদ্ধ করে নেওয়া হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যেমন ভাই-বোনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হতে পারে না, তেমনি শিক্ষক এবং ছাত্রীর মধ্যেও পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ঘটা উচিত নয়। এ একটি আদর্শ বিধান এবং এ বিধান ভঙ্গ করার অর্থ হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করা। এই বিধান ছাত্রীদের তাঁদের শিক্ষকদের হাত থেকে বাঁচাবার রক্ষাকবচ স্বরূপ। শিক্ষকের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু এবং এর ফলে তিনি তাঁর অধীনস্থ ছাত্রছাত্রীদের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শিক্ষকের কথাকে ছাত্রছাত্রীরা বেদবাক্য জ্ঞান করেন। ছাত্রছাত্রীরা একথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেন না যে তাঁর ভিতর কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে এবং তাই পূর্বোক্ত অপরিহার্য বিধান পালন করা তাঁর কর্তব্য। যেখানে দেহের চেয়ে আত্মার কল্যাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রীর বিবাহরূপী এই সব সম্বন্ধ অবাঞ্ছনীয় এবং সর্বসাধারণের কাছেও এটা অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়া উচিত।

হরিজনবন্ধু, ২৯-১১-১৯৩৫

যৌন-শিক্ষা

গুজরাতের মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আজকাল যৌন পূঁঢেষা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যাঁরা এর কবলিত হন, তাঁরাই আবার মনে করেন যে এ যেন একটা গৌরবের বিষয়। ক্রীতদাস যখন তার লৌহবলয় সম্বন্ধে গর্বানুভব করে ও মূল্যবান অলঙ্কারের মত তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে সেই ক্রীতদাসের প্রভুর পূর্ণ বিজয় লাভ হয়েছে। কিন্তু রতিদেবতার আপাতদৃষ্টিতে নয়নমোহনকারী এই সাফল্য অবশেষে যে ক্ষণস্থায়ী ও অবাঞ্ছিত মনে হবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। নির্বিষ বৃশ্চিকের মত শেষ পর্যন্ত এ শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ইত্যবসরে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। এর পরাভবের নিশ্চয়তা যেন আমাদের অলীক নিরাপত্তার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কোন পুরুষ বা রমণীর

অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ হচ্ছে কামনা-বাসনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। বাসনাজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের উপর রাজত্ব করার আশা পোষণ করতে পারে না। আর আত্মশাসন বিনা স্বরাজ বা রামরাজত্বের ভরসা নেই। আত্মশাসন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে শাসন করতে যাওয়া আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র। এ যেন সুন্দর রঙ করা মাটির আম। বাইরে থেকে দেখতে মনোহর, কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। যে কর্মী নিজ কামনা-বাসনা সংযত করতে শেখেন নি, তিনি হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, গোরক্ষা বা গ্রামোন্নয়ন আদি কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার সেবা করতে পারেন না। এই জাতীয় মহান্ কার্য শুধু বৌদ্ধিক সম্পদ্ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আত্মার শক্তি আসে ঈশ্বর-কৃপায় এবং যিনি বাসনার দাস, তিনি কখনও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে পারেন না।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে যৌনবিজ্ঞানের স্থান কি হবে বা আদৌ এর কোন স্থান থাকবে কিনা? যৌনবিজ্ঞান দুই প্রকারের। এক রকম যৌন-আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি শেখায় ও অপরটি যৌন উত্তেজনা বাড়ায় ও এর খোরাক সংগ্রহে প্রবুদ্ধ করে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য যতটা প্রয়োজন, দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক বলে একান্ত বর্জনীয়। কামকে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু আখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ঠিকই করেছে। ক্রোধ বা বিদ্বেষকে সকলে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। গীতার মতে কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। গীতায় অবশ্য কাম কথাটি ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে যে সংকুচিত অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হল, গীতার উপদেশ সে অর্থেও সমান কার্যকরী।

অবশ্য তবুও মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি থেকে যায়। কথা হচ্ছে এই যে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন-যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কাম্য কিনা? আমার মনে হয় তাঁদের এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান দান করা উচিত। বর্তমানে তাঁদের যে কোন উপায়ে এতদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও ফলে তাঁরা পথভ্রান্ত হয়ে নানারকম কুক্রিয়ার কবলে পড়েন। যৌন-কামনা সম্বন্ধে জোর করে চোখ বুজে আমরা যথোচিতভাবে এর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে পারব না। সুতরাং আমি তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজ প্রজনন-যন্ত্রের তাৎপর্য ও যথাযথ উপযোগিতা শিক্ষা দেবার ঐকান্তিক সমর্থক এবং আমার উপর যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার

পড়েছিল তাঁদের আমি আমার স্বকীয় পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে ধরনের যৌন-শিক্ষা চাই, তার লক্ষ্য হবে যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া। এ শিক্ষা স্বতঃই ছাত্রদের মানুষ ও পশুর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে, তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করবে যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়—এই উভয়বিধ বৃত্তির আধার হবার একমাত্র সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মানুষেরই। তাঁদের জানতে হবে যে, মনুষ্য কথাটির শব্দ-রূপার্থের যথাযথ পরিচয় তাঁদের মাঝে আছে, অর্থাৎ তাঁরা প্রবৃত্তিতাড়িত হলেও বিচারশীল জীব বটেন। অতএব অন্ধপ্রবৃত্তির কাছে বিচারক্ষমতার স্যার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেবার সমতুল। মানুষের ভিতর বিচারশক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হয় ও প্রবৃত্তি যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু পশুর ভিতর আত্মা চিরকালই সুপ্তিমগ্ন। হৃদয়কে সজাগ করার অর্থ নিদ্রামগ্ন আত্মাকে জাগরিত করা, যুক্তিবোধের ঘুম ভাঙানো এবং সু ও কু-র ভিতর পার্থক্য করার শক্তির স্ফুরণ ঘটানো।

সত্যকার এই যৌন-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবেন কে? নিঃসন্দেহে যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তিনিই। জ্যোতিষশাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্ম আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন হয়, যাঁরা এসব বিষয় ভালভাবে জানেন ও এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। এইভাবে যৌন-বিজ্ঞান অথবা ইন্দ্রিয়দমন-বিজ্ঞান শেখাবার জন্ম আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন, যাঁরা এ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন ও আত্মজয় করেছেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে সুমহান্ ভাবোদ্যোতক বাক্যও নিষ্প্রাণ ও জড়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং জনমানসে প্রবেশ করা ও হৃদয় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এর থাকে না। অথচ আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার অভিজ্ঞতার ফলে উৎসারিত বাক্যাবলী সর্বদা ফলপ্রসূ হয়।

আজকাল আমাদের সমগ্র পরিবেশ—পঠন-পাঠন চিন্তা সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুকেই একাধার থেকে কামোদ্দীপক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর হাত এড়ানো অতি কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃসন্দেহে এ লেগে পড়ে থাকার মত কাজ। আত্মসংযমকে মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য বিবেচনাকারী জনকয়েক মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাগুরুও যদি থাকেন এবং তাঁরা যদি সত্যকার জ্বলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও তাঁরা যদি সদাজাগ্রত ও নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রযত্নের ফলে গুজরাতের সন্তান-সন্ততিদের

চলার পথ আলোকোদ্ভাসিত হবে, অজ্ঞজন কামুকতার পঙ্কে নিপতিত হবার হাত থেকে ত্রাণ পাবেন এবং যাঁরা ইতিপূর্বে এর কবলিত হয়েছেন, তাঁদেরও পরিত্রাণের পথ পাওয়া যাবে।

হরিজন, ২১-১১-১৯৩৬

শিক্ষা ও সঙ্গীত

…আমাদের উপর এর (সঙ্গীতের) প্রভাব গভীর। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির প্রতি আমরা এখনও যথোচিত দৃষ্টি দিই নি, দিলে এতদিনে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গীত শেখানোর ব্যবস্থা আমরা করতাম। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত। নিখুঁত সঙ্গীত আত্মার আর্তিকে শান্ত করার ক্ষমতা রাখে। বহু সময় যে বড় বড় জনসমাবেশে অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখা যায়, সকলে মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শুরু করলে একে শান্ত করা যায়। বহুসংখ্যক ব্যক্তি এক সুর ও তাল সহযোগে গান গাইলে তা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক ও চিত্তকে ঊর্ধ্বগামীকারক মনে হয়। শত শত বালক সাহসিকতা ও বীররসমণ্ডিত কোন কবিতা সুর করে পড়ছে—এ এক আকর্ষণীয় দৃশ্য। এ তো হরহামেশাই চোখে পড়ে। এর ফলে তাদের পরিশ্রম সহজতর হয়ে থাকে। এ হল সঙ্গীতের শক্তির উদাহরণ। আমার ইংরেজ বন্ধুদের আমি শীত ভুলে থাকার জন্য গান গাইতে দেখেছি। আমাদের ছেলেরা সহজেই প্রচলিত পালা ও নাটকের গানগুলি গাইতে শেখে এবং হারমোনিয়ামের মত এক স্থূল বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে শেখে। এর ফলে ভাল সঙ্গীতের অনুশীলনী করার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। এর বদলে তাদের যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে আজ তাদের যে সময় জনপ্রিয় অথচ অর্থহীন গান গাইবার পিছনে নষ্ট হয় তাকে সৎ কাজে লাগানো যেত। সুশিক্ষিত গায়ক যেমন বেসুরো অথবা অসময়ে গান করেন না তেমনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীও নোংরা গান গাইবেন না। আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় সঙ্গীতকে স্থান দিতে হবে এবং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধানে এর ভূমিকাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। এ বিষয়ে ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত গুরুত্বসহকারে চিন্তনীয়।

বিচার সৃষ্টি, ১৯১৭

বিদ্যালয়ে সঙ্গীত

গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত খারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচারের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিশেষ করে আমেদাবাদে ও সাধারণতঃ গুজরাতে এর যে অগ্রগতি হয়েছে তার বিবরণ জানিয়েছেন। তবে তাঁর মনে এই বিষয়ে ক্ষোভ রয়েছে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরা পাঠ্যক্রমে সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আদৌ কোন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। পণ্ডিতজীর অভিমত ব্যাপক অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং তিনি মনে করেন যে সঙ্গীত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অঙ্গ হওয়া উচিত। আমি পণ্ডিতজীর অভিমতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। গলা সাধা হাতকে কর্মকুশল করার চেষ্টার মতই প্রয়োজনীয়। ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি তাদের যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কুচকাওয়াজ হাতের কাজ চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতশিক্ষা সবই একসঙ্গে চালাতে হবে।

এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিপ্লবসাধন করতে হবে—সেকথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি নিজ জীবনের কর্মের নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করতে হয় তাহলে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়। যে কোন প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখতে গেলেই এলোমেলো ও অপরিচ্ছন্ন পোশাক বিশৃঙ্খলতা ও এলোমেলো কথাবার্তার প্রকট দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাবে। আমার মনে তাই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে (কংগ্রেসশাসিত) কয়েকটি প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করে তাকে দেশের প্রয়োজনীয়তার উপযোগী কববেন, তখন যে অপরিহার্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সেগুলি নিশ্চয় বাদ পড়বে না।...

অবশ্য নূতন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদানে সমর্থ শিক্ষকের অভাব আছে।... কিন্তু প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ কোন যুবকের পক্ষে প্রাথমিক সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনবিদ্যা কুচকাওয়াজ ও হাতের কাজ শিখতে তিন মাসের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। আর বিষয়গুলি সম্বন্ধে কাজ চলা গোছের জ্ঞান থাকলে পড়াতে পড়াতে তিনি এসব সম্বন্ধে আরও শিখে নিতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে নিজেদের জাতি পুনর্গঠনকার্যে উত্তরোত্তর যোগ্য করে নেবার মত আগ্রহ ও উদ্যম শিক্ষকদের মনে আছে।

হরিজন, ১১-৯-১৯৩৭

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে

গ্রন্থাগার কেমন হবে এবং সেখানে কি করা হবে—সে সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারণা আছে।···প্রথমতঃ গ্রন্থাগারটির বাড়ীর নকশা এইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গ্রন্থাগারটির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর আয়তনও বৃদ্ধি করা যায় অথচ তার ফলে যেন বাড়ীটির সৌন্দর্য নষ্ট না হয়। বাড়ীটির পরবর্তী পরিবর্ধন যেন দৃষ্টিকটু না ঠেকে। গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং ছাত্র ও গবেষকরা যেন সেখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রন্থসমূহের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।···আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে গ্রন্থাগার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। খুব ভাল হয় যদি দুই-একজন এর পিছনে তাঁদের অধিকাংশ সময় দেন। গ্রন্থাগারিকের পদে এমন কোন অর্থপ্রাণ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির লোককে রাখবেন না যাঁর কাজ কেবল বইগুলিকে নিরাপদ ও অক্ষত রাখা। এমন একজনকে নির্বাচন করতে হবে যিনি বিভিন্ন পুস্তকের আপেক্ষিক গুণাগুণ বুঝে বই বাছাই করতে পারেন। যদি বিনা বেতনে কেউ কাজ করতে রাজী না থাকেন তাহলে ভাল মাইনে দিয়ে যোগ্য লোক রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হরিজনদের বিনা চাঁদায় বই পড়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁরা যদি বই নষ্ট বা এমন কি চুরিও করেন তাহলে গ্রন্থাগারকে সেই লোকসানের দায়িত্ব নিতে হবে। হরিজনরা সমাজের দীনতম অংশ এবং তাই তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থাগারের পরিচালনা সমিতির সদস্য পড়াশুনায় আগ্রহশীল ব্যক্তিদের ভিতর থেকে বিচার-বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি জীবিত থাকে এবং এর উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। একথা ভাববেন না যে গ্রন্থাগারের পরিচালন-সমিতি কেবল বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। কারণ গ্রন্থাগার কেমন হবে এবং কি করে উন্নতিসাধন করা যায় সে সম্বন্ধে পড়ুয়া ব্যক্তিরা ভালভাবেই জানেন।

হরিজনবন্ধু, ১-১০-১৯৩৩

পিতামাতার কর্তব্য

বিদ্যালয় বা আশ্রমে যেসব পিতামাতা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠান তাঁদের কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হবে। এ কর্তব্য পালিত না হলে ছেলেমেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পিতামাতা—সবারই ক্ষতি। পিতামাতাকে সর্বাগ্রে তাঁরা

যে প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন তার নিয়মকানুন জানতে হবে। নিজের ছেলেমেয়েদের অভ্যাস ও প্রয়োজনীয়তা তাঁদের বুঝে নিতে হবে এবং তারপর তাঁরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার হেরফের করবেন না। সাধারণতঃ কোন প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার পর সেখানকার শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের সেখান থেকে সরিয়ে আনা উচিত নয়।. সময় সময় অভিভাবকেরা ছেলেদের জন্য কোন চাকরির যোগাড় করতে পারলেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নাম কাটানোর ব্যবস্থা করেন। এরকম হওয়া উচিত নয়। আর বিবাহ বা সমজাতীয় কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ করে দেবার জন্য তাদের ছুটি নিতে বলাও সঙ্গত নয়। পিতামাতা যেমন তাঁদের অধিকাংশ অপরাপর কাজে ছেলেমেয়েদের টানেন না, তেমনি বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও তাদের টানা উচিত নয়। ছেলেমেয়েদের মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় পড়াশুনার উপর দেবার সুযোগ করে দিতে হবে। এছাড়া ছেলেদের শিক্ষাকালে আদর্শ ব্রহ্মচারী হবার শিক্ষা দিতে হবে। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠান দেখার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যদি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে মন দিয়ে পড়াশুনা করা ও ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে তা বাধক বিবেচিত হবে। সুতরাং এসব থেকে তাদের দূরে রাখা উচিত।···বিবাহ সম্বন্ধে এখানে যা বলা হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। যে সব অভিভাবক নিজেদের শিশুদের ভালভাবে ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানুষ করতে চান তাঁরা দেখতে পাবেন যে একাধিক ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ না বোঝার কারণেই তাঁরা তাঁদের সন্তানসন্ততিদের বিকাশে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁদের বিকাশের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়েছেন।

নবজীবন, ১৫-১২-১৯২১

শিক্ষা ও গৃহপরিবেশ

···কর্মীর ছেলেপুলেদের যদি আধুনিক শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে আমি কোন কার্যকরী পরামর্শ দিতে অপারগ। তবে কর্মীর সন্তানদের সুস্থ সবল সৎ ও বুদ্ধিমান গ্রামবাসী রূপে গড়ে তোলা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং তাদের পিতা যে গ্রামকে আবাসস্থল রূপে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাদের জীবিকানির্বাহের উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলা যদি এই শিক্ষার মানদণ্ড হয় তাহলে নিজের বাড়ীতে নিজের মা-বাবার কাছেই তারা এ শিক্ষা পেতে

পারে। এছাড়া এই শিক্ষার কল্যাণে যেদিন থেকে তাদের বোধশক্তি জাগবে এবং নিজেদের হাত-পাকে বিধিবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে পারবে, সেই দিন থেকে তারা পরিবারের আংশিক উপার্জনশীল সদস্য হতে পারবে। সুন্দর গৃহের মত ভাল বিদ্যালয় আর নেই আর সৎ ও চরিত্রবান পিতামাতার চেয়ে ভাল শিক্ষকও আর হয় না।

হরিজন, ২৩-১১-১৯৩৫

জনশিক্ষা ও সংবাদপত্র

আমার মতে সংবাদপত্রকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সংসারে এমন কিছু কিছু কাজ আছে যার সঙ্গে জনকল্যাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সব কাজকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ এই জাতীয় কাজ গ্রহণ করার লক্ষ্য হিসাবে যে আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত একে জীবিকার মাধ্যম মনে করলে সেই আদর্শ ম্লান এবং এমন কি ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে। আর সংবাদপত্রকে যখন কেবল জীবিকা নয় মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসাবেও জ্ঞান করা হয় তখন তো একাধিক দোষ এসে যায়। আজকে যে সংবাদপত্র-জগতে সেই সব দোষ বা পাপ প্রভূত পরিমাণে রয়েছে, একথা এ মহলের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না।

সংবাদপত্রের প্রাথমিক কার্য হল জনশিক্ষার প্রসার এবং জনসাধারণকে পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা। এ এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তবু আমরা দেখতে পাই যে জনসাধারণের পক্ষে সর্বদা সংবাদপত্রসমূহ-পরিবেশিত খবরে আস্থা রাখা সম্ভবপর নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে সংবাদপত্রের খবর থেকে সত্য ঘটনা একেবারে ভিন্ন। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অপরাপর কর্মীরা যদি এই কথা উপলব্ধি করেন যে জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচারই হল তাঁদের কর্তব্য, তাহলে প্রকাশযোগ্য সংবাদের সত্যতা ভালভাবে পরীক্ষা করে তবে তাঁরা তা ছাপাবেন। একথা সত্য যে তাঁদের অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। যেসব গাদা গাদা সংবাদ তাঁরা পান তাকে বাছাই করে হাতে যেটুকু সময় আছে তাড়াহুড়া করে তারই মধ্যে সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবুও

আমার মনে হয় যে কোন সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে যতক্ষণ না নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তা প্রকাশ না করাই ভাল।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে মান্যগণ্য ব্যক্তিদের বক্তৃতার যেসব বিবরণ বেরোয় তা প্রায়শঃ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে বা পরে স্মৃতির সাহায্যে সেই বক্তৃতার হুবহু অনুলিপি লেখার ক্ষমতা অল্প কয়েকজন লোকেরই আছে। এর ফলে বক্তব্যের বহু বিকৃতি ও অনুচিত পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেরা ব্যবস্থা হচ্ছে সাংবাদিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত বক্তৃতার প্রুফ বক্তার কাছে সংশোধনের জন্য পাঠানো। বক্তা যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই প্রুফ সংশোধন করে না পাঠান তাহলে সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষ নিজেদের সাংবাদিকের লেখা অনুলিপি প্রকাশ করতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায় যে সংবাদের প্রয়োজীয়তা বা গুরুত্ব বিচার না করে কেবল জায়গা ভর্তি করার জন্য যা-তা ছাপা হয়। এ অভ্যাস প্রায় সর্বব্যাপক। পাশ্চাত্য দেশেও এ রকম ঘটে। এর কারণ হল এই যে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই মুনাফার দিকে দৃষ্টি থাকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সংবাদপত্রসমূহ জাতির প্রভূত সেবা করছে এবং তাই এই সব দোষ-ত্রুটি লোকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু আমার মতে সংবাদপত্র দেশের সমপরিমাণ ক্ষতিও করছে। পাশ্চাত্য দেশে ছাইপাঁশ লেখায় ভর্তি এমন সব সংবাদপত্র আছে যা পড়াও পাপ। অনেক সংবাদপত্র তার নিজের পূর্ব সংস্কারের কারণ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়। বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা ও বিবাদের কারণ ঘটায় সংবাদপত্র। তাই সংবাদপত্র কেবল জনস্বার্থের সেবা করে বলেই নিন্দা-সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। সর্বসাকুল্যে দেখা যাবে যে সংবাদপত্রের লাভ ও লোকসান দুই-ই প্রায় সমান সমান।

গ্রাহকদের চাঁদা নয়, বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রধানতঃ আয় করা বর্তমানে সংবাদপত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। এর ফল হয় শোচনীয়। যে সংবাদপত্র তার সম্পাদকীয় রচনায় পানাসক্তির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখে, সেই সংবাদপত্রেই আবার মদ্যপানের সুফল বর্ণনাকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। একই সংবাদপত্রে আমরা ধূম্রপানের অপকারিতা এবং কোথায় ভাল তামাক পাওয়া যাবে তার হদিস ও কোন্ কোম্পানীর সিগারেট খেতে হবে—সেই খবর পড়ি। এমনও হয় যে, খবরের কাগজের এক দিকে কোন নাটকের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখা হল অথচ সেই কাগজেরই আর এক দিকে সেই নাটকের সপ্রশংস দীর্ঘ বিজ্ঞাপন

বেরোল। সংবাদপত্রসমূহে সব চেয়ে বেশী অর্থাগম হয় ঔষধের বিজ্ঞাপন থেকে যার কারণ দেশবাসীর বহু ক্ষতি হয়ে থাকে। এই সব কারণে সংবাদপত্রের অপরাপর উপকারের মূল্য প্রায় নস্যাৎ হয়ে যায়। এই সব বিজ্ঞাপনে কী ক্ষতি হয় আমি তা দেখেছি। বিজ্ঞাপনের চটকে প্রবঞ্চিত হয়ে অনেকে এই সব তথাকথিত পুরুষত্ব-বর্ধনকারী ও দৌর্বল্যে নিরাকরণকারী ঔষধপত্র কিনে থাকেন। এইসব ঔষধের অনেকগুলি দুর্নীতির পরিপোষক। বিস্ময়ের কথা এই যে ধর্মসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাতেও এজাতীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। পশ্চিম থেকে আমরা এই প্রথা শিখেছি। যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন আমাদের হয় এই অবাঞ্ছিত প্রথা বন্ধ করতে হবে, নচেৎ অন্ততঃ এর সংস্কার সাধন করতে হবে। বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: যে দেশে "রাজদ্রোহমূলক রচনা আইন" ও "ভারতরক্ষা আইন" প্রমুখ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধকারী আইনের অস্তিত্ব বিদ্যমান সে দেশের সংবাদপত্রের কর্তব্য কি? এই বাধাকে এড়াবার জন্য আমাদের সংবাদপত্রগুলি লেখার এমন একটি ধরন আবিষ্কার করেছে যাতে ঐসব আইনের আওতায় পড়ার সম্ভাবনাযুক্ত কোন রচনাকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকে তো এই উভয় অর্থবাচক লেখার কলাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলেছেন। কিন্তু আমার মতে এতে দেশের ক্ষতি হয়। এর পরিণামে দেশবাসী দ্ব্যর্থবোধক কথা বলতে শেখে এবং সত্য বলার সৎসাহস তারা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ভাষার রূপ পাল্টে যায় এবং ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম না হয়ে সত্য ভাব গোপন করার মুখোশে পর্যবসিত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে জনশিক্ষার পথ এ নয়। জনসাধারণ ও ব্যক্তি—সকলেরই মনের কথা খুলে বলার অভ্যাস করা দরকার। সংবাদপত্র তাঁদের এই শিক্ষা দিতে সক্ষম। সঠিক এবং শেষ অবধি আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক পন্থা হল এই যে যাঁরা ঐসব আইনের ভয়ে ভীত ও যাঁরা ওর আওতায় পড়তে চান না তাঁরা যেন সংবাদপত্র প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন, নচেৎ তাঁরা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের যথার্থ অভিমত ব্যক্ত করবেন এবং তার জন্য যে পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় হবেন। বিচারপতি স্টিভেন কোন এক স্থলে বলেছেন যে যার অন্তরে বিদ্বেষ নেই তাঁর বচনেও বিদ্বেষ থাকতে পারে না। আর অন্তরে যদি বিদ্বেষ থেকে থাকে তাহলে তাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা উচিত। কারও

যদি এই ভাবে আচরণ করার সাহস না থাকে তাহলে তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করবেন। এতেই আমাদের এবং আমাদের স্বদেশবাসীর মঙ্গল।

গুজরাতী 'বিচারসৃষ্টি' থেকে

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করলেন, "হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য ছাত্ররা কি করতে পারেন?

প্রশ্নটি ছিল গান্ধীজীর মনোমত। তিনি উত্তর দিলেন, "এর পথ খুবই সহজ। প্রতিটি হিন্দুও যদি গুণ্ডাভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং আপনাদের গালা-গালি দেন তবু আপনারা তাঁদের রক্ত-সম্বন্ধের ভাই ছাড়া আর কিছু মনে করবেন না। হিন্দু ছাত্রদেরও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব হবে। এরকম ঘটা কি অসম্ভব? না, বরং এর বিপরীত ঘটাই অসম্ভব। আর ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব জনসমুদয়ের পক্ষেও তা সম্ভবপর।

আজ সমগ্র পরিবেশই বিষাক্ত। সংবাদপত্রগুলি সব রকমের ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছে এবং জনসাধারণও তা বিশ্বাস করছেন। এর ফলে চতুর্দিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা মানবতার শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরস্পরের প্রতি বন্য পশুর মত আচরণ করছেন। অপর পক্ষ কি করল বা না করল বিবেচনা না করে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হল মানুষের ধর্ম। সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তবে বড় বেশী হলে তা দোকান-দারী। এমন কি চোর-ডাকাতরাও এটা করে থাকে। এতে কোন বাহাদুরি নেই। মানবতা লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে না। মানবতা মানুষকে নিজের তরফ থেকে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। সব মুসলমান যদি আমার পরামর্শ শোনেন তবে ভারতবর্ষে এমন দৃঢ়মূল শান্তি স্থাপিত হবে ছোরা-ছুরি অথবা লাঠি-সোঁটা যাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না। প্রতিশোধ-বৃত্তি অথবা পাল্টা প্ররোচনা না থাকলে শীঘ্রই দুষ্কৃতিকারী তার ছুরিমারা-রূপী কুকর্মে ক্লান্তি বোধ করবে। এক অদৃশ্য শক্তি তার উর্ধ্বে উত্থিত হস্তের গতিরোধ করবে এবং সেই হাত তার দুষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। আপনারা সূর্যের গায়ে ধূলা দেবার চেষ্টা করতে পারেন; কিন্তু তাতে তার ঔজ্জ্বল্যের হানি হবে না। এখনকার প্রয়োজন হল বিশ্বাস ও ধৈর্যে বুক বাঁধা। ঈশ্বর কল্যাণময় এবং দুষ্টামিকে তিনি একটা সীমার বাইরে বাড়তে দেন না।

হরিজন, ২৮-৪-১৯৪৬

শিক্ষাদর্শের সংক্ষিপ্তসার

শিক্ষা সম্বন্ধে আমার সম্ভবতঃ কিছু বিচিত্র ধারণা আছে যা আমার সহকর্মীরাও পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন নি। সংক্ষেপে এ নিম্নরূপ :

১. আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়বে।

২. তাদের শিক্ষা হবে প্রধানতঃ শরীরশ্রমমূলক। কোন শিক্ষাবিদ্-এর তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষা দিতে হবে।

৩. ছেলেমেয়েরা কোন্ কাজ করবে তা স্থির করার জন্য প্রত্যেকের বিশেষ প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৪. কোন কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেখানোর সময় সেই প্রক্রিয়ার সব কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৫. একটু বোধশক্তি হলেই শিশুদের সাধারণ জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। লিখতে পড়তে শেখা পরে এলে চলবে।

৬. শিশুকে প্রথমে সহজ জ্যামিতিক রেখা-চিত্র আঁকতে শেখানো হবে এবং এসব যখন সে সহজে আঁকতে শিখবে তখন তাকে অক্ষর লিখতে শেখানো হবে। এরকম করলে প্রথম থেকেই তার হাতের লেখা ভাল হবে।

৭. লেখার পূর্বে পড়তে শেখানো হবে। অক্ষরকে প্রথম ছবির মত চেনাতে হবে, তার পর শিশু তার নকল করবে।

৮. এইভাবে শিক্ষা পেলে আট বছর বয়স হতে না হতে শিশু তার শক্তি অনুযায়ী যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করবে।

৯. জোর করে শিশুকে কোন কিছু শেখানো হবে না।

১০. শিশুকে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তার সম্বন্ধে তার মনে যেন আগ্রহ জন্মে।

১১. শিক্ষা শিশুর কাছে খেলার মত মনে হবে। আর খেলাও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

১২. মাতৃভাষার মাধ্যমে সব শিক্ষা দেওয়া হবে।

১৩. অক্ষরজ্ঞানের পূর্বে শিশুর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি-উর্দুর পরিচয় ঘটাতে হবে।

১৪. ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষকের আচার-ব্যবহার দেখে এবং এ সম্বন্ধে শিক্ষকের কথাবার্তা শুনে শিশু এ সম্বন্ধে শিখবে।

১৫. শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় হল নয় থেকে ষোল বছর বয়স।

১৬. এই দ্বিতীয় পর্যায়েও ছেলেমেয়েরা যথাসম্ভব সহশিক্ষা পাক—এটা বাঞ্ছনীয়।

১৭. এই পর্যায়ে হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত এবং মুসলমান ছাত্রদের আরবী শেখানো হবে।

১৮. দ্বিতীয় পর্যায়েও শরীরশ্রম চলবে। প্রয়োজনমত সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষার জন্য এবার বেশী করে সময় বরাদ্দ করতে হবে।

১৯. এই পর্যায়ে ছেলেদের তাদের বংশগত পেশা এমন ভাবে শেখাতে হবে যে স্বেচ্ছায় তারা যেন সেই পেশা গ্রহণ করে তার দ্বারা নিজ জীবিকা উপার্জন করতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

২০. এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল উদ্ভিদ্‌বিদ্যা জ্যোতিষ গণিত বীজগণিত জ্যামিতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে।

২১. প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এই সময় সেলাই ও রান্না করতে শিখবে।

২২. ষোল থেকে পঁচিশ হল তৃতীয় পর্যায় যখন প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী নিজের ইচ্ছা ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে (৯-১৬) শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কোন না কোন শিল্পে কাজ করছে এবং সেই শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের আয় থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

২৪. উৎপাদন-কার্য একেবারে গোড়ার পর্যায় থেকেই আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এর দ্বারা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না।

২৫. শিক্ষকদের খুব উচ্চ বেতন দেওয়া চলবে না, নেহাত যতটুকু না হলে নয় তা-ই তাঁরা পাবেন। তাঁরা সেবা-ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যে-কোন আজেবাজে লোককে নেওয়া ঘৃণ্য ব্যাপার। প্রত্যেকটি শিক্ষক সচ্চরিত্র হবেন।

২৬. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বৃহৎ ও ব্যয়বহুল অট্টালিকার প্রয়োজন নাই।

২৭. ইংরাজী শেখানো হবে অনেকগুলি ভাষার মধ্যে একটি হিসাবে। হিন্দী যেমন রাষ্ট্রভাষা ইংরাজীরও তেমনি ব্যবহার হবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য।

২৮. নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পারি না যে পুরুষদের শিক্ষা থেকে তা পৃথক হবে কিনা এবং হলে কখন তার সূত্রপাত হবে। তবে

আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, নারীদের পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা তো পাওয়াই উচিত, এমন কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ সুবিধা পাবেন।

২৯. অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নৈশবিদ্যালয় থাকবে। তবে আমার মনে হয় না যে প্রাপ্তবয়স্কদের লিখতে পড়তে ও গণিত শেখানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের সাধারণ জ্ঞান প্রাপ্তিতে সাহায্য করা হবে এবং তাঁরা যদি চান তাহলে আমরা তাঁদের লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষতে শেখাব।

'আশ্রম অবজারভেনশেস্ ইন্ অ্যাকশান' থেকে

স্বাধ্যায়

শুধু স্কুল-কলেজে গেলেই জ্ঞানার্জন হয়—একথা মনে করা প্রচণ্ড কুসংস্কার। স্কুল-কলেজ সৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবীতে অলোকসামান্য মেধাসম্পন্ন ছাত্রের অপ্রতুলতা ছিল না। স্বাধ্যায়ের মত মহান্ ও স্থায়ী জিনিস আর কিছু নেই। স্কুল আর কলেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শুধু জ্ঞানের বাহাড়ম্বরটুকুর মাননীয় অধিকারীর মর্যাদা দেয়। শাঁস ছেড়ে আমরা খোসা নিয়ে তৃপ্ত হই। অযথা আমি স্কুল-কলেজের নিন্দা করতে চাই না। ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা কিন্তু এ নিয়ে বড় বেশী রকম বাড়াবাড়ি করছি। এগুলি জ্ঞানার্জনের বহুবিধ মাধ্যমের একটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৬-১৯৩১

খাদি

কি ও কেন

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ

সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রস্তাবনা

॥ ১ ॥

চরখার পুনরুদ্ধার কী করে করলাম

১৯০৮ সালের কথা। তখন আমি লণ্ডনে। চরখার কথা সেখানেই প্রথম মনে উদিত হয়। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি শুভেচ্ছা মিশন নিয়ে সেখানে-যাই এবং বহু উৎসাহী ছাত্র ও ভারতবাসীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্পর্কে কয়েকবার আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, চরখা ব্যতীত স্বাধীনতা সম্ভবপর নয়। অচিরেই আমার মনে হয় সকলকে সূতা কাটতে হবে। কিন্তু সে সময় তাঁত ও চরখার পার্থক্য কি তা আমার জানা ছিল না। 'হিন্দ স্বরাজ' নামক পুস্তকে চরখা অর্থে তাঁত শব্দের ব্যবহার করি।

যদিও চরখার কথা ১৯০৮ সালে প্রথম চিন্তা করি কিন্তু আসল কাজ শুরু হয় তিন বছর ধৈর্য সহকারে কঠোর পরিশ্রমের পর ১৯১৮ সালে। খাদির প্রথম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয় ১৯১৯ সালে। (বোম্বের ফ্যাশানপ্রিয় মহিলাদের সুবিধার্থে এই প্রতিজ্ঞা খুব শিথিল ছিল।) কংগ্রেসের কার্যসূচীতে ১৮২১ সালে চরখার স্থান হয়। এরপর থেকে এই আন্দোলনের ইতিহাস সকলের কাছে সুস্পষ্ট। সে ইতিহাস প্রায় দু'হাজার খাদি কর্মী এবং সত্তর হাজার কাটুনীর জীবনেতিহাসরূপে আজও রচিত হচ্ছে। কাটুনীদের জীবনে চরখা আশার আলোক প্রজ্বলিত করেছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৯-১৯২৮

॥ ২ ॥

আশ্রমে মিলের সূতা বন্ধ

১৯১৫ সালে প্রথম আমি তাঁতের কাজ করি তার পরে সূতা কাটার কাজ করি। এই হাত দিয়েই বিদেশী মিল ও দেশী মিলে প্রস্তুত সূতায় কাপড় বুনেছি। তাঁতে বসে কাপড় বুনছিলাম। বুনতে বুনতে মনে চিন্তা এল যখন এই কাপড় বোনার জন্য মিলগুলি আরও সংগঠিতরূপে কাজ শুরু করে দিবে তখন আমার দশা কী হবে, এই হাজার হাজার তাঁতির অবস্থা কী হবে? এই কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের

গ্রামগুলির লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ভগ্নীর কথা মনে পড়ল, তাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। অবশেষে এমন একজন কাটুনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম যিনি আমাদের সুতা কাটা শেখাতে সক্ষম হবেন। আরও অনুসন্ধান করতে লাগলাম যে, এমন কোন গ্রাম আছে কিনা যেখানে গেলে সুতা কাটার কাজ প্রত্যক্ষ করা যাবে। সে সময় আমার জানা ছিল না যে, পাঞ্জাবের কতিপয় ভগ্নী তখনও সুতা কাটেন। আমি ধীরে ধীরে নিরাশার আঁধারে ডুবছিলাম, এমন সময় এক বীরাঙ্গনা বিধবার আশ্রয় পেলাম। তিনি অস্পৃশ্যদের সেবাকার্যে লিপ্ত ছিলেন। উক্ত মহিলা আমার এই গভীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করলেন। আমি তাঁকে এই দায়িত্ব অর্পণ করলাম যে, তিনি গুজরাটের সর্বত্র ঘুরবেন এবং যে সকল ভগ্নীর হাতে তখনও চরখা-শিল্প বেঁচে আছে তাদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন না। তিনি সন্ধান পেলেন যে, গুজরাটের বীজাপুরে কতিপয় মুসলমান ভগ্নী আছেন যাঁরা চরখা চালাতে রাজী আছেন যদি তাঁদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সুতা আনা হয়। সেই মুহূর্ত থেকেই এই মহান্ পুনরুদ্ধারের প্রয়াস শুরু হয়ে গেল। এখন ভারতের পনের হাজারেরও অধিক গ্রামে সেই প্রচেষ্টা বিস্তারলাভ করেছে। এই অনুসন্ধানের পরই আমি স্থির করলাম যে, আমি যে আশ্রমের পরিচালক সে আশ্রমে বিদেশী অথবা মিলের সুতা আদৌ বুনা হবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-১৯২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ চরখা কেন

॥ ৩ ॥

আর্থিক ও নৈতিক পুনরুত্থান

আমার দৃঢ় বিশ্বাস চরখা ও হস্তচালিত তাঁতের পুনরুদ্ধারের দ্বারা ভারতের আর্থিক ও নৈতিক পুনরুত্থানের কাজে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাহায্য প্রদান করা হবে। কোটি কোটি লোকের কৃষি কাজের আয়ের আরও বৃদ্ধির জন্য কোনও একটি সহজ শিল্পের প্রয়োজন। বহু বছর পূর্বে চরখা সেই কুটির শিল্পের স্থান অধিকার করে ছিল। কোটি কোটি লোককে অনাহারজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে গৃহে গৃহে চরখা পুনরায় শুরু করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে তাঁত চালাতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-১৯২০

॥ ৪ ॥

দারিদ্র্য নিরসনের জন্য চরখা

বড় বড় মেশিন চালিয়ে যদি ভারতের দারিদ্র্য এবং উক্ত মেশিন কর্তৃক সৃষ্ট বেকার সমস্যা দূরীভূত হয় তবে আমি সেই মেশিনের প্রশংসা করব। চরখা নিজেই একটি মেশিন। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এর সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। একমাত্র প্রশ্ন, যার সঙ্গে ভারত এবং মানব-প্রেমীদের সংগ্রাম করতে হবে, তা হচ্ছে ভারতের দারিদ্র্য থেকে উৎপন্ন দুঃখের নিবারণ কী করে করা যায়।

যদি ভারতীয় নরকঙ্কালদের চিত্র মানসপটে চিন্তা করেন তবে আমাদের সেই শতকরা আশীজন লোকের কথা ভাবতে হবে যারা মাঠে কাজ করে এবং যাদের হাতে বছরে কমপক্ষে চার মাস প্রায় কোন কাজ থাকে না এবং এই কারণে অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর কাছাকাছি থাকে। এই হচ্ছে সাধারণ পরিস্থিতি। এই সকল নরনারী নিজেদের ঘরে বসে সহজে এমন কি কাজ করতে পারে যার দ্বারা তাদের সেই স্বল্প আয়ের বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে? এখনও কি এতে কারও সন্দেহ আছে যে সেই কাজ হচ্ছে সুতা কাটা, অন্য কিছু নয়!

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১১-১৯২১

॥ ৫ ॥

খাদির কাপড়ই সস্তা

যেমন গৃহে আহার্য প্রস্তুত করে নিলে মহার্ঘ হয় না এবং হোটেলের খাদ্যবস্তু সে স্থান নিতে পারে না, সেরূপ ঘরে ঘরে সুতা কাটা এবং কাপড় বোনা মহার্ঘ হতে পারে না। আমাদের লোকসংখ্যার ২৫ কোটিরও অধিক ব্যক্তি নিজেদের হাতে সুতা কাটবে এবং সেই সুতায় আশেপাশে কাপড় বুনে নেবে। এই লোকসংখ্যা কেবল জমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এরা সারা বছরে কমপক্ষে চার মাস কর্মহীন অবস্থায় থাকে।

যদি এই সব লোকে এই সময়টা চরখা চালায় এবং সেই সুতায় কাপড তৈরী করে নিজেরা ব্যবহার করে তবে তাদের সেই খাদির সঙ্গে কোনও মিলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হবে না। এই প্রকারে প্রস্তুত কাপড় সস্তার চেয়েও সস্তা হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২১

॥ ৬ ॥

কাতাইর স্বপক্ষে যুক্তি

কাতাইর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি দেখানো হয়:

১। যাদের ফুরসৎ আছে এবং কিছু পয়সারও প্রয়োজন তারা সহজেই এর দ্বারা উপার্জন করতে পারে।

২। সহস্র সহস্র লোকের এ কাজ জানা আছে।

৩। এ কাজ সহজেই শেখা যায়।

৪। এতে প্রায় কোন পুঁজির দরকার হয় না।

৫। চরখা সহজেই এবং সস্তায় তৈরী করা যায়। আমাদের অনেকেরই জানা নাই যে এক টুকরা খোলামকুচি ও ক্ষুদ্র একফালি বাঁশের টুকরা দিয়ে তৈরী তকলীতেও সুতা কাটা যায়।

৬। এই কাজে লোকের অরুচি নাই।

৭। এর দ্বারা অনটন ও দুর্ভিক্ষের সময় আশু সাহায্য পাওয়া যায়।

৮। বিদেশী বস্ত্র ক্রয়ের দ্বারা ভারতের যে অর্থ বাইরে যায় তা বন্ধ করা যেতে পারে।

৯। এইরূপে যে কোটি কোটি অর্থ বাঁচে তা স্বাভাবিক রূপেই এর যোগ্য-পাত্র গরীবদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়।

১০। এর ক্ষুদ্রতম সাফল্যের দ্বারাও লোকে অনেক সাময়িক সাহায্য পেতে পারে।

১১। জনগণের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করার এ এক অত্যন্ত শক্তিশালী সাধন।

এ কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী মধ্যমশ্রেণীর লোকের মধ্যে থেকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাবই এই কাজে সাফল্য অর্জনের পথে একটা অন্তরায়। এ ছাড়া বড় অসুবিধা হচ্ছে মিলের চমৎকার কাপড়ের পরিবর্তে খাদি গ্রহণের রুচি লোকের নাই। মধ্যবর্তীকালীন সময়ে খাদির মহার্ঘতাও এক সমস্যা। যদি খাদির অনুকূলে অধিক সংখ্যক লোকের মত থাকে তবে একে মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার যোগ্য করা যেতে পারে। এতে সন্দেহ নাই যে এই আন্দোলন সফল করতে হলে কিছু লোককে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সোজাসুজি এই ত্যাগের প্রয়োজন হত না যদি সরকার আমাদের নিজেদের হত। কারণ সে সরকার কৃষকদের চাহিদার উপর দৃষ্টি দিত এবং বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হত। সাময়িকভাবে যদি মধ্যমশ্রেণী স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করে তবে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যেরূপ কাজ হতে পারে সেরূপ কাজই হবে।

শক্তির অপচয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে হাজার হাজার ভগ্নীকে ডঃ রায় প্রথমে দানের অন্ন দিতেন আর এখন সসম্মানে কাজ দিয়ে আংশিক বা পূর্ণ স্বাবলম্বী করে দিচ্ছেন তাদের কি শক্তির অপচয় হচ্ছে? ভিক্ষা করা অথবা অনাহারে মৃত্যু ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন কাজ নাই। তাদের প্রয়োজনীয়-তার কথা উপলব্ধি করে তাদের দুঃখ অনুভব করে তাদের উন্নতির জন্য যে নব-যুবকগণ গ্রামে যাচ্ছে তারা কি নিজ শক্তির অপব্যয় করছে? হাজার হাজার সঙ্গতিসম্পন্ন যুবক-যুবতী যদি কোটি কোটি অন্নহীন বস্ত্রহীন দরিদ্রের কথা চিন্তা করে ধর্মবোধ থেকে আধঘণ্টা করে সময় সূতা কাটার জন্য দেয় তবে কি শক্তির অপচয় হচ্ছে বলা হবে? কারও কাছে যদি অন্য কোন কাজ না থাকে এবং কিছু পয়সার জন্য সূতা কাটে তবে ততটুকু লাভ তো হবেই, আর কেউ যদি

যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে কাটে তবে তাতেও লাভ আছে। এই প্রকার যদি এমন কোন কাজ থাকে যাতে কেবলই লাভ এবং কোনও ক্ষতি নাই তবে তা হচ্ছে সুতা কাটার কাজ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৮-১৯২৪

॥ ৭ ॥

শ্রমই অর্থ

জনসাধারণের নিকট অর্থাভাবেরচেয়ে কর্মাভাবের সমস্যাই অধিক। শ্রমই অর্থ। কেউ যদি কোটি কোটি লোকের কর্মের সংস্থান করে দিতে পারে তবে বলতে হবে অন্ন-বস্ত্র অথবা অর্থের ব্যবস্থাই সে করে দিল। চরখার দ্বারা অনুরূপ কর্মের ব্যবস্থা করা যায়। যে পর্যন্ত এ অপেক্ষা অধিকতর ভাল কিছু না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত চরখাই চালাতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৬-১৯২৫

॥ ৮ ॥

কর্মাভাবই আসল কথা

কর্মাভাবই সকল মন্দের মূল। যদি এই মূল উৎপাটিত করা যায় তবে অন্য কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেই অধিকাংশ মন্দের সংশোধন করা যেতে পারে। অনাহারে মরছে এমন জাতির নিকট কোন আশা বা উন্মেষণীশক্তির কল্পনা করা যায় না। এইরূপ জাতি অপরিচ্ছন্নতা এবং রোগের প্রতি অবহেলা করে। যে কোন সংস্কার করার কথা তুললেই বলবে 'এতে লাভ কী'? জীবনদায়ী চরখার দ্বারা কোটি কোটি লোকের নিরাশার এই কুয়াশা আশার আলোকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-১৯২৫

॥ ৯ ॥

গড় আয় ও চরখা

আমাদের দেশের প্রতি ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় আয় কত আপনার জানা আছে কি? আমাদের অর্থশাস্ত্রীরা বলেন, ছয় পয়সা। কিন্তু এই হিসাব নির্ভুল

নয়। নদীর জল কোথাও দু' ফুট, কোথাও ছ' ফুট এই হিসাবে এর গড় গভীরতা চার ফুট মনে করে কেউ যদি নদী পার হতে চায় তবে সে ডুবে যাবে না কি? পরিসংখ্যান সর্বদা সঠিক কথা বলে না। গরীব থেকে আরম্ভ করে ভাইসরয় এবং কোটিপতির আয়ের হিসাবের উপরে গড় আয় নির্ণয় করা হয়। আসলে প্রতি ব্যক্তির বাস্তবিক আয় খুব বেশী হলে তিন পয়সা হবে। যদি চরখা চালিয়ে আমি এই আয় তিন পয়সার অধিক করে দিই তবে চরখাকে কামধেনু বলা কি ভুল হবে? কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, ভারতে দারিদ্র্য নাই এবং কতিপয় লোকমাত্র অল্প কিছু পয়সার অভাবে অনাহারে মরছে তবে আমি নিজের ভুল স্বীকার করে নেব এবং চরখাকে নষ্ট করে দেব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৩-১৯২৭

॥ ১০ ॥

কবি ও চরখা

...তিনি* ভেবেছেন যে, আমি চাই সকলে তাদের সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সময় সুতা কাটুক। অর্থাৎ আমি চাই যে, কবি তাঁর অনুধ্যান ত্যাগ করুন, কৃষক তার লাঙ্গল ফেলে দিক, আইনজীবী তাঁর মোকদ্দমা এবং ডাক্তার তাঁর শল্য-চিকিৎসার অস্ত্র সরিয়ে রাখুন। কিন্তু সত্য কথা হল যে, আমি কাউকে তার কাজ পরিত্যাগ করতে বলি নি। বরং এই কথা বলেছি যে, তাঁরা সমগ্র জাতির জন্য আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে প্রতিদিন মাত্র ত্রিশ মিনিট করে সুতা কেটে তাঁদের নিজেদের কাজকে ভূষিত করুন। অবশ্য যে সকল অনশনক্লিষ্ট পুরুষ অথবা নারী যে-কোন কাজের অভাবে অলস তাদের আমি জীবিকার জন্য সুতা কাটতে বলেছি এবং অর্ধ-অনশনে যে সব কৃষক রয়েছে তাদের বলেছি অবসর সময়ে সুতা কেটে পরিপূরক উপার্জনের ব্যবস্থা করতে। কবি যদি দিনে আধঘণ্টা করে সুতা কাটেন তবে তাঁর কবিতা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কেননা তা হলে তাঁর কবিতা

*কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চরখা সমর্থন করেন না বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার তাঁর সমালোচনা করেন। তার উত্তরে 'চরখা' এই নামে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এর উত্তরে গান্ধীজী যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাঙলা ও বাঙালী' পুস্তক থেকে এখানে প্রয়োজনীয় অংশ দেওয়া হল মাত্র।—সম্পাদক।

এখনকার চেয়ে স্পষ্টতররূপে দরিদ্রের প্রয়োজন ও দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

কবি মনে করেন যে, চরখা জাতির কাছে মৃত্যুর শীতলতা বহন করে আনবে আর তাই একে পরিহার করতে চান। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, অযুত ভারতবাসীর মধ্যে যে অত্যাবশ্যক এবং জীবন্ত একত্ব রয়েছে চরখা তাকেই উপলব্ধি করতে চায়। জাঁকজমকশালী এবং বহু আকৃতির ও বর্ণের বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি প্রকৃতির উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় এবং আকারের মধ্যে একটি ঐক্য লক্ষ্য করেন তিনিও নির্ভুল। যে কোন দুটি লোক এক রকম হয় না, এমন কি যমজেরাও এক রকম নয়, তবু এমন অনেক জিনিস আছে যা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্যরূপে সমান। আর আকারের এই সমানত্বের পেছনে রয়েছে একই জীবন, যা সর্বব্যাপী।...আমাদের যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে আমরা যেমন শ্বাস নেবার জন্ত ইংলণ্ড থেকে বাতাস আমদানি করতে পারি না, এমন কি খাদ্যদ্রব্যও আমদানি করতে পারি না, তেমনি ইংলণ্ড থেকে কাপড়ও যেন আমরা আমদানি না করি। এই নীতিকে যুক্তির শেষ সীমায় টেনে নিয়ে যেতে এবং এই কথা বলতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই যে, বাংলা দেশ যেন বোম্বাই থেকে অথবা বঙ্গলক্ষ্মী থেকে তার কাপড় আমদানি না করে। বাংলা দেশ যদি ভারতবর্ষকে অথবা বহির্বিশ্বকে শোষণ না করে, স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবন যাপন করতে চায়, তবে সে যেমন তার খাদ্যশস্য গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন করে নেয়, তেমনি ভাবে কাপড়ও তাকে প্রতি গ্রামে উৎপাদন করে নিতে হবে। যন্ত্রের একটি নিজস্ব স্থান আছে, এ থাকবে বলেই এসেছে। কিন্তু একে প্রয়োজনীয় মানব-শ্রমকে স্থানচ্যুত করতে দেওয়া হবে না। উন্নত ধরনের লাঙ্গল ভাল জিনিস। কিন্তু দৈবাৎ কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কোন একজন মানুষ যদি ভারতবর্ষের সকল জমি চাষ করে এবং সমস্ত কৃষি-উৎপাদনের উপর আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখে, তবে অন্তদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোন কাজ না পেয়ে অনশনে থাকবে, অলস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা নির্বোধ ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং অনেক লোভনীয় অবস্থায় পতিত হবে। কুটির শিল্পের প্রতিটি উন্নতিকে আমি স্বাগত করি। কিন্তু আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঘরে কোন কাজ না দিয়ে বিদ্যুৎ-চালিত টেকোর দ্বারা মানুষের শ্রমকে স্থানচ্যুত করা অপরাধ।...

॥ ১১ ॥

সমবণ্টনের পরিকল্পনা

সমালোচকদের একমাত্র অভিযোগ চরখার দ্বারা উপযুক্ত আয় হয় না। কিন্তু এর দ্বারা যদি এক পয়সাও রোজ আমদানি হয় তবে তা কম নয়। কেননা মনে রাখতে হবে আমাদের দৈনিক গড আয় ছ' পয়সা মাত্র, সেক্ষেত্রে প্রতিটি আমেরিকানের গড় আয় দৈনিক ১৪ টাকা এবং প্রতিটি ইংরেজের ৬ টাকা। যেখানে একেবারে কিছুই নাই চরখা সেখানে কিছু না কিছু উৎপন্ন করবেই। যদি এই চরখার দ্বারা দেশের ষাট কোটি টাকা বাঁচানো যায়—এবং তা অবশ্যই সম্ভবপর—তবে রাষ্ট্রীয় আয়ে আমরা এক বৃহৎ বৃদ্ধিসাধন করতে পারি। এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের গ্রামগুলি স্বাভাবিক রূপেই সংগঠিত হয়ে উঠবে। আর এই প্রভূত অর্থ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টিত হবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা এই প্রভূত অর্থের ন্যায়পূর্ণ এবং প্রায় সমবণ্টনের পরিকল্পনা স্বরূপ। তা ছাড়া এইরূপ সমবণ্টনের নৈতিক গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করলে চরখার স্বপক্ষে যুক্তি আরও অকাট্য হয়ে পড়ে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-২-১৯২৭

॥ ১২ ॥

হরিজনদের সাহায্যকারী চরখা

পরিভ্রমণের সময় দেখেছি কাতাই এবং বুনাই এমন একটি শিল্প যা হাজার হাজার হরিজনদের অবলম্বন স্বরূপ। এই শিল্পকে ভালভাবে সংগঠিত করলে আরও অধিক লোকের অবলম্বন হবে। কোন কোন স্থানে এমন তাঁতীও পাওয়া যায় যাহাদিগকে তাদের এই পেশার জন্য অস্পৃশ্য মনে করা হয়। এরা সাধারণতঃ মোটা এবং সাধারণ খাদ্রিই বুনে। এই সব লোক দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাদি এসে এদের মোটা কাপড়ের চাহিদা উৎপন্ন করে তাদের রক্ষা করছে। বহু হরিজন পরিবার সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করে। এইভাবে খাদি গরীবের জীবনে দু প্রকারের সাহায্য করে। সর্বাপেক্ষা গরীব লোককে এ সাহায্য করে আর এই গরীবদের অধিকাংশই হরিজন। হরিজনরা গরীব অপেক্ষাও অধিক নিঃসহায়। কারণ বহু শিল্প যা অন্যে জানে হরিজনরা তা জানে না।

হরিজন, ২৭-৪-১৯২৪

॥ ১৩ ॥

চরখা ও স্বাস্থ্য

এ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণ সমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে কাতাই একটি চমৎকার কলা এবং এর পদ্ধতি বড়ই মনোরম। ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সুতা উৎপন্নের জন্য কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত নয়। কলার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সুতা কাটে তার জানা আছে যে যখন ইচ্ছানুযায়ী নম্বরে সুতা কাটার জন্য আঙুল ও চোখ অভ্রান্ত ভঙ্গীতে কাজ করে তখন কি আনন্দ পাওয়া যায়। সত্যিকারের কলা শান্তিদায়ক। এক বছর পূর্বে আমি স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনীর উদাহরণ দিয়েছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর চরখা চালিয়ে তাঁর শারীরিক স্নায়ুসমূহ প্রচুর শান্তি পেত এবং গভীর নিদ্রা হত। এক ভগ্নীর অশান্ত স্নায়ুসমূহ কাতাইর দ্বারা কিভাবে শান্তি লাভ করত নিম্নের পত্রাংশ থেকে তা বোঝা যাবে।

"যখন····· দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম। অন্ধকারের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা আমার আপাদমস্তক বিদীর্ণ করতে লাগল। আমি কিছু সময়ের জন্য প্রার্থনা করলাম ও শান্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম এবং পরে চরখা নিয়ে বসতেই যেন জাদুস্পর্শের ন্যায় আরাম বোধ করলাম। এর শান্ত ও নিয়মিত ছন্দোময় গতি আমাকে সুস্থির করল এবং এর সেবাময় চিন্তা আমাকে ঈশ্বরের আরও নিকটবর্তী করে দিল।" অনুরূপ অভিজ্ঞতা দু'-একজন নয় বহু কাটুনীরই হয়েছে। তবুও একথা বলে লাভ নেই যে, অনেকেই সুতা কেটে আনন্দ পায় সুতরাং সকলেই তা পাবে। ছবি আঁকা একটি উৎকৃষ্ট কলা কিন্তু সকলেই তা পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-১৯২৬

॥ ১৪ ॥

'নিউইয়র্ক পোস্টের' মিঃ ফ্রিম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মনে করেন চরখার দ্বারা রোগেরও উপশম হয়?"

"হ্যাঁ", গান্ধীজী উত্তরে বললেন, "এ বিষয়ে গ্লাসগোর এক অধ্যাপকের প্রেরিত কিছু সাহিত্য আমি পড়েছি। বাংলাদেশের এক অবসরপ্রাপ্ত জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে লিখেছিলেন যে প্রধানতঃ এর ছন্দোবদ্ধ গতির শান্তিদায়ক প্রভাবের জন্য পাগলদের চিকিৎসার পক্ষেও চরখা উপযুক্ত।"

মিঃ ফ্রীম্যান বললেন, "আমি আমেরিকানদের বোঝাতে চাই যে চরখা এক

'মননশীল যন্ত্র'। আমি যখন চরখার ক্লাসে চরখা নিয়ে একা বসি তখন তা আমাকে চিন্তার প্রেরণা যোগায়। যদি আমেরিকাবাসী চরখা চালাতে শুরু করে তবে তারা কিছু চিন্তা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া তাদের পক্ষে সময় পাওয়া সম্ভবপর নয়।

হরিজন, ১৭-১১-১৯৪৬

॥ ১৫ ॥

চরখা ও ব্রহ্মচর্য

যারা ব্রহ্মচর্য পালন করতে চায় তাদের চরখার কথা বলব। এটা অবজ্ঞার বস্তু নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। বিকারসমূহ বশে রাখার জন্য স্থৈর্যের প্রয়োজন। সমূহ আভ্যন্তরীণ অশান্তির লোপ হওয়া আবশ্যক। চরখার গতি এত শান্ত ও সৌম্য-যে, শ্রদ্ধার সঙ্গে চালালে সমস্ত বিকার শান্ত হয়ে যাবে। চরখা চালিয়ে আমি নিজের ক্রোধ দমন করতে সক্ষম হয়েছি। আরও ব্রহ্মচারীদের নিকট থেকে অনুরূপ প্রমাণ দিতে পারি। অবশ্য এই ব্যক্তিদিগকে মূর্খ ও অবোধ বলে উপহাস করাটা সহজ হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর জন্য কম মূল্য দিতে হবে না। কারণ বিদ্রূপকারী আবেগবশতঃ একটি এমন সুন্দর সাধন হারিয়ে ফেলে যার দ্বারা সে নিজের বিকারসমূহ শান্ত ক'রে শক্তি ও সামর্থ্য লাভে সক্ষম হতে পারে। যারা আমার এই কথাগুলি পাঠ করছে সেই সব যুবক-যুবতীদের চরখা চালাতে বিশেষভাবে সুপারিশ করছি। চরখা নিয়ে বসার কিছুক্ষণ পরেই তারা বুঝতে পারবে তাদের সকল বিকার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি না যে চরখা চালানো বন্ধ করার পরও সমস্ত দিন বিকারগুলি শান্ত থাকবে। কারণ মানুষের কামনা হাওয়াপেক্ষাও দ্রুতগামী। একে সম্পূর্ণ বশে রাখতে হলে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। আমার কথা হচ্ছে স্থৈর্যপ্রাপ্তির জন্য তাদের নিকট চরখা এক শক্তিশালী সাধন স্বরূপ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-১৯২৬

॥ ১৬ ॥

চরখা : সমবায়ের প্রচেষ্টা

চরখা কোটি কোটি লোককে সংগঠিত করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করে। লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ জোগায় এবং কোটি কোটি জীবনকে মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গ করে। এছাড়া ভগীরথতুল্য এত বড় কাজ করার পর আমরা নিজেরাও

এক বৃহৎ শক্তির দর্শন পেতে পারি। চরখা চালাতে গিয়ে গ্রামের অসংখ্য জটিল সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হবে। আমরা প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখতে শিখব, গ্রামে গ্রামে স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় থাকতে শিখব, আমাদের পথের সকল বাধা-বিপত্তি দূর করতে চেষ্টা করব ইত্যাদি। কারণ এইসব জিনিস না শিখলে এ কাজ সম্পূর্ণ হবে না। এই প্রকারে চরখার দ্বারা আমরা নিজেদের মধ্যে এই সকল ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-১৯২৬

॥ ১৭ ॥

গত বৎসর মাদ্রাজে এক সমবায় সমিতিতে ভাষণ দেবার সময় বলেছিলাম, চরখার দ্বারা আমি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমবায় সমিতি স্থাপনের প্রচেষ্টা করছি। সমবায় তো শুরু থেকেই হওয়া দরকার।

উদাহরণ স্বরূপ কোনও কেন্দ্রের কার্যপদ্ধতির কথা ধরুন। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কাটুনীদের জন্য কার্পাস একত্রিত করা হয়। বোধ হয় কেন্দ্রেই তার বীজ ছাড়ানো হয়। পরে তা পাঁজ তৈরীর জন্য ধুনকরকে দেওয়া হয়। পাঁজ হয়ে গেলে কাটুনীদের তা বণ্টন করা হয়। কাটুনীরা সপ্তাহে সপ্তাহে সূতা নিয়ে আসে এবং পরিবর্তে পারিশ্রমিক এবং নূতন পাঁজ নিয়ে যায়। এর পর সূতাগুলি বোনার জন্য তাঁতিকে দেওয়া হয়। কাপড় হয়ে গেলে খাদি-বস্ত্ররূপে তা সকলকে বিক্রয় করা হয়। এইরূপে কেন্দ্রীয় কার্যালয়কে জাতি বর্ণ ও ধর্মভেদ না করে সর্বসাধারণের সঙ্গে সর্বদা সমান সম্পর্ক রাখতে হয়। কারণ কেন্দ্র কোন লাভের বাসনা রাখে না। অধিক সংখ্যক দরিদ্র ব্যতীত কারও চিন্তা তাকে করতে হয় না। কেন্দ্রকে কার্যকরী রাখতে হলে সকল পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়। কেন্দ্র এবং এই বিশাল সংগঠনের সকল অঙ্গের মধ্যে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুতরাং চরখার কেন্দ্র একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। যারা তুলার বীজ ছাড়ায়, তুলা পেঁজে, তুলা ধোনে, সূতা কাটে, কাপড় বোনে এবং কাপড় খরিদ করে সকলেই এর সদস্য। এরা সকলেই পরস্পর সদ্ভাব ও সেবার বন্ধনে বাঁধা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৬-১৯২৬

॥ ১৮ ॥

চরখা একমাত্র সার্বজনীন শিল্প

আমাদের উপযোগী শিল্পসমূহ একটি একটি করে খুঁটিয়ে দেখার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি যে, লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে চরখাই একমাত্র শিল্প যা ব্যাপক-রূপে চলতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য শিল্পের কোনও গুরুত্ব নাই অথবা তা অকেজো। আসলে অন্য যে কোনও শিল্পের দ্বারা অধিক আয় করা যায়। ঘড়ি তৈরী করা নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত আয়বর্ধক এবং চমৎকার শিল্প। কিন্তু ঐ কাজে কতজনেরই বা দরকার? লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীদের পক্ষে কি তা সম্ভবপর? কিন্তু গ্রামবাসীগণ যদি নিজেদের গৃহ পুনর্রচনা করে এবং নিজেদের পিতৃপিতামহের ন্যায় পুনরায় বাস করতে আরম্ভ করে দেয়, নিজেদের বেকার সময়ের সদুপযোগ করতে থাকে তবে অন্যান্য সমস্ত শিল্প স্বভাবতঃই পুনর্জীবিত হবে। যাদের অন্য কোন শিল্প চালানোর সামর্থ্য আছে তারা সহজেই তা চালাতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টি এই চরখার উপরেই কেন্দ্রিত হওয়া উচিত। কারণ সকলেই এই শিল্প এখনি গ্রহণ করতে পারে। অধিকাংশ লোকেই অন্য কোন শিল্প গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৬

॥ ১৯ ॥

খাদি সকলের জন্য

খাদি কেবল কোন ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা বিশেষ কোন জাতির নয়। খাদি সমগ্র রাষ্ট্রের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরতা এবং স্বাধীনতার প্রতীক। খাদি এমন এক আন্দোলন যাতে ধনী-গরীব, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, পারসী, ইহুদী, ইংরেজ, আমেরিকান এবং জাপানী প্রভৃতি যারা ভারতবর্ষের শুভকামনা করে এবং শোষণের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চায় তারা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ এক অপূর্ব আন্দোলন। কেবলমাত্র কিছুজনের বা বহুজনের জন্যই নয়, এ কাজ সকলের পক্ষেই উত্তম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-২-১৯২৭

॥ ২০ ॥

শ্রমের মর্যাদা শিক্ষার জন্য চরখা

আমি যতই ব্যাপকভাবে গ্রামে যাচ্ছি ততই গ্রামবাসীদের হতাশাপূর্ণ শূন্য দৃষ্টি দেখে বড় আঘাত পাচ্ছি। নিজ নিজ বলদের সঙ্গে মজুরী করা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কাজ নাই। তাই তারাও প্রায় বলদের মতই হয়ে গেছে। এটা বড়ই দুঃখের কথা যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজ হাতে কাজ করে না। প্রকৃতি মানবজাতিকে যে বস্তু প্রদান করেছে তার অবমাননা করার ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রকৃতি আমাদের দিচ্ছে। কেবল চরখাই তা বন্ধ করতে পারে। এর জন্য বিশাল বুদ্ধি বা পুঁজির দরকার নাই। আজ আমরা অর্ধমৃতের ন্যায় বেঁচে আছি। ঘরে ঘরে চরখা এবং গ্রামে গ্রামে যদি তাঁত চলে তবে এর পরিবর্তন হতে পারে। এর দ্বারা প্রাচীন গ্রামীণ কলা ও সংগীতেরও পুনরুজ্জীবন হবে। যে দেশবাসীর আধ-পেট মাত্র খাওয়ার জোটে, সেদেশে ধর্মও হবে না, কলাও সম্ভব হয় নয় আর নিজেদের সংগঠন শক্তিও তাদের থাকতে পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-২-১৯২৭

॥ ২১ ॥

খাদির একটি বড় উদ্দেশ্য আছে। যারা বছরে প্রায় চার মাস যাবৎ বেকার থাকে খাদি সেই লক্ষ লক্ষ লোককে সম্মানজনক কাজ দিতে পারে। এ কাজে যে আয় হবে তা ছেড়ে দিলেও এর একটা বড় দিক আছে। যেখানে লক্ষ লক্ষ লোককে বাধ্য হয়ে অলস জীবনযাপন করতে হয় সেখানে অবশ্যই তাদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক এবং মানসিক মৃত্যু ঘটে। চরখার দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলার জীবনমান স্বভাবতই উচ্চ হয়। সেজন্য মিলের কাপড় যদি বিনা পয়সাতেও পাওয়া যায় তা নিতে অস্বীকার করাতেই মঙ্গল। নিজ শ্রমে উৎপন্ন খাদি পছন্দ করা উচিত।

হরিজন, ১০-১২-১৯৩৮

॥ ২২ ॥

গ্রামের পুনরুদ্ধারের জন্য চরখা

চরখা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। চরখার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকেও হারিয়েছি। চরখা ক্ষেতের কাজের পরিপূরক ছিল

এবং গ্রামের সম্মানও রক্ষা করত। তা বিধবাদের বন্ধু এবং অবলম্বন ছিল। এবং অলসতা থেকে গ্রামসমূহকে বাঁচাত। কারণ এর দ্বারা চরখার সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত বহু শিল্প চলত। গ্রামের ছুতার, কামার সকলেই কাজ পেত। সাত লক্ষ গ্রাম আত্মনির্ভরশীল ছিল। চরখার সঙ্গে সঙ্গে তেল ঘানি ইত্যাদি অন্যান্য উদ্যোগও নষ্ট হয়ে গেছে। এই শিল্পের স্থানে অন্য কোন শিল্প চালু হয় নি। সেজন্য গ্রামসমূহের শিল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উৎপাদন করার ক্ষমতা এবং আয় ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্যান্য যে সব দেশে গ্রামীণ শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে তাদের উদাহরণ দিলে চলবে না। কারণ সেখানের গ্রামসমূহের ক্ষতিপূরণের অন্য সুযোগ ছিল। ভারতের তা নাই। পশ্চিমের শিল্পপ্রধান দেশ অন্যান্য রাষ্ট্রকে শোষণ করছে। ভারত নিজেই শোষিত। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই মনে হচ্ছে চরখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পেরও পুনরুদ্ধার চাই।

এজন্য দরকার একদল তেজস্বী, দেশভক্ত ও নিঃস্বার্থ সৈনিক, যারা গ্রামে গ্রামে চরখার বার্তা পৌছে দেবে। এই হচ্ছে আসল সহযোগিতা এবং প্রৌঢ় শিক্ষার প্রচেষ্টা। এর দ্বারা চরখার শান্ত ও প্রাণদায়ক গতির মতই এক শান্তিময় নিশ্চিত ক্রান্তি সংঘটিত হবে।

চরখার কাজে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার উপরোক্ত বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। চরখা হিন্দু মুসলমানের সমভাবে সেবা করেছে। তা নীরবে লক্ষ লক্ষ গ্রামশিল্পীর নিকট প্রায় পাঁচ কোটি টাকা পৌছে দিয়েছে।

আমি নিঃসঙ্কোচে বলছি সর্বশ্রেণীর জনগণের কথা চিন্তা করে চরখা আমাদের স্বরাজের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেবে। চরখার দ্বারা গ্রামের পুনরুত্থান হবে এবং উঁচু-নিচু ভেদভাব বিলুপ্ত হবে।

হরিজন, ১৩-৪-১৯৪০

॥ ২৩ ॥

চরখা—অহিংসার প্রতীক

১৯১৯ সালে বলা হয় স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় চরখা এবং চরখা হচ্ছে অহিংসার প্রতীক। ১৯২১ সালে রাষ্ট্রীয় পতাকায় চরখা তার গৌরবজনক স্থান অধিকার করে। কিন্তু ভারতবর্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে চরখাকে গ্রহণ না করায় চরখা কখনও তার যোগ্য স্থান পায় নি। যখন অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবে তখন

নির্বিবাদে মনে হবে যে চরখা ভিন্ন অহিংসার দ্বিতীয় প্রতীক নাই এবং চরখার ব্যাপক প্রচার ব্যতীত অহিংসার প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভবপর নয়।

হরিজন, ১৩-৪-১৯৪০

॥ ২৪ ॥

চরখা যুদ্ধের নয়, সমাজের শান্তির চিহ্ন। চরখা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহকে অমঙ্গলের নয়, শুভেচ্ছা ও স্বাবলম্বনের বার্তা দিচ্ছে। চরখার দ্বারা পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হয় না অথবা এর সংরক্ষণের নিমিত্ত নৌবাহিনীর প্রয়োজন নাই। এর জন্য চাই এমন লক্ষ লক্ষ লোকের শুভ-সংকল্প যারা নিজেদের গৃহে আহার্য প্রস্তুত করার ন্যায় সুতাও কাটবে। আমি এমন বহু করার কাজ করিনি এবং এমন অনেক না-করার কাজ করে ভুল করেছি যার জন্য ভাবী বংশধরদের অভিশাপের পাত্র হতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস চরখার পুনরুদ্ধারের কথা বলে আমি তাদের আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছি। আমি এর দ্বারাই সব কিছু করেছি, কারণ চরখার প্রতি আবর্তনে শান্তি, শুভেচ্ছা এবং প্রেম পরিপূর্ণ আছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২১

॥ ২৫ ॥

আমার কথা হচ্ছে (খাদি ও অন্যান্য গ্রামোদ্যোগের পুনরুদ্ধারের দ্বারা)* আমরা এতদূর বিকাশসাধন করব যে, সাধারণ জনতার মধ্যে সারল্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের যে আদর্শ আছে যেন তদনুরূপ রাষ্ট্রীয় জীবনের পুনর্নিমাণ আমরা করতে পারি। আমরা এমন সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ব না যার ভিত্তি পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলির শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এমন ভ্রান্ত ভৌতিকবাদী সংস্কৃতিকে স্বীকার করব না যার রক্ষার নিমিত্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী নৌ ও বিমান বাহিনীর আবশ্যক হবে। এর পরিবর্তে আমরা এরূপ সাম্রাজ্যবাদকে শোধন করে এমন রাষ্ট্রসংঘ গঠন করব যা সকলকে উত্তম জিনিস দিতে এবং জগতের শক্তিহীন রাষ্ট্র অথবা জাতিগুলিকে পশুশক্তির পরিবর্তে নিজ চেষ্টায় দুঃখ বরণ করে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই পরিবর্তন চরখার সম্পূর্ণ সাফল্যের দ্বারাই সম্ভবপর। ভারত এই বাণী দেওয়ার যোগ্য তখনই হবে যখন

---

* বন্ধনীর মধ্যস্থ কথাটি আমাদের।—সম্পাদক

অন্ন ও বস্ত্র এই দুই মুখ্য বস্তুতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে প্রলোভন হতে দূরে থাকবে এবং এই কারণেই সে বাইরের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৬-১৯২১

॥ ২৬ ॥

বহির্ভারতে চরখা

'নিউ উয়র্ক পোস্টে'র মিঃ এণ্ড্ ফ্রীম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "আমেরিকাবাসীর জন্য চরখার কি কোন বার্তা আছে? চরখা কি পরমাণু বোমার সম্মুখীন হতে পারবে?"

উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় আমেরিকা এবং সমগ্র বিশ্বের নিকট চরখার সন্দেশ আছে। কিন্তু যে পর্যন্ত না ভারত সম্যকরূপে চরখাকে গ্রহণ করছে সে পর্যন্ত ঐ সন্দেশ দেওয়া যেতে পারে না। আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে চরখার দ্বারাই ভারত ও বিশ্বের রক্ষা সম্ভবপর। ভারত যদি যন্ত্রের দাস হয়ে যায় তবে আমি প্রার্থনা করব ঈশ্বর যেন জগৎকে এ থেকে রক্ষা করেন।"

গান্ধীজী বলে চললেন, "ভারতের নিকট এক অত্যন্ত মহৎ আদর্শ আছে। তাকে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেবলমাত্র সভা-সম্মেলনের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। সকলেই দেখছে যে, এত সভা-সম্মেলন হওয়া সত্ত্বেও শান্তিভঙ্গ হচ্ছে।"

মিঃ ফ্রীম্যান বললেন, "আমি একজন আমেরিকান ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে এইটুকু বলতে পারি যে, অনেক আমেরিকান চরখা কাটুনীদের পাগল বললেও এমন আমেরিকানও বহু আছে যারা গভীরভাবে এ সম্পর্কে চিন্তা করছে। এমন কোনও বস্তুর সন্ধান করতে হবে যা বিনাশের হাত থেকে সংস্কৃতিকে বাঁচাবে। জীবনযাত্রা সরল করতে হবে।"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "মানব ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করবার আর কোনও উপায়ই নাই। 'Unto This Last'*—সর্বোদয়—এই শব্দে যে অর্থ সমাহিত তা আমি সমর্থন করি। এই পুস্তক* পাঠে আমার জীবন পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদিগকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে যা আমরা সকলের নিকট

---

* জন রাস্কিন কৃত 'Unto This Last'

প্রত্যাশা করি। সকলেরই সমান সুযোগ পাওয়া চাই। সুযোগ পাওয়া গেলে প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের সমান সম্ভাবনা আছে।"

মিঃ ফ্রীম্যান জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি চান যে আমেরিকাবাসী চরখা গ্রহণ করুক?"

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। তবে আমি বুঝতে পারছি না, যে পর্যন্ত না এখানে চরখা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে পর্যন্ত ওখানে কেউ তা গ্রহণ করবে কিনা। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ যদি নিজের বস্ত্রের জন্য চরখাকে স্বীকার করে নেয় তবে দুনিয়াকে আর বলবার প্রয়োজনও হবে না। স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করবে। আজকাল তো পাশ্চাত্য মিলসমূহ ভারতের উপর এরূপ ভীষণ আক্রমণ চালাচ্ছে যে ভারতের পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার হবে।"

"কিন্তু আপনি তো আশা ছাড়ছেন না?"

"না, যে পর্যন্ত সেই চৈতন্য সত্তার উপরে আমার বিশ্বাস আছে যিনি আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সে পর্যন্ত আশা ছাড়তে পারি না।

হরিজন, ১৭-১১-১৯৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বৃহৎ শিল্প নয় কেন

॥ ২৭ ॥

বৃহৎ শিল্পায়ন থেকে মুক্তি চাই

এক বিশিষ্ট খদ্দরপ্রিয় ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত পত্রের এই অংশ সাগ্রহে পঠিত হবে ঃ

> "আমি খদ্দরে বিশ্বাস করি। খদ্দরের বাণী আলোর মতই স্পষ্ট মনে হয়। তা জীবনকে শুদ্ধ ও সরল করে দেয়। এই কাজের মাধ্যমে গরীবের সঙ্গে সেবার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে দারিদ্র্য আজ দেশের শরীর ও আত্মাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার এই হচ্ছে একমাত্র উপায়। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে শরীর ব্যতীত আত্মার মূল্য নাই। সিদ্ধপুরুষ আত্মার কথা বলতে পারেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কাছে শরীর ব্যতীত আত্মার কোন মূল্য নেই। অবশেষে চরখাই সেই হিংসাত্মক ব্যাপার থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে, যার

জন্যে আজকাল ইউরোপে রক্তপাত এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। চরখার দ্বারা উচ্চ শ্রেণী এবং জনসাধারণ পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। এর দ্বারা এখানে বলশেভিজম বা অন্যপ্রকারের হিংসাত্মক কাজ সম্ভবপর হবে না। তাই চরখার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে মনে করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চরখা কি চলবে? আবার কি ঘরে ঘরে চরখা তার সেই পবিত্র স্থান ফিরে পাবে? এদিকে আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত লোকেও বলছেন, বৃহৎ শিল্পায়ন প্রাকৃতিক শক্তির মতই এক শক্তি, আমরা চাই বা না চাই তা ভারতের উপরে এসে পড়বে। সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের কাজ চলছে। ভারতবর্ষ চাইলেও কি তা থেকে পৃথক থাকতে পারবে? শিল্পায়নের কবল থেকে বাঁচতে পারবে?"

খদ্দর-প্রেমী এই ব্যক্তি অনিচ্ছার সঙ্গে এবং অপরিহার্য রূপে যে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা শয়তানের এক পুরাতন কৌশল। সর্বদা আমাদের সঙ্গে অর্ধেক রাস্তা গিয়ে হঠাৎ সঙ্কেত করে আর এগিয়ে লাভ নেই এবং বলে এর পর প্রগতি সম্ভবপর নয়। সে ধর্মের স্তুতি করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় ও-পথ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

কথা হচ্ছে এই ব্যক্তি যে অসুবিধা বোধ করছেন তা পদে পদে প্রত্যেক সমাজ সংস্কারকই জানেন। অসত্য এবং অহঙ্কার কি সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে নি? তবুও যে ব্যক্তি অবশেষে সত্যের জয়ে বিশ্বাস করেন তিনি তাতেই অচল থাকেন। বৃহৎ শিল্পায়ন প্রাকৃতিক শক্তির মতই বলবান একথা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতির শক্তিকে নিজ আয়ত্তে রাখার মত, তাকে জয় করার মত শক্তি মানুষের আছে।...

স্বল্প সংখ্যক বহু সংখ্যকের উপরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে—বৃহৎ শিল্পায়নের অর্থ এই নয় কি?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৮-১৯২৫

॥ ২৮ ॥

বৃহৎ শিল্প এক অভিশাপ

আমার আশঙ্কা বৃহৎ শিল্পাকরণ মানবজাতির পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ প্রমাণিত হবে। এক দেশের উপরে আর এক দেশের শোষণ চিরদিন চলতে পারে না।

বৃহৎ শিল্পবাদের ভিত্তি হচ্ছে আপনার মধ্যে শোষণ করার ক্ষমতা থাকা চাই, বিদেশের বাজার আপনার জন্য খোলা থাকা চাই এবং আপনার প্রতিযোগী যেন কেউ না থাকে। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই সকল সুযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, তাই সেখানে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয়দের বহিষ্কার সেখানে তুচ্ছ ব্যাপার ছিল। ইংলণ্ডের দশা যদি এই হয় তবে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে শিল্পায়নের দ্বারা লাভের আশা করা যায় না। ভারতবর্ষ যখন অপর দেশকে শোষণ করতে শুরু করবে—এদেশে শিল্পায়ন যদি হয় তবে অবশ্যই শোষণ শুরু করতে হবে—তখন সে অপর দেশের কাছে অভিশাপ স্বরূপ এবং পৃথিবীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। অন্য দেশকে শোষণ করার জন্য ভারতে শিল্পায়নের কথা চিন্তা করব কেন ?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-১৯৩১

॥ ২৯ ॥

ভারতবর্ষকে রক্ষা করা মানে তার কোটি কোটি অধিবাসীকে রক্ষা করা। পৃথিবীতে এমন অন্য কোন দেশ নাই, যেখানে এখানকার মত লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে কেবল আংশিক সময়ের কাজ আছে এবং যে দেশের সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামীণ হয়েও যেখানে মাথা পিছু খুব বেশী দু' একর করে জমি আছে। এখানকার প্রয়োজনীয় সমূহ কাপড় মনুষ্যশক্তি ব্যতীত বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক, অথবা, অন্য কোন শক্তির দ্বারা তৈরী করার অর্থ বেকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা। সেজন্য যন্ত্রীকরণের ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ সাধিত হবে।

হরিজন, ২৭-১০-১৯৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ খাদির অর্থশাস্ত্র

॥ ৩০ ॥

খাদির আধার মানব-হিত

খাদি পরিত্যাগ করা মানে ভারতের আত্মাকে, ভারতের জনগণকে বিক্রয় করে দেওয়া।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১-১৯২৮

॥ ৩১ ॥

খাদির অর্থশাস্ত্র সাধারণ অর্থশাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। সাধারণ অর্থশাস্ত্রে মানব তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় না। খাদির সকল সম্বন্ধ মানব দর্শনের সঙ্গে। সাধারণ অর্থশাস্ত্র স্পষ্টতঃই স্বার্থপরায়ণ, কিন্তু খাদির অর্থশাস্ত্র অত্যাবশ্যক এবং নিঃস্বার্থপরায়ণ। খাদির পরিকল্পনায় প্রতিযোগিতা নাই, তাই মূল্যের প্রশ্ন আসে না। হোটেল এবং বাড়ীর রান্নার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে না। গৃহকর্ত্রীর মনে নিজ পরিশ্রমের মূল্য এবং রান্নাঘরের জমির ক্ষেত্রফলের হিসাব ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে না। তিনি কেবল এইটুকুই জানেন যে, সন্তানের পরিচর্যার মতই রান্নাঘরের কাজকর্ম করাও তাঁর কর্তব্য। যদি তিনি এর মূল্যের হিসাব করতে চান তবে বস্তুস্থিতি তাঁকে সবেগে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে, যার দ্বারা তাঁর সন্তান এবং ভোজনঘর দু-এরই বিনাশসাধন হবে। কিছু লোক এই দু-এরই বিনাশসাধন করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই জিনিস বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। আমাদের স্বভাবগত আলস্যের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে, যখনই আমরা ঘরের চরখাকে নষ্ট করে দিয়েছি তখনই আমরা মানব সমাজের প্রতি পাপ করেছি। আমাদের এই পাপের জন্য অনুতাপ করা উচিত এবং শান্তিদায়ক চরখাকে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৭-১৯৩১

॥ ৩২ ॥

খাদির অর্থশাস্ত্রের নিয়ম

…সাধারণতঃ এক জায়গায় প্রস্তুত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয় অথবা পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। যারা সেই বস্তু উৎপাদন করে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় না। খাদির ক্ষেত্রে তা হবে না। এর বিশেষত্বই হচ্ছে তা যেখানে উৎপন্ন করা হয় সেখানেই কাজে লাগাতে হবে। কাটুনী এবং বুনকর নিজেরা তা ব্যবহার করবে। অনুরূপ ভাবে খাদি ব্যবহৃত হলে তার চাহিদাও আপনা থেকেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এই চিন্তাধারা হয়ত সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা যাবে না কিন্তু এই পদ্ধতিকে আমরা যতটা কার্যে পরিণত করতে পারব তারই উপরে খাদির মূল্য নির্ভর করবে। খাদি এমনই একটা গ্রামীণ শিল্প যে, অনুরূপ দ্বিতীয় কোন শিল্পই নেই বা হতে পারে না।…যখন কাটুনী বা তাঁতি নিজেদের প্রয়োজনের জন্য সুতো

কাটে বা কাপড় বোনে তখন খাদি তাদের কাছে সব চেয়ে সস্তা হওয়াই স্বাভাবিক।

এর অর্থ খাদি যেখানে উৎপাদন হবে সে স্থান থেকে অনেক দূরে তা বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। অতিরিক্ত খাদি গ্রামের মধ্যেই বিক্রয় করতে হবে। তারপরেও যা উদ্বৃত্ত হবে সেই জেলার মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।...

হরিজন, ২৭-৪-১৯৩৪

॥ ৩৩ ॥

সৌরমণ্ডলের সূর্য খাদি

গ্রাম্য সৌরমণ্ডলের সূর্য হচ্ছে খাদি। অন্যান্য কুটিরশিল্প হচ্ছে এর গ্রহ-উপগ্রহের মত। উত্তাপ ও জীবনী শক্তিদায়ী সূর্যের মত খাদি এই সব কুটির-শিল্পকে সঞ্জীবিত করে এবং এরাও প্রতিদানে খাদিকে সহায়তা প্রদান করে। তাই খাদি ছাড়া অন্যান্য শিল্পের সমৃদ্ধি অসম্ভব। এদিকে আমার গত সফরের সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, অন্যান্য কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন ব্যতিরেকে খাদিও আর অগ্রসর হতে পারছে না। কারণ গ্রামের কর্মহীনতার সময়কে লাভজনক ভাবে কাজে লাগাতে হলে গ্রামীণ জীবনের সকল স্তরকে স্পর্শ করতে হবে। চরখা সঙ্ঘ ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের কাজও এই।

আমি জানি যে, এক শ্রেণীর লোক খাদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে মোটেই লাভজনক মনে করেন না। খাদিকে আমি গ্রামীণ কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লেখ করায় আশা করি তাঁরা ভয় পাবেন না। খাদি এবং অন্যান্য কুটির-শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে আমার মনের চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তবে এ বিষয়ে যাঁরা সহমত নন তাঁরা কেবল অপরাপর কুটিরশিল্পের প্রতি তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্রিত করতে পারেন।

হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৪

॥ ৩৪ ॥

চরখার উন্নতি

এমন চরখা বা যন্ত্র আমাদের হাতে আসুক যার দ্বারা কুটিরে বসবাসকারী ব্যক্তি নিজ কুটিরে বসেই এখনকার চরখায় সুতা কাটার জন্য যতটুকু সময় দেয় ততটুকু

সময় দিয়েই অধিক পরিমাণে এবং আরও সূক্ষ্ম সূতা কাটতে পারে—খাদি আন্দোলনের পুরোধাগণ এই প্রচেষ্টার বিরোধী নন। প্রাচীনকাল থেকেই কুটিরশিল্পের যন্ত্রপাতির উন্নতি করার রীতি চলে আসছে। তকলীর জায়গায় চরখা এসেছে। চরখারও ধীরে ধীরে সংস্কার সাধন করা হয়েছে, আজও আমরা বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পুরানো চরখার নমুনা দেখতে পাই। চরখার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই তার সংস্কারসাধনও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছলচাতুরীতে যে জিনিস বন্ধ হয়ে গেছিল চরখা সংঘ আবার সেই জিনিসের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এই সংঘের বা আমার নিজের যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি অবশ্যই এ নিবেদন করব যে, যন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না যার দ্বারা কুটিরশিল্পের ক্ষতি হবে এবং এক সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে; অন্য ভাষায় বলতে হয়, আমি ভারতের সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ জীবনের ক্ষতিসাধন করে তাকে শহুরে জীবনে পরিণত করার বিরোধী।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১১-১৯২৯

॥ ৩৫ ॥

খাদি-বিদ্যার্থীর প্রতি

আজকালকার খাদি-বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আমি পূর্বে কিছু লিখেছি। এ সম্পর্কে যত পরিষ্কার করে বলা যায় বা জোর দেওয়া যায় তা হচ্ছে কেবলমাত্র সূতা কাটা, তুলা ধোনা ইত্যাদি জানাটাই আসল খাদি-বিদ্যা নয়। সেগুলিকে এর যন্ত্র-শাস্ত্র বলা যেতে পারে। খাদির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হলে জানা দরকার যে, তা হাতেই কেন তৈরী করা হয়, শক্তিচালিত যন্ত্রে কেন তৈরী করা হয় না। যখন একজন মাত্র ব্যক্তি এমন যন্ত্র চালাতে পারে যার দ্বারা খুব অল্প সময়ে বহু পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হতে পারে, তখন সেই পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করতে অসংখ্যক হাত কেন লাগাব? যদি হাতেই খাদি তৈরী করতে হয় তবে কেবল তকলীর দ্বারাই তা কেন করব না? আর যদি তকলীতেই তা করতে হয় তবে বাঁশের তকলীতেই বা কেন হবে না? আবার যদি কেবল পাথরেই সূতা জড়িয়ে কাজ চলে তবে তকলীরই বা প্রয়োজন কি? এ সকল প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। এসবের উত্তর অনুসন্ধান করা খাদি কার্যের জরুরী অংশ। আমি এখানে এ সকল প্রশ্নের আলো[illegible]ই

না। এইটুকুই আমি বলতে চাই যে, এর যান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ জানা অপেক্ষা খাদির আসল জ্ঞান হাসিল করা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং এজন্য ধৈর্যপূর্বক অনুসন্ধান করা চাই। আজ আমাদের কাছে এই প্রকারের জ্ঞানলাভের সাধন নাই। তাই শিক্ষাপ্রদানের সময়েও খাদি-শিক্ষকদের নিজ নিজ জ্ঞান-বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যার্থীগণও নিজেরা পরিশ্রম করে জ্ঞান হাসিল করবেন। প্রাচীনকালে যখন কোনও বিষয়ে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের উপলব্ধি হত না তখন ছাত্ররাই স্বয়ং অনুসন্ধান করে সে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হতেন। আজ আমরা অনেকখানি অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আছি।

হরিজন, ১-৩-১৯৪২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সূত্র-যজ্ঞ কেন

॥ ৩৬ ॥

উপদেশ নয়, আচরণ

প্রশ্ন করা হয় যে, 'আমার খাওয়ার জন্যই যখন কাজ করার প্রয়োজন হয় না তখন আমি সূতা কাটব কেন'? এর উত্তর হচ্ছে, এইজন্যই যে আমি যা খাই তা আমার নয়। আমার দেশবাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি দিনযাপন করি। একটাও পয়সা যা আপনার পকেটে আসে, তা কোত্থেকে আসে সে কথার খোঁজ করুন তা হলে আমি যা লিখছি তার সত্যতা সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-১৯২১

॥ ৩৭ ॥

যদি আমি উড়িষ্যার নরকঙ্কালদের সামনে চরখা রেখে দিই তবে তারা সেদিকে চোখ তুলে তাকাবেও না। কিন্তু আমি যদি তাদের মধ্যে বসে সূতা কাটতে শুরু করি তবে তারা তা এমনভাবে গ্রহণ করবে যেমন মাছ জলকে গ্রহণ করে। সাধারণ লোক বড়দের উপদেশ নয় আচরণের অনুকরণ করে। তাই সূতা-কাটার প্রয়োজন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৮-১৯২৪

॥ ৩৮ ॥

...যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, সব চেয়ে গরীব ও পতিত বর্গের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ এদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নামে, সুতা কাটার জন্য রোজ এক ঘণ্টা করে শ্রমদান করুন। কেননা এটা রাষ্ট্রকে উপহার প্রদান স্বরূপ হবে, এজন্য তাঁরা এই সুতা অখিল ভারত খাদি মণ্ডলের কাছে নিয়মিতরূপে অর্পণ করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৯-১৯২৪

॥ ৩৯ ॥

মজুরীর জন্য ও যজ্ঞার্থ সূতা কাটা

'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-র পাঠক জানেন যে, আমি কখনও একথা বলি নি যে যারা অধিক উপার্জনের কাজে নিয়োজিত আছে তারাও নিজেদের সেই কাজ ছেড়ে সুতা কাটুক। আমি বার বার বলেছি যে, যাদের কাছে উপার্জন করার মত কোন কাজ নাই তারাই চরখা চালাবে, তাও তারা যখন বেকার থাকবে। এজন্য দুই শ্রেণীর লোক আছে যাদের কাছে সুতা কাটার কথা বলা যায়,—এক হচ্ছে যারা মজুরীর জন্য সুতা কাটবে, এদের কথা আমি পূর্বেই বলেছি; দুই হচ্ছে যারা উদাহরণ স্থাপনের জন্য এবং খদ্দরকে সস্তা করার জন্য যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে সুতা কাটবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১০-১৯২৫

॥ ৪০ ॥

গরীবের সেবাই ঈশ্বর সেবা

আমি যতবার চরখায় সুতা কাটি ততবারই ভারতের গরীবদের সম্বন্ধে চিন্তা করি। ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি ব্যতীত আর কোন ইচ্ছা যে মানুষের নাই তার কাছে তার পেটই ঈশ্বর। তাকে যে অন্ন দেয় সে-ই তার মালিক। তার মাধ্যমে সে ঈশ্বর-দর্শনও করতে পারে। এই সব লোক যাদের হাত-পা-শরীর আছে তাদের দান দেওয়া মানে উভয়েরই পতন। তাদের তো কাজের প্রয়োজন আর চরখা হচ্ছে সেই শিল্প যা কোটি কোটি লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে। আমি ভারতের মেহনতী মানুষের মনে বক্তৃতা দ্বারা নয় নিজে চরখা

চালিয়েই চরখার লুক্কায়িত শক্তির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারি। সেই জন্যই আমি সূতা কাটাকে প্রায়শ্চিত্ত বা যজ্ঞরূপে অভিহিত করি। যেহেতু আমি মনে করি যে, যেখানে গরীবের প্রতি পবিত্র ও সক্রিয় প্রেম থাকে সেখানে ঈশ্বরও থাকেন, সেই হেতু চরখায় আমি যে সূতা কাটি তার প্রতিটি খেইতে আমি ঈশ্বরের দর্শন পাই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৫-১৯২৬

॥ ৪১ ॥

খাদির আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য

এক ভাই সূতা কাটার ঔচিত্য সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং গুরুত্ব সহকারে বোঝানোর প্রয়াস করেছেন যে, যদি সকলেই সূতা কাটে তবে যে গরীব চরখার উপরে নির্ভর করে তাদের ক্ষতি হবে। এই ভাইটি ভুলে গেছেন যে, যাঁরা যজ্ঞার্থে সূতা কাটেন তাঁরা খদ্দরের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, সূতা কাটাকে সহজ করেন এবং ছোট ছোট আবিষ্কার করে একে আরও লাভদায়ক করেন। যজ্ঞস্বরূপ সূতা কাটার দ্বারা পেশাদার কাটুনীর মজুরীর কোনও প্রকারের ক্ষতি হতে পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-১৯২৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ খাদি-কর্মী

॥ ৪২ ॥

খাদির কাজে শুদ্ধতা

সত্য ও অহিংসার উপরে খাদির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যদি এই মৌলিক কথাটা ভুলে গিয়ে যেমনভাবে খুশি খাদির উৎপন্ন করতে থাকি তবে এমন সময় আসবে যখন আমরা নিজেরাই এর বিনাশসাধন করব। যদি আমরা আসল কথাতে দৃঢ় না থাকি তবে আমাদের পতন হবে। কর্মীদের এটা দেখা ধর্ম যে খাদি-কার্যের প্রতিটি বিভাগে যেন শুদ্ধতা বজায় থাকে। আমি আজ এ আশা করি

না যে আমাদের সকল কাটুনীই সত্য ও অহিংসার ভক্ত হবে। কিন্তু আমাদের তিন হাজার খাদি-কর্মীর কাছে অনুরূপ আশা অবশ্যই করব। যদি তা না হয় তবে আমাদের কাজের প্রগতি হবে না এবং আমাদের বিনাশ সাধিত হবে।

'দি আইডিয়লজি অফ দি চরখা', ডিসেম্বর, ১৯৪১

॥ ৪৩ ॥

খাদি-কর্মী অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে খাদি-শাস্ত্রের নিয়মসমূহের অনুসন্ধান করবেন। খাদি কী করে আরও মজবুত ও আকর্ষণীয় হবে সে চেষ্টা করতে হবে। খাদিকে কী করে সার্বজনীন করা যায় সে দায়িত্বও কর্মীদের। যে ব্যক্তি সদা জাগ্রত থাকে এবং নিজ জীবনের কার্যে সকল বুদ্ধি নিয়োজিত করে ভগবান তাদের সাহায্য করেন।

হরিজন, ১০-১২-১৯৩৮

॥ ৪৪ ॥

খাদি-কর্মী ও রাজনীতি

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত সময় খাদি-কর্মীর থাকবে না। কর্মীরা যদি কেবল আট ঘণ্টা সময় কাজ করে এবং বাকী সময় অন্যান্য মনোরঞ্জনের কাজে ব্যয় করে তবে চরখা সংঙ্ঘের কাজ এর দ্বারা সম্পূর্ণ হবে না। চরখা সংঘকে গড়ে তোলা বা তাকে নষ্ট করে দেওয়া তার কর্মীদের উপরেই নির্ভর করে। তাই বাকী সময় কর্মীরা খাদি তৈরীর বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং খাদি শাস্ত্র ও কলার অধ্যয়ন করে নিজের কাজে আরও কুশল ও যোগ্য হওয়ার জন্য ব্যয় করবে।

এর অর্থ এ নয় যে, চরখা সংঘের কর্মীরা রাজনীতি অথবা অন্যান্য বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করবে না। আগ্রহ তাদের থাকবে এবং থাকা উচিত। কিন্তু রাজনীতি সে-ই ঠিকভাবে বুঝতে পারবে যার চরখা সংঘের কাজে পুরোপুরি আগ্রহ আছে এবং সংযমের সঙ্গে এর সদুপযোগ করবে।

'দি আইডিয়লজি অফ দি চরখা', ৩-১১-১৯৪৫

॥ ৪৫ ॥

কর্মীর স্বাবলম্বন

·· দ্বিতীয় প্রশ্ন, খাদি-কর্মীর কতদিন পর্যন্ত বেতন নিয়ে কাজ করা উচিত। ·আমার মতে প্রথম থেকেই তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। তা যদি সম্ভবপর না হয় তবে কর্মী নিজেই এজন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে নেবে। আমার মতে খুব বেশী এজন্য পাঁচ বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। পাঁচ বছর পরে যে কর্মী স্বাবলম্বী হয়ে যাবে, আশা করা যায় প্রতি বছর তার বেতনের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করে যেতে হবে। কারণ এ আশা করা যায় না যে, পাঁচ বছরের শেষে সেই কর্মী হঠাৎ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এটা এক প্রকারের কলা, এ বিষয়ে সতকর্তার সঙ্গে চিন্তা ও পরিকল্পনার দরকার। যে ব্যক্তি অন্যকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেবে, সে অবশ্যই আগে স্বাবলম্বী হবে।

হরিজন, ৪-৮-১৯৪৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ মিলের কাপড় বনাম খাদি

॥ ৪৬ ॥

খাদি ও মিলের কাপড়

এক গজ খাদি ক্রয় করার অর্থ কমপক্ষে এর মূল্যের শতকরা পঁচাশি ভাগ ভারতের ক্ষুধার্ত গরীব লোকের পেটে যাবে। মিলের·কাপড ক্রয় করলে তার প্রতি গজে যে খরচ হয়েছে তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও বেশী পয়সা পুঁজিপতিদের পকেটে যাবে এবং শতকরা পঁচিশ ভাগেরও কম শ্রমিকেরা পাবে মাত্র। এই সব পুঁজিপতি কখনও অসহায় হন না। তাঁরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেরাই ভালভাবে করে নিতে পারেন। তাঁরা কখনও অনাহারে থাকেন না বা থাকার প্রয়োজন হয় না। যাদের এই অনাহারের কবলে পড়তে হয় সেই লক্ষ লক্ষ লোকের জন্যই খাদির পরিকল্পনা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-১০-১৯২৮

মিলের খাদি ?

॥ ৪৭ ॥

মাদুরাতে থাকাকালে আমি জানতে পারলাম যে, কিছু বস্ত্র-ব্যবসায়ী মিলের সূতা দিয়ে বোনা কাপড়কে হাতে-কাটা ও হাতে-বোনা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে তার নমুনা দেখানো হয় যা খাদির কাপড়ের হুবহু নকল মনে হয়। খাদিকে যাঁরা ভালবাসেন এবং খাদির দ্বারা হরিজনদের সেবা করা যায় এই শক্তিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এই খাদি খরিদ না করেন, যাতে অখিল ভারত চরখা সংঘের ছাপ নাই। আমি একথাও শুনেছি যে, খাদির নামে দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের মিলের কাপড় প্রচুর পরিমাণে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। অধিকন্তু আমার দুঃখের পাত্র আরও পূর্ণ করার জন্য এও বলা হয় যে, আমি খাদি সম্পর্কে আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন করেছি এবং দেশী মিলে প্রস্তুত কাপড়কে খাদি বলে মেনে নিয়েছি। এটা খাদি বিষয়ে আমার চিন্তাধারার ভুল ব্যাখ্যা। নৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে খাদিতে আমার বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ় হয়েছে। মিলের কাপড়, যদি তা দেশী মিলেও প্রস্তুত হয় তার সঙ্গে খাদির তুলনা হতে পারে না। মিলের কাপড়ে বা মিলের সূতায় গরীবদের যেভাবে শোষণ করা হয় তা খাদিতে হতেই পারে না। মিলের কাপড়ে বা মিলের সূতায় কোন না কোন প্রকারে গরীবদের শোষণ অবশ্যই হবে।... যদি মিলগুলি কেবল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে অত্যন্ত যোগতার সঙ্গেও পরিচালনা করা যায় তবুও বিতরণ ব্যবস্থা সুচারু রূপে হতে পারে না এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রভূত বেকারী বৃদ্ধি পাবেই। খাদি পরিকল্পনায় ত ঘরে ঘরে চরখা চলবে, তাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কেউ বেকার হবে না এবং তাদের শ্রমের উৎপন্ন জিনিস সহজে বিতরণ হতে পারবে। তাই আমার দৃষ্টিতে খাদি ও মিলের কাপড়ের মধ্যে কোন তুলনা করা চলে না।...খাদি মানবতার প্রতীক, কিন্তু মিলের কাপড় কেবল ভৌতিক মূল্য বহন করে। আমার কাছে চার আনা গজের খাদিই সস্তা এবং একই নম্বরের সূতার দু আনা গজের মিলের কাপড় চড়া দামেরই মনে হয়। আমার অনুরোধ যে, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে হবে এবং অস্বচ্ছ চিন্তাধারা থেকে রক্ষা পেতে হবে। মিলমালিকগণ যেন খাদির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করেন। তাঁদের পক্ষে এমন কাপড় তৈরী করা শোভা দেয় না যা দেখতে খাদির মত, এতে খাদির ক্রেতাদের ঠকানো হয়।

হরিজন, ৯-২-১৯৩৪

॥ ৪৮ ॥

স্বদেশী প্রদর্শনীতে খাদি

ভারতের সর্বত্র যেখানে স্বদেশী প্রদর্শনীতে মিলের কাপড় রাখা হয় সে সব প্রদর্শনীতে খাদির কাপড় রাখা চলবে না বলে অখিল ভারত চরখা সংঘ এক নিয়ম করেছেন। যেজন্ম এই নিয়ম করা হয়েছিল তা সফল হয়েছে কিন্তু উত্তর প্রদেশ থেকে এই নিয়ম শিথিল করার জন্ম দাবী জানানো হয়েছে। এখনও আমি এই লোভ সম্বরণ করে আছি। উত্তর প্রদেশের কর্মীরা এ বিষয়ে আমার মতামতের জন্ম বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি চাকচিক্যময় মিলের কাপড়ের সঙ্গে খাদির কাপড় রেখে জনসাধারণের মনে ভ্রম উৎপন্ন করা বিপজ্জনক। এটা অনেকটা মানব প্রাণীকে যান্ত্রিক মানবের সঙ্গে রাখার মত হবে। যদি এই মানব প্রাণী ও যান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে তবে পরাজিত হবে। মিলের তৈরী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় খাদির অবস্থাও তদ্রূপ হবে। এই দুই জিনিসের স্তর পৃথক পৃথক। লক্ষ্য এদের পরস্পরবিরোধী। খাদি সকলের কর্মের সংস্থান করে, মিলের কাপড় সেক্ষেত্রে কিছুজনকে কাজ দিতে পারে মাত্র এবং বহু ব্যক্তি যাদের পক্ষে এ কাজটা সসম্মানে করা যায় তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। খাদি সর্বসাধারণের সেবা করে, মিলের কাপড় কেবল উপরের শ্রেণীর সেবার জন্ম তৈরী হয়। খাদি শ্রমিক শ্রেণীর সেবা করে, মিলের কাপড় তাদের শোষণ করে। সারাভারতের কর্মীগণ আমার এই কথাকে সমর্থন করবে। আমি আশা করি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসীগণও চরখা সংঘের এই অভিজ্ঞতার ও নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।

হরিজন, ১০-৪-১৯৩৭

॥ ৪৯ ॥

অপ্রমাণিত খাদি

…অপ্রমাণিত (uncertified) খাদির ব্যবসায়ীগণ আমার এই অনুরোধ রক্ষা করবেন কিনা জানি না যে, হাজার হাজার গরীব কাটুনীর পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার মত এতটা স্বার্থপর হওয়া তাদের উচিত নয়। আশা করছি তাঁরা আমার এ অনুরোধ মেনে নেবেন। কিন্তু এর আসল প্রতিকার খাদি-ক্রেতাদের

হাতে আছে। যদি তাঁরা চরখা সংঘ কর্তৃক প্রমাণিত ভাণ্ডার ব্যতীত অন্য কোথাও খাদি খরিদ না করেন তবে অপ্রমাণিত খাদিভাণ্ডারগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। জনসাধারণের জানা উচিত যে, সংঘ কর্তৃক নির্ধারিত দামেই কাটুনী-গণ উচ্চহারে পারিশ্রমিক পেতে পারে।

হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬

॥ ৫০ ॥

দুর্ভাগ্যবশতঃ কংগ্রেসীরা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা খাদিতে বিশ্বাস না থাকায় আত্মবঞ্চনার জন্য অপ্রমাণিত ভাণ্ডার থেকে সস্তা দামের খাদি খরিদ করেন এবং এই প্রকারে খাদি-সম্বন্ধীয় কংগ্রেসের নীতিকে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। অধিকন্তু এর দ্বারা কাটুনীদের উচ্চহারে মজুরীপ্রাপ্তির সুযোগও নষ্ট করে দিচ্ছেন। জনসাধারণের এটা ভাল করে বুঝা উচিত যে, খাদির দাম যত বৃদ্ধি পাবে কাটুনীরা তত বেশী মজুরী পাবে।

যে কংগ্রেস নেতা চরখা সংঘের অনুমতি ছাড়া অথবা তার নির্দেশ ব্যতীত খাদিভাণ্ডার খুলবেন তিনি অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করবেন, জুয়াচুরিকে উৎসাহিত করবেন এবং কংগ্রেসের নীতিকে অমান্য করবেন। এর বিপরীত প্রত্যেক কংগ্রেসীর ধর্ম হওয়া উচিত এবং তাঁর গর্ববোধ করা উচিত যে, সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় মানব সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য চরখা সংঘের এই প্রচেষ্টায় তিনি সর্বপ্রকারের সাহায্য করবেন।

হরিজন ১৫-১০-১৯৩৮

॥ ৫১ ॥

আমি অপ্রমাণিত খাদিকে কোনও প্রকারে উৎসাহিত করতে পারি না। কিন্তু মিলের কাপড় একেবারে বহিষ্কার করা চাই। এমন দিন আসতে পারে যখন চরখা সংঘ প্রমাণপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে। তখন সকলেই খাদি বিক্রী করতে পারবে। যখন খাদি সার্বত্রিক হয়ে যাবে তখন এ জিনিস অনিবার্য হবে। সে সময় চরখা সংঘ খাদির নীতিশাস্ত্র এবং সাধারণ নিয়মকানুন রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। লোকদেরও স্বভাবতই সততার প্রতি এমন আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত যার

দ্বারা খাদির উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীগণও অত্যন্ত সততার সঙ্গে শুদ্ধ খাদি কেনাবেচা করবেন।

হরিজন, ২০-১০-১৯৪৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ রেশম ও খাদি

॥ ৫২ ॥

সূতী খাদি থাকলে রেশমও থাকবে

খাদি যেখানে কোটি কোটি লোকের কাজের সংস্থান করে দেয় রেশম সে জায়গায় কয়েক হাজার লোককে কাজ দিতে পারে মাত্র। ধনী-গরীব দুজনের প্রয়োজনেই খাদি লাগে।...যখন রেশম ও খাদি এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আসে, তখন স্বভাবতই কোটি কোটি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কল্যাণের কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা সব সময় সূতী-খাদিকে প্রথম স্থান দেবেন। চরখা সংঘেরও লক্ষ্য সর্বদা সূতী খাদিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

কেউ যেন একথা না মনে করেন যে, এর দ্বারা রেশম কাটুনী এবং রেশম যারা বোনে তাদের কল্যাণের কথা আমার মনে নাই। একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমি জানি যে, খাদি যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে দেশী রেশমও আপনা থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। জাপানী রেশম এবং পাশ্চাত্যের কৃত্রিম রেশম স্বদেশী কাপড়ের সর্বনাশ করে দেবে। খাদির মনোবৃত্তিই কাশ্মীরের উলের কাপড় এবং বাংলা-আসামের রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ করেছে। চরখা সংঘের দূরদর্শী নীতিই বড বড় বাধা-বিপত্তির হাত থেকে খাদিকে রক্ষার দ্বারা হাতে কাটা হাতে বোনা স্বদেশী রেশম শিল্পকেও স্বভাবতই রক্ষা করছে। এদের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা শুরু হয় তবে সকলেরই বিনাশ হবে। পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে, যদি সূতী খাদি টিকে থাকে কিন্তু রেশম শিল্প নষ্ট হয়ে যায়, তবে রেশম শিল্প নষ্ট হওয়ার ফলে বেকার ব্যক্তরা সহজেই তুলো থেকে সূতা কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি কাজ করতে পারে। কিন্তু সূতী খাদি নষ্ট হয়ে গেলে কোটি কোটি বেকার ব্যক্তির রেশম শিল্পে কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। দরিদ্রনারায়ণ-প্রেমীদের স্পষ্ট কর্তব্য যে,

যখন তাঁদের সামনে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আসবে তখন তাঁরা সর্বদা সুতী খাদিকেই যেন অগ্রাধিকার দেন।

হরিজন, ৭-১১-১৯৩৬

॥ ৫৩ ॥

মূল্য হিসাবে সূতা

প্রশ্ন : সুতী খাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি মূল্যের কিছু অংশ সুতায় দেওয়া জরুরী হয়, তবে অনুরূপ নিয়ম রেশম-খাদির ক্ষেত্রেও কেন প্রযোজ্য হবে না।

উত্তর : এ প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে। রেশমখাদিও খাদি, সে জন্য তা ক্রয়ের সময়ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুতা দেওয়ার শর্ত আরোপিত হওয়া চাই।

প্রশ্ন : সুতা কাটা গঠনমূলক কার্যক্রমেরই একটি অঙ্গ, তাই খাদির কাপড় খরিদ করার সময় সুতায় মূল্য দেওয়ার নীতি গঠনমূলক কর্মীদের বেলায় প্রযোজ্য না হওয়া উচিত নয় কি?

উত্তর : এই প্রশ্নে কিছুটা বিচার-বিভ্রান্তি আছে। খাদির মূল্য অর্থের পরিবর্তে আংশিকরূপে সুতায় দেওয়ার অর্থ হচ্ছে খাদিকে তার যোগ্য স্থান দেওয়া এবং সময়ানুসারে সুতাকে লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা। গঠনকর্মীগণকেও সুতা কাটতে হবে। যজ্ঞে কেউ অংশগ্রহণ করবে না এটা কি করে হতে পারে? সুতা কাটা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য যজ্ঞ স্বরূপ।

হরিজন, ২৮-৪-১৯৪৬

নবম পরিচ্ছেদ : সরকার ও খাদি

॥ ৫৪ ॥

বিদেশী বস্ত্র নিষেধ

স্বরাজলাভের পর সরকার সব চেয়ে প্রথম যে সকল বিষয় হাতে নেবে তার মধ্যে বিদেশী বস্ত্রের নিষেধও একটি হওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৩-১৯৩১

॥ ৫৫ ॥

সরকার কি করতে পারে

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে তাঁরা খদ্দর ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের বিকাশের জন্য কি করবেন। এর জন্য কোন পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক বা না হোক, এর জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ অবশ্যই খুলতে হবে। আজকের এই অন্নবস্ত্রের অভাবের সময় এই বিভাগ দেশের সব চেয়ে বেশী সেবা করবে। অখিল ভারত চরখা সংঘ ও অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের মত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সেবা মন্ত্রীরা পেতে পারেন। যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি বিনিয়োগ করে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে খাদি বস্ত্র পরানো যায়। প্রাদেশিক সরকারগুলি গ্রামবাসীদের বলে দেবেন যে তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করে নিতে হবে। এর ফলে নিজে থেকেই স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে যাবে। আর এই ব্যবস্থায় অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে বস্ত্র শহরবাসীদের জন্য উদ্বৃত্ত হবে ও তার ফলে কাপড়ের কলগুলির উপর থেকে চাপ কমে যাবে। আর তা হলে এদেশের কলগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বস্ত্রাভাব দূর করার কাজে সহায়তা করতে পারবে।

এই কর্মসূচীকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়?

সরকার গ্রামবাসীদের এই মর্মে জানিয়ে দেবেন যে, একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজেদের গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করে নিতে হবে এবং তারপর তাঁদের আর বাইরের কাপড় সরবরাহ করা হবে না। এর পরিবর্তে সরকার কাপাসের বীজ বা প্রয়োজন বুঝলে কাপাস তুলা বিনা মুনাফায় সরবরাহ করবেন এবং বস্ত্র উৎপাদন করার যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন মূল্য দিয়ে পাঁচ বৎসর বা তারও অধিক সময়ের কিস্তিতে তার দাম উশুল করে নেবেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারের তরফ থেকে কাতাই বুনাই-এর শিক্ষক যাবে এবং গ্রামবাসীরা খদ্দর দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনপূর্তি করে নেবার পর যেটুকু উদ্বৃত্ত হবে, সরকার তা কিনে নেবেন। কোন হৈ-চৈ-হট্টগোল ব্যতিরেকে এই পদ্ধতিতে দেশের বস্ত্রাভাব দূর হয়ে যাবে এবং এর জন্য ব্যবস্থা-খরচও খুব কম পড়বে।

গ্রামের জরিপ করতে হবে এবং বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া বা যৎসামান্য সহায়তায় গ্রামের প্রয়োজনীয় বা গ্রাম থেকে চালান দেবার উপযুক্ত যে সব

পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ঘানির তেল ও খইল, ঘানিতে উৎপন্ন জ্বালানী তেল, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, তাল ও খেজুর গুড়, মধু, খেলনা, মাদুর, হাতে তৈরী কাগজ ও সাবান ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। যথোচিত যত্ন নেওয়া হলে বর্তমানে মৃত বা মৃতপ্রায় গ্রামগুলি আবার কর্মচাঞ্চল্যে কলগুঞ্জন করে উঠবে এবং নিজেদের ও ভারতবর্ষের শহরগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার সরবরাহের ব্যাপারে তাদের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেবে।

এর পর ভারতের অসংখ্য পশুসম্পদের কথা ধরা যেতে পারে। শোচনীয় অবহেলার দরুন আজ এই সম্পত্তি বিনষ্টপ্রায়। গো-সেবা সংঘ এখনও পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ না হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান সহায়তা প্রদান করতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির বিকাশ না হবার জন্য গ্রামবাসীদের শিক্ষার ক্ষুধা অপূর্ণ রয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ এই অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাব পূরণ করতে পারে।

হরিজন, ২৮-৪-১৯৪৬

দশম পরিচ্ছেদ ঃ চরখা সঙ্ঘের নব সংস্করণ

—[আগস্ট আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪২ সালের জুন মাসে চরখা সংঘের এক সভা হয়। এর মাস দেড়েকের মধ্যেই গান্ধীজী, বল্লভভাই এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি সংঘের কয়েকজন ট্রাস্টীর জেল হয়। অবশিষ্ট ট্রাস্টীদেরও যে কোন সময় কয়েদখানায় নিয়ে যেতে পারে এই ভেবে ১৯৪২-এর ২৯শে ও ৩০শে আগস্ট সংঘের সভা আহ্বান করা হয়। এতে বিশেষ করে ট্রাস্টীদের অনুপস্থিতকালে সংঘের কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভার শেষে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর কোরামের অভাবে সভার কাজ স্থগিত থাকে। দীর্ঘ দু বৎসর পরে গান্ধীজী এবং সংঘের কয়েকজন ট্রাস্টী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৪৪-এর ১লা,

২রা এবং ৩রা সেপ্টেম্বর সেবাগ্রামে সংঘের সভা আহ্বান করা হয়। সভার তিন দিন গান্ধীজী যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন তার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হল।—সম্পাদক]

॥ ৫৬ ॥

খাদি সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন

প্রথম দিনের ভাষণ ঃ ১-৯-১৯৪৪

দু বছরেরও অধিক পূর্বে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এই দু বছরে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুটা পরিচয় আমি পেয়েছি। 'কিছুটা' বলছি কারণ পূর্ণ পরিচয় এখনও হয় নি। এই দু বছরে মনে করুন এক যুগ কেটে গেছে। এই সময়টায় সারা ভারতের উপর দিয়ে বিপদের ঝড় বয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে চরখা সংঘই বা কি প্রকারে রক্ষা পেতে পারে?

আজ আমরা পুনরায় মিলিত হয়েছি এবং কিছু কাজও আমরা করতে পারি। কিন্তু এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। চরখা সংঘের বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে অথবা সরকারের দখলে আছে। আজ আমাদের কতিপয় সহকর্মী এখানে নেই। আমি কংগ্রেসের কথা বলছি না। যাঁরা বিশেষরূপে চরখা সংঘের সেবা করেছেন, যাঁরা এর ট্রাস্টী তাঁরা সকলে এখানে উপস্থিত নাই। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। তাঁরা যে এই কাজ পরিচালনা করবেন সে আশ্বাস তাঁদের নিকট থেকে পাওয়া যেতে পারে।

জেলে আমি অনেক চিন্তা করেছি। যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করব।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা মনে হয়েছে তা হল চরখা সংঘের সত্তা লোপ পেতে পারে। সরকার একে নষ্ট করে দেবার বহু প্রচেষ্টা করেছে। আমাদের কাজ ত কিছু-না-কিছু চলছেই; কিন্তু আমি দেখছি শাসক শ্রেণী ইচ্ছা করলে আমাদের বিপর্যস্ত করতে পারে। অর্থাৎ আমার যে কল্পনা, এদেশে এখন চরখা শিল্প কোনও অবস্থায় বিপর্যস্ত হতে পারবে না, তা সিদ্ধ হয় নি। কিন্তু আমি এত শীঘ্র পরাজয় মেনে নেওয়ার লোক নয়। জেলেই আমি বুঝে নিয়েছি যে, আমরা সরকারের দয়ায় নির্ভরশীল। এ জিনিস আমাকে কাঁটার মত বিঁধছে।

জেলেই চিন্তা করেছি যে আমাদের চরখার কাজে কিছু ত্রুটি আছে। তা সংশোধন করতে হবে। আমি ভারতবাসীকে চরখা চালাতে বলেছি। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, যে চিন্তাধারা নিয়ে তা চালাতে হবে সেদিকে যতখানি জোর দেওয়া দরকার ছিল আমরা তা দিই নি। এর ব্যবহারিক দিকটাতেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। যে পর্যন্ত চরখার সন্দেশ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে না পারি সে পর্যন্ত আমাদের কাজ অপূর্ণ থাকবে। এই কারণেই আমাদের আদর্শ থেকে আমরা বহু দূরে আছি। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম। এমন বহু গ্রাম আছে যারা চরখা কি জানেই না। এটা আমারই ত্রুটি। একথা আপনারা চিন্তা করুন। এই চিন্তাধারা থেকেই বিকেন্দ্রীকরণের কথা এসেছে। আমাদের যদি উদ্দেশ্য হয় যে খাদির প্রচার হোক, এর বনিয়াদ দৃঢ় হোক তবে এ কাজের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া চাই।

আমাদের উপরে দোষারোপ করা হয় যে চরখা সংঘের লোকেরা, গ্রামোদ্যোগ সংঘের লোকেরা, গান্ধীবাদীরা সকলে জড। লোকে তাদের শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দেশের সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে হতে পারে তা তারা জনসাধারণকে বলতে পারে না। আমাদের মধ্যে মার্কসবাদী পুস্তক প্রবেশ করেছে। এই বহির্শক্তির প্রভাবে এ জিনিস টিকছে না।

আমরা নিজেদের অহিংসার পূজারী বলি। অহিংসার শক্তি যে কি তা যদি না দেখাতে পারি তবে আমরা কিরূপ গান্ধীবাদী? আসলে গান্ধীবাদ নামক কোন বস্তুই নেই। বাস্তবিক কিছু থাকে ত তা অহিংসাবাদ। চরখা সংঘের প্রতি ব্যক্তিকে অহিংসার জীবন্ত মূর্তি হতে হবে। অহিংসবাদীই বলুন বা গান্ধীবাদীই বলুন—তেজস্বী হতে হবে। আজ তো "গান্ধীবাদী" শব্দ গালাগালির শব্দ হয়ে গেছে। এটা আর স্তুতিবাচক শব্দ নয়। আমরা অহিংসাময় হতে পারি নি। যদি পারতাম তবে আজ প্রতিটি গ্রামে চরখা দেখতে পেতাম। আমি স্বীকার করছি যে তা আমরা করতে পারি নি। যদি সে যোগ্যতা আমার থাকত তবে কমপক্ষে সেবাগ্রামে চরখার দর্শন করাতাম। কিন্তু যদি এখানকার লোকের হাতে চরখা তুলেও দিই তবু তারা তা গ্রহণ করবে না। আমরা তাদের অধিক পয়সা দিচ্ছি, শেখাচ্ছি, অন্যান্য কাজ দিয়ে লোভও দেখাচ্ছি, নানা প্রকারের সেবা করছি, তবুও আমাদের কাজ সফল হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও চরখার শক্তিতে আমার বিশ্বাস অটল রয়েছে।

আমাদের মধ্যে ত্যাগী কর্মীর অভাব নেই। বহু ত্যাগী ভাই-ভগিনী আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁদের আমি পূজা করি। একে একে তাঁদের কথা মনে হলে হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। আমার অন্তরাত্মা বলছে, যেখানে এত ত্যাগী কর্মী আছেন সে দেশের অবনতি হতেই পারে না। কিন্তু এত ত্যাগ সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হয় নি। স্বাধীনতা অবশ্য আসবে। যেরূপ আমরা আশা করি তা অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আসবে। কিন্তু তাতেই আমার ক্ষুধা মিটবে না। নিজেকে কেবল জিজ্ঞাসা করি, 'এতে তুমি কতখানি অংশগ্রহণ করেছ?' আমরা যতটুকু করেছি তাতে যেন সন্তুষ্ট না থাকি। যতটুকু করেছি তা যথাশক্তি করেছি ঠিক, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে যদি আমরা সংঘের কাজ প্রসার করতে পারতাম তবে আজ নিরাশা দেখা যেত না। অহিংস স্বরাজ লাভ করতাম।

আপনাদের সম্মুখে একটি শক্ত উপায়ের কথা বলব। যদি এতে আপনাদের সম্মতি থাকে তবে আমিও এর মধ্যে আছি জানবেন। কিন্তু কথাটা না বুঝে-সুঝে যেন মেনে না নেন। এটা কেবল সাহসের কথাও নয়। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যদি তা মেনে নেন তবেই ঠিক হবে। যদি আমাদের নির্ভুল কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় তবে উচিত হবে চরখা সংঘকে বন্ধ করে দেওয়া। সংঘের যে সব সম্পত্তি আছে, অর্থ আছে, সে সব এই কাজের জন্যই কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনার জন্য এক কপর্দকও রাখার দরকার নাই। চরখাই আমাদের কাছে অন্নপূর্ণা। চল্লিশ কোটি লোকে এই কথা উপলব্ধি করলে চরখার কাজের জন্য এক পয়সাও প্রয়োজন হবে না। তখন সরকারী হুকুমনামাতেও আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ থাকবে না। পুঁজিপতিদের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার হবে না। আমরা নিজেরাই এক একটি কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে যাব এবং লোকে আমাদের কাছে সাগ্রহে আসবে। কাজের সন্ধানে তাদের অন্যত্র যেতে হবে না। প্রতিটি গ্রাম স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। বোম্বাই, কলিকাতার মত শহরসমূহে নয়, সাত লক্ষ গ্রামে, চল্লিশ কোটি জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা বিস্তৃতিলাভ করবে। তখন সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, ঝগড়া-বিবাদ, ভ্রান্তি ইত্যাদি কিছু থাকবে না। এই কাজের জন্যই চরখা সংঘের অস্তিত্ব। এইজন্যই আমাদের বাঁচা ও মরা।

আপনারা বলবেন এটা খুব বড় কাজ। এর জন্য বিশাল বুদ্ধির আবশ্যক। আমার মতে পুস্তকালয়ে বসে পুস্তকপাঠের দ্বারা বিশাল বুদ্ধি অর্জন করা যায়

না। নিজ হাতে পরিশ্রম করে বুদ্ধিকে তেজস্বী করতে হয়। এই থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্ভব। এই শিক্ষাব্যবস্থায় হাত-পায়ের শ্রমের দ্বারা বুদ্ধিকে তেজস্বী করতে হয়। পুস্তক বর্জনের কথা বলছি না, কিন্তু পুস্তকের স্থান হচ্ছে গৌণ। প্রথমে হচ্ছে চরখা। চরখার সাধনা করতে করতে গ্রামোদ্যোগ, নয়ীতালিম ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসের জন্ম হয়েছে। যদি আমরা বুদ্ধিপূর্বক চরখা গ্রহণ করতে পারি তবে গ্রামগুলির পুনর্জীবন হতে পারে।

আমাদের দেখতে হবে আমরা কি যথেষ্টরূপে চরখার সংশোধন করেছি? এর জন্য আমরা বহু তপস্যা করেছি, আবিষ্কার করেছি, চরখাও অনেক তৈরী করেছি। কিন্তু এখন এমন বিশেষজ্ঞ চাই যিনি যন্ত্রবিদ্যায় বিশারদ। তিনি এমন চরখা তৈরী করুন যার দ্বারা এখন যে পরিমাণ সূতা কাটা হয় তা'পেক্ষা অধিক উত্তম ও অধিক পরিমাণে সূতা কাটা যায়। এরূপ বিশেষজ্ঞ না পাওয়া গেলেও আমি হার মানব না। এ কাজ বিশ্বাসের সঙ্গে করতে হবে। বিশ্বাস যখন মূর্ত হয়ে ওঠে তখন বুদ্ধির প্রভাবে তা উজ্জ্বলতর হয়। নিজ হতে তা উজ্জ্বল হয় না। শ্রদ্ধা অত্যধিক প্রবল হলে তার বাহনও মিলে, তখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধা কখনও বিফল হয় না। তা আগে আগে অগ্রসর হতে থাকে। শ্রদ্ধার অবলম্বনে বুদ্ধি তেজস্বী হতে থাকে। আর তখনই শ্রদ্ধা বুদ্ধিবাদের সম্মুখীন হতে পারে। বক্তৃতা দেওয়া নয়, আসল বৈজ্ঞানিক পরিণাম চাই। আমরা সমগ্র বিশ্বে নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করব এবং বলব তোমরা নয় আমরাই ঠিক পথে চলছি।

॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয় দিনের ভাষণ : ২-৯-১৯৪৪

কাল রাত্রে এবং আজ সকালে বহু চিন্তার পর আমি একটি নকসা খাড়া করেছি। তা পড়ে শোনাচ্ছি।

"১। চরখা পরিকল্পনার মূল হচ্ছে গ্রাম এবং গ্রামে গ্রামে বিস্তৃতির দ্বারাই চরখা সংঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে চরখা সংঘের এই সভা স্থির করছে যে কার্যপদ্ধতির নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হোক।

(অ) যে সব কর্মী প্রস্তুত আছেন এবং সংঘ যাদের নির্বাচন করবে তারা গ্রামে যাবে।

(আ) বিক্রয়-ভাণ্ডার এবং উৎপাদন-কেন্দ্র নির্দিষ্ট করতে হবে।

(ই) যে সব শিক্ষালয় আছে তার ব্যাপক রূপ দিতে হবে। পাঠ্যক্রমও বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঈ) কোন প্রদেশ বা জেলা যদি স্বতন্ত্র রূপে কাজ করতে চায় ও স্বাবলম্ব হতে চায় আর সংঘ যদি তা স্বীকার করে নেয় তবে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে।

২। চরখা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ এবং হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ এই তিনটি সংঘের জন্য একটি স্থায়ী সমিতি নিযুক্ত করা হোক যারা নূতন পদ্ধতির অনুকূল আবশ্যকীয় বিষয় অবহিত করাবেন। এই তিনটি সংঘের জানা উচিত যে এঁদের উপরেই অহিংসার পূর্ণ রূপ কি হবে তা নির্ভর করে। এর সম্পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই পূর্ণ স্বরাজ নিহিত।

তিনটি সংস্থারই এরূপ প্রজ্ঞা চাই যেন সমগ্র রাজসত্তা এদের অবলম্বনে থাকে। এমন যেন না হয় যে এরাই প্রচলিত রাজসত্তার উপরে অবলম্বিত।

এর অর্থ তিনটি সংস্থার কর্মীদের স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় হতে হবে। যদি এ জিনিস সম্ভবপর না হয় তবে আমাদের কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আমাদের আদর্শ নিম্নগামী হবে পড়বে। আজ আমাদের অবস্থা বিচিত্র মনে হচ্ছে।"

চরখা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ এবং হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ এই তিনটি সংস্থার এক সম্মিলিত সমিতি তৈরীর কথা আমি ব্যক্ত করলাম। আমাদের কাজ এমন হওয়া উচিত যাতে সমগ্র রাজসত্তা এই সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল হয়।

আমাদের পরিস্থিতি অত্যন্ত দীন। চরখা সংঘের অনেকে বলছেন কংগ্রেসীগণ আমাদের সাহায্য করছেন না। আজ পর্যন্ত আমরা পঙ্গু আছি তাই কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে আছি। স্বীকার্য যে কংগ্রেসীগণ সাহায্য করলে আমাদের কাজ অগ্রসর হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন শক্তি চাই কংগ্রেসীগণই আমাদের জিজ্ঞাসা করতে আসবে যে, বল আমরা গ্রামে কিভাবে কাজ করতে পারি। আর চরখা সংঘের বাইরেই বা কোন্ কংগ্রেসী থাকতে পারে? যদি আমরা এ কথা বুঝতাম তবে পরস্পরে মিল থাকত। পরস্পরে মিলিত হতাম। আমরা কংগ্রেসের গঠনকার্য করতাম এবং কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে লড়াই-এর কাজ, সাংবিধানিক কাজ করত। এই দুই কাজ পরস্পরবিরোধী মনে হত না। সব কিছু আমাদের নূতন দৃষ্টিতে নূতন চিন্তাধারায় ভাবতে হবে।

যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিও যে ভারতের হিতকামী তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু তাঁদের এবং আমাদের মধ্যে লক্ষ্যের পার্থক্য আছে। যদি যন্ত্রবাদীদের কথানুসারে শহরবাসীরা চলে এবং আপনারা গ্রামবাসীরা যদি ভুল করে ঐ পথে চলেন তবে ভারতবর্ষের চিত্র বদলে যাবে। অর্থাৎ কোটি কোটি গরীবের মৃত্যু হবে এবং কতিপয় শক্তিমান যোদ্ধা এখানে থাকবে। আমি একশ পঁচিশ বৎসর বাঁচতে চাই, কিন্তু উনচল্লিশ কোটিকে নষ্ট করে এক কোটি থাকবে—উনচল্লিশ কোটি ভস্ম হয়ে যাবে এ আমি দেখতে পারব না। আমার শিক্ষা হচ্ছে, যে সর্বাপেক্ষা অধিক পঙ্গু তার সেবা করা। খাদির মাধ্যমে এত বছর ধরে আমরা এই কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ইতিহাস সামান্য কয়েক বছরের মাত্র।

যদি চরখাই আমাদের লক্ষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক হয় এবং আজকের কর্ম-পদ্ধতির দ্বারা যদি সেই লক্ষ্যের দিকে চলা সম্ভবপর হচ্ছে না মনে হয় তবে আমাদের নিজেদের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করতে হবে। এ নয় যে আজ পর্যন্ত যা করেছি সবই ভুল। যা কিছু আমরা করেছি সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। আর তাও কম করি নি। সামান্য পুঁজির দ্বারা বহু গ্রামে পৌঁছতে পেরেছি। এজন্য সামান্য অর্থ মাত্র খরচ হয়েছে। তবুও আমাদের উদ্দেশ্যের তুলনায় এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ হয়েছে মাত্র। জওহরলাল আমার কাছে চীনের সমবায় সম্বন্ধে পুস্তক পাঠিয়েছেন। আমরা যে কাজ করছি তার তুলনায় ওখানকার কাজ কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের কার্যক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে আমরা কিছুই কাজ করি নি। মিলের তুলনায় একশতাংশ কাজ করেছি মাত্র। এতে গর্ব করবার মত কিছুই নাই। আমাদের কাজে সাফল্য অর্জন করতে হবে। এ কাজ করতে গিয়ে কারও সঙ্গে ছলচাতুরী করব না। শক্তি কিসে বৃদ্ধি পাবে সে চিন্তা করতে হবে। পরিবর্তন আনার জন্য যদি আপনাদের নিজেদের হাতেই বর্তমানের এই চরখা সংঘকে বন্ধ করে দিতে হয় তবে তাতেও আপত্তি নাই।

॥ ৫৮ ॥

তৃতীয় দিনের ভাষণ : ৩-৯-১৯৪৪

খাদির কাজে আমাদের আরম্ভ ছিল খুবই সামান্য। আমার সঙ্গে তখন মগনভাই ও অন্যান্য যাঁরা জীবনপণ করে কাজে লেগেছিলেন তাঁরা ছাড়া বিঠল-

দাস ভাই ও কয়েকজন ভগ্নী ছিলেন। এর পর আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি এবং আজ প্রায় দুই কোটি লোক চরখার সঙ্গে যুক্ত। চরখার সাহায্যে গ্রামের লোকের বিলক্ষণ উপার্জনের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু আমাদের পূর্বের ন্যায় এই বিশ্বাস এখনও আছে কি যে, চরখা ছাড়া স্বরাজ অসম্ভব? চরখার এই দাবী যে পর্যন্ত না আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সে পর্যন্ত চরখা নিতান্ত অসহায়ের সম্বল ব্যতীত আমাদের কাছে অধিক কিছু মনে হবে না। সেক্ষেত্রে চরখা আমাদের মুক্তির উপায় হবে না। দ্বিতীয়তঃ দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে আমরা আমাদের দাবী পৌঁছাতে পারি নি। চরখা তাদের জন্য কি করতে পারে সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। এমন কি তার জন্য প্রয়োজনীয় কৌতূহলও নেই।

কংগ্রেস চরখাকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বেচ্ছায় করেছিল কি? তা নয়, কেবলমাত্র আমার জন্যই কংগ্রেস চরখাকে বরদাস্ত করেছে। সমাজবাদীরা ত সরাসরি একে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে অনেক বলেছেন ও লিখেছেন, তাঁদের দেওয়ার মত কোন স্পষ্ট বা কার্যকরী উত্তর আমাদের নেই। আমি তাঁদের কী করে বিশ্বাস উৎপন্ন করব যে, চরখাই স্বরাজের চাবিকাঠি। এত বছরেও আমরা দেখাতে পারি নি যে, এই সকল উপায়ে আমাদের দাবী পূরণ হতে পারে।...

মুসলমানদের রাজত্বকালেও চরখা চলত। সে সময় ঢাকাই মসলিন প্রসিদ্ধ ছিল। তখন চরখা ছিল দারিদ্র্যের চিহ্ন স্বরূপ, অহিংসার প্রতীক নয়। বাদশা বেগার খাটাত। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ঐ কাজ করে। সে সময় চরখা ছিল হিংসা এবং বলপ্রয়োগের প্রতীক। কাটুনীরা এক মুষ্টি শস্য অথবা সামান্য পয়সা পেত মাত্র আর তার পরিবর্তে বাদশাহ ও বেগমরা পেত সূক্ষ্ম মখমল।

কিন্তু আপনাদের আমি যে চরখা দিয়েছি তা অহিংসার প্রতীক স্বরূপ। অহিংসার প্রতীক রূপে আমি চরখাকে উপস্থিত করেছি। অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা কঠিন কাজ। এর সত্য উপলব্ধি করতে হলে এর গভীরে যেতে হবে। পৃথিবী আমাকে সেই পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে যাচ্ছে। চরখা সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া কথার জন্য সকলে আমাকে নির্বোধ বলতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চরখা দারিদ্র্যতা, অসহায়তা, অবিচার ও বাধ্যতামূলক শ্রমের প্রতীক ছিল। এখন একে বিপুল অহিংসাশক্তির, নূতন সমাজব্যবস্থা ও নূতন অর্থনীতির প্রতীকে

পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তিয়েছে। আমাদের ইতিহাসের পরিবর্তন করতে হবে। আর আমি তা আপনাদের মাধ্যমে করতে চাই।

আশা করি আপনারা আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন। তা সত্ত্বেও যদি চরখার স্বরাজ অর্জনের শক্তি সম্বন্ধে আপনাদের বিশ্বাস না হয় তা হলে বলব আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করুন। এক্ষেত্রে আপনারা সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বাস ছাড়া যদি আমার সঙ্গে চলতে থাকেন এর দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চিত করা হবে এবং দেশের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে।

আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা রয়েছে। এটা একটা নির্দিষ্ট মাপের খাদি বস্ত্রখণ্ড ছাড়া আর কী? এর জায়গায় অন্য এক খণ্ড বস্ত্রও তো আপনারা রাখতে পারেন। কিন্তু ঐ খাদি বস্ত্রখণ্ডের নেপথ্যে আছে আপনাদের পুঞ্জীভূত অনুভূতি। এ স্বরাজের প্রতীক, জাতীয় মুক্তির প্রতীক। একে আমরা ভুলতে পারি না। একে আমরা দূরে সরাব না। এর জন্য আমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রতীক চরখার তাৎপর্য কি? স্বয়ং-সম্পূর্ণতা কিম্বা যা খুশী বলুন। জাতীয় পুনর্গঠন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নামে পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং অন্যান্য দেশেও লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তমোক্ষণ করা হচ্ছে। আমার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সেই ধাঁচের নয়। চরখা শোষণ ও প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভের উপায়।

সুতরাং অহিংসাকে সম্পূর্ণরূপে যদি অনুসরণ করতে হয় তবে এর প্রকৃত স্বরূপ ও প্রতীক রূপে চরখাকে মেনে নিতে হবে এবং বরাবর দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে। যখনই আমি অহিংসার কথা চিন্তা করি চরখার চরিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। অহিংসাকে আমরা কল্পনায় দর্শন করতে পারি না। তাই বিদেহীর দেহ রূপে কোন বস্তু আমরা বেছে নিই। আমার নিকট চরখার এই তাৎপর্য এবং এইজন্যই আমি এর উপাসনা করি। আমার চরখা-উপাসনার নেপথ্যের ভাবনা যদি আপনারা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন তা হলে এক শত বৎসরেও অহিংসার উপলব্ধি আপনাদের হবে না। পুনরায় আমি বলছি, হয় আপনারা আমার সঙ্গ ছাড়ুন অথবা এই নূতন জিনিস গ্রহণ করে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুন। যদি আপনারা চরখাকে অহিংসার প্রতীক রূপে মনে না করেন অথচ আমার সঙ্গে কাজ করতে থাকেন, তবে নিজেরা তো বিপদে পড়বেনই আমাকেও ডোবাবেন।

পল্লী-পুনর্গঠন

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

গ্রামের মূল্য

দেশের গ্রামগুলির সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্বরাজ। এ ভিন্ন আর সবই কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-১৯২৯

গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে ভারতবর্ষও নিশ্চিহ্ন হবে। এ দেশ তখন আর ভারত থাকবে না। জগতে এ দেশের যে বিশেষ অবদান রেখে যাবার কথা, তাও তখন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬

ভারতের গ্রামসমূহ এ দেশেরই মত প্রাচীন। শহরগুলি বিদেশী আধিপত্যের পরিণাম। **প্রাচীন গ্রামময় ভারত এবং নগরকেন্দ্রিক ভারত—এই দুয়ের মধ্যে আমাদের কোন একটিকে বেছে নিতে হবে।** আজ শহরেরই কর্তৃত্ব চলেছে এবং শহরের শোষণের ফলে গ্রামগুলি তছনছ হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে। আমার খাদি মনোবৃত্তি আমাকে এই কথা বলে যে, **শহরের এই আধিপত্যের অবসান ঘটলে নগরগুলি গ্রামের সেবা করবে।** গ্রাম শোষণ করার অপর নাম হচ্ছে সু-সংগঠিত হিংসাচার। স্বরাজ অহিংসার আধারে গড়ে উঠুক, এ যদি আমাদের কাম্য হয় তা হলে গ্রামগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

হরিজন, ২০-১-১৯৪০

॥ ২ ॥

পল্লী-সংস্কার

স্বরাজের আওতায় গ্রামসেবা

গ্রামসেবার জন্য যে সব নর-নারী গ্রামে যাবেন তাঁরা গ্রামবাসীদের বলবেন যে, **নিজের গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা গ্রামবাসীদের কর্তব্য। স্বরাজ-সরকার তাদের জন্য এ কাজ করে দেবে, গ্রামবাসীদের এরকম আশা মনে পোষণ করলে চলবে**

না। পল্লীর শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ফলে আমাদের গ্রামগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনেই কেবল গ্রামের পুনরুত্থান সম্ভব। এই সব শিল্পের ভিতর চরখার স্থান সব কিছুর কেন্দ্রে। আর সব সহজেই চরখার চতুর্দিকে নিজেদের স্থান করে নেবে। এইভাবে সকলেই শ্রমশিল্পের মর্যাদা বুঝবে এবং সকলেই যদি এইভাবে রাষ্ট্রের হিতার্থে কোন শিল্পে আত্মনিয়োগ করে তা হলে জনসাধারণ নিজেদের জন্য বহু লক্ষ টাকার সাশ্রয় করতে পারবে। আর এইভাবে প্রমাণ করা চলে যে, আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাবলম্বনের নীতিকে কার্যকরী করলে জনসাধারণ অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় অল্পমাত্রায় কর দিয়েও অধিকতর পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হবে।

অহিংস স্বরাজে কেউ কারও শত্রু নয়। জাতি যাতে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার জন্য সকলেই নিজ নিজ নির্ধারিত কর্তব্য করে চলে। এ ব্যবস্থায় সকলেই লিখতে পড়তে জানবে এবং প্রত্যহ তাদের জ্ঞান একটু একটু করে বেড়ে চলবে। অসুস্থতা ও রোগ একেবারে কমে যাবে। স্বরাজে পথের ভিখারী বলে কিছু থাকবে না। শ্রমিকরা সর্বদাই খেটে খাবার সুযোগ পাবে। এই রকম সরকারের আওতায় জুয়া খেলা, মদ্যপান এবং অন্যান্য নৈতিক কদাচার অথবা শ্রেণী-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ধনীরা সুবুদ্ধিচালিত হয়ে সমাজহিতার্থে তাদের ধনসম্পত্তির বিনিয়োগ করবে। নিজেদের ঐহিক ভোগবিলাস বা জাঁকজমকের জন্য তারা টাকাপয়সার অপচয় করবে না। **মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধনী ব্যয়বহুল সুসজ্জিত প্রাসাদে থাকবে আর অধিকাংশ লোক আলো-হাওয়া বিহীন ঘুপচি ঘরের মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে—স্বরাজের আমলে এমন অবস্থা চলবে না। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য, অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ—এ সবের স্থান এখানে নেই।**

হরিজন, ২৫-৩-১৯৩৯

গ্রামীণ স্বরাজ

গ্রামীণ স্বরাজ বলতে আমি এক স্বরাট্ সাধারণতন্ত্র বুঝি। জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-পূর্তির ব্যাপারে এই গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র তার প্রতিবেশী গ্রামগুলির উপর নির্ভর করবে না; তবে অন্য যে সমস্ত

ব্যাপারে পরস্পরাবলম্বন প্রয়োজন, তার স্থান এতে থাকবে। অতএব 'প্রত্যিটি গ্রামবাসীর কর্তব্য হবে নিজেদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য এবং বস্ত্রের জন্য তুলার চাষ করা। গ্রামে পৃথক গোচারণভূমি থাকবে এবং বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক সকলের উপযোগী মনোরঞ্জনের ও খেলাধূলার জন্য আলাদা জায়গাও থাকবে। এসবের ব্যবস্থা করার পর জমি উদ্বৃত্ত থাকলে উপকারী অর্থকরী শস্যের আবাদ করা যেতে পারে। তবে গাঁজা, তামাক, আফিঙ্ এবং এজাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসের চাষ করা চলবে না। গ্রামবাসীদের নিজস্ব বিদ্যালয়, রঙ্গমঞ্চ ও সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী সাধারণ ভবন থাকবে। গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে এবং এর ফলে পরিষ্কার জল পাবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা মিলবে। পুষ্করিণী এবং ইঁদারা সুরক্ষিত করে এ কার্যে সফলতা লাভ সম্ভব। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক হবে। গ্রামের কার্যকলাপ যথাসম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে; আজকের মত জাতিভেদ প্রথা বা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তখন থাকবে না। অহিংসা এবং এর কার্যকরী রূপ সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ গ্রামীণ সমাজের শক্তির মূলাধার হবে। সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামরক্ষী-বাহিনীতে কাজ করতে হবে। এর জন্য সকলের নামের একটি তালিকা থাকবে এবং ওই তালিকা-দৃষ্টে পালা করে সকলে এ কাজ করবে। গ্রামের শাসনকার্য চালাবে পাঁচজনের একটি পঞ্চায়েত এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর দ্বারা তাঁদের বাৎসরিক নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনকারী এই সব গ্রামবাসীর ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এই সব পঞ্চায়েতের হাতে যাবতীয় অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে। অধুনা প্রচলিত শাস্তিবিধির স্থান সেই সমাজে থাকবে না বলে এই পঞ্চায়েতই তাঁদের কার্যকালীন এক বৎসরের জন্য সম্মিলিত আইনসভা, বিচারকমণ্ডলী এবং ব্যবস্থাপক রূপে কাজ করবেন।

আজই যে কোন গ্রাম এই রকম সাধারণতন্ত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করে নিতে পারে। গ্রামের সঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কেবলমাত্র খাজনা আদায়ের সূত্রে। কাজেই পূর্বোক্ত লক্ষ্যের পরিপূর্তির পথে এই সরকার খুব একটা বাধা দেবে না। প্রতিবেশী গ্রামসমূহের সঙ্গে, এবং আদৌ যদি তখন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির সঙ্গে, এই রকম গ্রামের

সম্পর্ক কী হবে—এ বিষয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করি নি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সরকারের কাঠামোর একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া। এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে সত্যকার গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ব্যক্তি-মানবই তার স্ব-রাজের নির্মাণকার। সে এবং তার সরকার অহিংসার নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। সে এবং তার গ্রাম সমগ্র বিশ্বের আক্রমণাত্মক শক্তির প্রতিরোধ করতে সমর্থ। কারণ প্রতিটি গ্রাম এই বিধান দ্বারা পরিচালিত যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এবং তার গ্রামের মর্যাদা রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করবে।

এখানে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্যে মূলতঃ অসম্ভব এমন কিছু নেই। এরকম একটি গ্রাম গড়ে তুলতে সারাজীবন লেগে যেতে পারে। সত্যকার গণতন্ত্র এবং গ্রামীণ জীবনের প্রেমী যে কোন ব্যক্তি একটি গ্রামকে নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে তাকেই নিজের বিশ্ব বলে বিবেচনা করে সেখানে লেগে পড়ে থাকলে নিঃসন্দেহে সুফল পাবেন। একাধারে তাঁকে গ্রামের ঝাড়ুদার, কাটুনী, চৌকিদার, চিকিৎসক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে কাজ শুরু করতে হবে। আর কেউ যদি প্রথম প্রথম তার ধারেকাছে না আসে তা হলে ঝাড়ুদার ও কাটুনীর কাজ করে তিনি আপাতত সন্তুষ্ট থাকবেন।

হরিজন, ২৬-৭-১৯৪২

গ্রামীণ একক্

আমার কল্পিত গ্রামীণ একক্ (unit) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীর মতই বলবান। এই গ্রামে এক হাজার লোকের বাস। এই রকম কোন একক্‌কে স্বাবলম্বনের আধারে সুসংগঠিত করলে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে।

হরিজন, ৪-৮-১৯৪৬

গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

গ্রামবাসীরা এমন উঁচুদরের কারিগর হবে যে তাদের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিটি পণ্য তৈরি মাত্র বাইরের বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। গ্রামগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হলে সেখানে তখন আর সুদক্ষ কারিগর ও উচ্চ শিল্পপ্রতিভাবিশিষ্ট অধিবাসীর কোন অভাব হবে না। গ্রামের নিজস্ব কবি, চারুশিল্পী, বাস্তুকার, ভাষাতত্ত্ববিদ্

এবং গবেষক কর্মী থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের জীবনে এমন কোন কাম্য থাকবে না, যা গ্রামে লাভ করা না যাবে। আজ গ্রামগুলি গোময়-স্তূপ বিশেষ। আগামী কাল সেগুলিকে ক্ষুদ্রায়তন স্বর্গোদ্যানে পরিণত করতে হবে। এখানকার বাসিন্দারা উঁচুদরের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হবে এবং কেউই তাদের প্রতারণা বা শোষণ করতে পারবে না।

দেশের গ্রামসমূহকে এইভাবে পুনর্গঠিত করার কাজ এই মুহূর্তেই আরম্ভ করতে হবে। আর এ কাজ সাময়িকভাবে করলে চলবে না, স্থায়ীভাবে করতে হবে।

হস্তশিল্প, চারুকলা, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুকে একটি মাত্র পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে গড়ে তুলতে হবে। নঈ তালিমের ভিতর পূর্বোক্ত কর্মসূচী চতুষ্টয়ের সমন্বয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে হয়েছে। মানবশিশুর মাতৃগর্ভে আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে তার মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র কালব্যাপী শিক্ষার পরিকল্পনা নঈ তালিমের ভিতর রয়েছে। আমি তাই গ্রামোন্নয়ন কার্যকে প্রথমাবধি পরস্পর সম্পর্করহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করব না। আমার কর্মসূচীতে পূর্বোক্ত চারিটি বিষয়েরই সমন্বয় হবে। হস্তশিল্প এবং শ্রমশিল্পকে শিক্ষা থেকে পৃথক কোন কিছু রূপে বিবেচনা করার পরিবর্তে আমি বরং এদের শিক্ষার মাধ্যম মনে করব। অতএব এই পরিকল্পনায় নঈ তালিমকে সংযুক্ত করতে হবে।

হরিজন, ১০-১১-১৯৪৬

অর্থের স্থান

(শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে আলোচনার অংশবিশেষ)

"অনেক টাকা তুলে আপনি কেন আপনার কাজ এক সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে করেন না?"

"না, ঠিক যতটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশী টাকা তোলার নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু আপনি যদি বিশটি বা অন্ততঃ দশটি আদর্শ গ্রাম তৈরি করতে পারতেন তা হলে কি ভাল হত না?"

"কাজটা যদি এত সহজ হয় তবে তুমি তোমার টাকা দিয়ে চেষ্টা করে

দেখতে পার। আমি কিন্তু জানি যে, এ কাজ এত সোজা নয় অর্থের জাদুদণ্ডের ছোঁয়া দিয়ে আদর্শ গ্রাম সৃষ্টি করা যায় না।"

হরিজন, ৩০-১১-১৯৩৫

ডঃ মট॥ ভারতবর্ষকে যদি টাকা দিতে হয়, তা হলে এদেশের কোন ক্ষতি না করে কীভাবে এ অর্থ বিবেচনার সহিত দেওয়া যায়? টাকা দিলে কি কোন উপকার হবে?

গান্ধীজী॥ না। যখন টাকা কেবল দেওয়া হয়, তখন তার ফলে শুধু অপকারই হয়। প্রয়োজন হলে অর্থ উপার্জন করতে হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এদেশের মিশনারী সমাজের কাজের জন্য আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে যে অর্থ এসেছে তা এদেশের হিত অপেক্ষা অহিত করেছে বেশী। একই সঙ্গে ঈশ্বর ও কুবেরের পূজা করা চলে না। আমার আশঙ্কা হয় যে, এক্ষেত্রে কুবেরকেই ভারতের সেবা করার জন্য পাঠানো হয়েছে; ঈশ্বর পশ্চাতে পড়ে আছেন। এর পরিণাম এই হবে যে, একদিন না একদিন তিনি এর প্রতিফল দেবেন। কোন আমেরিকাবাসী আমাকে যদি বলেন যে, টাকা দিয়ে তিনি আমাদের সেবা করবেন তা হলে তাঁকে আমি ভয় করব। আমি তাঁকে কেবল বলব, আপনারা আপনাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের তাঁদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা এদেশের সেবা করার জন্য পাঠান, টাকা রোজগার করার জন্য নয়। অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সঙ্গে টাকার কোনই সম্বন্ধ নেই।

হরিজন, ২৬-১২-১৯৩৬

॥ ৩ ॥

গ্রামের সাফাই

গ্রাম পরিষ্কার রাখা

গ্রামের পুষ্করিণী আর কূয়াগুলি পরিষ্কার করা, পরিষ্কার রাখা এবং গ্রামের গোবর গাদা সাফ করা—এই হবে গ্রামসেবকের কাজ। কর্মী যদি নিজের হাতে এ কাজ করা শুরু করেন এবং বেতনভুক্ ঝাড়ুদারের মত নিয়মিতভাবে সাফাইয়ের কাজ করতে থাকেন, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের এ কথাও বুঝিয়ে দেন যে ভবিষ্যতে

সাফাইয়ের যাবতীয় কাজ নিজেরাই করে নেবার জন্য এখন থেকে তাঁদের গ্রামসেবকের সঙ্গে কাজে লেগে পড়া উচিত, তা হলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে, আজ হোক কাল হোক গ্রামবাসীরা সেবকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেই।

গ্রামের রাস্তা ও গলিগুলি থেকে সমস্ত রকমের আবর্জনা পরিষ্কার করে এই সব জঞ্জালের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। এর ভিতর এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যাকে সারে পরিণত করা যায়, এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা মাটিতে পুঁতে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক শ্রেণীর জঞ্জালকে আবার সরাসরি সম্পদে রূপান্তরিত করা চলে। কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্যেকটি হাড়ের টুকরা অতীব মূল্যবান কাঁচা মাল। এর থেকে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করা যায় অথবা একে গুঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যায়। ছেঁড়া ন্যাকড়া ও বাজে কাগজ দিয়ে ভাল কাগজ তৈরি হতে পারে।

বিষ্ঠা গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের জন্য অতি মূল্যবান সারের কাজ করবে। বিষ্ঠাকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাটিতে বড জোর এক ফুট গর্ত খুঁড়ে তরলিত বা শুষ্ক বিষ্ঠার সঙ্গে শুকনো মাটি মিশিয়ে সেই গর্ত বোঝাই করতে হবে। ডাঃ পূরে তাঁর পল্লীস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তকে বলেছেন যে, মলকে নয় থেকে বারো ইঞ্চির বেশী গভীর গর্তে চাপা দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে উপর থেকে চাপা দেওয়া শুকনো মাটির ভিতর সূক্ষ্ম জীবাণু বিদ্যমান এবং এই মাটির ভিতর সূর্যালোক ও বায়ু অতি সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে ওই সব জীবাণু আলোক ও বায়ুর সহায়তায় এক সপ্তাহের মধ্যে এইভাবে মাটি চাপা দেওয়া মলকে উত্তমরূপে নরম ও সুগন্ধযুক্ত মাটিতে রূপান্তরিত করে দেয়। যে কোন গ্রামবাসী স্বয়ং এর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এর জন্য দুটি পদ্ধতির শরণ নেওয়া যেতে পারে। স্থায়ী পায়খানা তৈরি করে সেখানে মাটি বা লোহার বালতি রাখা চলতে পারে এবং প্রত্যহ এই বালতির মল পূর্বোক্ত প্রকারে বিশেষভাবে প্রস্তুত মাটির গর্তে ঢেলে দেওয়া চলতে পারে। আর তা নাহলে মাটিতেই ওইভাবে গর্ত খুঁড়ে সেখানে মলত্যাগ করা যেতে পারে। মল চাপা দেবার জন্য গ্রামে সাধারণ জায়গা থাকতে পারে, অথবা কৃষক তার নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রেও এরকম গর্ত তৈরি করতে পারে। তবে একমাত্র গ্রামবাসীদের সহায়তায় এ কাজ করা সম্ভব, আর নিতান্ত যদি এই সহযোগিতা লাভ সম্ভবপর না হয় তা হলে যে কোন উৎসাহী গ্রামবাসী স্বয়ং এইভাবে মল সংগ্রহ করে

নিজের জন্য তাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারেন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের এইরকম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার প্রত্যহ নষ্ট হচ্ছে এবং এইভাবে যত্র-তত্র মলত্যাগ করার জন্য গ্রামের বায়ু দূষিত হচ্ছে ও নানারকম রোগ ছড়াচ্ছে।

গ্রামের পুষ্করিণীগুলির জল স্নান করা, কাপড় কাচা, পান এবং রন্ধন—সব রকম কাজের জন্যই নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অনেক গ্রামের জলাশয়ে গবাদি পশুকেও স্নান করানো হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, মহিষের পাল পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। তাজ্জব এই যে, গ্রামের জলাশয়গুলির এই রকম অপব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও এদেশের গ্রামগুলি এখনও মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় নি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী মাত্রেই একবাক্যে ঘোষণা করবেন যে, গ্রামবাসীরা যে সব রোগে ভুগে থাকে তার অনেকগুলির কারণ হচ্ছে গ্রামে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যাপারে ঔদাসীন্য।

সবাই নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন যে, গ্রামীণ ভারতে পূর্বোক্ত কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে এক অতীব গৌরবজনক ও শিক্ষামূলক সেবাকার্য। এর দ্বারা ভারতবর্ষের পীড়িত মানবতার অসীম উপকার হবে। এ কাজ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তার থেকে একথা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে যে, এ কাজের জন্য যদি যথোপযুক্ত কর্মী পাওয়া যায় এবং তাঁরা যেরকম সহজভাবে ও গর্বভরা চিত্তে আজ কলম ও পেন্‌সিল নিয়ে কাজ করেন ঠিক সেইরকম ভাবেই যদি ঝাড়ু ও কোদাল হাতে নেন, তা হলে খরচের প্রশ্ন একরকম উঠবে না বললেই চলে। বড়জোর খরচ ঝাঁটা, ঝুড়ি, কোদাল, খন্তা এবং কিছু জীবাণুনাশক ঔষধপত্র—এই কটি দ্রব্য কেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শুকনো ছাই সম্ভবতঃ যে কোন রাসায়নিকের জীবাণুনাশক ঔষধের সমতুল্য। যাই হোক, আমরা মানবকল্যাণকামী রাসায়নিকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, গ্রামের উন্নতির জন্য খুব সস্তা অথচ ফলপ্রদ জীবাণুনাশক ঔষধ কী হতে পারে তা যেন তাঁরা আমাদের বলে দেন।

হরিজন, ৮-২-১৯৩৫

কম্পোস্ট সার

ব্যাপকভাবে কম্পোস্ট সারের প্রচলন করার প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করার জন্য এ মাসে নূতন দিল্লীতে এক অখিল ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম এবং শহরে এই পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এখানে

গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি যদি কাগজেই না থেকে যায় তা হলে এগুলিকে নিঃসন্দেহে ভাল এবং মঙ্গলজনক বলতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, সমগ্র দেশে এসব প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হবে কিনা। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সহযোগিতা করে, তা হলে এ দেশ যে কেবল খাদ্যাভাব দূর করতে সমর্থ হবে তাই নয়, ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে। এই জৈব সার সর্বদাই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা ভূমির কোন ক্ষতি হয় না। প্রত্যহ যে সব আর্বজনা জমা হয়, বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে তার কম্পোস্ট তৈরি করতে পারলে তা মাটির পক্ষে স্বর্ণসারের সমতুল্য হবে। এর ফলে দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হবে এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যশস্য ও ডাল ইত্যাদির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, এইভাবে আর্বজনার সদ্ব্যবহার হলে আমাদের পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কেবল ঐশী স্বভাবের তুল্যমূল্য নয়, এর ফলে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

হরিজন, ২৮-১২-১৯৪৭

॥ ৪ ॥

গ্রামের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা-ব্যবস্থার সীমা

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের কার্যকলাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু কর্মীর কর্মসূচীতে রোগ-চিকিৎসায় সহায়তা দান একমাত্র না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের স্থান গ্রহণ করেছে। গ্রামবাসীদের ভিতর এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয় বা ইউনানী ঔষধের কোন একটি বা ক্ষেত্রবিশেষে সব কটিই বিনা-মূল্যে বিতরণ করা হয়। এই সব ঔষধের বিক্রেতারা কর্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে বিনামূল্যে কিছু ঔষধ দিয়ে দিতে প্রস্তুত। কারণ এর দাম তাদের কাছে খুব বেশী নয়। আর তাঁদের মতে এই দানকার্যকে যদি একান্তভাবে স্বার্থবুদ্ধির দৃষ্টি দিয়েও দেখা যায়, তা হলেও তা লাভজনক বিবেচিত হবে। কারণ এতে তাঁদের ওষুধের গ্রাহক বেড়ে যাবে। এইভাবে গ্রামের হতভাগ্য রোগীরা শুভেচ্ছা চালিত অথচ ভ্রান্ত ধারণার অনুবর্তী বা অত্যুৎসাহী কর্মীর শিকারে পরিণত হয়। এই সব ওষুধের তিন-চতুর্থাংশ কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, এগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব সরাসরিভাবে সব সময় বোঝা না গেলেও পরোক্ষভাবে এ সব দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। যে ক্ষেত্রে এই সব ওষুধ রোগীর রোগের সাময়িক

উপশম এনে দেয়, সেখানেও দেখা যাবে যে গ্রামের বাজারে নিঃসন্দেহে এর বিকল্প কিনতে পাওয়া যায়।

গ্রামোদ্যোগ সংঘ এইজন্য পূর্বোক্ত প্রকারের চিকিৎসা-সহায়তার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বাদ দিচ্ছেন। **স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা শিক্ষামূলক।** তবে উভয় কার্যক্রমই কি পরস্পরসম্পর্কিত নয়? দেশের জনগণের কাছে স্বাস্থ্যের অর্থই কি সম্পদ নয়? তাদের বুদ্ধি নয়, তাদের দৈহিক ক্ষমতাই হচ্ছে সম্পদের প্রাথমিক সাধন। **এইজন্য সংঘ গ্রামবাসীদের রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি শেখাবার প্রযত্ন করেন।** সকলেই একথা ভাল ভাবে জানেন যে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আহার্য আজ পুষ্টির দিক থেকে নিতান্ত অসন্তোষজনক। যেটুকু তারা খায়, তারও অপব্যবহার হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। গ্রামের সাফাই ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব খারাপ। সুতরাং এই সব ত্রুটির সংশোধন হলে এবং জনসাধারণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের সাধারণ নিয়মগুলি পালন করলে অপর কোন চেষ্টা বা অতিরিক্ত অর্থব্যয় ছাড়াই গ্রামবাসীরা অধিকাংশ ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। গ্রামোদ্যোগ সংঘ এইজন্য চিকিৎসালয় খোলার ব্যবস্থা রাখেন নি। **গ্রামবাসীরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসাবে কোন্ কোন্ গ্রামীণ জিনিস ব্যবহার করতে পারে তার সম্বন্ধে গবেষণা চলছে।** সতীশবাবু যে সব সস্তার চিকিৎসার কথা বলেছেন সেগুলিকে এ লক্ষ্যাভিমুখী বলা যেতে পারে। সতীশবাবুর দ্বারা আবিষ্কৃত এই সব চিকিৎসা-পদ্ধতি অত্যন্ত সরল হলেও তার কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রেখে ঔষধের সংখ্যা হ্রাসের জন্য সতীশবাবু আরও গবেষণা করে চলেছেন। বাজার-প্রচলিত ঔষধগুলি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপীয়ার সম-পর্যায়ের ওষুধের সঙ্গে তার তুলনা করে দেখছেন। সরল গ্রামবাসীদের রহস্যমণ্ডিত বটিকা ও জল ফুঁড়ে দেওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করাই তাঁর এ কাজের লক্ষ্য।

হরিজন, ৫-৪-১৯৩৫

চিকিৎসা সহায়তা

গ্রামসেবায় নিযুক্ত জনৈক কর্মী লিখছেন—

"একশত পরিবার-বিশিষ্ট ছোট একটি গ্রামে আমি কাজ করছি। আপনি বলেছেন যে, ওষুধ দেবার কথা না ভেবে আগে গ্রামের সাফাই

এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচীর দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু কোন জ্বরাক্রান্ত গ্রামবাসী সাহায্যপ্রার্থী হলে কর্মীর কর্তব্য কি? এযাবৎ আমি তাদের গ্রাম্য বাজারে মেলে এমন দেশী গাছগাছড়া ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আসছি।"

কর্মীর কাছে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ওই-জাতীয় সাধারণ রোগের ব্যাপারে সাহায্যের অনুরোধ এলে নিঃসন্দেহেই কর্মী সাধ্যমত সহায়তা করবেন। নিশ্চিত-ভাবে রোগনির্ণয় করতে পারলে গ্রামের বাজারে পাওয়া যায় এমন ওষুধ যে সর্বাপেক্ষা সস্তা ও কার্যকরী হয়ে থাকে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। যদি কোন ওষুধ মজুত রাখতেই হয়, তা হলে ক্যাস্টর অয়েল, কুইনাইন এবং গরম জলকে শীর্ষস্থান দিতে হবে। ক্যাস্টর অয়েল অর্থাৎ রেড়ীর তেল প্রত্যেক জায়গাতেই পাওয়া যেতে পারে। 'সেন্না' পাতায়ও একই রকম কাজ পাওয়া যায়। তবে কুইনাইনের ব্যবহার করতে হবে ভেবেচিন্তে। সব রকম জ্বরে কুইনাইনের চিকিৎসা দরকার হয় না। সব জ্বর কুইনাইনে ভালও হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপবাস বা আহারের ব্যাপারে একটু সংযম করলেই জ্বর ভাল হয়ে যায়। ভাত বা আটা, ডাল ও দুধের বদলে ফলের রস, কিসমিস ভেজানো জল কিংবা টাটকা লেবুর রস বা তেঁতুল সংযোগে গরম গুড়জল পান করাকেই আমি আহার-সংযম বা প্রায়-উপবাস আখ্যা দিচ্ছি। গরম জল অত্যন্ত শক্তিশালী রোগনাশক পদার্থ। এর দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে ঘর্ম সঞ্চার হয় এবং তার ফলে জ্বর নেমে যায়। তা ছাড়া, গরম জল সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সস্তা বীজাণুনাশক। গরম জল পান করতে হলে ফুটাবার পর চর্মের পক্ষে সহনযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা হতে দিতে হয়। জল ফুটাবার মানে কিন্তু কেবল গরম করা নয়। জল ফোটা শুরু হলে টগবগ করে শব্দ হবে এবং ফুটন্ত জল বাষ্প হতে থাকবে।

রোগী-পরিচর্যার জন্য কি করা উচিত এ সম্বন্ধে কর্মীর নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না থাকলে স্থানীয় কবিরাজকে এর পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত। আর ধারেকাছে যদি কবিরাজ না থাকেন, অথবা থাকলেও তাঁর উপর যদি নির্ভর করা না চলে, তা হলে নিকটস্থ কোন সেবা-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ডাক্তারের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

তবে কর্মীরা স্বয়ং বুঝতে পারবেন যে, রোগ দূর করার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হচ্ছে সাফাইয়ের কাজে হাত দেওয়া। তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে,

প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। মানুষ যা নষ্ট করছে, প্রকৃতি তার সংস্কার করছে —একথা তাঁরা সুনিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন। মানুষ যখন ক্রমাগত প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারাকে বাধা দিতে থাকে তখন মনে হয় প্রকৃতির বুঝি আর কোন ক্ষমতা নেই। তিনি তখন আরোগ্যের অতীত বস্তুকে ধ্বংস করবার জন্য তাঁর সর্বশেষ এবং অপ্রতিরোধ্য দূত মৃত্যুকে পাঠান এবং এইভাবে সৃষ্টি নব পরিধেয় পরিধান করে। তাই মানুষ বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মীরাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও শ্রেষ্ঠ ভিষক্।

হরিজন, ১১-৫-১৯৩৫

রোগের চিকিৎসা

আমি যে সব গ্রামসেবা বা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মবিবরণী পাই তার অনেকগুলির ভিতর চিকিৎসা-কার্যে সহায়তা দানের কর্মসূচী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। চিকিৎসা-কার্যে সহায়তা দানের এই কর্মসূচীর ধারা নিম্নরূপ হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের কেউ একজন এই রকম ঔষধ বিতরণ করে থাকেন প্রচারিত হবার পর আশপাশের জনসাধারণ তাঁর কাছে ওষুধ নেবার জন্য সমবেত হয়। তিনি তাদের ওষুধ দেন। ঔষধদাতার এতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা করতে হয় না। রোগ বা তার উপসর্গ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন, এমন কি বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পরিচিত ঔষধ-বিক্রেতাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে ওই সব ঔষধ পেয়ে থাকেন। গভীর বিবেচনা-শক্তিরহিত দাতাদের কাছ থেকে দান পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আর্ত মানবতার সহায়তার্থ তাঁদের দানের উপযোগ হচ্ছে, এইটুকু জানতে পারলেই এই সব দাতার বিবেকবোধ পরিতৃপ্ত থাকে।

এই জাতীয় সমাজসেবা আমার কাছে চরম আলস্যজনক, এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনে হয়। তাকে যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তা খাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই—এই মনোভাব যখন রোগীর মনে সৃষ্টি করা হয়, তখনই বলতে হয় যে এই জাতীয় সমাজসেবা অনিষ্ট সাধন করে। ঔষধ খাবার পরও রোগীর জ্ঞান তিলমাত্র বৃদ্ধি পায় না, বরং বলতে হবে যে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বিনা পয়সায় বা নামমাত্র অর্থব্যয়ে এমন একটি বড়ি বা মাত্রাখানেক তরল ওষুধ পাওয়া যাবে যার দ্বারা তার শরীরের গোলমাল সেরে যাবে—এই বোধ তাকে পুনর্বার অনিয়ম বা অত্যাচার করতে প্রলুব্ধ

করবে। আর বিনাব্যয়ে এজাতীয় সাহায্য পাওয়ায় তার আত্মসম্মানবোধ কমে যাবে; কারণ আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তি বিনিময়ে কিছু না দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

আর এক ধরনের চিকিৎসা-সহায়তা আছে, যা প্রশংসনীয়। এ সহায়তা তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা রোগের গতি-প্রকৃতি জানেন। কিসের জন্য রোগীর দেহে বিশেষ এক ধরনের বিকার দেখা দিয়েছে তা তাঁরা রোগীকে জানাবেন এবং কিভাবে এর হাত এড়ানো যায় সে সম্বন্ধেও রোগীকে উপদেশ দেবেন। এই সব সেবকরা দিনরাতের খেয়াল না করে সেবা করে চলবেন। এই জাতীয় বুদ্ধিযুক্ত সহায়তাকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রদানকার্য আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে জনসাধারণ কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় ও নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হয় তার জ্ঞান অর্জন করে। তবে এজাতীয় সেবা কদাচিৎ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মবিবরণীতে চিকিৎসা-সহায়তার উল্লেখ করা একজাতীয় বিজ্ঞাপন। এর ফলে অন্যান্য কাজ করার জন্য চাঁদা পাওয়া সহজ হয়, আর হয়তো সেই সব অন্যান্য কাজ করার জন্য চিকিৎসা-সহায়তার মতই অতীব অল্প জ্ঞান ও প্রযত্নের প্রয়োজন পড়ে। অতএব শহর বা গ্রাম যে কোন অঞ্চলের সমাজকর্মীদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই সব চিকিৎসা করার কার্যক্রমকে নিতান্ত গৌণ সেবাকার্য জ্ঞান করেন। এই জাতীয় সেবার উল্লেখ কর্মবিবরণীতে না থাকাই শ্রেয়।

কর্মীদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ এলাকায় রোগের প্রসার বন্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তাঁদের ঔষধ-ভাণ্ডার হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। গ্রামের বাজারে যে যে ঔষধপত্র পাওয়া যায় তা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, এগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবেন এবং যথাসম্ভব এই গুলিকেই কাজে লাগাবেন। সিন্দিতে কাজ করে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সঙ্গে তখন তাঁরা সহমত হবেন। তাঁরা দেখবেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরম জল, সৌর কিরণ, পরিষ্কার লবণ এবং সোডা, কখনও কখনও ক্যাস্টর অয়েল বা কুইনাইনের প্রয়োগে ঈপ্সিত ফল লাভ হচ্ছে। প্রতিটি জটিল রোগীকে আমরা সরকারী হাসপাতালে পাঠানো একরকম বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি। কৃষকরা দলে দলে মীরাবেনের কাছে সমবেত হয় এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে। নিছক কিছুটা ওষুধের গুঁড়ো বা মিক্শ্চার সেবনের পরিবর্তে তারা বরং এই ব্যবস্থা-প্রণালীকেই মেনে নিয়েছে।

হরিজন, ৯-১১-১৯৩৫

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সার্বজনীন সাফাইয়ের বিধি-বিধান সমূহ যদি যথাযথভাবে পালন করা হয় এবং আহার্য ও ব্যায়ামের প্রতি যদি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় তা হলে কোন রকম রোগে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যেখানে আন্তরিক ও বাহ্য উভয়বিধ পবিত্রতা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, সেখানে অসুস্থতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা যদি শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেন তা হলে ডাক্তার, হাকিম বা কবিরাজ কারও প্রয়োজন ঘটবে না।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার জন্য আদর্শ জীবনযাত্রা প্রণালী আবশ্যক। আর এর জন্য নগর ও গ্রামগুলিতে আদর্শ জীবনযাত্রার পরিবেশ থাকা চাই। তবে ভগবানের নাম জপ প্রাকৃতিক চিকিৎসার মধ্যবিন্দু স্বরূপ। একে কেন্দ্র করেই প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি আবর্তিত হয়।

হরিজন, ২৬-৫-১৯৪৬

প্রাকৃতিক চিকিৎসার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা সর্বাপেক্ষা সরল ও স্বল্পব্যয়যুক্ত হবে। গ্রামগুলিতে এইরকম চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলন এ কাজের লক্ষ্য। গ্রামবাসীরা যেন এর জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যয়নির্বাহ করতে পারে। তবে কোন জিনিস নেহাৎ গ্রামে পাওয়া না গেলে বাইরে থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অবশ্যই এক অর্থ জীবন সম্বন্ধে উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। এ কথার মানে আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুযায়ী জীবনচর্যার নিয়ন্ত্রণ। হাসপাতাল থেকে পয়সা দিয়ে বা বিনামূল্যে ঔষধ নেবার মত সহজ ব্যাপার এটা নয়। যিনি হাসপাতালের দাতব্য চিকিৎসার শরণ নেন তিনি পরের দাক্ষিণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসার অধীন রোগীকে কারও কাছে হাত পাততে হয় না। আত্মনির্ভরতা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিকারক। দেহের ভিতর যে সব বিষ জমেছে তা দূর করে তিনি নিজেকে সারিয়ে তোলেন এবং যাতে আর ভবিষ্যতে রোগাক্রান্ত না হন তার জন্য প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

উপযুক্ত এবং সুষম আহার্যের প্রয়োজন খুব বেশী। দেশের গ্রামগুলি আজ আমাদেরই মত দেউলিয়া। গ্রামে যথেষ্ট শাকসব্জী, ফল এবং দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রাকৃতিক চিকিৎসা পরিকল্পনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ কার্যে

যে সময় ব্যয় হবে তাকে অপচয় জ্ঞান করা অনুচিত। এর পরিণামে প্রতিটি গ্রাম এবং অবশেষে সমগ্র ভারতের উপকার সাধিত হবে।

হরিজন, ২-৬-১৯৪৬

গ্রামের জন্য আমি যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা গ্রামে লব্ধ সামগ্রীর দ্বারা গ্রামবাসীদের সেবা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলব যে, তাদের জন্য আমার বিদ্যুৎশক্তি বা বরফের প্রয়োজন নেই। এ কাজ কেবল আমার মত গ্রামীণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারে।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪৬

একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন—আমার প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেবল গ্রামবাসীদের এবং গ্রামগুলির জন্য। তাই এতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র, রঞ্জন রশ্মি জাতীয় জিনিসের স্থান নেই। আর এতে কুইনাইন, এমিটিন, পেনিসিলিন ইত্যাদি ওষুধের প্রয়োজনও হবে না। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সুস্থ জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনুশীলনই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই-ই যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকে যদি এই কাজে সুদক্ষ হয়ে ওঠে তা হলে আদৌ কোন রোগ দেখা দেবে না। আর রোগ নিরাময়ের জন্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিধান পালন করার পরও যদি দৈবাৎ রোগাক্রমণ হয় তা হলে সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হচ্ছে রামনাম।

কিন্তু রামনাম জপের দ্বারা নিরাময়ের এই পদ্ধতি চক্ষের পলকে বিশ্বজনীন হতে পারে না। রোগীকে রামনামের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী করাবার জন্য চিকিৎসককে স্বয়ং এই বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক হতে হবে। আর এই ফাঁকে প্রকৃতির পঞ্চভূতের কাছ থেকে যতটুকু পাওয়া সম্ভব তা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হবে। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম অর্থাৎ মাটি জল আগুন বায়ু এবং আকাশ —এইগুলি প্রকৃতির পঞ্চভূত। আমার মতে এই-ই হচ্ছে প্রাকৃতিক চিকিৎসার সীমা। অতএব উরুলীকাঞ্চনে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসঙ্গত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি শেখানো এবং পূর্বোক্ত পঞ্চভূতের যথোচিত প্রয়োগে রোগীদের সুস্থ করার প্রয়াসের মধ্যেই সীমিত। প্রয়োজন হলে রোগ নিরাময়ের শক্তিবিশিষ্ট গ্রাম্য গাছগাছড়া ব্যবহার করা

যেতে পারে। অবশ্য পুষ্টিকর এবং সুষম আহার্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার অপরিহার্য অঙ্গ।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪৬

॥ ৫ ॥

গ্রামবাসীর খাদ্য

কাঁচা শাকসব্জী

খাদ্যতত্ত্ব ও খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সংক্রান্ত যে-কোন আধুনিক পাঠ্যপুস্তক খুলে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রতি বার আহারের সময় অন্ততঃ কয়েকটি কাঁচা শাকসব্জী খাবার জন্য সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, খাবার পূর্বে এগুলিকে বার বার ভাল ভাবে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে এতে কোনরকম ময়লা বা ধূলাবালি না লেগে থাকে। যে কোন গ্রামেই এরকম শাকসব্জী পাওয়া যায়, কেবল সেগুলি তুলে আনবার অপেক্ষা। অথচ আমরা ভাবি যে, কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া বুঝি শহরের বিলাসিতা। ভারতের অধিকাংশ গ্রামের অধিবাসীরা ডাল-রুটি বা ডাল-ভাত খেয়ে থাকেন। এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ লঙ্কা থাকে, যাতে শরীরের ক্ষতি হয়। খাদ্য সংস্কারের দ্বারা যেহেতু গ্রামগুলির আর্থিক পুনর্গঠন কার্যের সূত্রপাত করা হয়েছে সেই কারণে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় এমন খাদ্য খুঁজে বার করতে হবে। এ খাদ্য স্বল্পতম ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনাড়ম্বর হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য তালিকায় দুই-চার পদ কাঁচা শাকসব্জী যোগ করলে বর্তমানে গ্রামবাসীরা যে সব রোগভোগ করে তার অনেকগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। গ্রামবাসীদের আহার্যে ভিটামিনের স্বল্পতা আছে; এর অনেকখানিই কাঁচা শাকসব্জী দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। দিল্লীতে আমাকে জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক বলেছেন যে, কাঁচা শাকসব্জীর উপযুক্ত ব্যবহার হলে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হবে এবং দুধের দ্বারা আজ আমরা যে পুষ্টি আহরণ করি তার অনেকটা এই কাঁচা শাকসব্জীর ব্যবহারে পাওয়া যাবে। তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারতে আজ ঘাস-পাতার মধ্যে যে সব শতবিধ শাকসব্জী অজ্ঞাত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তাদের ভিতর কতটা পুষ্টির ক্ষমতা আছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা প্রয়োজন।

হরিজন, ১৫-২-১৯৩৫

গ্রামসেবকদের সঙ্গে আলোচনা

আজকের আহার্যতালিকা আমিই ভেবেচিন্তে এবং বিশেষতঃ গ্রামসেবকদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে স্থির করেছিলাম। কাজেই এ সম্বন্ধে আপনাদের আমি বিস্তারিত ভাবে জানাতে চাই। আপনাদের খাদ্য পুষ্টিগুণসম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন গড়পড়তা সাধারণ গ্রামবাসীর আয়ের সীমার মধ্যে হয়—এই আমি চেয়েছিলাম। আমরা এখানে স্থির করেছি যে, আট ঘণ্টা পরিশ্রমের ন্যূনতম পারিশ্রমিক অন্ততঃ তিন আনা হওয়া উচিত। সাধারণ গ্রামবাসীর আয়ের কথা বিবেচনা করার সময় এই কথাটিও তাই খেয়াল রাখতে হয়েছিল।

আজ আমরা ৯৮ জন খেয়েছি এবং এ বাবদ মোট ৯৮৶৩ পাই অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য ছয় পয়সার সামান্য কিছু বেশী খরচ হয়েছে।··

বিনোবা আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, তোমাদের জন্য রুটির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যহ সকালে তোমরা যে গমের জাউ খাও তাই দিলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আমি ভাবলাম, না, তোমরা এখন যুবক এবং ভগবান তোমাদের মজবুত দাঁত দিয়েছেন। তোমাদের তাই ভাল করে সেঁকা কড়া ভাখরী দেওয়া উচিত। ভাখরী যে-কেউ তৈরি করতে পারে এবং তা যত্রতত্র নিয়ে যাওয়া চলে। এ ছাড়া ভাখরী কয়েক দিন রেখে খাওয়া যায়। ভাখরীর আটা মাখার আগে তাতে তিসি তেলের ময়ান দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভাখরী নরম মুচমুচে হয়েছে। তারপর রোজ কিছু কাঁচা শাকপাতা আর তরকারি খাওয়া উচিত বলে আমরা আজ টমাটো এবং দুই রকমের চাটনি খেয়েছি। একটি চাটনি কয়েৎবেলের। এ অঞ্চলে এ ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চাটনিটি আমাদের বাগানের শাক দিয়ে তৈরি হয়েছিল। কয়েৎবেল বিরেচক এবং বলবর্ধক হিসাবে সুপরিচিত, এর সঙ্গে গুড় মিশিয়ে চমৎকার চাটনি তৈরি হয়েছিল। অপর চাটনিটিকে সুস্বাদু করার জন্য শাকের সঙ্গে নারিকেল, তেঁতুল ও নুন মেশানো হয়েছিল। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন পাবার জন্য প্রত্যহ কোন না কোন রূপে কিছু কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া প্রয়োজন। আমরা যে তরকারি আজ খেয়েছি তা অতীব সস্তা এবং দেশের গ্রামগুলিতে এই সব তরিতরকারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাটনিতে তেঁতুল দেওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। লোকসমাজে তেঁতুলের প্রতি কথঞ্চিৎ বিমুখতা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, তেঁতুল পুষ্টিকারক এবং রক্তশোধক। জনৈক আশ্রম-

বাসী একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। তাকে প্রচুর মাত্রায় তেঁতুলের জল দিয়ে বেশ উপকার পাওয়া গিয়েছিল। কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছে এমন কয়েকটি রোগীর উপরও এর ফল ভাল হয়েছে।

দুধ আমাদের খাদ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। তোমাদের আজ এক পোয়া করে দুধ দেওয়া হয়েছিল; তবে লক্ষ্য করে থাকবে যে তোমাদের ঘি দিই নি। এতে কোন হানি হয় নি, তা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ভাল ঘি পাওয়া সম্বন্ধে যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানে খারাপ ঘি খাওয়া কেন? তবে যত অল্পই হোক না কেন, রোজ কিছু না কিছু দুধ বা ঘোল খাওয়া দরকার। চিকিৎসকদের মতে এর দ্বারা উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ এবং আমিষ পরিপাক করার সহায়তা হয়। তাই কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা না করেই তোমরা ঘি বাদ দিতে পার।

তোমাদের দুটি অন্যতম প্রধান কর্তব্যের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে গ্রামবাসীদের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং নিজেরা স্বয়ং ওই রকম খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকা। দেশের কিছুসংখ্যক লোক তাদের আহার্যকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং অধিকাংশ লোকের আহার্যে ভিটামিনের যথেষ্ট অভাব। তাদের মধ্যে সঠিক খাদ্যবস্তুর প্রবর্তন করতে হবে। তোমাদের স্বয়ং গোপালন শিখতে হবে, তার পর এই বিদ্যা গ্রামবাসীদের শেখাতে হবে। বড়ই লজ্জার কথা যে, ভারতের অনেক গ্রামে দুধ পাওয়া যায় না। তোমাদের দ্বিতীয় মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে সাফাই এবং এ কাজ নিঃসন্দেহেই কঠিন। তবে তোমরা যদি সঠিক খাদ্য প্রবর্তন এবং নিজেদের গ্রামের সাফাইয়ের মান মোটামুটি উন্নত করতে পার তা হলে বলতে হবে যে, মানবদেহকে তোমরা দেব-দেউলের উপযুক্ত করে তুলেছ এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের জন্যও সে দেহ একটি কর্মকুশল হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

হরিজন, ২-১১-১৯৩৫

॥ ৬ ॥

গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা

মনে যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, ইংরেজ শিক্ষকরা কিছুতেই ইংলণ্ড এবং ভারতের প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। ওঁদের দেশে স্কুলের জন্য যেসব ইমারত দরকার হয় আমাদের দেশের জলবায়ুতে তার কোন আবশ্যকতা নেই। আর মুখ্যতঃ নগর পরিবেশে প্রতিপালিত ইংরেজ শিশুর

জন্য যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, আমাদের প্রধানতঃ গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুদের জন্য সেরকম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময় তাদের হাতে শ্লেট, পেনসিল বা বইপত্র না দিলেও চলবে। গ্রামের যে সব সরল যন্ত্রপাতি তারা অবাধে এবং লাভজনকভাবে চালাতে পারবে তা-ই তাদের প্রয়োজন। এর তাৎপর্য হচ্ছে শিক্ষাপদ্ধতিতে বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লব ছাড়া অপর কিছু শিক্ষাকে স্কুলে যাবার বয়সের প্রতিটি শিশুর কাছে সহজলভ্য করতে পারবে না।

এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পড়া, লেখা এবং গণিতের যে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়, পরবর্তী জীবনে শিশুর তা বিশেষ কাজে লাগে না। চর্চার অভাবে এর অধিকাংশই তারা বছর খানেকের মধ্যে ভুলে যায়। তাদের গ্রাম্য পরিবেশে এর কোন দরকার পড়ে না।

কিন্তু শিশুদের পরিবেশের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে তারা যে কেবল তাদের শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করতে পারবে তাই নয়, পরবর্তী জীবনেও তাদের ওই শিক্ষা কাজে লাগবে। আমার ধারণা যে, কোন স্কুল যদি কাতাই ও বুনাইয়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন এক খণ্ড কার্পাস চাষের জমি যদি থাকে তবে সে বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমি যে পরিকল্পনার কথা বলছি তাতে সাহিত্যশিক্ষাকে বর্জনীয় জ্ঞান করা হয় নি। পড়তে, লিখতে এবং সাধারণ গণিত না জানলে কোনরকম প্রাথমিক পাঠ্যক্রমকে সম্পূর্ণ বলা চলে না। তবে পড়া ও লেখার পাট আসবে এ পর্যায়ের শেষ বৎসরে, যখন ছেলেমেয়েরা সঠিকভাবে অক্ষরজ্ঞান পাবার পক্ষে সর্বাধিক মাত্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠবে। হস্তলিপি একটি চারুকলা। চিত্রশিল্পী যেমন যথাযথভাবে তার পট অঙ্কন করেন, ছাত্রদেরও তেমনি শুদ্ধভাবে প্রতিটি অক্ষর লিখতে হবে। ছেলেমেয়েদের প্রথমে প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা দিলে এ সম্ভবপর হবে। এইভাবে দিনের অধিকাংশ সময় বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাথমিক ইতিহাস ভূগোল এবং গণিতের সম্বন্ধে মৌখিক জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। এ ছাড়া তারা সদাচার শিখবে, প্রত্যক্ষ সাফাই বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পাঠ গ্রহণ করবে এবং পরে এই সব নিজেদের ঘরে প্রবর্তন করে তারা নীরব বিপ্লবীতে পরিণত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৭-১৯২৯

॥ ৭ ॥

কুটীরশিল্প এবং কৃষি

বস্ত্র

আজ যেমন প্রতিটি গ্রাম নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করে নেয় তেমনি বস্ত্রের ব্যাপারেও প্রতিটি গ্রাম নিজেদের জন্য সূতা কেটে কাপড় বুনে নেবে—এইটিই নিঃসন্দেহে আদর্শ হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার চেয়ে সূতা কেটে কাপড় বুনে নেওয়া গ্রামের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য। গ্রামে সহজেই আবশ্যক পরিমাণে তুলা মজুত করে রাখা যায় এবং বিশেষ কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই কাতাই বুনাইয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২৯

আমাদের যাবতীয় সার্বজনীন সহযোগী জীবনের ভিত্তি হচ্ছে চরখা। চরখা ব্যতিরেকে কোনরকম স্থায়ী সার্বজনীন জীবন গঠন করা অসম্ভব। **এই হচ্ছে একমাত্র দৃষ্টিগোচর বন্ধন যা আমাদেরকে দেশের দীনতম ব্যক্তিটির সঙ্গে সমসূত্রে আবদ্ধ করে এবং এইভাবে তার মনে আশার সৃষ্টি করে।** এর সঙ্গে আমরা অনেক কিছু যোগ করতে পারি এবং আমাদের তা যোগ করা উচিতও। তবে অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রী যেমন উপরের দেওয়াল গাঁথার পূর্বে বুনিয়াদ মজবুত কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেয় আমাদেরও তেমনি সর্বপ্রথম চরখার ব্যাপারে আঁটঘাঁট বেঁধে পরবর্তী কাজে নামতে হবে। আর উপরের গাঁথুনি যতই বিশাল হবে নীচের ভিতও সেই অনুপাতে গভীর ও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। সুতরাং এদেশে সুফল লাভ করতে হলে সূতা কাটাকে সার্বজনীন করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৯-১৯২৪

কৃষির দ্বারা যথেষ্ট উপার্জন না হবার দরুন এবং অনেক সময় বেকার থাকার জন্য যে সব গ্রামের অধিবাসী নিত্য অভাবপীড়িত, একমাত্র সেই সব গ্রামেই মজুরীর বিনিময়ে সূতা কাটা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

তবে দারিদ্র্য বা সচ্ছলতার কথা বিচার না করেই প্রতিটি গ্রামে প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজনের জন্য সূতা কাটার প্রচলন করতে হবে। সেই সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের যে সাহায্য দিতে হবে তা নিম্নরূপ ধারণ করবে। তাদের তুলার

বীজ ছাড়ানো, ধুনাই বা কাতাই যার যা প্রয়োজন শিক্ষা দিতে হবে এবং ক্রয়মূল্যে তাদের তুলা ও চরখার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া তাদের সুতা প্রচলিত দরে বুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৫-১৯২৯

গ্রামীণ পণ্য ব্যবহার করুন

গ্রামবাসীদের প্রতি এক ভীষণ অবিচার করার দোষে আমরা দোষী। গ্রামের লুপ্ত শিল্প ও চারুকলা পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহিত করে এবং তৈরি মালের কাটতি সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়তা দিয়েই কেবল আমরা এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। ঈশ্বরের মত ধৈর্যবান আর ক্ষমতাশীল আর কেউ না থাকলেও তাঁর ধৈর্য ও ক্ষমারও একটা সীমা আছে। গ্রামবাসীদের প্রতি আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করলে আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনব। এ কর্তব্য মোটেই কঠোর নয়, বরং অত্যন্ত সহজ। আমাদের গ্রামীণ মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং ব্যক্তিগত বা ঘর-গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এই গ্রামীণ মনোভাব দ্বারা চালিত হতে হবে। আর এতে খুব একটা ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কাও নেই। এমন কিছুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন, যারা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার কারিগরদের আশ্বাস দেবেন। আশ্বাস দেবেন এই মর্মে যে, তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত সব কিছু অবিলম্বে নিকটস্থ নগর বা শহরে বিক্রি হবে। এ এমন একটি কাজ যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতিটি নরনারী করতে পারেন। এতে রাজনৈতিক দল বা মত ও পথের পার্থক্য কোন বাধা স্বরূপ হবার কথা নয়। আমাদের দেশের যথার্থ অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে এই কর্ম-সূচীর পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতি বিদ্যমান।

হরিজন, ১-৩-১৯৩৫

গ্রাম শোষণমুক্ত হবে

গ্রামের শোষণ বন্ধ হলেই কেবল তার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর। ব্যাপকভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বাজারের সমস্যা দেখা দেবে এবং তার পরিণাম স্বরূপ স্বভাবতই প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামের শোষণ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের তাই স্বাবলম্বী ও স্বরাট্ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য যত্নশীল

হতে হবে এবং এই সব গ্রামে প্রধানতঃ নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপন্ন হবে। কুটীরশিল্পের এই চারিত্র্যধর্ম বজায় রেখে গ্রামবাসীরা তাদের সঙ্গতি ও ক্ষমতা অনুসারে যত আধুনিক যন্ত্রপাতিই নির্মাণ ও ব্যবহার করুক না কেন আমার তাতে আপত্তি নেই। শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে, এই সব কলকব্জা যেন অপরকে শোষণ করার জন্য ব্যবহৃত না হয়।

হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬

অন্যান্য শক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে

প্রশ্ন। গুজরাতের হাজার হাজার গ্রামে কলের জাঁতা চলে। এর এঞ্জিন জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলে সহজেই তার দ্বারা নদী, পুষ্করিণী এবং কূয়া থেকে সেচের জন্য জল তোলা যায়। সরকারকে প্রভাবিত করে বা ওই সব আটাকলের মালিকদের রাজী করিয়ে তাঁদের জাঁতা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না কি?

উত্তর। হাজার হাজার গ্রামে শস্য পেষাই করার জন্য কলের জাঁতা থাকা আমি আমাদের অসহায় অবস্থার প্রতীক বলে বিবেচনা করি। এই সব আটাকল বা তাদের এঞ্জিনগুলির প্রত্যেকটিই তো আর ভারতবর্ষে প্রস্তুত নয়। আমার কেমন যেন মনে হয়, প্রশ্নকারী ঠিক সংবাদ পরিবেশন করেন নি। গুজরাতের তো নয়ই, এমন কি সমস্ত ভারতের আটাকলের মোট সংখ্যা হাজার হাজার হবে কিনা সন্দেহ। তবে আমার অনুমান যদি মিথ্যা হয় তা হলে বলতে হবে যে, আমাদের দেশবাসী কী প্রচণ্ড রকম আলস্যের কবলে পড়েছে এ ঘটনা তারই নিদর্শন। আর গ্রামে ব্যাপকভাবে ওই সব কল-কব্জা বসানো লোভের লক্ষণও বটে। এইভাবে গরীবদের মেরে কি কারও নিজের পকেট ভারী করা উচিত? ওইরকম প্রতিটি আটাকল হাজার হাজার হাতে চালানো জাঁতাকে বেকার করে দেয়। এর ফলে অসংখ্য কুলবধূ উপার্জনবিহীন হয়ে পড়ে এবং জাঁতা প্রস্তুতকারক কারিগররাও বৃত্তিচ্যুত হয়। এখানেই এর শেষ নয়, এ পদ্ধতি সংক্রামক ব্যাধির মত অন্যান্য কুটীর-শিল্পকেও আক্রমণ করবে। আর কুটীরশিল্পের অধোগতির অর্থ শিল্পকলারও অবক্ষয়। এর দ্বারা যদি পুরাতনের বদলে নূতন শিল্পের প্রবর্তন হত তা হলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। যে সব হাজার হাজার

গ্রামে কলের জাঁতা চলছে, সেখান থেকে জাঁতা ঘোরাবার সুমধুর প্রভাতী সঙ্গীত বিদায় নিয়েছে।

এবার প্রধান বক্তব্যে আসা যাক। বর্তমানে এইসব শক্তিচালিত এঞ্জিনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে মনে করলেও আমাকে বলতেই হবে যে, এখন এইসব এঞ্জিন দিয়ে যে কাজ করানো হচ্ছে তা ছাড়া এগুলি দিয়ে যদি নদী, পুকুর বা কুয়া থেকে সেচের জল তোলা যায় তা হলে কৃতকর্মের অন্ততঃ আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। পত্রলেখক এর জন্য সরকারী সহায়তার কথা বলেছেন, কিন্তু তা কি একেবারে অপরিহার্য? এঞ্জিনের মালিকরা কি স্বেচ্ছায় এই কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তাঁদের এঞ্জিন দেবেন না? আমরা কি এতই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে সরকার বাধ্য না করলে আমরা কোন কিছু করতেই প্রস্তুত নই? যাই হোক, আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, জনসাধারণের সম্মুখে যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার কবল থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা দেশের সর্বপ্রকার শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

হরিজন, ১০-৩-১৯৪৬

॥ ৮ ॥

গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন

পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েত শব্দটিতে প্রাচীনত্বের আভাস আছে, আর শব্দটি চমৎকারও বটে। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গ্রামের পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিষদ্। এই প্রথার ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র পরিচালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের রাজস্ব উশুল করার নিখুঁত অথচ নির্মম পদ্ধতির চাপে পুরাকালের এই গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রগুলিকে এক রকম চুরমার করে দিয়েছে। গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রগুলি রাজস্ব আদায়ের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে নি। কংগ্রেসকর্মীরা এখন গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকার দিয়ে এই প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা মোটামুটি চেষ্টা করেছেন। এ প্রয়াসের সূত্রপাত হয় ১৯২১ সনে। তখন তা সফল হয় নি। আবার নূতন করে

চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। তবে সুন্দর ও বিধিবদ্ধ ভাবে—বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কথাটা না হয় না-ই প্রয়োগ করলাম—এ কাজে হাত না দিলে এবারকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নৈনিতালে আমি খবর পেলাম যে, উত্তর প্রদেশের কোন কোন জায়গায় এমন কি নারী ধর্ষণের মত ফৌজদারী মামলাও এইসব তথাকথিত পঞ্চায়েতের হাতে বিচারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞ বা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট পঞ্চায়েত কোন কোন ক্ষেত্রে কী অদ্ভুত ধরনের রায় দিয়েছে, তার কথাও আমার কানে এসেছে। এ সব যদি সত্য হয় তা হলে অত্যন্ত খারাপ বলতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ পঞ্চায়েত নিজের ভারে নিজেই চাপা পড়ে মরবে। সুতরাং গ্রামসেবকদের পরিচালনার জন্য আমি নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর সুপারিশ করছি :

১) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পঞ্চায়েত গড়া হবে না।

২) পঞ্চায়েতের নির্বাচনের জন্য ঢোল-শহরৎ দ্বারা প্রচার করে যে বিশেষ জনসভা আহ্বান করা হবে তাতে পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে।

৩) তহশিল কমিটী এই পঞ্চায়েতকে সুপারিশ করবে।

৪) **এ সব পঞ্চায়েতের কোন ফৌজদারী অধিকার থাকবে না।**

৫) এই পঞ্চায়েত দেওয়ানী মোকর্দমা বিচারের ভার নেবে—অবশ্য বিবদমান পক্ষ সমূহ যদি চায় কেবল তা হলেই।

৬) পঞ্চায়েতে কোন মোকর্দমা দিতে কাউকে বাধ্য করা চলবে না।

৭) জরিমানা করার কোন অধিকার পঞ্চায়েতের থাকবে না। এর দেওয়ানা রায়ের পিছনে কেবল নৈতিক শক্তির বল থাকবে। কঠোর নিরপেক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আনুগত্য হবে এর বৈশিষ্ট্য।

৮) আপাতত সামাজিক বা অপর কোন ধরনের বয়কটের কথা চিন্তা করা হবে না।

৯) প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে :

ক) গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা; খ) গ্রাম সাফাই; গ) গ্রামবাসীর চিকিৎসা; ঘ) গ্রামের পুকুর ও কূয়া পরিষ্কার রাখা; ঙ) তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নতি বিধান ও তাদের নিত্যকার অভাব অভিযোগের নিরাকরণ।

১০) নির্বাচিত হবার ছয় মাসের মধ্যে কোন পঞ্চায়েত যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া পূর্বোক্ত কাজগুলি হাতে নিতে না পারে বা অপর কোন কারণে

গ্রামের লোকের সদ্ভাব হারায় কিংবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার বিবেচনামতে কোন কারণে নিন্দার্হ বলে প্রতিপন্ন হয়, তা হলে সেই পঞ্চায়েতকে ভেঙে দিয়ে তার স্থলে নূতন পঞ্চায়েতের নির্বাচন করতে হবে।

প্রথমাবস্থায় পঞ্চায়েতকে জরিমানা বা সামাজিক বয়কট করার অধিকার না দেওয়া খুবই দরকার। গ্রামে অজ্ঞ ও অসৎ ব্যক্তিদের হাতে সামাজিক বয়কট এক বিপজ্জনক অস্ত্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে। আর জরিমানা করার অধিকারের ফলেও নানাবিধ অসাধুতা দেখা দিতে পারে এবং অবশেষে পঞ্চায়েতের মূল আদর্শই ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেখানকার পঞ্চায়েত সত্যসত্যই জনপ্রিয় এবং পূর্বোক্ত ধরনের গঠনমূলক কাজ করে নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে, সেখানে দেখা যাবে যে পঞ্চায়েতের নৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই লোকে এর কর্তৃত্ব ও বিচার মেনে নেবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব যা মানুষের অধিগত হতে পারে, আর এই কর্তৃত্ব থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-১৯৩১

পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে

শনিবারের সান্ধ্য প্রার্থনা সভা সামলকা নামক গ্রামে হল। ওই গ্রামে একটি পঞ্চায়েত ঘর তৈরি হয়েছিল। পঞ্চায়েত ঘর তৈরি করার জন্য গান্ধীজী গ্রামবাসীদের প্রশংসা করলেন। তবে তিনি এ কথাও বললেন যে, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম না করলে তাদের এই চেষ্টা সময় ও শ্রমশক্তির অপচয় বলে গণ্য হবে। পুরাকালে চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসতেন। জ্ঞানের সন্ধানে তাঁরা বহু কষ্ট স্বীকার করে এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা এই বিবরণ রেখে গেছেন যে, ভারতবর্ষে চুরি অজ্ঞাত ছিল এবং এদেশবাসী সৎ ও পরিশ্রমী ছিল। সে সময় ঘরের দরজায় তালা লাগানোর প্রয়োজন হত না। আজকের মত তখন এত অসংখ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না। এই সততা ও শ্রমনিষ্ঠা পঞ্চায়েতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক বৎসর পর তিনি যদি আবার ওই গ্রামের অধিবাসীদের প্রশ্ন করেন তা হলে তাঁরা কি বলতে পারবেন যে, তাঁদের পূর্ব বৎসরের ইতিহাস অকলঙ্কিত? তাঁরা কি গৌরব ভরে এ কথা ঘোষণা করতে পারবেন যে, পঞ্চায়েত ছাড়া তাঁরা অপর কোন আদালতের শরণ নেন নি? পঞ্চায়েত যদি বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করতে চায় তা হলে বিবাদ এড়ানোর

শিক্ষা গ্রামবাসীদের দেওয়াও পঞ্চায়েতের কর্তব্য। এর ফলে কোন রকম অর্থব্যয় ব্যতিরেকে দ্রুত ন্যায়বিচার লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। আর তাই পুলিস বা সৈন্যবাহিনীরও প্রয়োজন পড়বে না।

পঞ্চায়েতকে এর পর গ্রামের পশুর উন্নতির কাজ হাতে নিতে হবে। গরুর দুধের পরিমাণ ক্রমশঃ যেন বাড়তে থাকে। যত্ন না নেওয়ার জন্য আমাদের পশু-গুলি ভূমির উপর ভার স্বরূপ হয়ে পড়েছে। গো-বধের জন্য মুসলমানদের দোষ দেওয়া নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। গান্ধীজীর মতে হিন্দুরাই গরুর প্রতি দুর্ব্যবহার করে তিলে তিলে গো-জাতির বিনাশ করছে। সরাসরি মেরে ফেলার চেয়ে উৎপীড়ন করে ধীরে ধীরে মারা অনেক বেশী বীভৎস ব্যাপার। গ্রামে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও পঞ্চায়েতের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। জমিতে উপযুক্ত সার দিলে এ হওয়া সম্ভব। পশুপক্ষী এবং মানুষের মলমূত্রকে আবর্জনার সঙ্গে মিলিয়ে মূল্যবান সারে রূপান্তরিত করা যায়। এই সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া গ্রামের সাফাই ও গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও নজর দিতে হবে। গ্রামবাসীদের শরীর ও মন দুইই যেন শুদ্ধ হয়।

গান্ধীজী আশা করেন যে, তাঁদের গ্রামে কোন চলচ্চিত্র গৃহ তৈরি হবে না। অনেকে বলে থাকেন যে, চলচ্চিত্র জনশিক্ষার এক শক্তিশালী বাহন। ভবিষ্যতে হয়তো এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে; কিন্তু এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র দেশের কী ক্ষতি করছে তা তিনি দেখতেই পাচ্ছেন। গ্রামের লোক অনেক দেশী খেলাধূলা জানেন। গ্রাম থেকে নেশা ভাঙের বদভ্যাস চলে যাওয়া উচিত। আর তাঁদের গ্রামে এখনও যদি অস্পৃশ্যতার কোন চিহ্ন থেকে থাকে, তাও তাঁরা দূর করবেন বলে গান্ধীজী আশা করেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী ও খ্রীষ্টানরা যেন ভাইয়ের মত থাকেন। তিনি যে সব কথা বললেন তা যদি গ্রাম-বাসীরা করে দেখাতে পারেন তা হলে সত্যকার স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে উঠবে এবং ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে মানুষ তাঁদের আদর্শ গ্রাম দেখতে ও তার থেকে প্রেরণা লাভ করতে আসবে।

হরিজন, ৪-১-১৯৪৮

পঞ্চায়েত রাজ

ভারতের সত্যকার গণতন্ত্রের একক্ হচ্ছে গ্রাম। একটি গ্রামও যদি পঞ্চায়েত রাজ বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে কারও তাকে বাধা দেবার

ক্ষমতা নেই। জনা বিশেক লোক কেন্দ্রে বসে সত্যকার গণতন্ত্রকে রূপ দান করতে পারেন না। নিচে থেকে প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণকে দিয়ে একে মূর্ত করে তুলতে হবে।

হরিজন, ১৮-১-১৯৪৮

॥ ৯ ॥

গ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

শান্তিসেনা

কিছু দিন পূর্বে আমি শান্তিসেনার সংগঠন করার কথা বলেছিলাম। এর সদস্যরা দাঙ্গা, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। আমার মনে এই পরিকল্পনা ছিল যে, এই ধরনের শান্তিসেনা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিস এমন কি সৈন্যবাহিনীরও আর প্রয়োজন থাকবে না। এ কথা খুব উচ্চাশার পরিচায়ক মনে হতে পারে। এর পরিপূর্তি সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কংগ্রেসেকে যদি তার অহিংস সংগ্রামে জয়ী হতে হয়, তবে এই জাতীয় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামলানোর ক্ষমতা তাকে গড়ে তুলতে হবে।

তা হলে এবার দেখা যাক যে প্রস্তাবিত শান্তিসেনার সদস্যদের কি কি গুণ থাকা দরকার।

(১) অহিংসায় তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস থাকা চাই। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছাড়া এ সম্ভব নয়। ভগবানের কৃপা এবং শক্তি ছাড়া কোন অহিংস ব্যক্তি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে তিনি ক্রোধ, ভয় এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিশূন্য হয়ে মরতেও পারবেন না। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাই তাঁর উপস্থিতিতে ভয়ের কোন কারণ নেই—এই বিশ্বাস থেকে পূর্বোক্ত সাহসের জন্ম হয়। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে তথা-কথিত বিরোধী পক্ষ বা গুণ্ডাদের জীবনকেও সম্মান করা। মানুষের ভিতরকার পশুস্বভাব যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধের উপশম করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি খুবই সহায়ক হয়।

(২) শান্তি দূত পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবেন। অর্থাৎ

তিনি যদি হিন্দু হন তা হলে ভারতের অন্যান্য ধর্মমতকেও তিনি শ্রদ্ধা করবেন। সুতরাং তাঁকে এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের মূলসূত্রগুলি জানতে হবে।

(৩) সাধারণত শান্তি স্থাপনা করার এই কাজ স্থানীয় লোকেদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকাতেই করা সহজ।

(৪) একক ভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে এ কাজ করা যায়। সুতরাং কেউ যেন সঙ্গী সাথীর জন্য অপেক্ষা না করেন। তবে নিজের পাড়ায় সঙ্গী সাথী জুটাতে চাওয়া স্বাভাবিক এবং এইভাবে সঙ্গী সাথী জুটিয়ে শান্তি সৈনিকের একটি দল খাড়া করার চেষ্টা অবশ্য করতে হবে।

(৫) শান্তি দূত নিজের পাডা বা কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সেবাকার্য দ্বারা জনসংযোগ করতে থাকবেন। এতে লাভ হবে এই যে, কোন বিসদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দাঙ্গাকারী জনতা তাঁকে একেবারে অপরিচিত আগন্তুক, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করবেন না।

(৬) এ কথা বলাই বাহুল্য, শান্তি সৈনিকের চরিত্র সন্দেহাতীত হবে এবং পক্ষপাতহীন আচরণের জন্য তাঁর খ্যাতি থাকা চাই।

(৭) সাধারণত বিপদ আসার পূর্বে তার আভাস পাওয়া যায়। এই রকম খবর পাওয়া গেলে শান্তিসেনা আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। পূর্ব থেকেই তাঁরা অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য লেগে পডবেন।

(৮) শান্তিসেনার অন্দোলনের প্রসার ঘটলে এর জন্য কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী থাকা ভাল, তবে এ একেবারে অপরিহার্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক সৎ নর-নারীর সমাবেশ করা। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। নিজেদের নিয়মিত কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অবসর সময় নিজ নিজ এলাকার নর-নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। অথবা অন্য ভাবেও এঁরা শান্তিসেনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী অর্জন করতে পারেন।

(৯) প্রস্তাবিত শান্তিসেনাদের একটা নির্দিষ্ট পোশাক থাকা দরকার; তা হলে প্রয়োজনের সময় কোনরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই এঁদের চিনে বার করা যাবে।

এগুলি হচ্ছে সাধারণ ধরনের সুপারিশ। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কেন্দ্র নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরি করে নিতে পারেন।

হরিজন, ১৮-৬-১৯৩৮

অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

কিছু দিন পূর্বে আমার আগ্রহে 'শান্তি দল' গঠন করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল; তবে তার ফলে বিশেষ কিছু হয় নি। তবে এই প্রচেষ্টা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেছে যে, স্বভাবতই এই রকম দলের সদস্য-সংখ্যা খুব বেশী হবে না। দণ্ডশক্তির উপর আধারিত কোন বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের কালে স্বভাবতই দণ্ডশক্তির শরণ নেওয়া হবে। ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মানুষের চরিত্র শক্তির উপর নামমাত্র জোর দেওয়া হয়, বা একেবারে দেওয়া হয় না বললেই চলে। শারীরিক বলই ওখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটবে। এখানে চরিত্র বা আত্মার শক্তিই সব চেয়ে বড় কথা এবং শারীরিক শক্তির স্থান হবে গৌণ। এরকম লোক অধিক সংখ্যায় পাওয়া মুশকিল। এই জন্য অহিংস বাহিনীকে কার্যকুশল হতে হলে সংখ্যায় অল্প হতে হবে। এর সদস্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারেন; প্রতিটি গ্রাম বা পাড়ায় এক একজন শান্তি সৈনিক থাকতে পারেন। তবে তাঁরা একে অপরকে ভাল করে চিনবেন। প্রত্যেকটি দল নিজেদের নায়ক বেছে নেবেন। শান্তি সৈনিকদের দলে অবশ্য প্রতিটি সদস্যই সমমর্যাদা সম্পন্ন; তবে সকলেই যেখানে এক রকম কাজে নিযুক্ত সেখানে কোন একজনের নেতৃত্বে বাকী সকলে কাজ না করলে কাজের ক্ষতি হয়। কোন এলাকায় দুই বা তার চেয়ে বেশী শান্তি দল থাকলে তার নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। একমাত্র এইভাবে কাজ করলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হলে তারা সহজে অশান্তি নিবারণ করতে পারবে। আখড়া ইত্যাদিতে যত রকমের শরীরচর্চা হয়, তার সবটুকু এদের প্রয়োজনে না লাগলেও কিছু কিছু কাজে লাগবে।

তবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ভিতর একটি বিষয়ে ঐক্য থাকা চাই—ঈশ্বরের উপর তাঁদের যেন অবিচল আস্থা থাকে। তিনিই একমাত্র সঙ্গী ও কর্মকর্তা। তাঁর উপর বিশ্বাস না থাকলে এইসব শান্তি সৈনিকের দল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা কেবল তাঁর শক্তির প্রসাদেই কাজ করতে পারি। এই জাতীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রাণনাশ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করবেন এবং এইভাবে মৃত্যুকে জয় করে অমর হবেন।

যাঁর জীবনে এই সত্য জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে, বিপদের সম্মুখীন হলেও তিনি কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না। তাঁর স্বজ্ঞা তাঁকে সঠিক পথ বাৎলে দেবে। এতৎসত্ত্বেও আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি বিধি-বিধানের উল্লেখ করছি :

১) অহিংস স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখবেন না।

২) তাঁদের সহজেই চেনা যাবে।

৩) প্রাথমিক পরিচর্যা করার জন্য প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ব্যাণ্ডেজ কাঁচি, সুঁচ, সুতা ও অস্ত্রোপচার করার ছুরি ইত্যাদি থাকবে।

৪) আহতকে বহন ও স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া তিনি জানবেন।

৫) অগ্নি নির্বাপণ, স্বয়ং আহত না হয়ে অগ্নিবেষ্টিত এলাকার মধ্যে প্রবেশ, বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য উচ্চ জায়গায় চড়া ও সেখানে থেকে নিরাপদে নামা ইত্যাদি প্রক্রিয়া তাঁকে জানতে হবে।

৬) নিজের এলাকার সকলের সঙ্গে তাঁর ভালরকম জানাশোনা থাকা চাই। কেবল একেই একরকমের সেবা আখ্যা দেওয়া যায়।

৭) তিনি নিরন্তর মনে মনে রামনাম জপ করবেন এবং অপর যাঁরা এতে বিশ্বাস করেন তাঁদেরও অনুরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

মানুষ কখনও কখনও তোতা পাখির মত ভগবানের নামোচ্চারণ করে এবং আশা করে যে তাতেই ফল হবে। খাঁটি ভক্তের বিশ্বাস এতটা জীবন্ত হওয়া চাই যার ফলে তাঁর নিজের তোতার মত নামোচ্চারণ করার বৃত্তিই কেবল বিদূরিত হবে না, অপরের হৃদয় থেকেও এই দুর্বলতা দূর করার শক্তি তাঁর হবে।

হরিজন, ৫-৫-১৯৪৬

॥ ১০ ॥

গ্রামসেবক

গ্রামের কাজ

গ্রামসেবকের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে চরখা। খাদি পরিকল্পনার পিছনকার দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এই যে, এ শিল্প কৃষির পরিপূরক এবং কৃষির পাশে পাশে এর অবস্থান। যত দিন না দেশের গ্রামগুলি থেকে আলস্যকে নির্বাসিত করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ না গ্রামের প্রতিটি ঘরে মৌচাকের মত কর্মগুঞ্জন উঠছে, তত

দিন চরখা আমাদের জীবনে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে বলে দাবি করা যাবে না।

গ্রামসেবককে কেবল নিয়মিত চরখা চালালেই হবে না। উদরান্নের জন্য তিনি সূত্রধর, কৃষক অথবা চর্মকারের পেশা গ্রহণ করে তাদের হাতিয়ার নিয়ে কাজ করা আরম্ভ করবেন। নিদ্রা এবং বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট আট ঘণ্টা ছাড়া দিনের বাদবাকি সবটুকু সময় তিনি কোন না কোন কাজে মগ্ন থাকবেন। অপচয় করার মত সময় তাঁর থাকবে না। নিজে তিনি তো আলস্যের প্রশ্রয় দেবেনই না, অপর কাউকেও নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে দেবেন না। প্রতিনিয়ত আনন্দজনক শিল্প-উদ্যোগে লেগে থাকার জন্য তাঁর জীবন প্রতিবেশীদের কাছে একটা স্থায়ী আদর্শ স্বরূপ হবে। আমাদের বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অলসতার অবসান ঘটাতে হবে। এ না গেলে কোন ওষুধে কোন কাজ হবে না এবং আজকেরই মত আধা-উপবাস আমাদের চিরস্থায়ী সমস্যা হয়ে থাকবে। যিনি দুই দানা খান তাঁকে চার দানা উৎপন্ন করতে হবে। এই নীতিকে বিশ্বজনীন সত্যের মর্যাদা না দিলে জনসংখ্যার যত হ্রাসই হোক না কেন তাতে সমস্যার সমাধানে কোন সহায়তা মিলবে না। পূর্বোক্ত নীতিকে মেনে নিয়ে যদি তাকে কার্যান্বিত করা যায় তা হলে ভবিষ্যতে আমরা এদেশে বহু লক্ষ নব-জাতকের স্থান সংকুলান করতে পারব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামসেবক কর্মচাঞ্চল্যের জীবন্ত প্রতীক হবেন। কার্পাসের চাষ এবং গাছ হতে তুলা সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে বুনাই পর্যন্ত খাদির যাবতীয় প্রক্রিয়ায় তিনি দক্ষ হবেন এবং এইসব প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করে তোলা তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান স্বরূপ হবে। এ কাজকে তিনি এক বিজ্ঞান রূপে বিবেচনা করলে তা আর তাঁর বিরক্তিকর মনে হবে না। তিনি তখন এর থেকে নিত্য-নূতন আনন্দ পাবেন; কারণ এর মহান্ সম্ভাবনার কথা তিনি তখন উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারবেন। গ্রামে শিক্ষকতার কাজ করার জন্য গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছাত্র হবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ শীঘ্রই তিনি দেখতে পাবেন যে, সরল গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও তাঁর অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। গ্রামীণ জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে। তিনি গ্রামের কুটিরশিল্প খুঁজে বার করবেন এবং সেগুলির বিকাশ ও উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি হয়তো দেখবেন যে, খাদির বাণীর প্রতি গ্রামবাসীদের কোন আকর্ষণ

নেই; কিন্তু নিজের সেবাময় জীবনের দ্বারা তিনি তাঁদের ভিতর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করবেন। তবে তাঁকে নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। এইজন্য কৃষিজীবীদের ঋণের সমস্যা সমাধান করার গুরুদায়িত্ব তিনি নিজের উপর নিতে যাবেন না; কারণ তাঁর পক্ষে এ প্রচেষ্টা নিরর্থক।

গ্রামের সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষার কার্যক্রম তাঁর মনোযোগের বেশ একটা অংশ পাবার দাবি রাখে। তাঁর নিজের বাসস্থান ও তার চতুর্দিকই কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ হলে চলবে না। নিজে ঝাড়ু এবং ঝুড়ি হাতে কাজে লেগে পড়ে সমগ্র গ্রামে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ স্থাপন করবেন।

তবে গ্রামে চিকিৎসালয় স্থাপন করে স্বয়ং তিনি তার ডাক্তার হবার চেষ্টা করবেন না। এসব ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়াই বিধেয়। বিগত হরিজন যাত্রার সময় আমি একটি গ্রামে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, আমাদের জনৈক কর্মী সেখানে একটি বিরাট ইমারৎ বানিয়ে তাতে চিকিৎসালয় স্থাপন করে আশে-পাশের গ্রামে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করছেন। প্রত্যহ স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ঘরে ওষুধ পৌঁছিয়ে দিত এবং আমাকে বেশ গর্ব ভরে জানানো হল যে, সেখানে মাসে তেরো শো রোগী আসে। আমাকে স্বভাবতই ওখানকার কাজের তীব্র সমালোচনা করতে হল। কর্মীটিকে আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ভাবে গ্রামসেবা হয় না। গ্রামসেবকের কাজ রোগ হবার পর তার চিকিৎসা করা নয়, পরিবর্তে গ্রামবাসীদের রোগ প্রতিরোধ করতে শেখাবার জন্য প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য ও সাফাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া। তাঁকে আমি ওই প্রাসাদোপম বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে কোন কুঁড়ে ঘরে থাকার পরামর্শ দিই এবং ওই বাড়িটি লোকাল বোর্ডকে ভাড়া দিয়ে দিতে বলি। ওষুধ বলতে গ্রামসেবকের কাছে কুইনাইন, ক্যাস্টর অয়েল এবং আয়োডিন জাতীয় কয়েকটি মাত্র জিনিস থাকাই যথেষ্ট। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং গ্রামের সাফাই সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করা ও যে কোন মূল্যে তা বজায় রাখার উপর গ্রামসেবককে সমগ্র শক্তি সংহত করতে হবে।

এর পর তাঁকে গ্রামের হরিজনদের কল্যাণের কাজে মনোযোগ দিতে হবে। গ্রামসেবকের ঘরের দরজা তাদের কাছে সদা-উন্মুক্ত থাকবে। সত্য কথা বলতে কি, তাঁরা বিপদ-আপদে পড়লে স্বভাবতই সাহায্যের জন্য তাঁর কাছেই

আসবেন। অপরাপর গ্রামবাসীরা যদি তাঁর ঘরে হরিজনদের আসা পছন্দ না করেন তা হলে তিনি হরিজন পল্লীতে গিয়ে ঘর বাঁধবেন।

এবার অক্ষরজ্ঞান দেবার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা যাক। অক্ষর জ্ঞান দেবার প্রয়োজন থাকলেও এর উপর অনাবশ্যক জোর দেবার বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই। আপনারা এ কথা ধরে নেবেন না যে, গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রথমেই শিশু বা বয়স্কদের লিখতে পড়তে শেখানো দরকার। অক্ষরজ্ঞান হবার পূর্বেই সমসাময়িক ঘটনাবলী, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্ক সম্বন্ধে অনেক কিছু মুখে মুখে শেখানো যায়। চোখ, কান ও জিভের স্থান হাতেরও আগে। লেখার আগেই মানুষ পড়তে শেখে এবং অক্ষর দেখে দেখে লেখার পূর্বে শিশু অঙ্কন বিদ্যা শিখে যায়। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করলে, শিশুর বোধশক্তি অক্ষর-পরিচয়ের মারফত তাকে শিক্ষা দেওয়ার বাঁধাধরা প্রক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর বিকশিত হবে।

কর্মীর জীবন গ্রামের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমান তালে চলবে। গ্রাম-সেবককে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনাগ্রহী পুস্তক-কীট হলে চলবে না। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর কাছে গেলেই দেখতে পাবে যে, তিনি চরখা, তাঁত, বাটালি, কোদাল প্রভৃতি তাঁর কাজ করার হাতিয়ারগুলি নিয়ে কর্মব্যস্ত রয়েছেন। তিনি গ্রামবাসীদের তুচ্ছতম কৌতূহলটির জবাব দেবার জন্য ব্যগ্র থাকবেন। উদরান্নের জন্য শ্রম করার উপর তিনি সর্বদা জোর দেবেন। ঈশ্বর প্রত্যেককে নিজ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তারও অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যদি নিজের উদ্ভাবনী বুদ্ধির প্রয়োগ করে তা হলে তার যোগ্যতার উপযুক্ত (তা যতই কম হোক না কেন) কাজের অভাব হবার কথা নয়। গ্রামবাসী সানন্দে তাঁর ভরণপোষণের ভার নেবে— এইটাই স্বাভাবিক। তবে কোন কোন স্থলে হয়তো তাঁকে লোকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ নাও করতে পারে। কিন্তু তা হলেও তাঁকে নিজের কাজ আঁকড়ে থাকতে হবে। সম্ভবতঃ কোন কোন গ্রামে তাঁকে তাঁর হরিজনদের প্রতি অনুকূল মনোবৃত্তির জন্য একঘরে করা হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি হরিজনদের শরণ নেবেন এবং খাদ্যের সংস্থানের জন্য তাদের দ্বারস্থ হবেন। পরিশ্রমী লোককে সকলে সাগ্রহে কাজ দিতে চাইবে এবং গ্রামসেবক যদি সততা সহকারে হরিজনদের কাজ করে দেন তা হলে তাদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণে সংকোচ বোধ করার প্রয়োজন থাকবে না। তবে তিনি যেটুকু নেবেন তার চেয়ে বেশী

দিতে হবে। প্রথমাবস্থায় সুবিধা থাকলে তিনি কেন্দ্রীয় কোষ থেকে নিজের জন্য যৎসামান্য মাসোহারা নিতে পারেন।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের হাতিয়ার আধ্যাত্মিক। সূক্ষ্ম ভাবে প্রযুক্ত হলেও এ শক্তি অপ্রতিরোধ্য। এর প্রগতি গাণিতিক হারে হয় না, হয় জ্যামিতিক গতিতে। পিছনে চালন-চক্র থাকলে এর গতি রুদ্ধ হবার নয়। সুতরাং আমাদের কার্যকলাপের পটভূমিকা যেন আধ্যাত্মিক হয়, এটি দেখতে হবে। আর এরই কারণে আমাদের চরিত্র ও আচরণে নিখুঁত পবিত্রতার প্রয়োজন।

আমাকে যেন এ কথা না বলা হয় যে, এ এক অসাধ্য কর্ম এবং আপনাদের এর উপযোগী গুণাবলী নেই। এযাবৎ এ কাজ না করে উঠতে পারা ভবিষ্যতে এ পথে চলার বাধা স্বরূপ হওয়া নয়। এই কর্মসূচী যদি আপনাদের মতে যুক্তিযুক্ত হয় এবং এ কথা যদি আপনাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় তা হলে আপনাদের দ্বিধা করা সঙ্গত নয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে সংকোচ করার কোন কারণ নেই। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই উত্তরোত্তর অধিকতর চেষ্টা করার আগ্রহ জাগবে।

হরিজন, ৩১-৮-১৯৩৪

গ্রামসেবকের প্রশ্ন

জনৈক গ্রামসেবক প্রশ্ন করেছিলেন যে, গ্রামবাসীরা যেখানে দুধ, ফল বা শাক-সব্জী ইত্যাদি পায় না, সেখানে গ্রামসেবকের কি এসব খাওয়া উচিত? এর উত্তরে গান্ধীজী লিখলেন:

গ্রামসেবককে এই মূলমন্ত্র স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রামে যদি তিনি গ্রামবাসীদের সেবার জন্য গিয়ে থাকেন তা হলে যে সব খাদ্য খেলে তাঁর শরীর কাজের উপযুক্ত সুস্থ ও সবল থাকবে, তা তাঁর খাওয়া উচিত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, গ্রামসেবকের জীবনমান গ্রামবাসীদের তুলনায় উন্নততর হবে। তবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, কর্মীকে এই সব প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জোগাতে গ্রামবাসীদের তরফে কখনও কোন আপত্তি হয় না। এবিষয়ে কর্মীর বিবেকই মানদণ্ড। কর্মীর ভিতর সংযম থাকা চাই এবং তিনি রসনার পরিতৃপ্তির জন্য আহার করবেন না ও কোন বিলাসব্যসনের প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর জাগরণ কালের সবটুকু সেবা কর্মে উৎসর্গীকৃত হবে। এ সত্ত্বেও দুই চারজন হয়তো

তাঁর জীবনযাপনপ্রণালীর নিন্দা করতে পারেন। এরকম সমালোচনা আমাদের সহ্য করতে হবে। আমি যে ভোজ্য তালিকার কথা বলেছি, একটু পরিশ্রম করলে গ্রামে তা না পাওয়া যাবার কথা নয়। দুধ সাধারণতঃ পাওয়া যায় এবং কুল, করমচা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল সহজে পাওয়া যায় বলে আমরা তার কদর করি না। গ্রামে এমন অনেক উপকারী শাকপাতা নিজে থেকেই জন্মে থাকে যা আমাদের অজ্ঞতা বা আলস্যের (হয়তো বা উন্নাসিকতার) জন্য আমরা ব্যবহার করি না। আমি স্বয়ং এই জাতীয় অনেক শাকপাতা এখন খাচ্ছি। পূর্বে কখনও এসব খাই নি ; কিন্তু এখন দেখছি এসব ব্যবহার করা উচিত ছিল। গ্রামে গো-পালনের খরচ পুষিয়ে যাওয়া উচিত। নিজে অবশ্য আমি এ কাজ করে দেখি নি, তবে মনে হয় যে এ হওয়া উচিত। আমার এও মনে হয় যে, গ্রামসেবক যা খান, গ্রামবাসীদের পক্ষেও তা পাওয়া অসম্ভব নয় এবং এইভাবে উভয়ের জীবনমান সমান স্তরের হতে পারে।

হরিজন, ২৪-৮-১৯৩৫

অলীক ভীতি

অনেক কর্মীর মনে গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে এমন প্রচণ্ড ভয় যে তাঁরা মনে করেন বাইরের থেকে মাসোহারা না পেলে কেবল গ্রামে পরিশ্রম করে তাঁরা নিজেদের প্রতিপালন করতে পারবেন না। বিশেষতঃ কর্মী যদি বিবাহিত হন এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের দায়িত্ব যদি তাঁর থাকে তা হলে এ ভয়ের কোন সীমা থাকে না। আমার মতে এ এক আত্ম-অবমাননাকর বিশ্বাস। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, গ্রামে যদি কেউ শহুরে মনোবৃত্তি নিয়ে যায় এবং সেখানে যদি সে শহুরে জীবনযাপন করতে চায় তা হলে শহরবাসীদের মত গ্রামবাসীদের শোষণ না করে তার পক্ষে এজাতীয় জীবনযাপনের উপযুক্ত যথেষ্ট অর্থ রোজগার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কেউ যদি গ্রামে বসতি স্থাপন করে গ্রামবাসীদের মত জীবনযাপন করতে চায় তা হলে তার পক্ষে পরিশ্রম দ্বারা নিজের উদরান্নের সংস্থান করে নেওয়া খুব কঠিন হবার কথা নয়। তাঁর মনে এইটুকু বিশ্বাস থাকা উচিত, গ্রামবাসীরা যদি তাদের সনাতন ও বুদ্ধির সম্পর্ক রহিত পন্থায় সমগ্র বৎসর কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতে পারে, তা হলে তিনিও একজন গড়পড়তা গ্রামবাসীর সমান রোজগার করতে সমর্থ হবেন। আর এ কাজ তিনি করবেন অপর কোন গ্রামবাসীকে বৃত্তিচ্যুত না করেই। কারণ তিনি কারও উপর

নির্ভরশীল পরগাছার মত গ্রামে যাবেন না, তিনি যাবেন উৎপাদক রূপে।

কর্মীর পরিবারের আকার মোটামুটি ধরনের হলে তাঁর স্ত্রী এবং বাড়ির অপর কেউ পূর্ণ সময়ের কর্মী হবেন। এইরকম কর্মীর শুরুতেই যে গ্রামবাসীদের মত পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকবে, তা নয়। তবে তিনি যদি আত্মগ্লানি এবং ভয়ের প্রভাবমুক্ত হন তা হলে তাঁর এই অপূর্ণতার পরিপূর্তি তিনি বুদ্ধি দিয়ে করে নিতে পারবেন। যতক্ষণ না গ্রামবাসীরা তাঁকে তাঁর পুরা সময় গ্রামের সেবায় দিতে বলছেন, ততক্ষণ তিনি নিছক উপভোক্তা না হয়ে উৎপাদকও হবেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই রকম আহবান এলে সাড়া দেওয়া অন্যায় নয়। কারণ তাঁর প্রেরণায় গ্রামবাসীরা যে অতিরিক্ত উৎপাদন করবে স্বভাবতই তিনি তার একটা অংশের ন্যায়সঙ্গত ভাগীদার। তবে বিগত কয়েক মাসে অখিল ভারত চরখা সংঘের অধীনে পরিচালিত গ্রামসেবার কাজ থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যে, এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বড় ধীরে সাড়া পাওয়া যায়। গ্রামসেবককে তাই গ্রামবাসীদের সম্মুখে সদ্‌গুণাবলী ও কর্মিষ্ঠ বৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ হতে হবে। কর্মী গ্রামবাসীদেরই একজন হয়ে গ্রামে বাস করবেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এমন একজন মোড়ল জাতীয় ব্যক্তি হয়ে পড়বেন না যাকে সম্মানজনক ব্যবধান থেকে ভক্তি করাই কেবল পোষায়। গ্রামবাসীদের কাছে কর্মী হবেন শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং তা হলেই শীঘ্র বা বিলম্বে তিনি গ্রামকে প্রভাবান্বিত করতে পারবেন।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, যে গ্রাম তিনি বেছে নেবেন তাতে কোন্ ধরনের অর্থকরী কাজ তিনি করতে পারেন? গ্রামবাসীরা সাহায্য করুন বা না করুন তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা গ্রাম সাফাইয়ের জন্য রোজ কিছুটা সময় দেবেন। নিজের সাধ্যমত তিনি সহজ সরল চিকিৎসা-প্রণালী দ্বারা গ্রামবাসীদের সাহায্য করবেন। কুইনাইন বা ওই জাতীয় কোন ওষুধ দেওয়া, ঘা হলে গরম জলে ধুয়ে দেওয়া, নোংরা চোখ কান ধুয়ে ফেলা, ঘায়ে পরিষ্কার মলম লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি মোটামুটি চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে পড়ে। গ্রামে রোজ রোজ যে সব অসুখ-বিসুখ হয় তার সরল চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ণনাকারী কোন বই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যাই হোক, পূর্বোক্ত দুটি বিষয় গ্রামসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। এর জন্য প্রত্যহ তার দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয়। গ্রামসেবক-দের কাছে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করা বলে কিছু নেই। তাঁর কাছে গ্রাম-

বাসীদের জন্য কাজ করা প্রেমের তাগিদে করণীয় কর্তব্য। সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত দুই ঘণ্টা ছাড়া জীবিকা অর্জনের জন্য আরও আট ঘণ্টা পরিশ্রম করবেন। মনে রাখতে হবে যে, অখিল ভারত চরখা সংঘ এবং অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ প্রবর্তিত নূতন পরিকল্পনায় সকল প্রকার শ্রমের জন্য একটা ন্যূনতম সমান পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়েছে। এতদনুযায়ী কোন ধুনুরী এক ঘণ্টা ধুনকি চালিয়ে উচিত মত পরিমাণের তুলা ধুনে নিলে তার মজুরী এক ঘণ্টায় অনুরূপ পরিমাণ কর্ম সম্পাদকারী কোন তাঁতী, কাটুনী বা কাগজীর সমানই হবে। সুতরাং কর্মী সহজে যে কাজ করতে পারবেন তা স্থির করে নিয়ে সেই কাজ শিখে নেবার স্বাধীনতা তাঁর আছে। তবে এ ব্যাপারে এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, সেই কাজের দ্বারা উৎপন্ন পণ্য যেন সহজে তাঁর গ্রাম ও তার আশেপাশে বিক্রি হয়ে যায়, অথবা চরখা সংঘের কাছে যেন তার চাহিদা থাকে।

প্রতিটি গ্রামের অধিবাসী যে প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভব করে তা হল সততা সহকারে পরিচালিত একটি দ্রব্যসামগ্রীর দোকান। এখানে ভেজাল-বিহীন খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ বিক্রী হবে। জিনিসের ক্রয়মূল্যের উপর সামান্য কমিশন নেওয়া হবে। এ কথা সত্য যে, দোকান যতই ছোট হোক না কেন, এর জন্য কিছু না কিছু পুঁজির দরকার হয়। তবে যে কর্মীকে তাঁর কর্ম-ক্ষেত্রের কিছুসংখ্যক লোকও অল্পবিস্তর চেনে, তাঁর সততার উপর লোকের এতটুকু আস্থা থাকবে যাতে তিনি ধারে অল্পস্বল্প মাল থোক দরে পেতে পারেন।

এইসব প্রত্যক্ষ সুপারিশের পরিমাণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। চোখ কান খোলা রেখে যে কর্মী কাজ করবেন তিনি নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন এবং কোন্ ধরনের শরীরশ্রমের কাজ করলে নিজের জীবিকা-নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রামবাসীদের আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠবেন—এ কথা শীঘ্রই তিনি নিজেই জানতে পারবেন। তিনি তাই এমন ধরনের শ্রম করার কাজ বেছে নেবেন যার ফলে গ্রামবাসীদের শোষণ হবে না বা যা তাদের স্বাস্থ্য বা সুনীতি জ্ঞানকে আঘাত দেবে না। পক্ষান্তরে তাঁর কাজের ফলে গ্রামবাসীরা তাদের অবকাশ কালকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত কোন শিল্প-উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেদের স্বল্প পরিমাণ উপার্জনকে কিছু মাত্রায় বাড়াবার প্রেরণা পাবে। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির ফলে তাঁর মনোযোগ গ্রামের ঝোপ জঙ্গল সহ যাবতীয় আবর্জনার উপর পড়বে এবং যাবতীয় অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ তিনি খুঁজে বার করবেন। শীঘ্রই তিনি দেখবেন যে এই জিনিসগুলির অধিকাংশ কাজে লাগানো সম্ভব।

তিনি যদি খাবার উপযুক্ত লতাপাতা যোগাড় করতে পারেন তা হলে নিজের খাদ্যের একাংশ উপার্জন করেছেন বলতে হবে। মীরাবেন আমাকে অনেকগুলি মার্বেলের মত সুন্দর সুন্দর পাথর উপহার দিয়েছেন এবং পাথর হিসাবেই সেগুলি বহু রকমের কাজে লাগছে। আমার হাতে যদি একটু সময় থাকত তবে কিছু মামুলি যন্ত্রপাতি কিনে সেগুলিকে আমি বিভিন্ন আকার দিয়ে বাজারে বিক্রি করার উপযোগী পণ্যে রূপান্তরিত করতে পারতাম। কাকা সাহেব আমাকে কতকগুলি বাঁশের টুকরো দিয়েছিলেন। উনান ধরানো ছাড়া ওইগুলি দিয়ে আর কোন কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু অতি সাধারণ একটি ছুরি দিয়ে ওইগুলির কোন কোনটিকে আমি কাগজ কাটা ছুরি এবং কোনটিকে বা চামচে পরিণত করেছি। এসবের একটা সীমিত বাজার আছে। মগনবাড়ীর কোন কোন কর্মী একপাশে লেখা বাজে কাগজ দিয়ে অবসর সময়ে খাম তৈরি করেন।

আসল কথা হচ্ছে, গ্রামবাসীরা সব রকম আশা-ভরসা হারিয়ে বসে আছে। তাদের মনে এই সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে যে, প্রতিটি অপরিচিত ব্যক্তির হাতই তাদের গলা টিপে ধরার জন্য উদ্যত এবং সবাই তাদের ঠকাতেই আসে। বুদ্ধি ও শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে তাদের চিন্তা করার ক্ষমতাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাজের সময়টুকুও তারা ভাল করে কাজ করে না। কর্মী ভালবাসা ও বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে এইসব গ্রামে প্রবেশ করবে। তাঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই যে, মানুষ যেখানে বিনা বুদ্ধিতে পরিশ্রম করে বছরের অর্ধেক দিন বেকার থাকে, সেখানে তিনি বুদ্ধি প্রয়োগে পুরো বছর কাজ করলে অবশ্যই গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করবেন ও এইভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করে সততা সহকারে নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারবেন।

তবুও হবু কর্মীর মনে প্রশ্ন জাগবে, "কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের কি হবে? আর তাদের শিক্ষারই বা কি ব্যবস্থা করা যাবে?" কর্মীর ছেলেপুলেদের যদি আধুনিক শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা থাকে তা হলে আমি কোন কার্যকরী পরামর্শ দিতে অপারগ। তবে কর্মীর সন্তানদের সুস্থ, সবল, সৎ ও বুদ্ধিমান গ্রামবাসী রূপে গড়ে তোলা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং তাদের পিতা যে গ্রামকে নূতন বাসস্থল রূপে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাদের জীবিকানির্বাহের উপযোগী ক্ষমতা-সম্পন্ন করে তোলা যদি এই শিক্ষার মানদণ্ড হয়, তা হলে নিজের বাড়িতে নিজের বাবা মায়ের কাছেই তারা এ শিক্ষা পেতে পারে। এছাড়া এই শিক্ষার কল্যাণে যে দিন থেকে তাদের বোধশক্তি জাগবে এবং নিজেদের হাত পা-কে

বিধিবদ্ধ ভাবে কাজে লাগাতে পারবে, সেই দিন থেকে তারা পরিবারের আংশিক উপার্জনশীল সদস্য হতে পারবে। সুন্দর গৃহের মত ভাল বিদ্যালয় আর নেই, আর সৎ ও চরিত্রবান পিতা-মাতার চেয়ে ভাল শিক্ষকও আর হয় না। আজকালকার হাই স্কুলের শিক্ষা গ্রামবাসীদের বুকের উপর পাষাণভারের মত চেপে বসেছে। তাদের সন্তান-সন্ততি কখনও এ শিক্ষার সুযোগ পাবে না। আর সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতে ভাল রকম শিক্ষা পেলে এর অভাবে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না। গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকা যদি একটি সুন্দর গৃহস্থালী চালাবার উপযুক্ত যোগ্য পুরুষ বা নারী না হন, তা হলে তাঁর গ্রামের কর্মী হবার মত সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদাপ্রার্থী না হওয়াই বিধেয়।

হরিজন, ২৩-১১-১৯৩৫

জনৈক গ্রামসেবকের প্রশ্ন

একটি কর্মী সমাবেশে গান্ধীজীকে বক্তৃতা দিতে বলার পরিবর্তে কর্মীরা তাঁর হাতে একটি প্রশ্ন-তালিকা দিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ জানতে চাইলেন।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল গ্রামসেবকের কর্তব্য সম্বন্ধে। গান্ধীজী বললেন যে, গ্রাম-সেবকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে গ্রামবাসীদের সেবা করা এবং তিনি যদি একাদশ ব্রতকে চির-উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ নিজের সম্মুখে জাগরূক রাখেন তা হলেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে তাঁদের সেবা করতে পারবেন। এই একাদশ ব্রতকে বিনোবা দুটি শ্লোকে গ্রথিত করেছেন এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ আশ্রমের কর্মীরা নিত্যকার প্রার্থনা-সভায় শ্লোক দুটি উচ্চারণ করে থাকেন :

> অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ,
> শরীরশ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন,
> সর্বধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শভাবনা
> হী একাদশ সেবাবী নম্রত্বে ব্রতনিশ্চয়ে।

এর অর্থ হচ্ছে : অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য, প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় না করা, শরীরশ্রম, স্বাদ বৃত্তির উর্ধ্বে ওঠা বা তাকে জয় করা, নির্ভীকত্ব, সকল ধর্মকে সমান জ্ঞান, স্বদেশী, এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন—এই একাদশ ব্রতকে নম্রতা সহকারে পালন করতে হবে।

অপর প্রশ্নটি ছিল গ্রামসেবকের জীবিকা সম্বন্ধে। কর্মী কি ভাবে তা অর্জন

করবে? কর্মী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে মাসোহারা পাবে, না, নিজের শ্রমে অতটা উপার্জন করবে, অথবা এর জন্য গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করবে? গান্ধীজী বললেন যে, সেরা উপায় হচ্ছে গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করা। এতে লজ্জার কারণ নেই, আছে বিনম্রতা। আর এ প্রক্রিয়ার শরণ নিলে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ থাকবে না; কারণ এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যার বাসিন্দারা কর্মীর উচ্ছৃঙ্খলতা বা উদ্দণ্ডতার প্রশ্রয় দেবে। কর্মীকে কাজের সময়ের সবটুকু গ্রামের কাজে দিতে হবে এবং তারপর নিজের প্রয়োজনীয় শস্য ও তরিতরকারি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দরকার পড়লে ডাক খরচ বা ওই জাতীয় নগদ অর্থ ব্যয়ের মত কাজকর্ম করার জন্য তিনি গ্রাম থেকে কিছু টাকা পয়সাও তুলতে পারেন। তবে গান্ধীজীর মতে এ একেবারে অপরিহার্য নয়। গ্রামবাসীর আহ্বানে তিনি যদি সেখানে গিয়ে থাকেন তা হলে গ্রামবাসী সানন্দে তাঁর ব্যয় নির্বাহ করবে। তবে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন গ্রামবাসীরা আর তাঁর অভিমতের সমর্থন করবে না এবং তারা সে অবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সত্যাগ্রহাশ্রমে ১৯১৫ সনে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দেবার পর এরকম ঘটনা ঘটে। এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কর্মীর উচিত খেটে খাওয়া, কোন প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করার মানে হয় না।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল শরীর-শ্রম সম্বন্ধে। গ্রামে গ্রামসেবক থাকার অর্থ এই যে তিনি যথাসাধ্য শরীর-শ্রম করবেন এবং গ্রামবাসীদের আলস্য বর্জন করার শিক্ষা দেবেন। তিনি অবশ্য যে কোন ধরনের কাজ করতে পারেন, তবে ঝাড়ুদারের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ঝাড়ু দেওয়াকে নিঃসন্দেহে উৎপাদক শ্রম বলা চলে। কোন কোন কর্মী যে দৈনিক আধ ঘণ্টা নিছক সেবামূলক অথচ উৎপাদক কাজে নিয়োগ করতে চান, এটা তাঁর খুব পছন্দ। সাফাই কার্যকে নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। আটা পেষাইকেও একই শ্রেণীতে ফেলা যায়। আর অর্থ বাঁচানোর মানেই হল অর্থ উপার্জন করা।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল রোজনামচা লেখা সম্বন্ধে। গান্ধীজীর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না যে, জাগরিত অবস্থার প্রতিটি মিনিটের হিসাব-নিকাশ করার জন্য গ্রামসেবককে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কর্মময় হবে ও নিজের রোজনামচার স্পষ্টভাবে এই কাজের উল্লেখ থাকবে। সত্যকার রোজনামচা বা দিনলিপি লেখকের মন ও আত্মার যথার্থ প্রতিবিম্ব স্বরূপ। তবে

অনেকের পক্ষে হয়তো মনের গতিবিধির যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাঁরা ডায়েরীতে কেবল বাইরের কাজের বিবরণ রাখবেন। তবে এলোমেলো ভাবে এ কাজ করলে চলবে না। কেবল "রান্না ঘরে কাজ করেছি"—এইটুকু লিখলে চলবে না। কেউ রান্নাঘরে সময় নষ্ট করতে পারেন। সঠিক কাজের বিবরণ লিখতে হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল গুজরাতের 'দুবলাদের' মধ্যে কাজ করার সম্বন্ধে। গুজরাতের কোন কোন অঞ্চলে এদের অবস্থা ভূমিদাসের মত। গান্ধীজী বললেন যে, 'দুবলাদের' সেবা করার অর্থ হচ্ছে তাদের দুঃখ কষ্টের অংশীদার হতে প্রস্তুত থাকা। এ ছাড়া এদের মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের হাতে এরা যেন ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় ব্যবহার পায়।

বক্তব্যের পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন,"গ্রামসেবককে রাজনীতি বর্জন করতে হবে। তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন, তবে কোন নির্বাচনী অভিযানে তাঁর যোগ দেওয়া অন্যায় হবে। তাঁর কর্মসূচী স্পষ্ট তাঁর চোখের সামনে থাকবে। গ্রামোদ্যোগ সংঘ এবং চরখা সংঘ উভয়ই কংগ্রেস কর্তৃক সৃষ্ট হলেও এই দুই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে। এইজন্য এই দুই প্রতিষ্ঠান এবং তার সদস্য-কর্মিবর্গ সব রকমের কংগ্রেসী রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। এই হচ্ছে অহিংস প্রক্রিয়া।

"গ্রামের দলাদলিও তিনি এড়িয়ে চলবেন। শহরে যে সব জিনিস না হলে তাঁর চলে না তার অধিকাংশের প্রয়োজনীয়তা বর্জন করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তিনি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করবেন। আমি যদি কোন গ্রামে গিয়ে বসি তা হলে কোন্ কোন্ জিনিস আমি গ্রামে নিয়ে যাব না তা আমাকে পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে। এসব জিনিস মূলতঃ যতই নিরীহ প্রকৃতির হোক না কেন, এ কাজে এজাতীয় সীমারেখা না টেনে উপায় নেই। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে, সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনে এইসব জিনিস খাপ খায় কিনা। তাঁকে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং সকল প্রকার প্রলোভনের বিরুদ্ধে তিনি পাথরের মত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকবেন ও এইভাবে গ্রামবাসীদেরও প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। বিভীষণ একাই যেমন লঙ্কাকে রক্ষা করেছিলেন তেমনি একজন মাত্র শুদ্ধহৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি পুরো একটি গ্রামকে বাঁচাতে পারেন। শোদম ও গোমোরাতে যতদিন

একজনও পবিত্র মানুষ অবশিষ্ট ছিল ততদিন ওই জনপদ দুটির বিনাশ হয় নি।"*

হরিজন, ২৯-২-১৯৩৬

গ্রামসেবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি

যে কার্যক্রম ও জীবনের আদর্শ সম্মুখে রেখে আপনারা কাজ করবেন তার সম্বন্ধে আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই।

ভবিষ্যৎ গড়া বলতে সচরাচর যা বোঝায়, আপনারা তার জন্য এখানে আসেন নি। আজ টাকা আনা পয়সা দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং তার শিক্ষা এক অর্থকরী পণ্যে পর্যবসিত। আপনারাও যদি এই মানদণ্ড স্বীকার করে এসে থাকেন তা হলে নিশ্চয় হতাশ হবেন। আপনাদের প্রশিক্ষণকাল শেষ হলে হয়তো দশ টাকা মাসোহারায় কর্মজীবনের সূত্রপাত হবে এবং এর অবসানও হবে ওই টাকাতেই। কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উচ্চ-পদারূঢ় রাজকর্মচারী যা পান তার সঙ্গে আপনারা যেন নিজেদের অবস্থার তুলনা না করেন।

আমাদের প্রচলিত মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাগতিক অর্থে কোন রকম ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতিশ্রুতি আমরা আপনাদের দেব না এবং প্রত্যুত আপনাদের মনকে আমরা ওই রকম ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে আনতে চাই। মাসিক ছয় টাকায় আপনাদের খাবার খরচ চলে যাবে এই হচ্ছে আমাদের কাম্য। একজন সিভিল সার্ভিসের অফিসার হয়তো মাসে ষাট টাকা ওই বাবদে খরচ করেন। তবে এইজন্য শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে আপনাদের চেয়ে শ্রেয়ঃ এ কথা মনে করার কারণ নেই। এইজাতীয় ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কারণে তিনি হয়তো ওই সব দিক থেকে বিচার করলে আপনাদের থেকে নিম্নস্তরের বলে প্রতিপাদিত হবেন। আমার মনে হয় আপনারা নিজেদের যোগ্যতার পরিমাণ কাঞ্চনমূল্যে করেন না বলেই এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। দুবেলা দুমুঠি কেবল খেতে পাবার বিনিময়ে দেশের সেবা করাতেই আপনাদের আনন্দ। ফাটকা খেলে কেউ হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাজের পক্ষে তিনি হয়তো একেবারে

* বাইবেলে উক্ত প্রাচীন প্যালেস্টাইনের দুটি শহর। নগরবাসীদের দুষ্ট স্বভাবের জন্য স্বর্গের আগুনে শহর দুটি ভস্মীভূত হয়।—অনুবাদক

আযোগ্য হবেন। আমাদের এই অনাড়ম্বর পরিবেশে এসে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন এবং তাঁদের পরিবেশে আমরা অস্বস্তি বোধ করব। দেশের সেবার জন্য আমরা আদর্শ শ্রমিক চাই। যে সব গ্রামবাসীদের সেবা করতে হবে তারা তাঁদের খাওয়া-দাওয়া বা অন্যবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কি ব্যবস্থা করল এ নিয়ে এইসব আদর্শ শ্রমিক মাথা ঘামাবেন না। নিজের প্রয়োজনপূর্তির জন্য তাঁরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবেন এবং সকল রকমের দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা উল্লাস বোধ করবেন। আমাদের দেশের মত যেখানে সাত লক্ষ গ্রাম নিয়ে চিন্তা করতে হয়, সেখানে এইরকমটাই স্বাভাবিক। এ কাজের জন্য নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং পেন্সন ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী বেতন-ভোগী কর্মচারী রাখা পোষায় না। গ্রামবাসীদের বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করাই এ কাজের স্বাভাবিক পুরস্কার।

আপনাদের ভিতর কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে গ্রামবাসীদের জীবনমানও কি এই রকম হবে? না, তা কখনই নয়। এই জাতীয় ভবিষ্যৎ আমাদের মত সেবকদের, আমাদের প্রভু গ্রামবাসীদের নয়। অনেক দিন আমরা ওদের কাঁধে চড়ে কাটিয়েছি। তাই আমাদের প্রভুদের ভাগ্য যাতে আজকের চেয়ে অনেক ভালো হয় তার জন্য স্বেচ্ছায় আমরা এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বরণ করে নিতে চাই। আজ তাদের যা আয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী আয় তারা যাতে করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে। আর গ্রামোদ্যোগ সংঘের লক্ষ্যও তাই। তবে পূর্বে আমি যে রকম সেবকদের কথা বর্ণনা করেছি, অধিক সংখ্যায় সেই রকম সেবক না পেলে সংঘের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। প্রার্থনা করি যেন আপনারা ওই রকম সেবক হতে পারেন।

হরিজন, ২৩-৫-১৯৩৬

জনৈক গ্রামসেবকের প্রশ্ন

শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা 'বীরভূমের জনৈক বিনম্র গ্রামবাসী' দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মারফত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছেন।—

> ১। আপনার বহুমূল্য অভিমত অনুসারে আদর্শ ভারতীয় গ্রামের স্বরূপ কি এবং ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় এই 'আদর্শ গ্রামের' মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোন্ গ্রামকে কতটা নূতন করে গড়ে তোলা সম্ভব?

২। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সমাধানের জন্য কর্মী কোন্‌টিতে সর্বপ্রথম হাত দেবে এবং কি ভাবে সে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবে?

৩। ছোটখাট গ্রাম্য-প্রদর্শনী এবং জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত? পল্লী-পুনর্গঠনের ব্যাপারে কি ভাবে এই সব প্রদর্শনীকে কাজে লাগানো যায়?

উত্তর

১। আদর্শ ভারতীয় গ্রাম এমন হবে যেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিপূর্ণ চিত্র দৃষ্টিগোচর হবে। গ্রামের ঘর তৈরির মাল-মশলা পাঁচ মাইলের মধ্যে থেকে আসবে এবং কুটিরগুলির ভিতর আলো-হাওয়ার প্রাচুর্য থাকবে। ঘরের পিছনে একটি করে উঠান থাকবে—সেখানে গৃহপালিত পশু বেঁধে রাখা হবে। বাড়ির পিছনে ওই জায়গাটুকুতে শাক-সবজির বাগানও করা চলবে। গ্রামের পথেঘাটে যথাসম্ভব কম ধুলো-ময়লা ও আবর্জনা থাকবে। গ্রামে গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মত জলের কুয়া থাকবে ও সেখান থেকে জল নেবার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ থাকবে না। সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের লোকের নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনার গৃহ ওই গ্রামে থাকা চাই। এ ছাড়া সাধারণের মিলন-গৃহ, সার্বজনীন গোচারণভূমি, সমবায়মূলক দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন-ব্যবস্থা গ্রামে থাকবে। গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা চাই ও কারিগরি শিক্ষা সেই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ হবে। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদের সালিশী করার জন্য গ্রামে পঞ্চায়েতও থাকবে। গ্রামে গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাক-সবজি, ফলমূল ও খাদি উৎপন্ন হবে। আদর্শ গ্রাম সম্বন্ধে এই হচ্ছে মোটামুটি আমার কল্পনা। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য গ্রামের ঘরগুলির সামান্য মেরামত ছাড়া বিশেষ হেরফের করা যাবে না। কোন আদর্শবাদী জমিদারের সাহায্য পেলে বা গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাবৃত্তি থাকলে কেবল পূর্বোক্ত আদর্শ বাসগৃহ ছাড়া বাদবাকী সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যায়। এতে এমন একটা ব্যয় পড়বে না যার জন্য সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। সরকারী সাহায্য পেলে তো কথাই নেই। সে ক্ষেত্রে পল্লী-পুনর্গঠনের কার্যক্রমের সম্ভাবনার অন্ত দেখা যায় না। তবে সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা না করে গ্রামবাসীরা কেবল নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য শ্রমদান দ্বারা নিজেদের

উন্নতির জন্য কতটা কি করতে পারে তাই খতিয়ে দেখতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুদ্ধিমান কর্মীর দ্বারা পরিচালিত হলে তারা ব্যক্তিগত আয় শুধু নয়, সমগ্র গ্রামের আয় অনতিবিলম্বে দ্বিগুণ করতে পারবে। আমাদের গ্রামগুলিতে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে এই সম্পদকে সর্বদা ব্যবসার জন্য কাজে লাগানো যায় না; কিন্তু স্থানীয় প্রয়োজনে লাগানোর ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, নিজেদের অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে গ্রামবাসীদের ভিতর প্রবল একটা অনিচ্ছার ভাব দেখা যায়।

২। গ্রামসেবক সর্বপ্রথম গ্রাম-সাফাইয়ের সমস্যার সমাধান করবেন। গ্রামে কাজ করতে গিয়ে কর্মী যে সকল সমস্যার ভারে প্রপীড়িত হন তার মধ্যে এই সমস্যাটি সব চেয়ে বেশী উপেক্ষিত। গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। কর্মী স্বেচ্ছায় 'ভাঙ্গী'র ব্রত গ্রহণ করবেন এবং ইতস্ততঃ যে সব মল পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে তিনি তাকে সারে পরিণত করবেন। এ ছাড়া তিনি গ্রামের পথঘাটও পরিষ্কার করবেন। গ্রামবাসী কোথায় কি ভাবে প্রত্যহ শৌচাদি কর্ম করবেন তার সম্বন্ধে তিনি গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেবেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল্য ও তার অবহেলনার জন্য কী প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধেও তিনি গ্রামবাসীদের জ্ঞান দেবেন। গ্রামবাসীরা তাঁর কথা শুনুন বা না-ই শুনুন, কর্মী নিজের কাজ করে যাবেন।

৩। এইজাতীয় গ্রাম্য প্রদর্শনীর কেন্দ্রবিন্দু হবে চরখা এবং স্থানীয় অবস্থার অনুকূল বিভিন্ন কুটীর-শিল্প চরখার চতুর্দিকে স্থান পাবে। এইভাবে পরিকল্পিত প্রদর্শনী স্বভাবতই গ্রামবাসীদের কাছে প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যম হবে এবং এর সঙ্গে বক্তৃতা, প্রচার পুস্তিকা ও দর্শনীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকলে একেবারে সোনায় সোহাগা হবে।

হরিজন, ৯-১-১৯৩৭

গ্রামসেবা-কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ

পল্লী-পুনর্গঠনের কর্মসূচীর ভিতর যদি গ্রামের সাফাই সন্নিবিষ্ট না হয় তা হলে আমাদের গ্রামগুলি আজকেরই মত গোময় স্তূপ হয়ে থেকে যাবে। গ্রামের সাফাই গ্রাম-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং এ কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ তত কঠিন।

যুগ যুগ ধরে যে অপরিচ্ছিন্নতা চলে আসছে তাকে দূর করা এক বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টা। যে গ্রামসেবক গ্রামের সাফাই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং যিনি কুশলী ঝাড়ুদার নন, তিনি কিছুতেই গ্রামসেবার উপযুক্ত হতে পারবেন না।

এ কথা আজ মোটামুটি স্বীকার করা হয় যে, নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষা ছাড়া ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা দেওরা এক রকম অসম্ভব। গ্রামসেবককে তাই এই শিক্ষাপদ্ধতি শিখে নিতে হবে ও স্বয়ং তাঁকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম স্বভাবতই বুনিয়াদী শিক্ষার অনুগামী হবে। নঈ তালিম যেখানে শিকড় গাড়তে সক্ষম হবে, বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সেখানে পিতা-মাতার শিক্ষক হয়ে পড়বে। যাই হোক না কেন, গ্রামসেবককে বয়স্ক শিক্ষার ভারও নিতে হবে।

নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়ে থাকে। আইনে যত দিন না পুরুষের সমান অধিকার তারা পায় এবং যত দিন না ঘরে কন্যার জন্ম পুত্রসন্তানের জন্মেরই মত অভিনন্দিত হয়, তত দিন বুঝতে হবে যে ভারতবর্ষ আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগছে। নারীদের পদানত করে রাখা অহিংসার অস্বীকৃতি। প্রতিটি গ্রামসেবক তাই বয়স হিসাবে প্রত্যেক নারীকে নিজের মাতা, ভগ্নী বা কন্যা রূপে বিবেচনা করবেন এবং তাঁদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন। একমাত্র এই জাতীয় কর্মীই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জনে কৃতকার্য হবেন।

অসুস্থ জাতির পক্ষে স্বরাজ অর্জন করা অসম্ভব। তাই দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার অপরাধকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। প্রতিটি গ্রামসেবকের স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নীতি জানা অত্যাবশ্যক।

সাধারণ ভাষা না থাকলে কোন জাতিই দানা বাঁধতে পারে না। হিন্দী-হিন্দুস্থানী ও উর্দুর ঝগড়ার মধ্যে না গিয়ে গ্রামসেবক রাষ্ট্রভাষার জ্ঞান অর্জন করবেন। এই রাষ্ট্রভাষা এমন হওয়া দরকার যাতে হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই তা সহজবোধ্য হয়।

ইংরেজী ভাষার প্রতি আমাদের মোহ হেতু আমরা প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রতি অবিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করছি। আর কিছু নয়, একমাত্র এই বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই গ্রামসেবক গ্রামবাসীদের ভিতর নিজ মাতৃ-ভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রয়াস করবেন। ভারতের অপরাপর ভাষার প্রতি গ্রামসেবকের সমান শ্রদ্ধা থাকবে এবং তিনি যেখানে কাজ করবেন সেখানকার

ভাষা তিনি শিখে নেবেন। এইভাবে গ্রামবাসীদের ভিতর তিনি তাদের মাতৃ-ভাষার প্রতি প্রেম গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

আর্থিক সাম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর রচিত না হলে এই কার্যসূচী সবটুকুই বালুচরে ঘর বাঁধার মত ব্যর্থ হবে। আর্থিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে সকলেরই কাছে সম পরিমাণ পার্থিব বস্তু থাকবে। তবে সকলেরই বসবাসোপযোগী ঘর থাকবে, যথেষ্ট ও সুষম খাদ্য জুটবে এবং শরীর আচ্ছাদনের জন্য যথোচিত পরিমাণ খাদি প্রত্যেকে পাবে—এসব নিশ্চয় আর্থিক সাম্যের আওতায় পড়ে। আজকের হৃদয়হীন অসাম্য শুদ্ধমাত্র অহিংস পন্থায় বিদূরিত হবে, এও এর তাৎপর্য।

হরিজন, ১৮-৮-১৯৪০

সামগ্রিক গ্রামসেবা

গঠনমূলক কর্মী সম্মেলনে একটি প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন :

গ্রামের প্রতিটি অধিবাসীর সঙ্গে সমগ্র গ্রামসেবকের পরিচয় থাকবে এবং তিনি তাঁদের সর্বপ্রকারে সেবা করবেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে কর্মী একা হাতে সব করবেন। গ্রামবাসীরা যাতে নিজেরাই নিজেদের কাজ করে নিতে পারেন তার পথ তিনি গ্রামবাসীদের দেখাবেন এবং এর জন্য যে সাহায্য ও মাল-মশলা প্রয়োজন তা তিনি তাঁদের যোগাড় করে দেবেন। তিনি তাঁর সহায়কদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নেবেন। এমন ভাবে তিনি গ্রাম-বাসীদের হৃদয় জয় করে নেবেন যে তাঁরা যেন তাঁর পরামর্শ যাচ্ঞা করেন ও তদনুযায়ী চলেন। আমি যদি ঘানী নিয়ে কোন গ্রামে বসি তা হলে আমি মাসে পনের কুড়ি টাকা রোজগারকারী কোন সাধারণ কলু হব না। আমি হব মহাত্মা কলু। "মহাত্মা" শব্দটি এক্ষেত্রে কৌতুক করে ব্যবহার করলেও আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কলু হিসাবে আমি গ্রামের আদর্শস্থানীয় হব। আমি গীতা ও কোরাণ জানা কলু হব। গ্রামের শিল্পগুলিকে শিক্ষা দেবার মত জ্ঞান আমার থাকবে। সময়াভাবের জন্য এ কাজ আমি হয়তো করে উঠতে পারব না। গ্রামবাসীরা আমার কাছে এসে বলবেন, "অনুগ্রহ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দিন।" উত্তরে আমি বলব, "আপনাদের জন্য আমি একজন শিক্ষক যোগাড় করে দেব, কিন্তু তাঁর খরচ আপনাদের দিতে হবে।" আর সানন্দে তাঁরা এ দায়িত্ব স্বীকার করবেন। গ্রামবাসীদের আমি সূতা

কাটা শিখিয়ে দেব এবং তাঁরা যখন একজন তাঁতী যোগাড় করে দেবার জন্য আমাকে বলবেন তখন যে শর্তে তাঁদের জন্য শিক্ষক জুটিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই শর্তে তাঁতীও যোগাড় করে দেব। আর এই তাঁতী তাঁদের বস্ত্র-বয়নবিদ্যা শিখিয়ে দেবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাফাই-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি তাঁদের সচেতন করে তুলব এবং তাঁরা যখন আমার কাছে এসে একজন ঝাড়ুদার যোগাড করে দিতে বলবেন, আমি তখন বলব, "আমিই আপনাদের ঝাড়ুদার হব এবং এ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়ে দেব।" এই হচ্ছে সমগ্র গ্রামসেবা সম্বন্ধে আমার ধারণা।

হরিজন, ১৭-৩-১৯৪৬

॥ ১১ ॥

ছাত্র সম্প্রদায় ও গ্রাম

পাঠরত অবস্থাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের (এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি কলেজের ছাত্র পড়ে) গ্রামের কাজ করা উচিত। এইভাবে যে সব কর্মী আংশিক সময় দিতে প্রস্তুত, তাদের জন্য নিম্নরূপ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

ছাত্ররা তাদের সমগ্র অবকাশকাল গ্রামসেবায় নিয়োগ করবে। এর জন্য তারা চিরাচরিত পথে ভ্রমণ না করে নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাবে এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে তাঁদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবে। এই অভ্যাসের ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র গড়ে উঠবে এবং তারপর ছাত্ররা যখন সত্যসত্যই তাঁদের মধ্যে বাস করতে যাবে, তখন পূর্ব-পরিচয়ের জন্য তাদের নবীন আগন্তুক মনে করে সন্দেহ করার বদলে গ্রামবাসীরা তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন। দীর্ঘ অবকাশকালে ছাত্ররা গ্রামে থাকবে এবং সেই সময় তারা বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবে এবং গ্রামবাসীদের সাফাইয়ের নিয়মগুলি শেখাবে ও সাধারণ অসুখে রোগীর যত্ন-পরিচর্যা করবে। তারা তাঁদের ভিতর চরখার প্রবর্তন করে প্রতিটি কর্মহীন মুহূর্তের সদুপযোগ শেখাবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ অবকাশের সদুপযোগ সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। সময় সময় অবিবেচক শিক্ষকরা ছুটির পড়া দিয়ে থাকেন। আমার মতে সর্বাবস্থাতেই এ একটা অন্যায় প্রথা। অবকাশ হচ্ছে এমন একটা কাল যখন ছাত্রের মন বাঁধাধরা কাজ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তাকে এ সময় স্বাবলম্বন ও মৌলিক আত্মবিকাশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমি যে

ধরনের গ্রামসেবার কথা উল্লেখ করেছি, নিঃসন্দেহে তা শিক্ষার লঘু কার্যক্রম সমন্বিত শ্রেষ্ঠ আনন্দের ব্যবস্থা। পাঠ সমাপনান্তে সম্পূর্ণভাবে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য এ নিশ্চিত প্রস্তুতির উপায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-১৯২৯

॥ ১২ ॥

নারীজাতি ও গ্রাম

মায়ের জাতকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যায় অস্বীকার করার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। আর নারীরা ছাড়া অপর কে এ শিক্ষাদানের যোগ্য পাত্র? বিনম্র ভাবে আমি তাই বলব যে, অখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে (অল ইণ্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স) তার নামের উপযুক্ত হতে হলে গ্রামে যেতে হবে। প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদির মূল্য আছে; কিন্তু এগুলি কেবল মুষ্টিমেয়-সংখ্যক ইংরেজী-জানা শহুরে লোকের কাছে পৌঁছয়। এখন প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন। আর কোন দিন যদি এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ও, কাজটি বড় সহজ হবে না। কিন্তু কোন রকম ফল লাভ করার আশা করার পূর্বে কোন না কোন দিন এ কাজ তো হাতে নিতেই হবে। অখিল ভারত মহিলা সম্মেলন কি গ্রামোদ্যোগ সংঘের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে? যত যোগ্যই হোন না কেন, কোন গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকা নিছক সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে গ্রামে যাবার আশা করতে পারেন না। গ্রামীণ জীবনের সব কটি দিকে তাঁর কাজের প্রভাব পড়া চাই। আবারও আমি বলছি যে, গ্রামসেবার অর্থ গ্রামবাসীদের কেবল চলনসই লেখাপড়া শেখানো নয়, এর উদ্দেশ্য সত্যকার শিক্ষা। মানুষ বিচারপরায়ণ প্রাণী। তার উপযুক্ত যথার্থ যে জীবন, সে জীবনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা এর অন্যতম লক্ষ্য।

হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৫